জিন্না : পাকিস্তান
নতুন ভাবনা

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৩৯৪ / এপ্রিল ১৯৮৮

প্রচ্ছদপট
অঙ্কন : সুব্রত চৌধুরী
মুদ্রণ : ন্যাশনাল হাফটোন কোং

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও সুব্রত প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৫১ ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা-৯ হইতে আর. রায় কর্তৃক মুদ্রিত

কল্যাণীয়া ঈশাণী (লালটু)

ও তার মত ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের ছাত্রী ও ছাত্রদের হাতে

দিল্লীর গান্ধী সংগ্রহালয়ের নির্দেশক আমার সহকর্মী ডঃ রেজি আহ্‌মদ ও তাঁর সহায়কদের বদান্যতায় এই পুস্তকে উল্লিখিত অধিকাংশ গ্রন্থ পাঠের সুযোগ ঘটেছে। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত জিন্নার চিত্র দুটিও তাঁর সৌজন্যে প্রাপ্ত। মিত্র ও ঘোষের সুহৃদ মণীশ চক্রবর্তী গ্রন্থটির নামকরণ করেছেন। শ্রীমান নৃপেন চক্রবর্তী যত্ন সহকারে মুদ্রণকার্যের ব্যবস্থা করেছে। পরম শ্রদ্ধাভাজন সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয় তাঁর কর্মব্যস্ততার মধ্যেও কেবল আমার প্রতি প্রীতিবশতঃ এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে আমাকে সম্মানিত করেছেন। এঁদের সবাইকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই।

এক বিচ্ছিন্নতাবাদের আঘাতের উপশম হতে না হতেই ভারতবর্ষ আরও একাধিক বিচ্ছিন্নতাবাদের শিকার। অতীতের ভুল-ত্রুটি থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে সাম্প্রতিক কালের বিচ্ছিন্নতাবাদের আক্রমণের সম্মুখীন হবার বুদ্ধি ও সাহসের সন্ধান দিতে যদি এ গ্রন্থ সহায়ক হয় তাহলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বুঝব।

"চারু-নীড়", কামডহরি,
গড়িয়া, কলিকাতা ৭০০০৮৪

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকা

গুজরাতী প্রথা অনুসারে পুত্রের নামের সঙ্গে পিতার নাম যুক্ত করে পরিশেষে যোগ করতে হয় বংশের পদবী। যেমন গান্ধী বংশের করমচাঁদের পুত্র মোহনদাস। যেমন তাতা বংশের নাসরবানজীর পুত্র জামশেটজী। তেমনি খোজানী বংশের ঝীণাভাইয়ের পুত্র মহম্মদালী। বড়ো হয়ে মহম্মদালী তাঁর নামটাকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। মহম্মদ আলী। তাঁর পিতার নামকেও দুই ভাগে বিভক্ত করে প্রথম ভাগটাকেই করেন তাঁর পদবী। দ্বিতীয় ভাগটা বর্জন করেন। বাদ যায় বংশ পদবীও। বিলিতী কায়দায় বানান করতে গিয়ে ঝীণা হয়ে যায় এমন একটি শব্দ যার উচ্চারণ সাহেবদের মুখে জিনা, ভারতীয়দের মুখে জিন্না, আরবদের মুখে জিন্নাহ্। যেমন আল্লাহ্। ইংরেজদের বানানে মহারাজা শব্দটির অন্তেও এইচ জুড়ে দেওয়া হতো। বার্মার অন্তেও। হাওড়ার অন্তে এখনো হয়।

জিন্না সাহেব যে সম্প্রদায়ের মুসলমান তার নাম ইসমাইলিয়া খোজা। একবার এক আইনের কেতাবে দেখেছিলুম, "The term 'Hindu' includes Ismailia Khoja." আইনটা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত। তাই যদি হয় তবে জিন্না সাহেব উত্তরাধিকারসূত্রে হিন্দু। কিন্তু ধর্মবিশ্বাসে মুসলমান। ধর্ম যত সহজে বদলানো যায় উত্তরাধিকার তত সহজে নয়।

গুজরাতী হিন্দুদের অনেকের নাম ঝীণা। তার মানে 'ছোট'। কে জানে 'ছোট' থেকে বড়ো হওয়ার আকাঙ্ক্ষা মহম্মদ আলীর অন্তরে কাজ করছিল কি না। নিজের প্রতিভার জোরে তিনি বড়ো ব্যারিস্টার হয়েছিলেন। বড়ো রাজনীতিক হওয়াও স্বাভাবিক। হলেন শেষ পর্যন্ত একটি নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা গভর্নর জেনারেল। বেঁচে থাকলে প্রেসিডেণ্টও হতে পারতেন। তাঁর মতে পাকিস্তানই নাকি বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা—এটা তাঁর একার সৃষ্টি। গান্ধী না থাকলেও ভারত একদিন না একদিন স্বাধীন হতো। কিন্তু জিন্না না থাকলে পাকিস্তান কি আদৌ সম্ভব হতো? ভারতকে স্বাধীন করার দাবীদার আরো একজন কি দু'জনের নাম শোনা যায়, কিন্তু পাকিস্তানকে স্বতন্ত্র করার দাবীদার আর একজনও নেই। লা শরিক জিন্নাহ্। যেমন লা শরিক আল্লাহ্।

এমন এক ইতিহাস-নির্মাতার ইতিকথা লিখেছেন শ্রী শৈলেশকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায়, যিনি স্বয়ং একজন গান্ধীপন্থী। গান্ধীপন্থীর পক্ষে জিন্না সাহেবকে বোঝাও

সহজ নয়, বোঝানোও সহজ নয়। তবে গান্ধীপন্থীদের আদর্শ হলো খ্রীষ্টপন্থীদের মতো শত্রুকেও ভালোবাসা, অপরাধী হয়ে থাকলে ক্ষমা করা, বিদ্বেষ পুষে না রাখা, মন্দের ভিতর থেকে ভালো আসে এই তত্ত্বে বিশ্বাস বজায় রাখা। চল্লিশ বছর পরে জিন্না সম্বন্ধে সহৃদয়ভাবে বিচার করার সময় এসেছে। সে ভার নিয়েছেন গ্রন্থকার।

ঐতিহাসিক পুরুষরা ইতিহাসের হাতের যন্ত্র হিসাবেই কাজ করে যান। কখনো জ্ঞাতসারে, কখনো অজ্ঞাতসারে। তাঁরা যে কোথা থেকে শুরু করে কোথায় গিয়ে শেষ করবেন তা তাঁরাও আগে থেকে জানেন না। দাবাখেলায় একপক্ষের চাল নির্ভর করে অপরপক্ষের চালের উপরে। ব্রিটিশ শাসকরা একটা চাল দিলে গান্ধীজী দিতেন তার পাল্টা চাল। আর গান্ধীজী একটা চাল দিলে জিন্না সাহেব দিতেন তার পাল্টা চাল। মনে হতো জিন্না সাহেব যেন ব্রিটিশ পক্ষের ডামি। সেটা কিন্তু ঠিক নয়। তিনিও ছিলেন স্বাধীন খেলোয়াড। ব্রিটিশ শাসকরা তাঁকে পদ দিয়ে বা উপাধি দিয়ে কিনে নিতে পারেননি। তিনি ছিলেন আনপার-চেজেবল। ইনকরাপটিবল। অবিকল গান্ধীজীর মতো। তবে শেষের দিকে তাঁর ধারণা জন্মেছিল তাস খেলায় ব্রিটিশ পক্ষই তাঁর ডামি। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলী, ক্যাবিনেট মিশনের নেতা পেথিক-লরেন্স, বড়লাট ওয়েভেল বা মাউণ্ট-ব্যাটেন তাঁর খেলাই খেলবেন, তাঁদের নিজেদের খেলা নয়। দারুণ, নিদারুণ ভ্রম। ইংরেজ আর কারো খেলা খেলে না। সে ফরাসীর কাঁধে বন্দুক রেখে জার্মানের সঙ্গে লড়ে। মুসলমানের কাঁধে বন্দুক রেখে হিন্দুর সঙ্গে লড়ে, মুসলিম লীগের কাঁধে বন্দুক রেখে কংগ্রেসের সঙ্গে লড়ে। মিটমাটের সময় যখন আসে তখন প্রতিপক্ষের সঙ্গে করমর্দন করে। মিত্রকে তেমন পাত্তা দেয় না। তবে একেবারে পথে বসায় না। জিন্না সাহেব পেলেন ঠিক ততখানি, যতখানি ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি মাউণ্টব্যাটেন মানে মানে সাম্রাজ্য গুটিয়ে নেবার সময় কংগ্রেসের সম্মতি নিয়ে দিতে সক্ষম।

গান্ধীজীকে দিয়ে মানিয়ে নিতে পারতেন না, সেটা তিনি জানতেন। কিন্তু গান্ধীজী যদি তাঁর প্রস্তাবে বাধা দিতেন তা হলে তিনি ১৯৪৮ সালের জুন মাসের পূর্বেই প্রদেশওয়ারি ভাবে ক্ষমতা বণ্টন করে দিয়ে যেতেন। ফলে কংগ্রেস পেত আটটি প্রদেশ, সেই আটটিকে নিয়ে কেন্দ্র গঠন করতে পারত, কিন্তু আসামে সৈন্য পাঠাতে পারত না, মাঝখানে পড়ত মুসলিমশাসিত বঙ্গ, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সৈন্য পাঠাতে পারত না, মাঝখানে পড়ত মুসলিমশাসিত পাঞ্জাব। তিনটি প্রদেশ নিয়ে গঠিত পাকিস্তান আরো দুটিকেও কুক্ষিগত করত। গান্ধীজী কি আরো এক দফা সত্যাগ্রহের সাহায্যে ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা করতে পারতেন? না, তার জন্যে

আবশ্যক হতো মাউন্টব্যাটেনের মতি পরিবর্তন নয়, মুসলিম লীগের নীতি পরিবর্তন। তার জন্যে জিন্না সাহেবের সঙ্গে একমত হয়ে প্রত্যেকটি প্রদেশে তথা কেন্দ্রে কংগ্রেস লীগ কোয়ালিশন সরকার গঠন। সেটার জন্যে কংগ্রেসকে তথা হিন্দু সম্প্রদায়কে এত বেশী ত্যাগ স্বীকার করতে হতো যে কংগ্রেস তো নারাজ হতোই, হিন্দু জনমতও বিদ্রোহী হতো। গান্ধীজী আপনাকে শূন্যে পরিণত করেন। কিন্তু জাত বেনিয়া তিনি, যাচাই করে দেখেন ভারতের মুক্তি নামক মুক্তাটা সাচ্চা না ঝুটা। সেটা সাচ্চাই বটে। মাউন্টব্যাটেন ঠকাননি। ভারত সত্যিই মুক্ত, যদিও বিভক্ত।

জিন্না সাহেব যেটা পান সেটাও সাচ্চা। যা মোগল আমলে সম্ভব হয়নি, যা ব্রিটিশ আমলে সম্ভব হতো না, তাই সম্ভব হলো জিন্না-নেতৃত্বে। এই উপমহাদেশের এক-চতুর্থাংশ হলো 'দারুল ইসলাম'। বাকীটা থেকে গেল 'দারুল হরব'। যেমন বরাবর ছিল। মুসলিম দুনিয়ার দিক থেকে কত বড়ো জয়! কৃতজ্ঞ মুসলিম নেশন জিন্নাকে বাদশাহ্ বানাতেও পারত। কিন্তু ন্যাশনালিস্ট হিসাবে তিনি অস্থিরমতি হলেও ডেমোক্রাট হিসাবে স্থিরমতি ছিলেন।

তার মানে তিনি ব্যালটে বিশ্বাস করতেন, বুলেটে নয়। নিতান্ত মরীয়া না হলে তিনি বলতেন না যে তাঁর হাতেও একটা পিস্তল আছে। সেই পিস্তলের নাম ডাইরেক্ট অ্যাকশন। রাশ টানার সাধ্য তাঁর ছিল না, থাকলে মহামারী ঘটে যেত না। খতিয়ে দেখলে মুসলমানই মারা পড়ল বেশী। ভারতবর্ষকে দু'ভাগে বিভক্ত করার ফলে ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজও দু'ভাগে বিভক্ত হলো। চার কোটি মুসলমানকে বিপদে ফেলে তিনি পাকিস্তানে নিষ্ক্রমণ করলেন। কংগ্রেস যদি পাকিস্তানের অনুকরণে হিন্দু রাষ্ট্র পত্তন করত মুসলমানদের দশা হতো যাকে বলে 'না ঘরকা না ঘাটকা'। যেমন দশা হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর পাঞ্জাবী মুসলমান ফৌজের দ্বারা পরিত্যক্ত বিহারী মুসলমানদের। বাংলাদেশ তাদের রাখতে চায় না, পাকিস্তান তাদের নিতে চায় না। কংগ্রেস স্বাধীন ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র করে তাদের প্রথম শ্রেণীর নাগরিকের অধিকার দিয়েছে। জিন্না সাহেবের ইচ্ছা থাকলেও পাকিস্তানে হিন্দু ও শিখদের তিনি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রথম শ্রেণীর নাগরিকত্ব দিয়ে যেতে পারেন নি। হয়তো দিতেন, যদি আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতেন। কিন্তু যাঁদের মদত নিয়ে তিনি তখ্‌তে বসেছিলেন সেই মোল্লারাই তাঁকে শাসিয়ে রেখেছিল। আর তাঁর আসল ক্ষমতা চলে গেছল তাঁর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলী খানের হাতে।

পাকিস্তানী পার্লামেণ্টের কাছে কার্যত প্রধানমন্ত্রীই দায়ী। গভর্নর জেনারেল জিন্না। বিদ্যমান ভারত শাসন আইন অনুসারে তাঁর পাকিস্তানী পার্লামেণ্টের কাছে

দায়ী নন। তাঁর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ব্রিটিশ সরকারের সেক্রেটারি অভ্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরের পর সেই কর্তৃপক্ষই বা কোথায়? গভর্নর জেনারেল অভ্ পাকিস্তান কারো কাছে দায়ী নন। অথচ নামেই সর্বক্ষমতাবান।

জিন্নাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কোয়েটার কাছে এক স্বাস্থ্যকর স্থানে চিকিৎসকের হেফাজতে। সেখানে নাকি তিনি তাঁর চিকিৎসককে বলেন পার্টিশন হচ্ছে তাঁর জীবনের বৃহত্তম ভুল। সেখান থেকে যখন তাঁকে করাচীতে ফিরিয়ে আনা হয় তখন তাঁকে অভ্যর্থনা করতে কেউ বিমান বন্দরে আসেন না। মাটিতে শুইয়ে রাখা হয় তাঁকে। তাঁর দেহের উপর পিঁপড়েরা ঘুরে বেড়ায়। লক্ষ করেন এক বাঙালী মুসলমান বিমানবন্দর কর্মী। মিনিট দশেক পরে তাঁর মন্ত্রীরা আসেন ও তাঁকে সরানো হয়। করাচীতে জন্ম, করাচীতেই মৃত্যু। কিন্তু ভারতীয় হিসেবে নয়, পাকিস্তানী হিসাবে।

তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্বে তিনি ছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম সভ্য, দাদাভাই নওরোজীর রাজনৈতিক শিষ্য। ভারতীয় জাতির জাতীয় স্বার্থের প্রহরী। মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা তিনি সমর্থন করতেন না, তাতে জাতীয় সংহতি ক্ষুন্ন হয়। মুসলিম লীগের গোড়ার দিকে তিনি তার সভ্য হননি। মুসলিম নির্বাচকমণ্ডলী থেকে নির্বাচিত হয়ে কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য হওয়ার পর মুসলিম লীগের সভ্য হন। তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি কংগ্রেস ও লীগ দুই প্রতিষ্ঠানের সভ্য হন কী মনে করে, তখন তিনি উত্তর দেন, "আমি ভারতের জাতীয় স্বার্থের খাতিরে কংগ্রেসের সভ্য, আর মুসলিম সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক স্বার্থের খাতিরে মুসলিম লীগের সভ্য। তখনকার দিনে মালবীয়জী প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা হিন্দু মহাসভাতেও ছিলেন। বৃহত্তর স্বার্থের সঙ্গে ক্ষুদ্রতর স্বার্থের বিরোধ ছিল না। বৃহত্তর স্বার্থ ভারতের স্বরাজ বা হোম রুল। তার প্রথম কিস্তি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। তাতে হিন্দু মুসলমানের স্বার্থ ক্ষুদ্রতর।

তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্বে তিনি কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সেতুবন্ধন করেন। লোকমান্য টিলকের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে তিনি লখনউতে ১৯১৬ সালে কংগ্রেস লীগ চুক্তি সম্পাদনে অগ্রণী হন। তখন তাঁর উপর আস্থা জাগে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের। সরোজিনী নায়ডু বলেন, তিনি হিন্দু মুসলিম ঐক্যের রাজদূত। কংগ্রেসের চেয়ে আরো এক পা এগিয়ে তিনি হোম রুল লীগের সভাপতি হন, যার জন্যে অ্যানী বেসাণ্ট অন্তরীণ হন। জিন্নার প্রতিপত্তি তখন তুঙ্গে। মডারেটদের চেয়ে উচ্চে। এই পর্বে ছেদ পড়ে কংগ্রেস যখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ নীতি গ্রহণ করে। জিন্নার নীতি ননকোঅপারেশন নয়, রেসিপ্রোকাল

কোঅপারেশন। ননভায়োলেণ্ট নয়, কনস্টিটিউশনাল। গান্ধী-নেতৃত্ব তিনি গ্রহণ করতে পারেন না নীতিগত পার্থক্যের দরুন। ব্যক্তিগত সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। গান্ধীজী যখন গণসত্যাগ্রহ আরম্ভ করতে উদ্যত তখন তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বারদোলি গিয়ে রাত্রিবেলা গান্ধীজীর শিবিরে উপস্থিত হন। বলেন গভর্নমেণ্ট সৈন্য আনিয়ে নিয়ে অপেক্ষা করছে, আন্দোলন শুরু হলেই গুলী চলবে। সুতরাং আন্দোলনে ঝাঁপ দেবার আগে বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাই শ্রেয়। তাঁকে নিয়ে জিন্না ও মালবীয় লর্ড রেডিঙের সঙ্গে বসবেন। যদি তিনি রাজী হন। গান্ধীজী রাজী হন না। কিন্তু গণ সত্যাগ্রহের প্রোগ্রাম পরিত্যাগ করেন। যেহেতু যুক্তপ্রদেশে চৌরী চৌরা থানা আক্রমণ করে ক্রুদ্ধ জনতা পুলিশকে পুড়িয়ে মেরেছে সেহেতু দেশ গণসত্যাগ্রহের জন্যে প্রস্তুত নয়। সিদ্ধান্তটা জিন্নার পরামর্শে কি না অনুমানসাপেক্ষ।

তৃতীয় পর্বে জিন্না কংগ্রেসের সভ্য নন, অথচ মুসলিম লীগের সভ্য থেকেও তার মডারেটদের একজন নন। তিনি তাঁর স্বকীয় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টি গঠন করেন কেন্দ্রীয় আইনসভায়। সভ্যদের কেউ বা হিন্দু, কেউ বা পার্শী। সবাই যে মুসলমান তা নয়। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বলতে বোঝায় সরকারের থেকে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট তো বটেই, কংগ্রেসের থেকেও ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট। স্বরাজ পার্টির সভ্যরা ছিলেন কংগ্রেসের লোক। কংগ্রেস কেবল বিরোধিতাই করে। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টি কখনো কংগ্রেসের পক্ষে ও সরকারের বিপক্ষে ভোট দেয়, কখনো সরকারের পক্ষে ও কংগ্রেসের বিপক্ষে। তৃতীয় পর্বে জিন্না একবার লণ্ডনের এক ডিনারে পাকিস্তানের প্রবক্তা চৌধুরী রহমত আলীর দ্বারা নিমন্ত্রিত হন। তাঁকে অনুরোধ করা হয় পাকিস্তানের উদ্যোক্তা হতে। জিন্না বলেন ওটা একটা অবাস্তব স্বপ্ন। তিনি তার পক্ষপাতী নন। ঘটনাটা ১৯৩৪ সালের।

চতুর্থ পর্বে তিনি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টি ভেঙে দিয়ে কেন্দ্রীয় আইন সভায় মুসলিম লীগ পার্টি গঠন করেন। বাইরেও মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হন। ভারতের জাতীয় স্বার্থের চেয়ে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থই ক্রমে ক্রমে বৃহত্তর হতে থাকে। মুসলিম স্বার্থের একমাত্র প্রতিনিধি বলে দাবী করে মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগ একমাত্র মুসলিম প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান হলে কংগ্রেসকে হতে হয় অমুসলিম বা হিন্দু প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস লীগ চুক্তি যদি নতুন করে সম্পাদন করতে হয় তবে কংগ্রেসকে স্বীকার করতে হয় নিছক সাম্প্রদায়িক ভূমিকা। তার কাছে সাম্প্রদায়িক স্বার্থই হয় বৃহত্তর। কংগ্রেস কেমন করে রাজী হয়? তাই কংগ্রেস লীগ চুক্তি সম্পন্ন হয় না। কংগ্রেস একাই অধিকাংশ প্রদেশে সরকার গঠন করে। লীগকে অংশ দেয় না। তাছাড়া লীগের পলিসিও কংগ্রেসের সঙ্গে মেলে না।

কংগ্রেস সব সময় ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে অসহযোগী, লীগ সব সময় নয়। কখনো সহযোগী, কখনো অসহযোগী।

জিন্না তখন থেকেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে কংগ্রেসকে কিছুতেই কেন্দ্রীয় স্তরে একক সরকার গঠন করতে দেবেন না। করতে হবে লীগের সহযোগে ও লীগের শর্তে। নতুবা তিনি দাবী করবেন পাকিস্তান ও তার জন্যে লড়বেন কংগ্রেসের সঙ্গে। ইংরেজ যদি কংগ্রেসের পক্ষ নেয় তবে ইংরেজের সঙ্গেও। রক্তপাত হয় হবে। তার ভয়ে তিনি নিরস্ত হবেন না। কাজটা কি সংবিধানসম্মত হবে? না হলেও তিনি পেছোবেন না। তবে তার আগে পাকিস্তানের ইস্যুতে নির্বাচনে লড়বেন অন্যান্য দলের মুসলমান প্রার্থীদের সঙ্গে। কংগ্রেসপন্থী মুসলমানদের সঙ্গে তো আলবৎ। ওরা হিন্দুর দলে ভিড়েছে। কংগ্রেসের শো বয়।

ভারতের জাতীয় স্বার্থ? সেটার কি কোনো মানে হয়? ভারত একটা ভৌগোলিক অভিধা। সেখানে দুই নেশনের বাস। হিন্দু আর মুসলমান। মুসলিম নেশনের স্বার্থে চাই স্বতন্ত্র বাসভূমি। হিন্দুস্থানের বাইরে পাকিস্তান। দুই স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর মতো দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। পাকিস্তানের বৃহত্তর স্বার্থই মুসলিম লীগের ও তাঁর অন্বিষ্ট। তখনো তিনি জাতীয়তাবাদী, কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নন। তখন তিনি মুসলিম জাতীয়তাবাদী। যেসব মুসলমান ভারতীয় জাতীয়তাবাদী তারা মুসলিম স্বার্থবিরোধী। ধর্মে মুসলমান হওয়া যথেষ্ট নয়. হতে হবে মুসলিম লীগের সভ্য। তাও যথেষ্ট নয়, হতে হবে দুই নেশন তত্ত্বে বিশ্বাসী। বিশ্বাস করতে হবে যে হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায় নয়, দুই নেশন। যেমন ইংরেজ ও ফরাসী। ফরাসীদের দেশে ইংরেজরা বিদেশী, ইংরেজদের দেশে ফরাসীরা বিদেশী। সেই যুক্তি অনুসারে পাকিস্তানে হিন্দুরা বিদেশী, হিন্দুস্থানে মুসলমানরা বিদেশী। বিদেশীদের পাইকারী হারে বিনিময় করতে হবে। যেমন গ্রীস থেকে তুরস্কে, তুরস্ক থেকে গ্রীসে। হিন্দু মুসলিম সমস্যার সমাধান তা হলে পরস্পরের মূলোচ্ছেদ করা।

জিন্না যে প্রত্যয়ে এসে পৌঁছেছিলেন সেটা প্রত্যক্ষ অসত্য। অসত্যের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল হিংসা। সাত-আটশো বছর একসঙ্গে বসবাসের ইতিহাসে এমনতর মহামারীর নজীর একটাও নেই। যত দোষ নন্দ ঘোষ ইংরেজও এর জন্যে দায়ী নয়। ইতিহাসের কাঠগড়ায় জিন্নাকেই জবাবদিহি করতে হবে।

তবে তাঁর দিক থেকেও বলবার আছে যুক্তিযুক্ত কিছু কথা। সরকার থাকলেই তার বিরোধীপক্ষ থাকে। সেই বিরোধী পক্ষের অভাব পূরণের জন্যেই সৃষ্টি হয়েছিল কংগ্রেসের। অগ্রণী হয়েছিলেন অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম প্রমুখ কয়েকজন

ইউরোপীয় তথা ভারতীয় নেতা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হিন্দু মুসলমান পার্শী খ্রীষ্টান। পার্লামেণ্টারি কেতা অনুসারে বিরোধী পক্ষই বিকল্প সরকার গঠনের অধিকারী। বিকল্প সরকার গঠনের সুযোগ পেলে কংগ্রেসই সরকারের মসনদে বসবে। সেই সুযোগটা জোটে ১৯৩৭ সালে ছয়টি প্রদেশে। পরে আরো দুটি প্রদেশে। তখন কংগ্রেস সরকারেরও বিরোধী পক্ষ দেখা দেয়। প্রধানত মুসলিম লীগ। পার্লামেণ্টারি রীতি অনুসারে কংগ্রেস সরকারের বিকল্প সরকার গঠনের অধিকারী মুসলিম লীগ। কিন্তু মুসলিম লীগের যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই সেখানে সে বিকল্প সরকার গঠন করলে সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থাভাজন হবে কী করে? কংগ্রেস যখন মসনদ ছেড়ে জেলে চলে যায় তখন মুসলিম লীগকে সরকার গঠন করতে ডাকা হয় না। সরকারী কর্মচারীরাই মন্ত্রীর পরিবর্তে পরামর্শদাতা হন। সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় মুসলিম লীগ। প্রাদেশিক স্তরেই যদি এ রকম বঞ্চনা ঘটে তবে কেন্দ্রীয় স্তরেও তো সেই রকম ঘটবে। ইংরেজ সরে গেলে দিল্লীর সিংহাসনে বসবে কংগ্রেস, যেহেতু তারই পার্লামেণ্টারি মেজরিটি। কংগ্রেস সরে গেলে লীগকে কি দিল্লীর সিংহাসনে বসতে দেওয়া হবে? সেটা সম্ভব নয়, কারণ তার পার্লামেণ্টারি মেজরিটি থাকবে না, থাকা অসম্ভব। তা বলে কি সে চিরকাল বিরোধী পক্ষে থেকে যাবে? আর কোনো বিকল্প কি নেই? এর উত্তর, আছে, যদি একটি কেন্দ্র না হয়ে দুটি কেন্দ্র হয়। দুই কেন্দ্রের খাতিরে দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান। ইংরেজরাই সেটা সম্পন্ন করে যাক। অন্যথা গৃহযুদ্ধের দ্বারা সেটা রূপায়িত হবে। গৃহযুদ্ধে মুসলিম রেজিমেণ্ট-গুলো যোগ দেবে। মুসলিম জনতাও। হিন্দুরা যেখানে সংখ্যালঘু ও মুসলমানরা সংখ্যাগুরু সেখানে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হবে তলোয়ারের জোরে। তার চেয়ে ভালো হচ্ছে ভদ্রভাবে পাকিস্তান সৃষ্টি করতে দেওয়া। ব্রিটিশ মধ্যস্থতায়।

ব্রিটিশ মধ্যস্থতায় পাকিস্তান গান্ধীজীর মূলনীতিবিরুদ্ধ। তরোয়ালের জোরে পাকিস্তান, সেটাও তাই। কংগ্রেস ও লীগ একমত হয়ে যদি ভারত ভাগ করত তবে তিনি বাধা দিতেন না। সেটা কিন্তু ব্রিটিশ অপসরণের পরে। আগে নয়। জিন্নার জেদ কিন্তু পরে নয়, আগে। শেষ পর্যন্ত যেটা ঘটে সেটা আগেও নয়, পরেও নয়, একই কালে। ব্রিটিশ মধ্যস্থতায়। পনেরোই আগস্ট গান্ধীজী অনশন করেন। আর কংগ্রেস করে উৎসব। সম্ভবপর হিন্দু রাজত্বের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে লীগও করে ধুমধাম।

ব্রিটিশ রাজের একমাত্র উত্তরাধিকারী কংগ্রেস নয়, অন্যতর উত্তরাধিকারী মুসলিম লীগ, এটাই স্বীকার করে নিল উভয় পক্ষ। ক্ষমতা ভাগ করে নয়, ভূমি

ভাগ করে। যে যার ভূমিতে স্বাধীন। এই মীমাংসাই চূড়ান্ত। গান্ধীজী একে রোধ করতে পারতেন। কিন্তু উভয়পক্ষের গ্রহণযোগ্য অন্য কোনো মীমাংসা নির্দেশ করতে পারতেন না। দুর্বলতর কেন্দ্র আর প্রবলতর প্রদেশ কোনো কাজের নয়। কেন্দ্রেও কংগ্রেস লীগের দ্বৈরাজ্য। দ্বৈরাজ্য পরিণত হতো দুই রাজ্যে। গান্ধীজী তাই নীরবে সায় দেন। মৌন সম্মতি। কিন্তু বিয়োগান্ত নাটকের তো সেইখানেই যবনিকাপতন নয়। ট্র্যাজেডির অন্তিম দৃশ্য মহাগুরুনিপাত। দুই রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু দুই সম্প্রদায়ের দুঃসহ বেদনাই তাঁকে কাতর করেছিল। ভিতরে ভিতরে তিনি মৃত্যুর জন্যে আকুল হয়েছিলেন।

আর জিন্না? আমার তো মনে হয় তিনিও মৃত্যুর জন্যে অধীর হয়েছিলেন। মৃত্যুর শয্যায় কে একজন স্তাবক তাঁকে স্তোক দেন, "কায়দে আজম, আপনি অনেক দিন বাঁচবেন।" তিনি উষ্মার স্বরে বলেন, "না।" তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে তাঁকে ব্যবহার করা হচ্ছে, তিনি ব্যবহারকর্তা নন। অত্যন্ত অহঙ্কারী পুরুষ, অন্যের দ্বারা ব্যবহৃত হতেন তিনি! তাঁর নেতৃত্বের ভূমিকা নিঃশেষ। আয়ুও নিঃশেষ।

পাকিস্তানে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। খেলায় বাজী ধরে তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেন। সেটা কংগ্রেসেরই কৌশলে। কংগ্রেস চেয়েছিল পূর্ব পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গ। নইলে দিল্লী নিরাপদ হতো না, কলকাতা লাভ করা যেত না। কংগ্রেস চেয়েছিল দিল্লীর একাধিপত্য। সংবিধান সভায় স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতি তথা ওয়েটেজ প্রথা বিলোপ। সরকারী চাকরিতে স্বতন্ত্র কোটা তথা ওয়েটেজ বর্জন। মুসলিম লীগকে দেশের ও প্রদেশের একাংশ ছেড়ে না দিলে তো লীগ এসব ছেড়ে দিত না। ইংরেজ ভাগ করে দিয়ে গেল এটা পূর্ণ সত্য নয়। কংগ্রেস ভাগ করিয়ে নিল এটাও অনেকটা সত্য। কংগ্রেস নেতারাই গান্ধীজীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাধাদানে নিবৃত্ত করেন। রাজাগোপালাচারী, বল্লভভাই, জবাহরলাল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কৃপালানী। আজাদ বাদে। তিনিই এ কাব্যের উপেক্ষিত। খান্ আবদুল গফফার খান্ তো বিড়ম্বিত। আমরা যেন জিন্নাকেই পুরোপুরি দায়ী না করি। ইংরেজকেও না।

গান্ধীজীর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল ইংরেজ থাকতে হিন্দু মুসলিম সমস্যা মিটবে না, ইংরেজ চলে গেলেই মিটবে। এটাও পূর্ণ সত্য নয়। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব মোগল ও মারাঠার মধ্যেও ছিল। বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা ছিল শিয়া রাজ্য, মোগল সম্রাটরা সুন্নী। বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা সরাসরি ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখত, দিল্লীর আধিপত্য মানত না। ওদের পদানত না করে আওরংজেবের স্বস্তি ছিল না। একচ্ছত্র হতে কেউ পারেননি, অশোকও না, আকবরও না, আওরংজেবও না। এমন যে

দেশ তাকে এক শাসনাধীন করা ভারতীয়দের সাধ্য নয় বলেই ব্রিটিশ শাসন কায়েম হয়েছিল। ব্রিটিশ অপসরণের পর আবার সাধ্যাতীত হতো। এটাই আমাদের ইতিহাসের লিখন। মোগল ও মারাঠার স্থান নেয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ। ইংরেজ গেলে ওরা লড়তে লড়তে দুর্বল হতো, তখন তৃতীয় কোনো এক শক্তি গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ থামিয়ে নিজে গরুড় হতো। মুসলমানরা সবাই স্বেচ্ছায় কংগ্রেসে যোগ দেবে এটা গান্ধীজীর মোহ। তেমনি জিন্না সাহেবের মোহ মুসলমানরা সবাই স্বেচ্ছায় মুসলিম লীগে যোগ দেবে। কংগ্রেসই হচ্ছে ভারতবর্ষ এটা সত্য নয়। তেমনি লীগই হচ্ছে মুসলিম ভারত এটাও নয় সত্য।

হিন্দু হিন্দুই থাকবে, মুসলমান মুসলমানই থাকবে, দুই জুড়ে গিয়ে এক ভারতীয় হবে এ তত্ত্ব কার্যত পরাহত হয়েছে। হিন্দুকে সেকুলার হতে হবে, মুসলমানকে সেকুলার হতে হবে, সেকুলারের সঙ্গে সেকুলার মিলে এক হবে, এর জন্যে যদি দু'তিন শতক সময় লাগে তো সেটাও এমন কিছু বেশী সময় নয় আমাদের পাঁচ হাজার বছরের সুদীর্ঘ ইতিহাসে। ব্যক্তিগত জীবনে যে যা খুশি হোক, কিন্তু সমষ্টিগত জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতাই শ্রেয়। জিন্নাও এটা জানতেন, কিন্তু তাঁর দলবলের হিন্দু ভীতি ও ইংরেজ প্রীতি তাঁকে মুখ্য স্রোত থেকে পৃথক স্রোতে চালিত করে। দেশভাগের পর চেতনা হয়, কিন্তু সেই পৃথক স্রোতের শক্তি তাঁর ব্যক্তিগত শক্তির চেয়ে প্রবল। গান্ধীজীর কাছে যিনি হার মানলেন না তিনি, মোল্লাদের কাছে মানলেন। বেঁচে থাকলে মিলিটারির কাছেও মানতেন। পাকিস্তান পড়ে মোল্লা মিলিটারির যৌথ কবলে। পূর্ব পাকিস্তান মুক্তি পায়। কিন্তু পরে তারও একই পরিণতি। মুক্তিদাতা মুজিব নিহত।

ভারতীয় মুসলমানদের শিকড় যে ভারতে, পাকিস্তানে নয়, আরবে নয়, ইরানে নয়, মধ্য এশিয়ায় নয়, এটা উপলব্ধি করতেও আরো সময় লাগবে। আর হিন্দুদেরও হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে ভারত আর হিন্দু একার্থক নয়, ভারত হিন্দুর চেয়ে বড়ো, হিন্দুর চেয়ে পুরাতন, আর্যের চেয়েও প্রাচীন, বেদের চেয়েও আগেকার। অগ্রাধিকার যদি কারো থাকে তবে তা আদিবাসীদের। তারাই এদেশের রেড ইণ্ডিয়ান। তারাই আদি ভারতীয়। হিন্দু নয়। সবাইকে হিন্দু বানাবার উদগ্র বাসনা ভারতীয় জাতীয়তা-বাদ নয়। জিন্না প্রমুখ ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের আত্মীয় না করে পর করে দেয় ভারতীয় জাতীয়তাবাদের হিন্দু পুনরুজ্জীবনকামী শাখা। প্যান-ইসলামিজমের মতো প্যান-হিন্দুইজম্। জিন্নার কংগ্রেস ত্যাগের পশ্চাতে সেটাও কাজ করছিল। ভারতীয় হতে হলে হিন্দু হতে হবে এমনতর দাবী কেউ করেনি, কিন্তু "বন্দে মাতরম্" গাইতে

হবে, অন্তত গানের সময় উঠে দাঁড়াতে হবে, এটাও ভারতীয়তার নামে হিন্দুত্ব চাপানোর দাবী। অধিকাংশ বাঙালীর বাসভূমি আজ যার নাম বাংলাদেশ। সে দেশে 'বন্দে মাতরম্' কেউ গায় না। প্রায় দশ কোটি বাঙালী তাকে অস্বীকার করেছে।

শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্না সাহেবের রাজনৈতিক বিবর্তনের একটি ধারাবাহিক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন। রোম যেমন একদিনে নির্মিত হয়নি পাকিস্তানও তেমনি একদিনে সংস্থাপিত হয়নি। তার শিলান্যাস হয় গৃহপ্রবেশের চল্লিশ বছর পূর্বে। মুসলিম দরবারীরা যখন বড়লাটের সকাশে গিয়ে স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতির আর্জি পেশ করেন জিন্না তখন তার বিরোধী ছিলেন। অথচ সেদিনকার সেই জিন্নাই বিশ বছর বাদে কট্টর স্বতন্ত্র নির্বাচনবাদী। সার আলী ইমাম ইতিমধ্যেই অনুতপ্ত হয়ে বলেছেন, "এই হতভাগা হাত দিয়ে আমি সেই কাগজে সই করেছিলুম।" জিন্নার মনেও দ্বিধা ছিল। তিনি বার বার প্রস্তাব করেছেন যে তিনি যৌথ নির্বাচনে রাজী হবেন, যদি কেন্দ্রীয় আইনসভায় সংখ্যালঘু মুসলমানদের আরো ওয়েটেজ দেওয়া হয় ও প্রাদেশিক আইন সভায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওয়েটেজ লোপ করা হয়। হিন্দুরা রাজী হবে কেন? হিন্দুদের খরচে কংগ্রেসই বা রাজী হবে কী করে? জিন্না নিজেই ১৯১৬ সালে যে চুক্তি সম্পাদনে সাহায্য করেছিলেন এটা সেই চুক্তির খেলাপ। তবে এর একটা ভালো দিক ছিল। যৌথ নির্বাচন প্রবর্তিত হলে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর-নির্ভর হতো। মুসলিম লীগ হয়তো ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে অবিভক্ত বঙ্গে জয়লাভ করত না। ফলে বঙ্গভঙ্গ হতো না। এটা সম্ভব হলো ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তাঁর রোয়েদাদে স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতি বহাল রেখে বাঙালী হিন্দুদের ওয়েটেজ রদ করায়। শুধু তাই নয়, তাদের আসনসংখ্যা কমিয়ে দেওয়ায়। বাঙালী হিন্দুরা ওয়েটেজও হারাল, যৌথ নির্বাচনও পেল না।

পার্টিশনের পূর্বাহ্ণে বঙ্গকে অবিভক্ত রেখে ভারতের তথা পাকিস্তানের বাইরে রাখার একটা প্রস্তাবও উঠেছিল। হিন্দুরা মুসলিম মেজরিটি মেনে নিত, ওয়েটেজ চাইত না, যদি লীগপন্থী মুসলমানরা যৌথ নির্বাচনে রাজী হতো। তারা নারাজ, তাই কথাবার্তা ভেস্তে যায়। জিন্না স্বতন্ত্র বঙ্গে রাজী ছিলেন, কিন্তু স্বতন্ত্র নির্বাচন ছাড়তে নারাজ। তা হলে কি স্বতন্ত্র নির্বাচন থেকেই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের উদ্ভব? বঙ্গভঙ্গ থেকে স্বতন্ত্র নির্বাচন, স্বতন্ত্র নির্বাচন থেকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। আবার বঙ্গভঙ্গ। মাঝখানে চল্লিশ বছর।

শৈলেশকুমারের এই বাংলা গবেষণা গ্রন্থ আমাদের রাজনৈতিক সাহিত্যে একটি মূল্যবান সংযোজন। আমার নিজের পরিমিত জ্ঞান এই গ্রন্থ পাঠ করে সমৃদ্ধ হয়েছে। কোনো কোনো বিষয়ে ভ্রান্তিরও অপনোদন হলো। আশা করি আমার মতো আরো অনেকের চোখ খুলে যাবে। আমরা সকলেই স্বখাত সলিলে মজ্জমান।

অন্নদাশঙ্কর রায়

জিন্না : পাকিস্তান

নতুন ভাবনা

এই লেখকের অন্যান্য বই

সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ, গান্ধীজীর গঠনকর্ম, সত্যাগ্রহের কথা, বিপ্লবী বন্ধুর প্রতি

অনুবাদ গ্রন্থ

মহাত্মা গান্ধীর—আমার ধ্যানের ভারত, ছাত্রদের প্রতি, সত্যাগ্রহ, আমার ধর্ম, সংযম বনাম স্বেচ্ছাচার, পল্লী পুনর্গঠন, শিক্ষা, আমার জীবন কাহিনী

আলবার্ট আইনস্টাইনের—জীবন-জিজ্ঞাসা

আলডুস হাক্সলের—বিজ্ঞান স্বাধীনতা ও শান্তি, এপ অ্যাণ্ড এসেন্স

কিশোরলাল মশরুওয়ালার—গান্ধী ও মার্কস

সম্পাদিত গ্রন্থ

মহাত্মা গান্ধীর—My Non-violence

আলবার্ট আইনস্টাইনের—My Views

গান্ধী পরিক্রমা ইত্যাদি

॥ ১ ॥

গান্ধী আমার জীবনের ধ্রুবতারা। জিন্না রাজনীতির ক্ষেত্রে কেবল তাঁর প্রতিপক্ষই ছিলেন না, জীবনচর্যার দিক থেকেও এক ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা। তবুও কেন যে আমি পাকিস্তানের জনক কায়েদ-এ-আজম মহম্মদ আলি জিন্নার সম্বন্ধে আলোচনা করতে মনস্থ করেছি, তার কৈফিয়ত দেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

এর কারণ গান্ধীর শিক্ষাতেই নিহিত, তিনি ছিলেন সত্য-সাধক। সত্যের সন্ধানে নিজের জীবনের গোপনতম দুর্বলতাসমূহকেও লোকচক্ষুর সম্মুখে তুলে ধরতে তিনি দ্বিধাবোধ করেননি। তাঁর আত্মকথার পাঠক সত্যের মহিমা সম্বন্ধে সচেতন। জননেতা—বিশেষ করে রাজনৈতিক কর্মী নিজের তাবৎ কার্যকলাপকে সমালোচনার উর্ধ্বে মনে করেন। নচেৎ তাঁর জনপ্রিয়তা কুণ্ঠিত হবার আশঙ্কা। আর জনপ্রিয়তা ও জনসমর্থনই তো রাজনৈতিক নেতার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী আশ্রয়। গান্ধী বোধহয় পৃথিবীর একমাত্র রাজনৈতিক নেতা—যিনি পরবর্তী কালে নয়—নিজের প্রবর্তিত আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে বলতে পারেন যে তাঁর ঐ কার্য "হিমালয় সদৃশ ভ্রান্তি"র দ্যোতক। গান্ধীর জীবন ও উক্তি থেকে এরকম অজস্র উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

বর্তমান লেখকের রাজনৈতিক চেতনার সূত্রপাত হয় ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের আশে-পাশে। মুসলিম লীগ এবং তার নেতা জিন্না তখন স্বাধীনতাপ্রেমী দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং জাতীয়তাবাদী পত্র-পত্রিকা কর্তৃক তীব্রভাবে সমালোচিত। তার ছাপ অন্যান্য দেশবাসীর সঙ্গে সঙ্গে আমার উপরও পড়েছিল। ধীরে ধীরে মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে জিন্না অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক এবং ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত, তাদেরই স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্র। প্রত্যুত ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান লেখক যখন যথাসাধ্য আগস্ট আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল, মুসলীম লীগের তখনকার ভূমিকার জন্য তার নেতা জিন্নাকে দেশদ্রোহী মনে হত। তারপর ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন আমি কংগ্রেসের পূর্ণ সময়ের কর্মী এবং দেশে যখন এক মহা নাটকের—বিভক্ত হয়ে স্বাধীনতা অর্জনের—অনুষ্ঠান হচ্ছে, তখন তো আরও অনেক দেশবাসীর মত নেতিবাদী জিন্নাকে এর খল নায়ক ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারিনি।

প্রায় ঐ সময়েই আমি অবশ্য জিন্না সম্বন্ধে জওহরলালজীর নিম্নোক্ত মন্তব্য পড়ার

সুযোগ পাই :

"যাই হোক, কিছু কিছু পুরাতন নেতা কলকাতা[১] কংগ্রেসের পর কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন এবং তাঁদের মধ্যে জিন্না ছিলেন এক জনপ্রিয় ও বিখ্যাত ব্যক্তি। সরোজিনী নাইডু তাঁকে 'হিন্দু মুসলিম ঐক্যের রাজদূত' আখ্যা দিয়েছিলেন। অতীতে মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের কাছাকাছি আনার কৃতিত্ব বহুলাংশে ছিল তাঁরই।"[২]

কিন্তু জওহরলালজীর পূর্বোক্ত স্বীকৃতির তাৎপর্য তখন আমি অনুধাবন করতে পারিনি। সম্ভবতঃ সেই চল্লিশের দশকের আবেগমণ্ডিত পরিস্থিতিই ছিল এর কারণ। সুতরাং আমার কাছে জিন্না প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িকতাবাদীই রয়ে গেলেন।

মনের বদ্ধ অর্গলে প্রথম আঘাত পড়ল পঞ্চাশের দশকে। আচার্য কৃপালনী প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী "ভিজিল" পত্রিকায় হাসু কেবলরমানীর "পাকিস্তান এক্স্রেইড" প্রবন্ধমালায় ১১ই আগস্ট ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমানদের উত্তাল ক্রন্দন-কোলাহলের মধ্যে স্থায়ীভাবে ভারতবর্ষ ত্যাগ করার চতুর্থ দিনে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্যদের সামনে জিন্নার প্রথম বক্তৃতার অংশবিশেষ পড়লাম। পরে ঐ বক্তৃতা জিন্নার এক জীবনীতেও উদ্ধৃত হয়। তিনি বলেছিলেন :

"আপনারা স্বাধীন। এই পাকিস্তান রাষ্ট্রে আপনাদের ইচ্ছামত মন্দির মসজিদ অথবা অপর যে কোন উপাসনাস্থলে যাবার অধিকার আপনাদের আছে। আপনাদের ধর্ম, জাতি ও সম্প্রদায় যাই হোক না কেন, তার সঙ্গে এই মূল নীতির কোন সম্পর্ক নেই যে আমরা একই রাষ্ট্রের অধিবাসী। আমার মতে এই মূল নীতিকে আমাদের আদর্শ রূপে সদাজাগরূক রাখা কর্তব্য। তাহলে আপনারা দেখবেন যে কালক্রমে হিন্দুরা আর হিন্দু এবং মুসলমানরা আর মুসলমান থাকবে না—ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে নয়, কারণ সেটা হল প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের প্রশ্ন—এ হল রাজনৈতিক অর্থে, রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে।"[৩]

আমি যেন জিন্নাকে নূতন করে আবিষ্কার করলাম। জিন্নার বক্তৃতার ঐ অংশ আমি অন্ততঃ যেসব বহুল প্রচারিত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র পড়তাম তাতে প্রকাশিত হয়নি। আর হলেও আমার নজরে পড়েনি। তাই হাসু কেবলরমানীর রচনায় ঐ উদ্ধৃতি পড়ে চমকিত হলাম। এ তো কোন সাম্প্রদায়িকতাবাদীর উক্তি হতে পারে না।

ঐ পর্যায়ের অপর একটি প্রবন্ধে হাসু কেবলরমানী জানিয়েছিলেন যে পাকিস্তান সৃষ্টি হবার কিছুদিনের মধ্যেই জিন্না সীমান্ত গান্ধী খাঁ আবদুল গফুর খাঁর সঙ্গে

বিবাদ মিটিয়ে নেবার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। কারণ নবসৃষ্ট রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রধান হবার পর তিনি যাঁদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছিলেন, তাঁদের সান্নিধ্যে জিন্না স্বস্তিবোধ করছিলেন না। কিন্তু ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই থেকে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি এবং তার পরিণতিতে ১১ই সেপ্টেম্বরে তাঁর মৃত্যু জিন্নার এই ইচ্ছার পরিপূর্তির পথে বাধা হয়ে দাড়াল।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদের আত্মস্মৃতি "ইণ্ডিয়া উইন্‌স্ ফ্রিডম" ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সেই গ্রন্থটি পড়ার পর ভারত বিভাজনের দায়িত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করার খোরাক পেলাম। মৌলানা লিখেছেন যে উত্তর (তখন সংযুক্ত) প্রদেশে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচন কংগ্রেস ও লীগ একরকম সম্মিলিত ভাবে লড়ে। দুই দলের মধ্যে মোটামুটি এই বোঝাপড়া ছিল যে সম্মিলিত ভাবে উভয় দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে লীগকেও মন্ত্রিসভায় উপযুক্ত স্থান দেওয়া হবে। কিন্তু সময়কালে জওহরলালজীসহ উত্তর প্রদেশের কংগ্রেসী নেতৃবর্গ পূর্ব-প্রতিশ্রুতি মানতে চাইলেন না। তারা দাবি করলেন যে মন্ত্রিসভায় স্থান পেতে হলে বিধান সভার লীগ সদস্যদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বর্জন করতে হবে। তাই স্বভাবতই আলোচনা ভেঙে গেল। এ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে মৌলানা আজাদ বলেছেন:

"উত্তর প্রদেশের লীগের সহযোগিতার প্রস্তাব যদি গ্রহণ করা হত, তাহলে কার্যতঃ মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে যেত। জওহরলালের কাজের ফলে উত্তর প্রদেশের লীগ যেন নবজীবন পেল। ভারতবর্ষের রাজনীতির প্রত্যেক ছাত্রই জানেন যে উত্তর প্রদেশ থেকেই লীগ পুনঃসংগঠিত হয়। শ্রীযুক্ত জিন্না ঐ অবস্থার সুযোগ পূর্ণমাত্রায় নিলেন এবং এমন এক আক্রমণ শুরু করলেন যার পরিণামে পাকিস্তানের জন্ম হল।"[৪]

মৌলানার গ্রন্থ তাঁর "বন্ধু ও সাথী" জওহরলালকে উৎসর্গীকৃত এবং নেহেরুর জীবদ্দশায় প্রকাশিত। তিনি কখনও মৌলানার এই গুরুত্বপূর্ণ উক্তির প্রকাশ্য প্রতিবাদ করেছিলেন বলে জানা নেই। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রপ্রসাদের আত্মকথা পড়ার সময়ও এই ঘটনার উল্লেখ পাই, যদিও ঐ আত্মকথারই এক অংশে সৌম্যভাষী রাজেন্দ্রবাবু জওহরলালজীর কাজের সপক্ষে যুক্তি দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দেও জওহরলাল ঐরকম আর একটি মারাত্মক ভুল করেন যার ফলে জিন্না সীমাবদ্ধ ক্ষমতাযুক্ত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবও আর মানতে অস্বীকার করেন। কিন্তু এইসব গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের কথা পরে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হবে।

যাই হোক, জিন্না সম্বন্ধে নূতন করে মূল্যায়ন করার আগ্রহের সৃষ্টি হল গান্ধী

শতবার্ষিকীতে ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রবীণ সাংবাদিক বি. শিবরাও-এর জিন্না সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম, পরে যা তাঁর একটি গ্রন্থের[৫] অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়। শিবরাও-এর জাতীয় স্তরের নেতাদের সঙ্গে দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল।

বিশের দশকের জিন্নার সঙ্গে আলাপচারির উল্লেখ করে শিবরাও জানাচ্ছেন:

"শ্রীমতী বেসান্ত এবং অন্যান্য লিবারালরা যে কারণে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনকে বিপজ্জনক মনে করতেন জিন্নাও সেই কারণে তার বিরোধী ছিলেন। বিশেষ করে ভারতবর্ষের মুসলমানদের উপর খিলাফৎ আন্দোলনের সম্ভাব্য পরিণাম নিয়ে তাঁর মনে দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। অজ্ঞ এবং ধর্মান্ধ মুসলমানদের আন্দোলনের সহকর্মী করাকে তিনি একান্তভাবে অবিবেচনাপ্রসূত বলে মনে করতেন।"[৬]

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে মোতিলাল নেহেরুর গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাবের সমর্থনে শাসকদের উদ্দেশে তিনি বলেন: "ভারত এক জাতি নয়, এখন একথা আমাদের বলা হচ্ছে। যখন মহাযুদ্ধ চলছিল এবং ভারতবাসীকে রক্ত ও অর্থ দেবার আবেদন জানানো হয়েছিল, তখন আমরা এক জাতি ছিলাম।··· যখন আমরা দায়িত্বশীল সরকার, সংসদায় প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্তির দিকে যথোচিত পরিমাণে অগ্রসর হবার দাবি জানাচ্ছি তখন শুনতে পাচ্ছি যে আমরা এক জাতি অথবা এক রাষ্ট্র নই।"[৭]

একথা সর্বজনবিদিত যে লিবারাল ও সংবিধানপন্থী জিন্না গান্ধীর অসহযোগ কর্মসূচির সঙ্গে সহমত হতে না পেরে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুর কংগ্রেসের পর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন। কিন্তু ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দেও মাহমুদাবাদের রাজা যিনি নিজেকে প্রথমে মুসলমান মনে করতেন. তাঁকে জিন্না কঠোরভাবে বলেছিলেন যে "না, তিনি প্রথমে ভারতবাসী পরে নিজেকে মুসলমান"[৮] বিবেচনা করবেন। অন্ততঃ ত্রিশের দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত তিনি যে জাতীয়তাবাদী ছিলেন একথা তার সমালোচকের পক্ষেও অস্বীকার করা সম্ভব নয়। আমার এক পরম শ্রদ্ধাভাজন অতি প্রবীণ গান্ধীপন্থী শিক্ষাব্রতী এবং গঠনকর্মীর কাছে শুনেছি যে তাঁদের যৌবনে অর্থাৎ ১৯১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয়তাবাদের প্রেরণা তাঁরা পেয়েছিলেন আরও অনেকের সঙ্গে সঙ্গে জিন্নার বক্তৃতায়। সেসব সেকালে মাদ্রাজের নটেশন কোম্পানী পুস্তিকার আকারে মুদ্রিত করে প্রচার করত।

দাদাভাই নৌরজী ও ফিরোজ শা মেটার শিষ্য জিন্না কেবল বিলাত-ফেরত বিখ্যাত ব্যারিস্টারই ছিলেন না, চলন-বলন, পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার এবং মানসিকতার দিক থেকেও ছিলেন সেকালের প্রথা অনুযায়ী পাক্কা সাহেব। নিয়মিত

নমাজ পড়া অথবা দাড়ি রাখা ইত্যাদি ভারতীয় মুসলমানের বাহ্য অভিজ্ঞানের তিনি ধার ধারতেন না। পাঞ্জাবী মুসলমানদের সালোয়ার কুর্তা অথবা যাকে জিন্না টুপি বলা হয়, সেসব পরা (তাও কালেভদ্রে, কোট-প্যান্টেই তিনি বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন) শুরু করেন তিনি ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। গোখলে জিন্না সম্বন্ধে বলতেন যে তিনি হলেন হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। জিন্নাও গোখলে এবং তিলকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন এবং তিলকের বিরুদ্ধে সরকার যখন রাজদ্রোহের অভিযোগ আনে তখন আদালতে জিন্না অত্যন্ত প্রবলভাবে তাঁর পক্ষ সমর্থন করেছিলেন।[৯] জিন্নার রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দিকের কার্যকলাপ দেখে সরোজিনী নাইডুও অনুরূপ মন্তব্য করেন। এরকম মানুষ ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশনে দ্বিজাতি তত্ত্ব প্রচার করবেন এবং মুসলমানদের স্বতন্ত্র বাসভূমি—ভারত বিভাজন করে স্থাপিত পাকিস্তানরূপী সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্রষ্টা হবেন ভাবতে বিস্ময় বোধ হয়।

জিন্না সেকালের মুসলমান সমাজের গোঁড়ামিকে অগ্রাহ্য করে পর্দাবিহীন নিজ পত্নীকে[১০] সভা-সমিতি এবং এমন কি লাটভবনেও নিয়ে যেতেন। মানসিক বিষাদ রোগে আক্রান্ত বেগম জিন্নার স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ না হয়ে গেলে এবং অকালে তিনি জিন্নংবাসিনী না হলে হয়ত বা ভারতীয় মুসলমান নারীদের মধ্যে আধুনিকতা প্রবর্তনের নেত্রীও হতে পারতেন। বি. শিবরাও শুনেছেন যে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে এক-দিন জিন্না "বোম্বে ক্রনিকাল" দৈনিক পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক হর্নিম্যানকে বলছিলেন, "মুসলমানদের যে সম্প্রদায়ে তাঁর জন্ম তাঁরা দশাবতারে বিশ্বাসী এবং উত্তরাধিকার আইন ও সামাজিক প্রথার দিক থেকেও হিন্দুদের সঙ্গে তাঁদের বহুল সামঞ্জস্য আছে।"[১১] আর এটা আদৌ অবিশ্বাস্য নয়। কারণ অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমান হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত বলে হিন্দুসমাজের চালচলন ও প্রথার রেশ তাঁদের মধ্যে থেকে যাওয়াই স্বাভাবিক। জিন্না এই পরিমাণ ধর্মীয় গোঁড়ামিবর্জিত ছিলেন যে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে একবার দিল্লীতে স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুকে হালকা মেজাজে বলেছিলেন, "আমার মনে হয় আমি হিন্দু-মুসলমান সমস্যার একটা সমাধান বাতলাতে পারি। আপনারা আপনাদের গোঁড়া পুরোহিতশ্রেণীকে উৎসাদন করুন এবং আমরাও আমাদের মোল্লাদের ধ্বংস করি—তাহলে সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।"[১২]

সমসাময়িক লেখকেরা জিন্নার যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে তাঁকে চূড়ান্ত বাস্তবতা-নিষ্ঠ, অহমিকাপূর্ণ, রগচটা, উন্নাসিক ও গজদন্ত-গোপুরম্-নিবাসী মনে হয়। অনেকে

বলেন যে তাঁর ভিতর মানবীয় আবেগের ন্যূনতা ছিল। এমন কি তাঁর এককালের ঘনিষ্ঠ সহযোগী চাগলারও অভিমত হল : "জিন্নার মত এমন মানবীয় সংবেদনশীলতা-বিবর্জিত আর কোন মানুষের সম্পর্কে আমাকে আসতে হয়নি। তাঁর আচরণ ছিল হিমশীতল এবং ভাবাবেগবিহীন। আইন এবং রাজনীতি ছাড়া অপর কোন বিষয়ের প্রতি তাঁর অভিরুচি ছিল না।"[১৩] কিন্তু সত্যসত্যই কি তাই? এমন ঘটনার কি নজীর নেই যখন তিনি সাধারণ মানুষের মত আচরণ করছেন, যে মানুষ আবেগ-তাড়িত এবং ভালবাসতে ও ভালবাসা পেতে চায়? সম্প্রতি এমন কতকগুলি ঘটনার কথা জানা গেছে যার কারণ জিন্নার হিমশীতল এবং মানুষের সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবমূর্তি সম্বন্ধে পুনর্বিচার করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

জিন্নার স্ত্রীর শেষকৃত্যের সাক্ষী হবার বিরল সুযোগ চাগলা পেয়েছিলেন। জিন্নার সেই সময়কার অবস্থা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন : "সেই একবার মাত্র আমি জিন্নার আচরণে মানবীয় দুর্বলতার ছায়া প্রত্যক্ষ করেছিলাম : প্রভূত তাঁর চক্ষে জলধারা প্রবাহিত হয়েছিল।"[১৪] ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকার এক প্রবন্ধে[১৫] এই ঘটনা ব্যক্ত হয়েছে যে মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জিন্না তাঁর মোটরগাড়ির বিশ্বস্ত চালক মহম্মদ হানিফ আজাদকে নিজের কামরায় ডেকে একটি বিশেষ আলমারি খুলে তাঁর পরলোকগত পত্নীর ব্যবহৃত কাপড়চোপড় বার করে তাঁর সামনে সাজিয়ে রাখতে আদেশ করতেন। "দীর্ঘকাল নিঃশব্দে সেই বস্ত্রগুলির দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে একসময় তাঁর চক্ষু সজল হয়ে উঠত।"

জিন্নার অন্যতম জীবনীকার হেক্টর বলিথো তাঁর তরুণদের সান্নিধ্যপ্রেমের কথা লিখেছেন, যা "এক নিঃসঙ্গ বয়স্ক ব্যক্তির ব্যর্থ পিতৃমানসিকতার পরিচায়ক।" একটি ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলছেন যে কোন এক নিশীথে জিন্না, "এই কারণে ঘুমোতে পারেননি" যে তাঁর বাড়িতে অতিথি তাঁর এক বন্ধুপুত্র এবং তার সঙ্গী "তার পরদিবস চলে যাবে।" তাঁর জীবনীকার আরও লিখেছেন যে বিখ্যাত হবার বহুদিন পরও জিন্না একবার কোন এক বন্ধুর শিশুপুত্রের জন্য দোল খাওয়া কাঠের ঘোড়া কেনার উদ্দেশ্যে কেমন ভাবে কোন দিকে দৃকপাত না করে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে খেলনার দোকানের দিকে ধাওয়া করেছিলেন।

ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকায় প্রকাশিত অপর একটি প্রবন্ধে[১৬] লেখক জানাচ্ছেন যে তদানীন্তন বিখ্যাত নেতা জিন্না কি ভাবে তাঁর ব্যস্ত কার্যক্রমের ভিতর থেকে সময় বার করে আগ্রায় গিয়ে এক নগর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে একটি হিন্দু যুবকের পক্ষ সমর্থন করে তাকে বিপন্মুক্ত করেছিলেন। বোম্বের বিখ্যাত ব্যারিস্টার এই ঘটনার

পাঁচ বৎসর পূর্বে আইনের পেশা থেকে অবসর গ্রহণ করলেও একটি যুবকের ভবিষ্যৎ এবং তার পিতার মনোভাবের কথা উপলব্ধি করে জিন্না আপাতদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক ঐ কার্য করেছিলেন। জিন্নার ব্যক্তিত্বের কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য দিক বসন্ত কৃপালনীর আত্মস্মৃতিমূলক ঐ রচনায় ফুটে উঠেছে।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরের শেষভাগে জিন্না যখন হিন্দুবিদ্বেষীরূপে তীব্র-ভাবে নিন্দিত তখন তাঁর জন্মস্থান করাচীর এক হিন্দু বন্ধুর পুত্র বসন্ত কৃপালনীর সনির্বন্ধ অনুরোধে আগ্রার জনৈক হিন্দু ব্যবসায়ীর প্রতি করুণাপরবশ হয়ে আদালতে তাঁর পুত্রের পক্ষ সমর্থন করার জন্য তিনি আগ্রা যান। যুবকটির বিরুদ্ধে সেখানকার সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষ এইজন্য সাজানো মামলা দায়ের করেছিল যে সে তাদের উৎকোচ দিতে অস্বীকার করেছে। হিন্দু ভগবান ধোণ্ডে তখন জিন্নার ব্যক্তি-গত পরিচারক এবং কৃপালনীর মতে কায়েদ-এ-আজম "তার প্রতি অত্যন্ত নির্ভরশীল ছিলেন এবং সে ছিল তাঁর প্রায় সব সময়ের সহচর।" কৃপালনী আরও জানিয়েছেন যে কেবল তাকে আর্থিক দিক থেকে সাহায্য করার জন্য জিন্না তাঁকে নিজের ব্যক্তি-গত সহায়কের পদে নিযুক্ত করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে কৃপালনী স্বেচ্ছায় সে কাজ ছেড়ে দেন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে জিন্নার মানবীয় দিক সম্বন্ধে এরকম আরও বহু ঘটনা খুঁজে বার করা যেতে পারে। কিন্তু বর্তমান আলোচনার পক্ষে সে সব বড একটা প্রাসঙ্গিক নয়, কারণ আমাদের মূল জিজ্ঞাসা ভিন্ন। জিন্নার মত মানসিকতা ও পৃষ্ঠভূমির একজন কুশাগ্র বুদ্ধির মানুষ ভারতে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পাকিস্তান নামক এক ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের জনক হবেন—এ যেন ইতিহাসের এক পরম বিস্ময়জনক রহস্য।

ইতিহাসের এই আপাত-অবিশ্বাস্য অথচ সত্য ঘটনার কারণ আবিষ্কারের প্রয়াস আমার কাছে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক মনে হয়েছিল। সুতরাং শিবরাও-এর প্রবন্ধটি পড়ার পর থেকেই জিন্না সম্বন্ধে অধ্যয়ন আমার প্রায় একটা বাতিকে পরিণত হয়। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলি বর্তমান লেখকের সেই জিন্না-জিজ্ঞাসার পরিণাম।

॥ ২ ॥

জিন্নার ধারাবাহিক জীবনী অবলম্বন করে আমরা প্রথমে অগ্রসর হব। তবে ভারতবর্ষে জিন্নার জীবনী নিয়ে গুরুতর আলোচনা তেমন হয়নি বললেই চলে। অথচ তাঁর পরলোকগমনের এতগুলি বছর পর অন্ততঃ তাঁর প্রথম জীবন অর্থাৎ

যখন তিনি নির্ভেজাল জাতীয়তাবাদী ও কংগ্রেসের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন, তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া উচিত ছিল। সুতরাং আমাকে তাঁর প্রথম জীবন অর্থাৎ ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের সূচনায় তাঁর কংগ্রেস ত্যাগ করার সময় পর্যন্ত কালের তথ্যের জন্য প্রধানতঃ পাঁচটি[১] গ্রন্থের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। জিন্নার পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে বহু তথ্য সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়। যথাস্থানে সেসব গ্রন্থের উল্লেখ করা হবে।

ঝিনাভাই পুঞ্জার প্রথম সন্তান মহম্মদ আলী জিন্নার জন্ম ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর[২] করাচী শহরে। সিন্ধু প্রদেশে ভূমিষ্ঠ হলেও তাঁরা গুজরাতের বাসিন্দা (কাঠিয়াওয়াড়ী) শিয়াপন্থী খোজা মুসলমান এবং তাঁর পদবী ছিল ঝিনাভাই[৩]। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লণ্ডনে থাকাকালীন আধুনিক হবার উদ্দেশ্যে পদবীর "ভাই" অংশ বর্জন করে তদানীন্তন ইংরেজ সমাজের রীতি অনুসারে নিজের নাম এম. এ. জিন্না রূপে লেখা আরম্ভ করেন। জিন্না নামেই তিনি সমধিক পরিচিত।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে করাচীর এক মাদ্রাসায় তাঁর বিদ্যারম্ভ হয়।[৪] পরবর্তী বৎসরে তিনি মাদ্রাসা-তুল-ইসলামে ভর্তি হন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বেতে তাঁর পিসিমার বাড়িতে থেকে গোকুলদাস তেজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়লেও পরের বছর আবার করাচীতে ফিরে এসে পুরাতন মাদ্রাসাতেই ভর্তি হন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে করাচীর ক্রিশ্চান মিশনারী সোসাইটির হাইস্কুলে ভর্তি হন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী[৫] ইংলণ্ডে রওনা হন। পিতার উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসায়সূত্রে পরিচিত তাঁর এক ইংরেজ বন্ধুর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে তাঁকে শিক্ষানবিশী করিয়ে ঐদিকে অভিজ্ঞ করে তোলা। কিন্তু সে পেশা তাঁর ভাল না লাগায় বিলাতে পৌঁছবার কয়েক মাসের মধ্যেই ব্যারিস্টারী পড়ার জন্য লিঙ্কনস ইনে যোগদান করেন। ঐ অল্প বয়সে দূর দেশে ভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে এমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া কম মনোবলের পরিচায়ক নয়। গান্ধীও মোটামুটি ঐসময়ে ঐ লিঙ্কনস ইন থেকে ব্যারিস্টার হবার জন্য প্রস্তুতি করছিলেন। তবে বিলাতে ছাত্রাবস্থায় দুই গুজরাতী এবং কাঠিয়াওয়াড়ী ছাত্রের মধ্যে পরিচয় ঘটেছিল কিনা তা জানার কোনো উপায় নেই।

অবশ্য পরিচয় না হবার সম্ভাবনাই অধিক। ভবিষ্যৎ মহাত্মা যখন সেখানে পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে নিরামিষ আহার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন এবং এডুইন আর্নল্ডের গীতা, বুদ্ধচরিত এবং নিউ টেস্টামেণ্ট নিয়ে মগ্ন, ভবিষ্যৎ কায়েদ-এ-আজম তখন ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভবনে দর্শকের আসনে বসে মুগ্ধচিত্তে আইরিশ হোমরুল এবং

নারীমুক্তি সম্বন্ধে দাদাভাই নৌরজীর (তিনি তখন পার্লামেন্টের সদস্য) বক্তৃতা শুনছেন। জিন্নার অপর দুটি অবসর বিনোদনের কেন্দ্র ছিল ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পাঠাগার এবং রবিবারের হাইড পার্ক যেখানে নানা বক্তা বিচিত্র সব বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে অন্যতম তরুণ ভারতীয় ছাত্ররূপে জিন্না ব্যারিস্টারী পাস করলেন। তবে ইতিমধ্যে তিনি ভারতবর্ষের "গ্র্যাণ্ড ওল্ড ম্যান" দাদাভাইকে মনে মনে গুরুরূপে বরণ করে নিয়েছেন। ইচ্ছা ভারতে ফিরে গিয়ে তিনি গুরুর মতোই লিবারাল এবং সংবিধান অনুসারী পার্লামেন্টারিয়ান হবেন।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে জিন্না বোম্বের হাইকোর্টে ব্যারিস্টারী আরম্ভ করলেন। ইতিমধ্যে দাদাভাই-এর সঙ্গে বিলাতের সম্পর্ক ঝালিয়ে নেওয়া ছাড়া তিনি তদানীন্তন কংগ্রেসের অপর প্রথম সারির নেতা গোখলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছেন। কিন্তু (গান্ধীরই মত) প্রথম দিকে পশার না জমায় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি নেন। মাত্র তেসরা নভেম্বর পর্যন্ত সরকারী চাকরি করলেও ঐ অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর ফৌজদারী আইনের জ্ঞানের খ্যাতি রটে যায়। ছয় মাসের মধ্যে চাকরি ছেড়ে আবার তিনি স্বাধীন আইন ব্যবসায়ে ফিরে এলেন। এবারে ভাগ্যদেবী তাঁর প্রতি সদয়। দুই বছরের ভিতর তাঁর মাসিক আয় দুই হাজার টাকার উপর দাঁড়াল। সেকালের হিসাবে সেটা প্রভূত আয়। আর্থিক দিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে এবারে তিনি রাজনীতিতে মন দিলেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে অসুস্থ স্যার ফিরোজ শা মেটার স্থলাভিষিক্ত হয়ে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে তিনি গোখলের সঙ্গে বিলাত যাত্রা করেন। উদ্দেশ্য নির্বাচনের প্রাক্কালে ভারতের স্বায়ত্তশাসনের দাবির সপক্ষে ব্রিটেনের জনমত সৃষ্টি। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ —২৯শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের সে বছরের সভাপতি দাদাভাই নৌরজীর একান্ত সচিব হিসাবে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে যোগদান করেন এবং দুই দিন দুটি প্রস্তাবের উপর বক্তৃতা দেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী কলকাতা-তেই ইণ্ডিয়ান মুসলমান অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। এই স্বল্পজীবী প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ছিল "মুসলমানদের বিশেষ অভাব-অভিযোগ লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরা ও তাঁদের স্বার্থরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর রাজনৈতিক ও আর্থিক উন্নতির জন্য অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করা"। সম্ভবতঃ প্রতিষ্ঠানটি তার কয়েক দিন পূর্বে (১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর ৩০-৩১) ঢাকাতে প্রতিষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের পাল্টা জবাব, যা ছিল কেবল মুসলমানদেরই প্রতিষ্ঠান এবং

যাতে জিন্না জেনেশুনেই যোগ দেওয়া থেকে বিরত ছিলেন। জিন্নার প্রথম যুগের লীগের বিরোধিতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে পরবর্তীকালে লীগের প্রথম দিকের নেতাদের অন্যতম আগা খাঁ মন্তব্য করেন যে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের কঠোরতম বিরোধী "ছিলেন জিন্না যিনি আমি এবং আমার বন্ধু যা কিছু করেছি এবং করার চেষ্টা করছিলাম তার প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছিলেন।...তিনি বলেছিলেন যে আমাদের পৃথক নির্বাচন প্রথার নীতি জাতিকে খণ্ডবিখণ্ড করছিল।"[৬]

এই প্রসঙ্গে লীগের জন্মের নেপথ্য ইতিহাস[৭] ব্যক্ত করা প্রয়োজন—যা অতীব চিত্তাকর্ষক। সিপাহী বিদ্রোহ শেষ মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের নৈতিক সমর্থন ও নেতৃত্ব পাবার ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শ্বেতাঙ্গ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে একটা ব্যাপক শক্তি হিসাবে দানা বাঁধে। বহু অভিজাত মুসলমান আবার মুসলিম শাসন প্রবর্তন করা সম্ভব হবে—এই আশায় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহে যোগ দেন। বিদ্রোহ দমনের পর ইংরেজরা তাই মুসলমানদের প্রতি দুয়োরাণীসুলভ দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করে। আহত অহমিকার জন্য অতীতের শাসক সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী মুসলমানরাও স্বয়ং নূতন শ্বেতাঙ্গ শাসকদের থেকে দূরে সরে থাকেন। এই কারণে বিশেষ করে বঙ্গদেশ (যেখানকার নেতৃবৃন্দ বিদ্রোহের সমর্থক ছিলেন না) ও অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুরা ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরেজের প্রসাদপুষ্ট চাকরি ও অন্যান্য পেশা গ্রহণ করে আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাপন্ন হয়ে ওঠেন। মুসলমান সমাজের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা স্যার সৈয়দ আহমদ (১৮১৭—১৮৯৮) মুসলমানদের অনগ্রসরতার কারণ উপলব্ধি করতে পেরে আলিগড়ে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের (পরে বিশ্ববিদ্যালয়) মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের এই পরামর্শ দেন যে নিজেদের পিছিয়ে পড়া অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা যেন ইংরেজের সঙ্গে সংঘর্ষের পথে না যান। সাম্রাজ্যের স্বার্থে আলিগড়ের মহমেডান অ্যাংলো ও রিয়েণ্টাল কলেজের প্রথম তিন ইংরেজ অধ্যক্ষও স্যার সৈয়দ এবং তাঁর পরলোকগমনের পর কলেজের পরবর্তী কর্তৃপক্ষদের নীতিকে প্রভাবিত করেন। অধ্যক্ষ তিনজন যথাক্রমে বেক্ (১৮৮৩—১৮৯৩), থিয়োডর মরিসন (১৮৯৯—?) এবং আর্চবোল্ড। হিন্দু বিশেষ করে বাঙালী হিন্দুদের নেতৃত্বে পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং রাজনৈতিক ধ্যানধারণায় অনুপ্রাণিত ভারতবাসী ব্রিটিশ প্রজা হিসাবে সমানাধিকার এবং প্রতিনিধিত্বমূলক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে মুখর হতে থাকেন। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বীজ বপন করে তাদের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করার জন্য বঙ্গভঙ্গের ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম দিকে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালী এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

তাই অন্ততঃ মুসলমানদের সপক্ষে আনার জন্য লর্ড কার্জন ঢাকায় গিয়ে প্রকাশ্য সভায় বলেন যে বঙ্গভঙ্গের দ্বারা মুসলমানদের জন্য নিজ অভিরুচি অনুসারে চলার উদ্দেশ্যে একটি পৃথক প্রদেশের সৃষ্টি করাও তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য। নবসৃষ্ট পূর্ববঙ্গ প্রদেশের লেফ্‌টন্যাণ্ট গভর্নর স্যার ব্যামফুল্ড ফুলারের মুসলমানদের তাঁর সুয়োরাণী আখ্যা দেবার কাহিনীও সর্বজনবিদিত। এইভাবে বিভাজনের একদা-বিরোধী ঢাকার নবাব সলিমুল্লা ও আরও অনেক বিশিষ্ট মুসলমানকে কার্জন ব্রিটিশ শাসনের অনুকূল করেন এবং শুরু হয়ে যায় মুসলিম-তোষণের পালা।

বঙ্গভঙ্গ নবজাগ্রত রাজনৈতিক নেতৃত্বের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে স্বাধিকারের দাবিকে দুর্বল করার পরিবর্তে আরও উত্তাল করে তুলল। বৈধানিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। অগ্নিযুগের বাণী : "আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগো রে সকল দেশ!" ইংরেজ শাসকদের প্রতিক্রিয়া হল রোমান সাম্রাজ্যবাদীদের অনুসারী divide et Impera বা ভেদনীতি।

মুসলিম শিক্ষা-সংস্কৃতির তদানীন্তন পীঠস্থল আলিগড় কলেজের সম্পাদক নবাব মহসীন-উল-মুল্ককে কলেজের অধ্যক্ষ আর্চবোল্ড ভারত সরকারের গ্রীষ্মাবাস সিমলায় গভর্নর জেনারেলের একান্ত সচিব কর্নেল ডানলপ স্মিথ ও আরও কয়েকজন বড়লাটের পার্ষদের সঙ্গে সলাপরামর্শ করে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগস্ট একটি চিঠি লেখেন। সে পত্রে এই পরামর্শ দেওয়া হয় যে তিনি যেন অবিলম্বে বড়লাটের কাছে মুসলমানদের একটি প্রতিনিধিমণ্ডল পাঠাবার ব্যবস্থা করেন যাঁরা তাঁকে একটি স্মারকপত্র দেবেন। কেমন ভাষা ও ভঙ্গীতে আবেদনপত্র লিখতে হবে এবং তার বক্তব্য কি হবে সে সবই আর্চবোল্ড ছকে দিয়েছিলেন ও এও জানিয়েছিলেন যে যবনিকার অন্তরাল থেকে তিনি এ ব্যাপারে সব রকমের সাহায্য করতে প্রস্তুত। তদনুসারে নবাব মহসীন-উল-মুল্কের উদ্যোগে ও আগা খাঁর নেতৃত্বে ৭০ জনের একটি প্রতিনিধি দল ১লা অক্টোবর বড়লাটের সঙ্গে দেখা করেন।

কী ভাবে ঐদিন সেই প্রতিনিধিমণ্ডলের দ্বারা মুসলমানদের জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বমূলক স্বায়ত্তশাসনের বদলে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে মনোনীত প্রতিনিধিদের স্বীকৃতির প্রতিশ্রুতি দিয়ে বড়লাট মিণ্টো "কংগ্রেসী আন্দোলনকারী"দের প্রভাব থেকে ৬ কোটি ২০ লক্ষ মুসলমানদের পৃথক করে দেন এবং দিনটি তাই লেডি মিণ্টোর মতে "ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা", একথা তিনি তাঁর ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ঘটনার বিবরণ পেয়ে উল্লসিত ভারতসচিব লর্ড মর্লি ২৬শে অক্টোবর মিণ্টোকে লেখেন : "আপনার মুসলমানদের সম্বন্ধে যা কিছু

আপনি জানিয়েছেন তা হৃদয়গ্রাহী। আমার একটাই দুঃখ যে ঐদিন আমি অশরীরী ভাবে আপনার বাগান-পার্টিতে ঘোরাফেরা করতে পারিনি। সমস্ত ব্যাপারটাই যতটা সম্ভব ভাল হয়েছে এবং ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে আপনার পদমর্যাদা ও ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব সপ্রমাণ করেছে। আপনার কর্তৃত্বের আর একটা সুফল হল এই যে এর ফলে এখানকার সমালোচকদের পরিকল্পনা ও কৌশল একেবারে বানচাল হয়ে গিয়েছে। আর তাঁরা একথা উচ্চারণ করতে পারবেন না যে ভারত সরকারের কার্যকলাপ হল আমলাতন্ত্রের সঙ্গে জনসাধারণের সংঘাতের প্রচলিত ইতিবৃত্ত।"

বড়লাটের কাছে দরবার করে ঐসব মুসলমান নেতারা যে উৎসাহ পেয়েছিলেন তার জের টেনে নভেম্বরের ৬ই নবাব সলিমুল্লা আরও অনেক মুসলমান নেতাদের একটি পরিপত্র পাঠিয়ে মুসলমানদের জন্য পৃথক একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রস্তাব করেন। তদনুসারে বছরের শেষের দিকে ঢাকায় মুসলমান নেতৃবৃন্দের এক সর্বভারতীয় সম্মেলনের শেষে মুসলিম লীগের জন্ম হয়। জন্মলগ্নেই লীগ তার চারিত্র-ধর্মের পরিচয় দিল বঙ্গভঙ্গের সমর্থন এবং বয়কট আন্দোলনের বিরোধিতামূলক প্রস্তাব গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে মুসলমানদের জন্য কেবল ব্যবস্থা পরিষদেই নয়, এমন কি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠানসমূহেও পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা, চাকরির ক্ষেত্রে এবং এমন কি প্রিভি কাউন্সিলেও আসনসংরক্ষণ ইত্যাদি বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবি সময়ে সময়ে মুসলিম লীগের মঞ্চ থেকে উত্থাপিত হত। অবশ্য পরে আমরা দেখব যে ঘটনাচক্রের আবর্তনে এক এক সময়ে লীগের ভূমিকায় কি রকম পরিবর্তন হচ্ছে।

যাই হোক পূর্বে যেমন বলা হয়েছে, জাতীয়তাবাদী জিন্না জন্মমুহূর্তে লীগের সঙ্গে যুক্ত হওয়া থেকে বিরত ছিলেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে জিন্না সুরাট কংগ্রেসে যোগ দিয়ে ঐ প্রতিষ্ঠানের নরম ও চরম পন্থায় বিভক্ত হবার দক্ষযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করেন। পরবর্তী বৎসরের ২৪শে জুন বোম্বে হাইকোর্টে তিলকের কারামুক্তির দাবি জ্ঞাপন করেন। ডিসেম্বরে কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ইতিমধ্যে লীগ মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থার জন্য দাবি করছে বলে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের পয়লা আগস্ট খুব সম্ভব মর্লি-মিন্টো শাসন সংস্কার প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আঞ্জুমান-ই-জিয়া-উল-ইসলাম আহূত এক বিরাট জনসভায় এই মর্মে জিন্না প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে মুসলমান নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ ব্যতিরেকে যেন তাঁদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন ক্ষেত্র নির্ধারণ করা না হয়। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী বোম্বের মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত (১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের মর্লি-মিন্টো শাসন সংস্কারের সৌজন্যে প্রবর্তিত) আসন থেকে বোম্বে

কাউন্সিলের বেসরকারী সদস্যদের দ্বারা জিন্না বড়লাটের কাউন্সিলের (ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে) সদস্য নির্বাচিত হন। দাদাভাই নৌরজীর মত পার্লামেণ্টারিয়ান হয়ে তাঁর দেশসেবার ইচ্ছা এইভাবে পূর্ণ হয়।

এইবার আর এক দফা জিন্নার জীবনপঞ্জী পরিক্রমা স্থগিত রেখে ভারতবর্ষের শাসন সংস্কারের ইতিহাস এবং বিশেষ করে মর্লি-মিণ্টো শাসন সংস্কারের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। কারণ এর সঙ্গে জিন্নার পরবর্তী জীবনপ্রবাহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

॥ ৩ ॥

ভারতবর্ষের শাসন সংস্কারের কথা আলোচনা করতে গেলে স্বভাবতই সর্বাগ্রে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কথা এসে পড়ে, যদিও তার পূর্বসূরী প্রতিষ্ঠান ও নেতৃত্বের কথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। তবে এ ব্যাপারে কংগ্রেসের প্রমুখ ভূমিকার জন্য সঙ্গত কারণেই পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলির তথ্যের জন্য কংগ্রেসের সরকারী ইতিহাসের[১] উপর নির্ভর করতে হয়েছে।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের পরিণামে ভারত শাসনের দায়িত্ব প্রত্যক্ষ ভাবে ইংলণ্ডের ব্রিটিশ সরকারের উপর বর্তাল। সেখানে তখন মোটামুটি গণতন্ত্র ও সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাম্রাজ্যের কালা আদমীদের খোদ ইংরেজদের তুলনায় কিছুটা নিকৃষ্ট দরের মানুষ মনে করার মানসিকতা থাকলেও ওদের রাজনৈতিক অধিকারাবলী থেকে মহারাণীর ভারতীয় প্রজারা একেবারেই বঞ্চিত থাকবে—এমন কথা ওদেশের বেশ কিছু রাজনৈতিক নেতা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এছাড়া ইংরাজী শিক্ষা ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ভারতবাসীদেরও পরিচয় হচ্ছে। তাই স্বভাবতই ব্রিটিশ নাগরিকরা যেসব অধিকার ভোগ করে তা পাবার জন্য ভারতবাসীদের মধ্যেও প্রথমে মৃদুকণ্ঠে এবং তারপর বেশ সরব দাবি উঠতে লাগল। প্রজাবিদ্রোহ কি রূপ নিতে পারে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দেই ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তাই তাঁরা অত্যন্ত সীমিত মাত্রাতে হলেও মহারাণীর ভারতীয় প্রজাদের স্বায়ত্তশাসন, সংবাদপত্রের ও বাক্-স্বাধীনতা, সরকারী চাকরিতে স্থান, অস্ত্র রাখার অধিকার এবং বিচার ব্যবস্থার স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে একটু একটু করে অধিকার দেবার নীতি মেনে নিলেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৮১ থেকে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এদেশে প্রথম হাইকোর্ট এবং সর্বতোভাবে মনোনীত সদস্য সমন্বিত ব্যবস্থাপক সভার (লেজিসলেটিভ কাউন্সিল) প্রবর্তন হল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের জন্ম এবং এতে কোন আশ্চর্যের কারণ নেই যে এর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অ্যালান অক্টেভ হিউম-এর মত মডারেট ইংরেজরাও ছিলেন যাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতবাসীদের রাজনৈতিক চেতনার জাগৃতি যেন বিস্ফোরক অবস্থায় না যায়। ডাফরিনের মত তদানীন্তন এবং ডালহাউসি ও রিপনের মত ভূতপূর্ব বড়লাটের সমর্থনও এর পিছনে ছিল। অতীতের বড়লাটেরা ছাড়াও ইংলণ্ডের অনেক জননেতা হিউমের অনুরোধে বিলাতে ভারতের দাবির অনুকূলে জনমত তৈরী করতেও সম্মত হন।

কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনেই ব্যবস্থাপক সভার সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি ও নির্বাচিত সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, অযোধ্যা ও পাঞ্জাবে ব্যবস্থাপক সভা, ঐসব ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সদস্যদের প্রতিবাদের শুনানীর জন্য ভারতসচিবের কাউন্সিল বাতিল করে হাউস অফ কমন্সে এক স্থায়ী কমিটি ইত্যাদির দাবি জানানো হয়। দ্বিতীয় বৎসরে কংগ্রেসের দাবি হল ব্যবস্থাপক সভার অর্ধেক সদস্য যেন জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হয়। এছাড়া মিউনিসিপ্যালিটি এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ, বণিকসঙ্ঘ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রাদেশিক স্থানীয় কাউন্সিলসমূহে পরোক্ষ নির্বাচন এবং স্থানীয় কাউন্সিল থেকে উচ্চতম কাউন্সিলেও পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা ঐ বৎসরের দাবির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পরবর্তী কয়েক বৎসরেও কংগ্রেসে এজাতীয় প্রস্তাব গৃহীত হল। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস এই অভিমত ব্যক্ত করল যে ভারতের জনসাধারণকে তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা আইন সভায় স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে না দেওয়া পর্যন্ত এদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্রসের "কাউন্সিল রিফর্ম" আইন গৃহীত হয়। এতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহ ও অন্যান্য নির্বাচক মণ্ডলীকে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচনের অধিকার দিলেও আইনতঃ সে নির্বাচন কেবল সুপারিশ মাত্র ছিল। কারণ ঐ তথাকথিত নির্বাচিত সদস্যদের থেকেই ব্যবস্থাপক সভার সদস্য কে কে হবেন তা বাছাই-এর অধিকার সরকারের হাতে রেখে দেওয়া হয়েছিল, যদিও সাধারণতঃ ঐভাবে নির্বাচিত সদস্যদেরই মনোনীত করা হত। পূর্বোক্ত শাসন সংস্কার আইনে উচ্চতম কাউন্সিলে মাদ্রাজ, বোম্বে, বঙ্গদেশ ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশ—তখনকার এই চারটি প্রাদেশিক আইনসভার বেসরকারী সদস্যদের মনোনয়নের দ্বারা এক এক জন করে সদস্য নেবার অধিকার দেওয়া হয়। তাই কংগ্রেস পরবর্তী পাঁচ বছর এর ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং পাঞ্জাবের জন্য প্রাদেশিক বিধানসভার দাবি জানাতে থাকে।

কংগ্রেসের এইসব প্রস্তাব দ্বারা জনমত জাগ্রত করা এবং দেশে পশ্চিমী শিক্ষার বিস্তার ও ব্রিটেনের সংসদীয় প্রথা এবং ইউরোপ আমেরিকার গণতন্ত্রের উদ্ভব-প্রয়াসের সঙ্গে শিক্ষিত ভারতবাসীর আরও বেশী মাত্রায় পরিচয় ইত্যাদির জন্য দেশের প্রায় অদ্বিতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার জন্য দাবি উত্তরোত্তর প্রবল হতে আরম্ভ করল। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দ্বারা প্রতি প্রদেশ থেকে দুইজন করে প্রতিনিধি কমন্স সভায় নেবার দাবি জানানোর সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় আইন সভাগুলিতে আর্থিক বিষয়ের উপর ভোটা-ভুটির ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব করল। এছাড়া বড়লাটের শাসন পরিষদ (একজি-কিউটিভ কাউন্সিল) এবং ভারত সচিবের পরিষদেও ভারতবাসীদের সদস্য হিসাবে নেবার দাবি জানাল কংগ্রেস।

এসব দাবির প্রতিক্রিয়া ব্রিটিশ শাসকদের মধ্যে হল দ্বিবিধ প্রকারে। একদল ভারতে শাসন সংস্কারের সপক্ষে গুরুত্ব সহকারে চিন্তা আরম্ভ করলেন। অপর দল যাঁরা প্রশাসন যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে ছিলেন, তাঁরা যাতে ক্ষমতা না ছাড়তে হয় এর জন্য ভেদনীতির শরণ নিয়ে জনমতের কণ্ঠরোধ করার পরিকল্পনা করলেন। বাংলা এই আন্দোলনে অগ্রণী ছিল বলে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কার্জনের বঙ্গভঙ্গের আদেশ পূর্বোক্ত পরিকল্পনার প্রথম ধাপ রূপে দেখা দিয়েছিল—এ আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখেছি। আমরা এও দেখেছি যে মুসলমানদের জাতীয় আন্দোলনের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য যে প্রয়াস শুরু হয় তার পরিণতি কি ভাবে মুসলীম লীগের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হয়। পূর্ব অধ্যায়ে একথাও বলা হয়েছে যে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক বয়কট আন্দোলন ছাড়াও ভারতের রাজনীতিতে ম্যাৎসিনী, গ্যারিবল্ডি ও ডি ভ্যালেরার আদর্শে অগ্নিযুগের প্রবর্তন হয়েছিল। অর্থাৎ দেশের নবজাগরণকে ব্যাহত করা গেল না।

১৯০৫ থেকে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি বৎসর কংগ্রেসে ভারতীয় জনমতের অধিকতর স্বায়ত্তশাসনের দাবির সোচ্চার সমর্থন হতে লাগল। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সরকারের ভারতে শাসন সংস্কারের অনুকূল লবিও সক্রিয় হয়েছে। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস তাই আসন্ন শাসন সংস্কারকে আগাম অভিনন্দন জানাল এবং এই আশা ব্যক্ত করল যে বিশদ প্রস্তাব যেন উপযুক্ত উদারতাপূর্বক রচিত হয়। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের শাসন সংস্কার আইন (যার সঙ্গে তদানীন্তন ভারতসচিব জন মর্লি ও বড়লাট মিণ্টোর নাম যুক্ত) প্রবর্তিত হল। এর মূল ধারা নিম্নরূপ : উচ্চতর বা সুপ্রীম কাউনসিলে আরও ৬০ জন সদস্য থাকবেন, যার ২৭ জন হবেন নির্বাচিত।

বাকী সদস্যদের মধ্যে ২৮ জন হবেন রাজকর্মচারী এবং অন্যান্য ৫ জন বড়লাট দ্বারা মনোনীত বিভিন্ন সম্প্রদায় ও স্বার্থের বেসরকারী প্রতিনিধি। নির্বাচিত সদস্যরাও বহুলাংশে বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করবেন। সাতটি প্রদেশ থেকে জমিদার, পাঁচটি প্রদেশ থেকে মুসলমান এবং একটি প্রদেশ থেকে (পালা করে) মুসলমান জমিদার এবং বণিক সঙ্ঘগুলি দ্বারা দুই জন নির্বাচিত হবেন। বাকী আসনগুলি অসংরক্ষিত রূপে বিবেচিত হবে এবং ঐ আসনগুলি ভরা হবে (তখনকার) নয়টি প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের বেসরকারী সদস্যদের দ্বারা। এছাড়াও এই শাসনসংস্কারের মাধ্যমে বড়লাট এবং বিভিন্ন প্রদেশের ছোটলাট ও লেফটন্যান্ট গভর্নরদের শাসন-পরিষদে এক এক জন করে ভারতীয় সদস্য নেবার প্রথা প্রবর্তিত হল।

পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন যে এইভাবে মলি-মিন্টো শাসন সংস্কারের মাধ্যমে সর্বপ্রথম সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচনের সূত্রপাত হয়েছিল। এছাড়া মুসলমানদের জন্য জনসংখ্যার হারের তুলনায় অধিক আসন বা সংরক্ষণ দেবার ব্যবস্থাও এই প্রস্তাবে ছিল। অর্থাৎ আগা খাঁর নেতৃত্বাধীন মুসলিম প্রতিনিধিমণ্ডলকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা দীর্ঘদিন বিষবৃক্ষের যে বীজ গোপনে লালন-পালন করেছিলেন এইভাবে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তা উপ্ত হল।

কংগ্রেস স্বভাবতই ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের অধিবেশনে চারটি প্রস্তাবের মাধ্যমে এ সম্বন্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল। ডাঃ সীতারামাইয়া বলছেন:

"প্রথম প্রস্তাবে ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করার ব্যাপারে (কংগ্রেস) আপত্তি জ্ঞাপন করল। নিম্নোক্ত ধারার জন্যও কংগ্রেস অসন্তোষ ব্যক্ত করল: (ক) এক বিশেষ ধর্মমতের অনুগামীদের একান্তভাবে অনুচিত মাত্রাতিরিক্ত প্রতিনিধিত্ব দেওয়া, (খ) নির্বাচকমণ্ডলী এবং ভোটার ও প্রার্থীদের যোগ্যতার ক্ষেত্রে মহামান্য সম্রাটের প্রজাদের মধ্যে অন্যায় ও অপমানজনক ভাবে মুসলমান ও অমুসলমানের পার্থক্য করা।"[২]

প্রস্তাবের অপরাংশ এবং অন্য তিনটি প্রস্তাব গণতান্ত্রিক মানদণ্ডের প্রতি কংগ্রেসের আগ্রহের দ্যোতক হলেও আমাদের বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক বোধে উল্লেখ করা হল না।

নিজেদের কৃতি সম্বন্ধে লর্ড মর্লি অবশ্য স্বীকার করেছিলেন যে, "কেউ যদি একথা বলেন যে শাসন সংস্কারের এই অধ্যায়ের ফলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ভারতবর্ষে সংসদীয় প্রথার প্রবর্তন হয়েছিল, তবে আমি অন্ততঃ তা মানতে পারব না।" পরবর্তী শাসন সংস্কারের প্রবর্তক মণ্টেগু এবং চেমসফোর্ডের বক্তব্য ছিল: "পূর্বতন

সংস্কার ভারতীয় জনমতের সন্তুষ্টিবিধানে অক্ষম এবং আর বেশীদিন ঐ সংস্কার অনুসারে চললে ভারতীয় সদস্যদের সঙ্গে সরকারের মতভেদ আরও তীব্র হবে এবং দায়িত্বের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত সমালোচনা আরও উচ্চকণ্ঠ হবে।"

যাই হোক, তাবৎ আপত্তি সত্ত্বেও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ভারতবাসী মর্লি-মিণ্টো শাসন সংস্কারকে প্রত্যাখ্যান করে নি। আর আমরা দেখেছি যে এই ব্যবস্থা অনুসারে বোম্বে থেকে মুসলমান সদস্যরূপে নির্বাচিত হয়ে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী জিন্না কলকাতায় (তখন ভারতের রাজধানী) বড়লাটের কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর আমরা আবার জিন্নার রাজনৈতিক জীবনের ধারা অনুসরণ করব।

॥ ৪ ॥

বড়লাটের কাউনসিলের সদস্য হিসাবে গোখলের প্রেস বিলের সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন (৮ই ফেব্রুয়ারী) ছাড়াও যে বিষয় নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে খোদ বড়লাটের সঙ্গে বাগ্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে জিন্না ভারতের সংসদীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে এক নূতন ইতিহাস সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে পার্লামেণ্টারিয়ান হিসাবে দেশবাসীর বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেন তা হল দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতবাসীদের স্বাধিকার আন্দোলনের সমর্থন। ভারতের যে দুই নেতাকে ভবিষ্যতে দুই বিরোধী শিবিরের কর্ণধার হতে হয়েছিল তাঁদের প্রথম পরিচয় (সাক্ষাৎভাবে না হলেও) পরস্পরের গুণগ্রাহী হিসাবে—এ ইতিহাসের আর এক খামখেয়ালী। যাই হোক গোখলে কর্তৃক উত্থাপিত ঐ প্রস্তাবের সমর্থনে জিন্না বলেন:

"মাই লর্ড, গোড়াতেই আমি এমন একটি বিষয় সম্বন্ধে বলতে চাই যা অত্যন্ত বেদনাজনক। এই সমস্যাটি এদেশের সর্বস্তরের মানুষের আবেগকে উত্তাল করে তুলেছে এবং তাদের ঘৃণা ও আতঙ্কের ভাবকে উত্তুঙ্গে উপনীত করেছে। বিষয়টি হল—দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর প্রতি অত্যন্ত রূঢ় ও নিষ্ঠুর আচরণ।

সভাপতি (বড়লাট লর্ড মিণ্টো):

"মান্যবর মহোদয়কে শান্ত হতে (to order) বলতে হচ্ছে। আমার মতে 'নিষ্ঠুরতা' শব্দটি অত্যন্ত কঠোর। মাননীয় সদস্য মনে রাখবেন যে তিনি সাম্রাজ্যের এক বন্ধুত্বসম্পর্কযুক্ত অঙ্গের সম্পর্কে কথা বলছেন এবং তাই তাঁর ভাষাও পরিস্থিতি অনুকূল হওয়া উচিত।

মাননীয় শ্রীযুক্ত জিন্না ঃ

"মাই লর্ড, আমার আরও কঠোর শব্দ প্রয়োগের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমি এই কাউন্সিলের বিধান সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে সচেতন এবং তাই আমি এক মুহূর্তের জন্যও সে বিধান ভঙ্গ করতে চাই না। তবুও আমি বলছি যে ভারতবাসীদের প্রতি যে ব্যবহার করা হচ্ছে তা অকল্পনীয় রকমের রূঢ়তম এবং পূর্বেই আমি যে কথা বলেছি এর কারণে এদেশের মনোভাব বাদ-বিবাদের উর্দ্ধে।"[১]

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬—২৯শে ডিসেম্বর এলাহাবাদের ২৫তম কংগ্রেস অধিবেশনে জিন্না সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন ব্যবস্থার নিন্দা করে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন।[২] মাত্র কিছুদিন পূর্বে মর্লি-মিণ্টো শাসন সংস্কারের মাধ্যমে মুসলমানরা এই অধিকার পেয়ে উল্লসিত। ঐসময়ে এর প্রকাশ্য বিরোধিতা করতে বুকের পাটার দরকার ছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখনীয়, আর এক জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা এবং রাজেন্দ্রপ্রসাদের প্রায় গুরুস্থানীয় বিহারের মৌলভী মজরুল হক্ ছিলেন এই প্রস্তাবের সমর্থক। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে জিন্না মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলা বোর্ড প্রমুখ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবির কথা বিরোধিতা করে মন্তব্য করেন যে এ মত "তাঁর ব্যক্তিগত" এবং "মুসলমান সম্প্রদায়ের দ্বারা অধিকৃত হয়ে"[৩] তিনি এ প্রস্তাব করছেন না।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের নববর্ষেও জিন্না এলাহাবাদে স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্নের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন। ৫ই জানুয়ারী ওয়েডারবার্নের নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমান সদস্যদের দ্বারা গঠিত এক প্রতিনিধি-মণ্ডলের বিশিষ্ট সদস্যরূপে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ১৬ই মার্চ গোখলের "এলিমেণ্টি এডুকেশান" বিলের সমর্থনে কাউন্সিলে বক্তৃতা দিলেন। ইতিমধ্যে গোখলে-জিন্না জুটি ভারতবর্ষের সংসদীয় রাজনীতিতে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। "উভয়েই উভয়কে পছন্দ ও বিশ্বাস করতেন। দেশের উন্নয়নের জন্য উভয়ে সম্মিলিত ভাবে কাজ করতেন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু তাঁর 'অ্যামবাসাডার অফ ইউনিটি' গ্রন্থে বলেছেন যে জিন্না সে সময়ে বলতেন যে তাঁর আকাঙ্ক্ষা হল গোখলের পদচিহ্ন অনুসরণ করা।"[৪] এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে গান্ধীও গোখলেকে তাঁর রাজনৈতিক গুরুর অভিধা দিয়েছিলেন।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে জিন্না বড়লাটের কাউন্সিলে ভূপেন্দ্রনাথ বসুর পুলিস প্রশাসন পদ্ধতি ও গোখলের "এলিমেণ্টি এডুকেশন" বিলের সমর্থনে বক্তৃতা দেন। তিনি দিল্লী দরবারেও[৫] যোগ দেন। ডিসেম্বরের ২৬—২৮শে কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁর

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে নির্বাচন স্বীকৃতি পেয়েছে। ডিসেম্বরের ৩১শে বাঁকিপুরে মুসলীম লীগ কাউন্সিলের সভায় বিশেষ আমন্ত্রিত হিসাবে যোগদান করে[৬] তিনি "ভারতবর্ষের পক্ষে উপযুক্ত স্বায়ত্তশাসন" প্রাপ্তি ও "জাতীয় ঐক্য স্থাপনকে" যাতে লীগ তার লক্ষ্যরূপে স্বীকার করে তার জন্য অভিমত ব্যক্ত করেন।

ইতিমধ্যে দিল্লীর বিগত (১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে) লীগ অধিবেশন থেকে প্রতিষ্ঠানের পালে যে নূতন হাওয়া লেগেছিল তার কথাও এখানে উল্লেখ করা দরকার। সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়ে যাওয়ায় ঐ অধিবেশনে আগা খাঁ ও আমীর আলী মন্তব্য করেন যে অতঃপর হিন্দুদের সঙ্গে সহযোগিতা করা যেতে পারে। লীগে এই নূতন হাওয়া দেখে তার প্রশংসা করার সঙ্গে সঙ্গে ঐ বছরের কংগ্রেসের সভাপতি উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন প্রস্তাব করেন যে এলাহাবাদের হিন্দু-মুসলীম সম্মেলনে কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে লীগের প্রতিনিধিরাও যোগ দিন। কিন্তু ব্রিটিশ স্বার্থের সংরক্ষকদের প্রবল প্রতিরোধে এটা সম্ভবপর হয় নি। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চে কলকাতার লীগ অধিবেশনেও হিন্দুদের প্রতি অনুকূল মনোভাব প্রকাশ করা হয়। জিন্না লীগের পালে লাগা এই নূতন হাওয়াকেই পুষ্ট করলেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মে মুসলীম লীগের তদানীন্তন সম্পাদক সৈয়দ ওয়াজির হাসানকে জিন্না এক পত্রে লেখেন যে হিন্দু-মুসলীম ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য উভয় সম্প্রদায়েব নেতাদের একটি সম্মেলন আহ্বান করা দরকার এবং হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য পৃথক পৃথক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে দুই সম্প্রদায়ের ছাত্ররা যাতে পরস্পরের সঙ্গে যথাসম্ভব অধিক মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হয় তার জন্য একই বিদ্যালয়ে পৃথক পৃথক শাখা খুলে হিন্দু মুসলমান ছাত্রদের স্থান দিতে হবে।

এদিকে দেশের মুসলমানদের মধ্যেও তখন জাতীয়তাবাদের জোয়ার জাগছে, যদিও তা বহুলাংশে ঐস্লামিক সাযুজ্য-কেন্দ্রিক। তুরস্ক ও পারস্যের (ইরাণ) জাতীয়তাবাদ যেমন তাঁদের প্রভাবিত করেছিল, তেমনি তুরস্ককে উপলক্ষ করে ডাঃ আন্সারী এবং চৌধুরী খলিকুজ্জমাঁ প্রমুখ আরও অনেকের চিকিৎসা মিশন নিয়ে ঐ দেশে যাওয়া, "জমিন্দার" পত্রিকার সম্পাদক মৌলানা জাফর আলীর কন্সটান্টিনোপলে গিয়ে তত্রস্থ ভিজিরকে ভারতীয় মুসলমানদের তরফ থেকে সংগৃহীত টাকার তোড়া দেওয়া ইত্যাদিও তাঁদের মধ্যে নবচেতনা আনার কাজে সাহায্য করে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর উর্দু আল-হিলাল পত্রিকার মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের পাঞ্চজন্য নির্ঘোষ প্রচার করতে থাকেন। মৌলানা মহম্মদ আলীর ইংরাজী "কমরেড" এবং উর্দু "হমদর্দ" পত্রিকাও মুসলমানদের আত্মস্থ হয়ে

জাতীয়তাবাদের ধারায় অবগাহন করার প্রেরণা দিতে থাকে।

"লীগও এর প্রভাব এড়াতে পারল না এবং ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে লখনউ-এ অনুষ্ঠিত এর অধিবেশনে প্রতিষ্ঠানের সংবিধানে পরিবর্তন হয়। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা। অন্যান্য আদর্শের মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে সাংবিধানিক পদ্ধতিতে ভারতের উপযুক্ত স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা এর লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারিত হয়। আরও স্থির হয় যে জাতীয় ঐক্যের ব্যাপ্তি, ভারতবাসীর মধ্যে জনসেবার চেতনা বৃদ্ধি ঘটিয়ে প্রচলিত প্রশাসন পদ্ধতিতে ক্রমাগত উন্নতি সাধন করতে হবে। আর এই লক্ষ্য সাধনে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে সহযোগিতা করা হবে। এইভাবে লীগের আদর্শকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অনুকূল করা হয় এবং তার পরিণামে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের পথ প্রশস্ত হয় ও অচিরে দুটি সংগঠনের পক্ষে সম্মিলিত পদক্ষেপ করাও সম্ভবপর হয়ে ওঠে।"[৭]

লীগের মার্চের ঐ অধিবেশনে শ্রীমতী নাইডুর সঙ্গে জিন্নাও বিশেষ আমন্ত্রিত হিসাবে যোগদান করেন। সভাপতি স্যার সফী নূতন সংবিধান উপস্থাপিত করে মন্তব্য করেন, "আমার বন্ধু মাননীয় শ্রীযুক্ত জিন্নার সঙ্গে আমি এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ সহমত যে কাউন্সিল প্রস্তাবিত পন্থার পরিবর্তে অপর যে কোন পন্থা অবলম্বন করা একেবারেই অবিজ্ঞোচিত কাজ হবে।"

লীগ বাঁকিপুরে দেওয়া তাঁর পরামর্শ মেনে নেওয়ায় জাতীয়তাবাদী জিন্নার পক্ষে মুসলীম লীগের সদস্যপদ গ্রহণে আর বাধা রইল না। ১০ই অক্টোবর ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিধিবদ্ধ ভাবে মুসলীম লীগের সভ্য হলেন।

॥ ৫ ॥

জিন্নার মুসলীম লীগে যোগদান করা সম্বন্ধে সরোজিনী নাইডু লিখেছেন:

"নিজের উদাহরণ দ্বারা জিন্না যে নিখিল ভারত মুসলীম লীগের দৃষ্টিভঙ্গী সম্প্রসারিত করার জন্য ইতিমধ্যে এত করেছিলেন, অবশেষে তাতে তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে যোগদান করলেন। তাঁর বিশিষ্ট উচ্চকোটির এবং হয়ত বা কিয়ৎ পরিমাণ উন্নাসিক সম্মানবোধের জন্য ঐজাতীয় একটা সাদাসিধা অনুষ্ঠানও প্রায় একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের রূপ নিল। তাঁর নাম সুপারিশকারী দুইজনকে[১] এই মর্মে এক আগাম পবিত্র প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছিল যে, তাঁর মুসলীম লীগ ও মুসলীম স্বার্থের প্রতি আনুগত্য কোনক্রমেই বা কোন সময়েই, যে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের সাধনে তাঁর জীবন উৎসর্গীত, তার পথে বিন্দুমাত্র বাধক হতে পারবে না।"[২]

জাতীয়তাবাদী মানসিকতার কোন্ উচ্চস্তরে জিন্না উঠেছিলেন, তার নিদর্শন পাওয়া যায় উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে।

যাই হোক জিন্না মুসলীম লীগে যোগদান করে প্রতিষ্ঠানটিকে কংগ্রেসের কাছাকাছি আনার সর্ববিধ প্রচেষ্টা করতে লাগলেন। ঐ বৎসরই আগ্রায় অনুষ্ঠিত লীগের অধিবেশনে (ডিসেম্বর ৩০—৩১) যোগ দিয়ে তিনি "মহম্মদ আলীর সেই সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করেন যাতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠানসমূহে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থার প্রস্তাবকে আরও এক বছরের জন্য মুলতুবী রাখার কথা বলা হয়।"[৩] কারণ এজাতীয় নির্বাচন ব্যবস্থা দেশকে দুটি পরস্পর সম্পর্কবিহীন জলনিরোধক কামরার মত বিভক্ত করে। সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের স্বাদপ্রাপ্ত লীগনেতৃত্ব জিন্নার সে পরামর্শ অগ্রাহ্য করলেও প্রধানতঃ তাঁর উদ্যোগে নিম্নোদ্ধৃত প্রস্তাব স্বীকার করে:

"নিখিল ভারত মুসলীম লীগ নিজের এই দৃঢ় বিশ্বাসের কথা স্পষ্ট করে ব্যক্ত করতে চায় যে ভারতবর্ষের অধিবাসীদের ভবিষ্যৎ বিকাশ এবং প্রগতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সখ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ও পারস্পরিক সহযোগিতার উপর নির্ভর করে এবং তাই লীগ আশা করে যে উভয় পক্ষ মাঝে মাঝে একত্র হয়ে জনহিতের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে সম্মিলিত ও কার্যকরী পদক্ষেপ নেবার উপায় উদ্ভাবন করবেন।"[৪]

মুসলীম লীগের সঙ্গে যুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর পূর্বের দৃঢ় সম্পর্ক বজায় ছিল। কংগ্রেস ও লীগকে কাছাকাছি আনার জন্য তাঁর নিরন্তর প্রয়াস এবং হিন্দু-মুসলীম ঐক্যের জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা দেখে গোখলে এই সময়ে জিন্নার সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত মন্তব্য করেন: "তাঁর ভিতর সাচ্চা বস্তু আছে আর আছে তাবৎ সাম্প্রদায়িক পক্ষপাত ও গোঁড়ামি থেকে মুক্ত সেই মানসিকতা যার জন্য তিনি হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজদূত হতে পারেন।"[৫] ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর তিনি করাচী কংগ্রেসে কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়ার কার্যকলাপে সংস্কার সাধনের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন এবং তার উপর বিস্তারিত বক্তৃতা দিলেন। নবাব সৈয়দ মহম্মদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ অধিবেশনে ভূপেন্দ্রনাথ বসু লীগের নূতন ভূমিকার প্রশংসা করে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। জিন্নার উদ্যোগে কংগ্রেসের ঐ অধিবেশনে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে কংগ্রেস ও লীগ উভয় প্রতিষ্ঠানেরই ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের বাৎসরিক অধিবেশন বোম্বেতে হবে।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তিনি ভূপেন্দ্রনাথ বসু, লাজপত রায়, মজরুল হক্

প্রমুখের সঙ্গে কংগ্রেসের তরফ থেকে শাসন সংস্কারের কথা বলার উদ্দেশ্যে এক প্রতিনিধিমণ্ডলের সদস্যরূপে লণ্ডনে যান এবং দলের অন্যতম প্রবক্তারূপে কংগ্রেসের দাবির কথা বিলাতের অনেক অনুষ্ঠানে বলেন। জুনের ৩ তারিখে লণ্ডনের "টাইমস" পত্রিকায় প্রকাশিত এক বিবৃতির মাধ্যমে ভারতসচিবের কাউন্সিলে মনোনয়নের বদলে নির্বাচনের মাধ্যমে ভারতীয়দের যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব দেবার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন। ঐ মাসেই লীগের সম্পাদক ওয়াজির হাসানকে লীগের পরবর্তী অধিবেশন কংগ্রেসেরই মত বোম্বেতে আহ্বানের প্রস্তাব করেন এবং লীগ কাউন্সিলের কিছু সদস্যের বিরোধিতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হয়। লণ্ডনে থাকা-কালীন ৮ই আগস্ট সিসিল হোটেলে অনুষ্ঠিত গান্ধীর (ভারতে স্থায়ীভাবে প্রত্যা-বর্তনের মুখে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে তখন তিনি বিলাতে) এক সংবর্ধনা সভায় আনন্দ-কুমার স্বামী এবং সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের নেতার ভূয়সী প্রশংসা করেন।[৬] ভারতের বর্তমান শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাসে যে দুই নেতার ভূমিকা সর্বাগ্রণ্য, এই তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎকার। কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে (ডিসেম্বর ২৮—৩০) নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী বোম্বের মুসলমান ছাত্র ইউনিয়নের উদ্বোধকের ভাষণে বলেন যে, শৃঙ্খলাযুক্ত নৈতিক জীবন গড়ে তোলার সঙ্গে তারা যেন "রাজ-নীতিতে আগ্রহশীল হয়, তবে আন্দোলনাত্মক রাজনীতির সংস্রব এড়িয়ে চলে।"[৭] মে মাসে লোকান্তরিত গোখলের স্মরণ-সভায় তাঁর স্মারক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। অক্টোবরে "টাইমস অফ ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় প্রকাশিত এক পত্রে কংগ্রেস ও লীগের অধিবেশন একই স্থানে আয়োজিত করে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনার প্রস্তাব করেন। নভেম্বরের ১১ই মুসলীম নেতা ও জনসাধারণকে আবেদন জানান যে তাঁরা যেন "হিন্দু বন্ধুদের"[৮] সঙ্গে একসাথে চলার উদ্দেশ্যে এবং এক সম্মিলিত ফ্রন্ট গড়ার জন্য "নিখিল ভারত মুসলীম লীগের পতাকাতলে সমবেত হন"।[৯]

বিগত বছরে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে পরস্পরের কাছাকাছি আসার যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল তা আরও পুষ্টিলাভ করে। টেণ্ডুলকরের মতে "শ্রীযুক্ত মহম্মদ আলী জিন্নার জন্যই প্রধানতঃ এই নূতন ধারার সৃষ্টি হয়েছিল।"[১০] স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গে একটি প্রস্তাবের (১৯তম) মাধ্যমে কংগ্রেস "নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে শাসন সংস্কার এবং নিরবিচ্ছিন্ন কাজ, গণশিক্ষা ও প্রচারের জন্য একটি পরিকল্পনা রচনা করার নির্দেশ দিল। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে এই অধিকারও

দেওয়া হল যাতে এই উদ্দেশ্যে লীগ কমিটির সঙ্গে আলোচনা করতে পারে এবং প্রয়োজনীয় পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।"[১১] দিনকয়েক পর (১লা জানুয়ারী ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ) ঐ বোম্বেতেই লীগের অধিবেশনে হজরত মোহানী ও আরও কিছু কট্টরপন্থীদের প্রবল বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করে জিন্নার নিম্নোক্ত মর্মের প্রস্তাব বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে গৃহীত হয়ঃ "...কংগ্রেসের মত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরামর্শক্রমে শাসন সংস্কারের পরিকল্পনা রচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হল। তাবৎ রাজনৈতিক দল যেন ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয় এই আশা ব্যক্ত করা হল। ঘোষণা করা হল যে 'কংগ্রেস ও লীগ হল ভারতবর্ষের দুই প্রধান প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান'।"[১২] তাঁর প্রস্তাবক্রমে[১৩] হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানকল্পে লীগ ও কংগ্রেসের একটি যুক্ত কমিটি গঠিত হয়। লীগ অধিবেশনের সভাপতি মজহরুল হক্ প্রকাশ্য সভায় জিন্নার এই ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। লীগের ঐ অধিবেশনে আরও অনেকের সঙ্গে গান্ধী, মালব্য ও সরোজিনী নাইডু প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা যোগ দিয়েছিলেন।

দুই প্রতিষ্ঠানের একই শহরে বার্ষিক অধিবেশনের এই প্রথা কংগ্রেস ও লীগের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণকে এত কাছাকাছি আনে যে পরে মৌলানা মহম্মদ আলী সে সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত এক মন্তব্য করেছিলেনঃ

"মুসলমানদের প্রগতি এত দ্রুত হয়েছে যে তাঁদের মধ্যে থেকেই এক রসিক সমালোচক এই মন্তব্য করেছেন যে লর্ড সিনহা...তাঁর বিহারী প্রতিবেশী এবং মুসলীম লীগের অধিবেশনের সভাপতি আইনজীবী ভ্রাতার সঙ্গে একই রেলগাড়ির কামরায় ভ্রমণ করেছিলেন এবং তুলনামূলক ভাবে বিচার করার জন্য একে অপরের সভাপতির অভিভাষণ দেখতে নিয়েছিলেন। কিন্তু...উভয় সভাপতিই তারপর নিজ নিজ অভিভাষণ ফেরত নিতে ভুলে যান। ফলে দৈবের নির্বন্ধে মৌলানা মজহরুল হক্ তাঁর মুসলমান শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে নিজের বলে যে ভাষণ পড়েন তাতে বাঙ্গালী-সুলভ তীক্ষ্ণ বাগ্মিতা ছিল। আর অনুরূপ পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের সামনে লর্ড সিনহা যে অভিভাষণ পাঠ করেন তাতে পাওয়া যায় চিরকালের রাজানুগত মুসলমানদের সতর্কতা ও থেকে থেকে থমকে দাঁড়ানোর সুর।"[১৪]

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধে ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে নবচেতনার যে প্রবল ভাগীরথীপ্রবাহ তার আবাহনকারী ভগীরথত্রয়ের মধ্যে জিন্না অন্যতম। অপর দুইজন তিলক ও শ্রীমতী বেসান্ত। ৬ই জুন "প্রেস আইনের" প্রতিবাদে সরকারকে একটি স্মারকপত্র দেবার জন্য বোম্বের এক জনসভায় যে কমিটি গঠিত হয়, জিন্না

তার সদস্য মনোনীত হন। ২১শে জুন আবার ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। আগস্টের ৭—১২ই পুণার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে রাজদ্রোহ-মূলক বক্তৃতার অভিযোগে অভিযুক্ত তিলকের পক্ষ সমর্থন করেন। অক্টোবরের ২১শে আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত ষোড়শ বোম্বাই প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে শাসন সংস্কারের সপক্ষে বলার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। যদিও কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্কের ব্যাপারে সরকারী বক্তব্য (Moral and Material Progress and Conditions of India) প্রামাণ্য নয়, তবু জিন্নার সেই সময়কার ভূমিকা উপলব্ধি করতে ঐ প্রতিবেদনের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি মূল্যবান: "১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে বোম্বেতে যখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের অধিবেশন হয় তখন হিন্দু-মুসলীম সমঝোতা প্রথম রূপ নেওয়া আরম্ভ করে; ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে আহমেদাবাদে শ্রীযুক্ত এম. এ জিন্নার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সম্মেলনে পূর্বোক্ত বোঝাপড়া বিপুল শক্তিশালী হয়। তাঁকে তখন লীগের পরবর্তী বাৎসরিক অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচন করা হয়েছে। তিনি হিন্দুদের কংগ্রেস দলের একটি সম্মেলনেরও সভাপতিত্ব করেন, যে দল কিনা ইতিপূর্বে একান্তভাবে হিন্দু-প্রভাবিতই ছিল।"[১৫]

ঐ বৎসর বোম্বের অনুকরণে লখনউ-এ অনুষ্ঠিত প্রথমে কংগ্রেসের (২৫—২৮ ডিসেম্বর) ও পরে (ডিসেম্বর ৩০—৩১) লীগের অধিবেশনকে জিন্নার বিজয়-বৈজয়ন্তীশোভিত অধিবেশন বলা চলে। লখনউ কংগ্রেসেই সরোজিনী নাইডু মুসলীম ঐক্যের জন্য জিন্নার প্রয়াসের ভূয়সী প্রশংসা করার সময় তাঁর সম্বন্ধে গোখলের বিখ্যাত উক্তির পুনরুদ্ধৃতি দেন—"হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজদূত।" সেবারে কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন অম্বিকাচরণ মজুমদার। ইতিমধ্যে কংগ্রেস ও লীগের যৌথ কমিটি এলাহাবাদ ও কলকাতায় মিলিত হয়ে বাংলা ও পাঞ্জাব ছাড়া আর সব প্রদেশের আইনসভায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি-নিধিত্বের প্রশ্নের একটা সর্বজনমান্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। সে ব্যাপারেও জিন্নার বিশেষ ভূমিকা ছিল। বাকীটুকু লখনউ-এ সমাধা হল। কংগ্রেস-লীগ সমঝোতাতে শতকরা ২০জন মনোনীত সদস্যের অবকাশ থাকলেও প্রশাসকদের আইনসভার অধীন করার সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে আসন বাঁটোয়ারার প্রশ্নের মীমাংসা করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থায় মুসলমান সংখ্যালঘুদের জন্য আসন বণ্টন হল নিম্নহারে:

"পাঞ্জাবে নির্বাচিত সদস্যদের অর্ধেক, সংযুক্ত প্রদেশে শতকরা ৩০ ভাগ, বাংলায়

শতকরা ৪০ ভাগ, বিহারে শতকরা ২৫ ভাগ, মধ্যপ্রদেশে শতকরা ১৫ ভাগ, মাদ্রাজে শতকরা ১৫ ভাগ এবং বোম্বাই প্রদেশে তিন ভাগের এক ভাগ। ইম্পিরিয়াল অথবা প্রাদেশিক কোন নির্বাচনেই তাঁরা এই বিশেষ স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের কোটার বহির্ভূত আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না। এই ব্যবস্থাও রইল যে, '...এক অথবা অপর সম্প্রদায়ের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন বিল...নিয়ে কেবল তখনই আলোচনা হবে যদি সংশ্লিষ্ট আইনসভার সেই সম্প্রদায়ের সদস্যদের অন্ততঃ তিন-চতুর্থাংশ সেই বিলের বিরোধিতা না করেন।' ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের...নির্বাচিত ভারতীয় সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ হবেন মুসলমান। তাঁরা নির্বাচিত হবেন মুসলমানদের পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা যার অনুপাত হবে...যে হারে তাঁরা পৃথক মুসলমান ভোটারদের দ্বারা প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে প্রতিনিধিত্বপ্রাপ্ত।"[১৬]

পূর্বোক্ত সমঝোতা আর কয়েকদিন পরেই ঐখানে জিন্নার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত লীগের অধিবেশনেও গৃহীত হয়। লীগকে দিয়ে ঐ চুক্তি অনুমোদন করিয়ে নেবার জন্য বিশেষ ভূমিকা নেওয়া ছাড়াও সভাপতির অভিভাষণে জিন্না বলেন :

"হিন্দুদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী হবে শুভেচ্ছা এবং ভ্রাতৃভাবাপন্ন। আমাদের চালক নীতি হবে দেশের স্বার্থে তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা। দুই ভ্রাতৃ-প্রতিম মহৎ সম্প্রদায়ের ভিতর যথার্থ বোঝাপড়া এবং হৃদ্যতাপূর্ণ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হলেই কেবল ভারতবর্ষের যথার্থ প্রগতি সম্ভবপর হবে।"[১৭]

জিন্নার কণ্ঠে এক নূতন স্বর যা মুসলীম লীগের মঞ্চে অতীতে কখনও শোনা যায় নি : "প্রথম নিখিল ভারত মুসলীম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রধান ভিত্তি ছিল—ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বিবর্তনের গতিপথের প্রতিটি বাঁকে যখন যে কোন সাংবিধানিক ব্যবস্থাপিতকরণের অবকাশই আসুক না কেন, মুসলমান সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যকে দৃঢ় এবং অবিকৃত রূপে রেখে দেওয়া। এই সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক জীবন ও চিন্তাধারার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বোক্ত নীতিরও বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ ঘটেছে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সামান্য দৃষ্টিভঙ্গী ও আদর্শের ক্ষেত্রে নিখিল ভারত মুসলীম লীগ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দণ্ডায়মান এবং সামগ্রিক ভাবে ভারতবর্ষের অগ্রগতির উদ্দেশ্যে যে কোন দেশাত্মমূলক প্রয়াসের অংশীদার হতে প্রস্তুত।"[১৮]

লখনউ-এর ঐ চুক্তির বৈশিষ্ট্য এই যে কেবল তিলকের[১৯] মত চরমপন্থী নেতাই তার প্রশংসা করেন নি, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত নরমপন্থী নেতাও এর সমর্থনে বলেছিলেন, "...হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ভাবগত ঐক্যের চূড়ান্ত

নিদর্শন এ। আজ মুসলমান সমাজের নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের আমি ভূয়সী প্রশংসা জানাই। দুই বাহু সম্প্রসারিত করে তাঁরা আমাদের গ্রহণ করেছেন।"[২০] এর অপর বৈশিষ্ট্য হল এই যে আসন বাঁটোয়ারার ঐ হার এমন কি মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কারের প্রস্তাবেও গৃহীত হয়েছিল।

লখনউ-এর ঐ বোঝাপড়া এইজন্য সম্ভবপর হয়েছিল যে জিন্না ও অপরাপর মুসলমান নেতৃবৃন্দ একথা স্পষ্টভাবে জানান যে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা ও অন্যান্য রক্ষা-কবচ একান্তভাবে সাময়িক ব্যবস্থা। এ কেবল ততদিনের জন্যই যতদিন না মুসলমান সমাজ তার বর্তমান অনগ্রসর অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারছে। ভবিষ্যতে এর প্রয়োজন আর থাকবে না। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কারের প্রস্তাব বিবেচনার জন্য গঠিত পার্লামেণ্টারী কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য দেবার সময়ে জিন্না দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একথা ঘোষণা করেন। নিম্নে জিন্নার সাক্ষ্য থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে ঃ

"মেজর অর্মসবি গোর, এম. পি.—আপনি বললেন যে আপনি ভারতবর্ষের দৃষ্টি-কোণ থেকে বলছেন। আপনি কি তবে ভারতের জাতীয়তাবাদী হিসাবে বলছেন?

"শ্রীযুক্ত জিন্না—আজ্ঞে হ্যাঁ।

"মেজর গোর—অর্থাৎ আপনার বক্তব্য হল রাজনৈতিক জীবনে যথাসম্ভব শীঘ্র মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে পার্থক্য করা বন্ধ হোক—এই আপনি চান।

"শ্রীযুক্ত জিন্না—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার কাছে ঐ শুভ দিনটির থেকে অধিকতর আনন্দদায়ক আর কিছু হতে পারে না।"[২১]

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে জিন্না ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলে যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেগুলি হল ভারতীয়দের সশস্ত্র বাহিনীতে অফিসারের পদ দেওয়া, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন, সরকারী চাকরির ভারতীয়করণসহ অন্ততঃ আই. সি. এস.-দের অর্ধেক পদ ভারতবাসীদের দেওয়া, ভারত ও বিলাত উভয় দেশে যুগপৎ ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষা গ্রহণ, ঢাকা ও পাটনা বিশ্ব-বিদ্যালয় বিল, ভারতবাসী ও ইউরোপীয়দের মধ্যে সমতা প্রবর্তন ইত্যাদি। এছাড়া তিনি এই বছরে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, তেজবাহাদুর সপ্রু এবং ওয়াজির হোসেনের সঙ্গে কংগ্রেস ও লীগের এক যুক্ত প্রতিনিধিমণ্ডলের সদস্য হিসাবে লণ্ডনে গিয়েছিলেন লখনউ চুক্তির ভিত্তিতে শাসন সংস্কারের দাবি নিয়ে। ২৮শে জুলাই বোম্বেতে হোমরুল লীগের বন্দী নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে লীগ কাউনসিল ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্মিলিত সভার সভাপতিত্ব করেছিলেন। ইতিমধ্যে হোমরুল লীগের সভানেত্রী শ্রীমতী বেসান্ত ও তাঁর অন্যান্য সহকর্মীদের অন্তরীণ করার সর-

কারী আদেশের প্রতিবাদেই যেন তিনি হোমরুল লীগে যোগ দিয়ে তার বোম্বে শাখার সভাপতি হন এবং শ্রীমতী বেসান্তকে পাঠানো এক চিঠিতে লেখেন : "মুসলমানদের প্রতি আমার নিবেদন হল এই যে তাঁরা যেন তাঁদের হিন্দুভাইদের হাতে হাত মেলান। হিন্দুদের প্রতি আমার নিবেদন হল—আপনাদের অনগ্রসর ভাইদের উত্থানের সহায়ক হোন। এই আদর্শ নিয়েই যেন হোমরুল লীগের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং তাহলে আমাদের পক্ষে আর ভয়ের কারণ থাকবে না।" অক্টোবরের ৬ তারিখে অনুরূপ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত লীগ ও কংগ্রেসের সম্মিলিত সভায় যোগদান করেন এবং উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে এক নিখিল ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলের সদস্য হিসাবে ২৬শে অক্টোবর বড়লাটের সঙ্গে দেখা করেন। এছাড়া জুলাই-এ দুবার ও নভেম্বরে একবার বোম্বেতে এবং অক্টোবরে একবার এলাহাবাদে হোমরুল লীগের সভায় যোগ দেন এবং শেষোক্ত সভায় বলেন যে ভারতের স্বায়ত্তশাসনের জন্যই তিনি হোমরুল লীগে যোগ দিয়েছেন।

ঐ বছরেও কংগ্রেস ও লীগের বাৎসরিক অধিবেশন একই সময়ে ও একই শহরে অর্থাৎ কলকাতায় হল। কংগ্রেসের সভাপতি অ্যানি বেসান্ত এবং লীগের জিন্না। উভয় অধিবেশনেই কংগ্রেস-লীগ প্রস্তাব গ্রহণের দাবি উঠল। কংগ্রেস অধিবেশনে জিন্না এতদ্সংক্রান্ত প্রস্তাবের সমর্থনে যুক্তিজাল বিস্তার করলেন। লীগের অধিবেশনে গান্ধী ও সরোজিনী নাইডু যোগ দিয়ে আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের মুক্তির সপক্ষে উত্থাপিত প্রস্তাবের উপর বক্তৃতা দিলেন। হিন্দুদের অভিসন্ধি সম্বন্ধে সংশয়িত লীগের সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে জিন্না বললেন, "আপনাদের শত্রুদের প্ররোচনায় আতঙ্কিত হয়ে হিন্দুদের সঙ্গে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকবেন না। কারণ স্বায়ত্তশাসন প্রাপ্তির জন্য এই সহযোগিতা অপরিহার্য।"[২২]

ভারতের জনমতও ঐসময় উদ্দাম হয়ে উঠেছিল হোমরুলের দাবিকে কেন্দ্র করে। অ্যানি বেসান্ত, আরুণ্ডেলে প্রমুখ এর নেতাদের কারান্তরালে নিয়ে গেলেও জনমত অবদমিত হয় নি। এছাড়া আলী ভ্রাতৃদ্বয় এবং মৌলানা আজাদও বন্দী। বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস ও লীগ কমিটি বন্দীমুক্তি নিয়ে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কথা বিবেচনা করছে। এর মধ্যে ভারতের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা শাসন সংস্কারের কথা বলছেন, যদিও অপর একদল এর প্রতিকূল। কিছু কিছু রক্ষণশীল ব্রিটিশ নেতা লখনউ চুক্তি অনুযায়ী ইম্পিরিয়াল কাউনসিলের ১৯ জন নির্বাচিত সদস্যের (এতে জিন্নারও প্রমুখ ভূমিকা ছিল) প্রস্তাবে "বিদ্রোহ" ও "জার্মান ষড়যন্ত্রের" গোপন হস্ত দেখে তার বিরোধিতা করছেন। পাঞ্জাব ও মাদ্রাজের ছোটলাটরা ভারতীয়-

দের আরও ক্ষমতা দেবার প্রস্তাবের আদৌ অনুকূল নন।

বছরের মাঝামাঝি মেসোপোটেমিয়ায় (যেখানে অধিকাংশ ভারতীয় সৈন্য যুদ্ধরত ছিল) ইংরেজদের শোচনীয় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবার ফলে প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতীয় সৈনিকদের সদুপযোগের প্রশ্নে তদানীন্তন ভারতসচিব অস্টিন চেম্বারলেন পার্লামেণ্টে তীব্রভাবে সমালোচিত হন। ফলে তিনি পদত্যাগ করলেন এবং পার্লামেণ্টে তাঁর সমালোচক ও ভারতদরদীরূপে খ্যাত ৩৬ বছর বয়স্ক মণ্টেগু তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। ২০শে আগস্ট মন্ত্রিসভার তরফ থেকে তিনি ঘোষণা করলেন যে ভারতবর্ষে ক্রমশঃ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করে ভারতবাসীদের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করাই ব্রিটিশ সরকারের নীতি। এর ফলে শ্রীমতী বেসান্ত ও তাঁর সহকর্মীরা কারামুক্ত হলেন এবং পূর্বে উল্লিখিত ৬ই অক্টোবরের লীগ কাউন্সিল ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্মিলিত সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংঘর্ষের পথে না গিয়ে বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডের কাছে এক প্রতিনিধি-মণ্ডল পাঠানো হল। ইতিমধ্যে গান্ধীর পরামর্শে কংগ্রেস-লীগ প্রস্তাবের অনুবাদ ভারতীয় ভাষাসমূহে করিয়ে তার সমর্থনে ২০ লক্ষ দেশবাসীর সাক্ষর সংগ্রহ করে জনমত তৈরী করার একটা ব্যাপক কর্মসূচী পালিত হল। মণ্টেগু স্বয়ং ভারতবর্ষে চেমসফোর্ডের সঙ্গে নানাস্থানে সফর করে শাসন সংস্কার সম্বন্ধে সবার মতামত যাচাই করলেন।

মহাযুদ্ধের প্রতি ভারতের দৃষ্টিকোণ কি হবে এ নিয়ে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ ঘোষণার পর থেকেই জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলছিল। জিন্না গান্ধীর মত নৈতিক কারণে যুদ্ধপ্রচেষ্টার নিঃশর্ত সমর্থনের মতাবলম্বী ছিলেন না। তাঁর ভূমিকা ছিল—এর জন্য প্রথমে ভারতবাসীদের "ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের সঙ্গে এক পর্যায়ের বলে স্বীকার করে নেওয়া প্রয়োজন"। জিন্নার ভূমিকাকে বড়লাট চেমসফোর্ড "দরাদরি" বলে ভর্ৎসনা করায় জিন্না প্রকাশ্যভাবে এর প্রতিবাদে অকুতোভয়ে বলেন: "আমার স্বদেশের সম্রাটের সমান অধিকারসম্পন্ন প্রজা হিসাবে নিজের আত্মসম্মানপরবশ আমি যদি আমার সরকারের মুখের উপর বলি যে আজকের বিধিনিষেধ দূর করতেই হবে—তবে তা কি দরাদরি করা? মাই লর্ড, নিজের স্বদেশে আমাকে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের সমমর্যাদা দেওয়া হোক দাবি করা কি দর কষাকষি? এর নাম কি দরাদরি?"[৩] ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দিল্লীতে বড়লাট কর্তৃক আহূত "যুদ্ধসম্মেলনে" জিন্নার বক্তব্য সরকারী প্রস্তাবের বিরোধী বলে বড়লাট তা বিধিবহির্ভূত বলে বাতিল করায় জিন্না এক তারবার্তায় লর্ড

চেমসফোর্ডকে জানান : "আমাদের স্বদেশের জন্য যে নীতি অস্বীকার করা হয়েছে, তার জন্য আমাদের যুবকদের যুদ্ধ করার জন্য আমরা বলতে পারি না।...সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য ভারতবর্ষকে যদি যথেষ্ট আত্মত্যাগ করতে হয় তাহলে তা সম্ভব সাম্রাজ্যের অংশীদার হিসাবে, তার অধীন হিসাবে নয়।...প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে কংগ্রেস-লীগ পরিকল্পনার ভিত্তিতে পার্লামেন্টের অনুমোদনক্রমে নির্ধারিত একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা হোক এবং অবিলম্বে এর জন্য পার্লামেন্টে একটি বিল উপস্থাপিত করা হোক।"[১৪]

॥ ৬ ॥

অবশেষে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের জুনে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড বা সংক্ষেপে মণ্টফোর্ড প্রস্তাব প্রকাশিত হল। পূর্বেই যেমন বলা হয়েছে, এতে আসন বণ্টনের ব্যাপারে কংগ্রেস-লীগের যৌথ প্রস্তাব মোটামুটি স্বীকৃত হয়। কিন্তু এতে আইনসভার কাছে দায়িত্ব-শীল মন্ত্রীসভার প্রস্তাব থাকলেও যথার্থ স্বায়ত্তশাসন এবং ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, আইনের সামনে ইংরেজ ও ভারতীয়দের সমান মর্যাদা ইত্যাদির অবকাশ ছিল না বলে বোম্বেতে হাসান ইমামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে হতাশা ব্যক্ত করা হল। এছাড়া আলী ভ্রাতৃদ্বয় ও মৌলানা আজাদ তখনও বন্দী এবং শ্রীমতী বেসান্ত, বিপিনচন্দ্র পাল ও তিলকের উপর দেশের কোন কোন জায়গায় যাবার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত না হওয়ায় ব্রিটিশ শাসকদের সদিচ্ছার প্রতিও সন্দেহের কারণ ছিল। এই নিয়ে বড়লাটের কাছে কংগ্রেসের যে প্রতি-নিধিমণ্ডল গিয়েছিল জিন্না ছিলেন তার অন্যতম সদস্য। একই সময়ে মাহমুদাবাদের রাজার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত লীগের অধিবেশনেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২৬—৩১শে ডিসেম্বর দিল্লীতে মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন হয়। জিন্না এতে যোগ দেন এবং আবার নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য মনোনীত হন।

ইতিমধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান ঘটেছে এবং আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ প্রভৃতি নিজেদের সপক্ষে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের নীতির জয়গান করেছেন। স্বভাবতই কংগ্রেস মণ্টফোর্ড শাসন সংস্কারের প্রস্তাবকে মিত্রপক্ষের ঐ সুউচ্চ আদর্শের আলোকে বিশ্লেষণ করে তার ত্রুটি-বিচ্যুতি জনসমক্ষে তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে আবার কংগ্রেস-লীগ প্রস্তাবকে মেনে নেবার দাবি জানাল। অবশ্য এর সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশসমূহে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার দাবি

জানিয়ে রাউলাট কমিটির রিপোর্ট, ভারতরক্ষা আইন, প্রেস আইন ইত্যাদির প্রতি বিরোধ জ্ঞাপন করল।

লীগের বাৎসরিক অধিবেশনও ঐ দিল্লীতেই হল এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ আন্সারী ও মূল সভাপতি ফজলুল হক্ উভয়েই ছিলেন কংগ্রেস-পন্থী। জিন্না তো ছিলেনই। সেবারকার লীগের অধিবেশনে শাসন সংস্কারের সম্বন্ধে কংগ্রেসের অনুরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করা ছাড়াও আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল যার উল্লেখ করা প্রয়োজন। মহাযুদ্ধে জার্মানীর সঙ্গে থাকলেও তুরস্কের খলিফার[১] কোনরকম ক্ষতি করা হবে না—মহাযুদ্ধ চলাকালীন এই মর্মে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বেমালুম ভুলে গিয়ে ব্রিটিশ সরকার খলিফার অধিকার খর্ব করার ব্যবস্থা করলেন। স্বভাবতই অন্যান্য দেশের মুসলমানদের মত ভারতবর্ষের মুসলমানরাও খিলাফৎ বজায় রাখার জন্য উন্মুখ হলেন। লীগের দিল্লী অধিবেশনে এই মর্মে এক প্রস্তাব এলে জিন্না এই বলে তার বিরোধিতা করলেন যে এ ব্যাপারে অভিমত ব্যক্ত করার বৈধানিক অধিকার লীগের নেই, কারণ খিলাফৎ সরকারের বৈদেশিক নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে লীগ প্রতিনিধিদের অধিকাংশকে স্বমতে আনতে না পারায় জিন্না কয়েকজন সমমতাবলম্বী প্রতিনিধিসহ সম্মেলন থেকে বেরিয়ে চলে যান।[২] জিন্নার সংবিধাননিষ্ঠ চরিত্র এবং প্যান-ইসলামিক মানসিকতার প্রতি তাঁর দৃষ্টিকোণ বোঝার জন্য ঘটনাটির গুরুত্ব আছে।

জিন্নার জীবনের ঘটনাবৃত্ত সম্পূর্ণ করতে এবার আমরা একটু পিছনের দিকে ফিরে যাব এবং ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলে তাঁর ক্রিয়াকলাপের কথা বাদ দিয়ে অন্য যেসব গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে ঐ বছর তিনি যুক্ত ছিলেন তার উল্লেখ করব। ১০ই জুন জিন্না বোম্বেতে সরকারী "যুদ্ধ সম্মেলনে" যোগ দিয়ে হোমরুল লীগের আনুগত্য, সিভিল সার্ভিসের ভারতীয়করণ এবং দেশে দায়িত্বশীল সরকার স্থাপনের প্রশ্নে ছোটলাট লর্ড উইলিংডনের সঙ্গে প্রকাশ্য বাক্-বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হন। ছোটলাটের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ সম্মেলনে জিন্নার বক্তৃতা কেবল নৈতিক সংসাহসেরই দ্যোতক নয়, রাজনীতি বিষয়ে তাঁর দূরদৃষ্টিরও পরিচায়ক, যা ঐ বক্তৃতার অংশবিশেষ থেকে স্পষ্ট হবে। যুদ্ধজয়ের জন্য কেবল ভাড়াটে সিপাহী দিয়ে কাজ হবে না, ভারতের যুবকদের দ্বারা জাতীয় সৈন্যবাহিনী গড়ার প্রস্তাব দিয়ে তিনি বললেন: "তারা এই কথা অনুভব করা পছন্দ করে যে তারা সাম্রাজ্যের নাগরিক। আর এই রকম হলেই তারা উদ্বুদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসবে ও স্বার্থত্যাগ করবে।...আমরা কেবল কথা শুনতে চাই না। এ ব্যাপারটার নিষ্পত্তি

অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী করা হোক এও আমরা চাই না। আমরা চাই কাজ এবং অবিলম্বে তার ক্রিয়ান্বয়ন।...ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যের অংশীদার না করা পর্যন্ত, তাকে বিশ্বাস না করা পর্যন্ত আমরা ভারতের যথার্থ প্রতিরক্ষায় সফল হব না, সাম্রাজ্যকে সাহায্য করা তো আরও দূরের কথা।"[৩] বলা বাহুল্য জাতীয়তাবাদের পক্ষে এত স্পষ্ট অভিমত এবং তাও ছোটলাটের মুখের উপর, সভাপতির ভাল লাগেনি এবং সভাপতি ছোটলাট উইলিংডন জিন্নার বক্তৃতায় পদে পদে বাধা দিয়েছিলেন।

সাতদিন পর বোম্বের এক জনসভায় হোমরুল লীগের প্রতি ছোটলাটের অপমানজনক দৃষ্টিকোণের জন্য জিন্না তার খোলাখুলি নিন্দা করেন। ঐ মাসেই সংবাদপত্রের এক বিবৃতিতে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড প্রস্তাব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মন্তব্য করেন যে প্রশাসকদের (executive) উপর ব্যবস্থা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ থাকা চাই। পরের মাসে এলাহাবাদের "ইণ্ডিয়ান রিভিউ" পত্রিকায় মণ্টফোর্ড প্রস্তাবের দ্বৈতশাসনের বিরোধিতা করেন। আরও ২৯জন জননেতার সঙ্গে সাক্ষরিত এবং "টাইমস অফ ইণ্ডিয়ায়" ৮ই নভেম্বরে প্রকাশিত এক পত্রে জনমতবিরোধী বলে ছোটলাট লর্ড উইলিংডনকে কোন বিদায়-সংবর্ধনা দেবার অনুষ্ঠানের আয়োজন না করার পরামর্শ দেন। ডিসেম্বরের ১১ই বোম্বের টাউন হলে আয়োজিত ছোটলাটের বিদায়সভা পণ্ড করার জন্য তাঁর পত্নীসহ আরও অনেকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেন। ঐ ব্যাপারে তাঁর ভূমিকার স্বাকৃতি হিসাবে জনসাধারণের দানে বোম্বেতে "জিন্না হল" নির্মাণের ব্যবস্থা হয় এবং ঐ মাসেই শ্রীমতী বেসান্ত তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। জিন্না হল পরবর্তীকালে সভা-সমিতির কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে বোম্বের সর্বজনীক জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে।

রাউলাট আইন (রিপোর্টের প্রথম প্রকাশ ১৯শে জানুয়ারী ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ) হল ভারতবাসীদের প্রতি ইংরেজ শাসকদের নববর্ষের উপহার। গান্ধী তিলক প্রমুখ বহু ভারতীয় নেতার যুদ্ধ প্রচেষ্টার প্রতি সক্রিয় সহযোগিতা এবং ধন ও মনের দ্বারা ভারতবাসীর যুদ্ধে মিত্রশক্তিকে সাহায্য করার প্রতিদান ঐ ব্যক্তিস্বাধীনতা-খর্বকারী কালা কানুন। বিশেষ করে মুসলমানরা ক্ষুব্ধ খিলাফৎ ছাড়াও বিগত লীগ অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ আনসারীর বক্তৃতার নিষিদ্ধকরণ এবং কানপুরের দাঙ্গা দমনের জন্য মুসলমানদের উপর প্রয়োজনাতিরিক্ত চাপ ইত্যাদির জন্য। বিলের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করে গান্ধী জনমত তৈরী করেছিলেন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে আরও অনেকের সঙ্গে জিন্নাও আইন পাস করার বিরুদ্ধে প্রবল যুক্তিজাল বিস্তার করলেন। জিন্না বললেন :

"বিচার-বিভাগের ক্ষমতা প্রশাসকদের দিলে প্রচণ্ড রকমে ক্ষমতার অপব্যবহারের পথ প্রশস্ত হবে।... কোন সভ্য দেশের আইনের ইতিহাসে এমন আইন প্রণয়নের নজির বা উদাহরণ নেই।...এজাতীয় আইন করার সময়ও এখন নয় কারণ সুদূর-প্রসারী শাসন সংস্কার সম্বন্ধে প্রচণ্ড আশা জনসাধারণের মনে সৃষ্টি হয়েছে। ...প্রস্তাবিত ব্যবস্থাসমূহ গৃহীত হলে তার পরিণামে অভূতপূর্ব অসন্তোষ ও আন্দোলনের সৃষ্টি হবে এবং সরকার ও জনসাধারণের মধ্যেকার সম্পর্কে এর পরিণাম হবে

কিন্তু জিন্না এবং ভারতীয় সদস্যদের প্রতিবাদ উপেক্ষা করে ৩৪জন সরকারী সদস্যের ভোটের জোরে মার্চ মাসে রাওলাট আইন পাস হল। এর দিনকয়েক পরই ২৮শে মার্চ জিন্না তাঁর বোম্বের নিবাস থেকে বড়লাটের কাছে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের সদস্যপদে ইস্তফা দিয়ে যে কঠোর পত্র পাঠালেন তা তাঁর জাতীয়তাবাদী চরিত্র ও দৃঢ়চেতা স্বভাবের দ্যোতক। জিন্না লিখলেন :

"এই বিল পাস করে আপনার সরকার মাত্র এক বছর পূর্বে যুদ্ধসম্মেলনে ভারতবাসীর সাহায্য চেয়ে যেসব যুক্তি দিয়েছিল তার প্রতিটিকে সক্রিয়ভাবে নস্যাৎ করেছে। গ্রেট ব্রিটেন যেসব নীতি সংরক্ষণার্থ যুদ্ধ করেছিল, সরকারের এই পদক্ষেপের দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে তা পদদলিত হয়েছে। ন্যায়বিচারের মূলনীতি উৎপাদিত হয়েছে এবং যখন রাষ্ট্রের সামনে কোনরকম সত্যকারের সঙ্কট নেই তখন জনসাধারণের মৌলিক অধিকার খর্ব করা হয়েছে। আর এটা করা হয়েছে এমন এক মাত্রাতিরিক্ত ন্যক্কারজনক ও অযোগ্য আমলাতন্ত্রের দ্বারা যার না জনসাধারণের প্রতি কোন উত্তরদায়িত্ব আছে এবং না আছে যথার্থ জনমতের সঙ্গে বিন্দুমাত্র যোগাযোগ।...সুতরাং এই বিল পাস করা এবং যেভাবে তা পাস করা হয়েছে তার প্রতিবাদে আমার ইস্তফা পাঠাচ্ছি।...কারণ আমি মনে করি বর্তমান অবস্থায় কাউন্সিলে থেকে আমি দেশের জনসাধারণের কোন কাজে লাগব না। এছাড়া কাউন্সিলের সদস্য জনপ্রতিনিধিদের অভিমতের প্রতি যে সরকার এমন প্রচণ্ড তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে তার প্রতি সহযোগিতা করা কারও আত্মমর্যাদার অনুকূল নয়। কাউন্সিলের বাইরে যে অগণিত জনসাধারণ রয়েছেন তাঁদের মনোভাব এবং আবেগের মর্যাদা রক্ষার্থেও আমার এই সিদ্ধান্ত। আমার মতে যে সরকার শান্তির সময়ে এজাতীয় আইন প্রণয়ন করে সে আর নিজেকে সভ্য সরকার বলে দাবি করতে পারে না...।"[৫]

সবার প্রতিবাদ উপেক্ষা করে রাউলাট আইন পাস হবার পর তাকে কেন্দ্র করে

দেশবাসী বিক্ষোভে যেন ফেটে পড়ল। ৬ই এপ্রিল উপবাস ও হরতালের মাধ্যমে গান্ধী দেশবাসীকে সক্রিয় প্রতিবাদ জানাতে আহ্বান করলেন। একটি সরকারী প্রতিবেদন (India 1919) অনুসারে তখন অবস্থা নিম্নরূপ :

"জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত উত্তেজনার একটি দৃষ্টিগোচর বৈশিষ্ট্য ছিল হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে অভূতপূর্ব হৃদ্যতা। নেতাদের ঐক্য বেশ কিছুদিন যাবৎ জাতীয়তাবাদী মঞ্চের একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনার রূপ নিয়েছিল। জনসাধারণের মধ্যে এই উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সময়ে এমন কি নিম্ন শ্রেণীয়রাও অন্ততঃ একবারের জন্য তাদের মধ্যেকার ভেদাভেদ বিস্মৃত হতে প্রস্তুত হয়েছিল। এই ভ্রাতৃত্ববোধের অসাধারণ দৃষ্টান্ত পরিদৃষ্ট হল। হিন্দুরা প্রকাশ্যে মুসলমানদের হাত থেকে জল নিয়ে পান করা আরম্ভ করলেন এবং মুসলমানরাও অনুরূপ করা শুরু করলেন। শোভাযাত্রাসমূহে যেসব ধ্বনি উচ্চারিত হত এবং যেসব উদ্‌ঘোষ লেখা ব্যানার বহন করা হত তার মূল বক্তব্য ছিল হিন্দু-মুসলিম ঐক্য। মসজিদের বেদী থেকে এমন কি হিন্দু নেতাদের বক্তৃতা দিতে দেওয়া হয়েছিল।"[৬]

কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড (১৩ই এপ্রিল) এবং পাঞ্জাবের সামরিক শাসন সরকারী দমননীতি ও নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা হয়ে দাঁড়াল। হাণ্টার কমিশনের সামনে জালিয়ানওয়ালাবাগের খলনায়ক জেনারেল ডায়ারের দম্ভপূর্ণ স্বীকারোক্তি কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিল। কংগ্রেসের সমান্তরাল তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন প্রশাসনের হৃদয়হীনতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতাদের মতই ঐসময়ে জিন্না বহু অনুষ্ঠানে রাউলাট আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেছিলেন।

মে মাসে জিন্না বিলাত গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। লীগের প্রতিনিধিমণ্ডলের নেতা হিসাবে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে আসন্ন প্যারিস সম্মেলনে অন্ততঃ একজন মুসলমান প্রতিনিধি নিয়োগ করতে সম্মত করা। যুদ্ধোত্তর ঐ সম্মেলন বসেছিল তুরস্কের সঙ্গে শান্তিচুক্তি নির্ধারণে যাতে খলিফার ভাগ্য নির্ধারিত হবার কথা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ভারতসচিব মণ্টেগুর সঙ্গে তাঁর ভারত সফরকালীন পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে রাউলাট আইন মঞ্জুর না করতে রাজী করা। কিন্তু বোম্বের ভূতপূর্ব ছোটলাট উইলিংডন এবং তদানীন্তন ছোটলাট মণ্টেগুকে জিন্নার সম্বন্ধে বিরূপ করে রেখেছিলেন। সুতরাং উভয় প্রয়াসেই ব্যর্থ হয়ে জিন্নাকে খালি হাতে নভেম্বরের মাঝামঝি ভারতে প্রত্যাবর্তন করতে হল।

জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে ভারতবর্ষে তখন বিদ্রোহবহ্নি

লেলিহান হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় মণ্টেগু-চেমসফোর্ডের শাসন-সংস্কার প্রস্তাব আইনে পরিণত হলেও বিদ্রোহী নেতৃত্বের কাছে আর তা যথেষ্ট মনে হল না। বছরের শেষে অমৃতসরে মোতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে দেশের পরিস্থিতির মূল্যায়ন ছাড়াও দেশবন্ধুর প্রস্তাবানুসারে মণ্টেগু-চেমসফোর্ডের ভায়াকির বদলে অবিলম্বে পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকারের দাবি জানানো হল। জিন্না কংগ্রেস অধিবেশনে দেশবন্ধুর প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা করেন।

॥ ৭ ॥

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ ভারতবর্ষের সঙ্গে সঙ্গে জিন্নার রাজনৈতিক জীবনেও এক গুরুত্বপূর্ণ কাল।

জানুয়ারীতে ডাঃ আন্সারীর নেতৃত্বে খিলাফতের যে মুসলমান প্রতিনিধিমণ্ডল বড়লাটের কাছে দরবার করেছিলেন তাঁরা নিরাশ হয়েছেন। মার্চে মহম্মদ আলীর নেতৃত্বে অপর একটি প্রতিনিধিদল বিলাতে গিয়ে প্রাধানমন্ত্রী লয়েড জর্জসহ আরও অনেকের সঙ্গে দেখা করলেও শেষ অবধি শূন্য হাতে ফিরতে বাধ্য হয়। তাই দেশে তখন ইংরেজের বিরুদ্ধে জনমত প্রবল। আহত ও ক্ষুব্ধ মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধিকারের দাবিতে অপরাপর সম্প্রদায়ও ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মুখর। বিদেশী শাসনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নেবার জন্য দেশবাসী উন্মুখ। বিগত এক বছর ধরে গান্ধী অসহযোগের কর্মসূচীর পক্ষে বিভিন্ন মঞ্চ থেকে জনমত. তৈরী করছেন। ১৯শে মার্চের দেশব্যাপী উপবাস ও প্রার্থনা, জালিয়ানওয়ালা-বাগের স্মরণে ৬ থেকে ১৩ই এপ্রিল জাতীয় সপ্তাহ পালন ইত্যাদি ঐ জনমত জাগ্রত করার কর্মসূচী। ১৪ই মে শেষ অবধি ঘোষিত হল যে খিলাফৎ থাকবে না। প্রায় একই সময়ে ভারতে হাণ্টার কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হল, যাকে জওহরলাল-জীর ভাষায় জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনাবলীর উপর "চুনকাম করা" ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। দেশবাসীর ব্রিটিশ-বিরোধ উত্তুঙ্গ শিখরে। ২৮শে মে বোম্বাই-এ খিলাফৎ কমিটি গান্ধীর অসহযোগ ছাড়া পথ নেই—এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিল। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ৩০শে মে মিলিত হয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করল। এলাহাবাদে দোসরা জুন সর্বদলীয় সম্মেলনে অসহযোগের বিস্তৃত কর্মসূচী প্রণীত হল। ১৮০০০ মুসলমান দারুল-হারব ভারত থেকে দারুল-ইসলাম রূপে পরিগণিত আফগানিস্থানে প্রচণ্ড দুঃখ-কষ্টের মধ্যে হিজরৎ শুরু করে মুসলিম-মানসের তীব্রতা ও তিক্ততার নিদর্শন পেশ -

করলেন। গান্ধীর কার্যক্রম ছাড়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার পক্ষে গ্রহণীয় অপর কোন কর্মসূচীও দেশের সামনে নেই।

তবু সংবিধাননিষ্ঠ এবং অসাম্প্রদায়িক জিন্না খিলাফৎ নিয়ে আন্দোলন ও অসহ-যোগের বিরোধিতা করছেন, এ আমরা পূর্ব অধ্যায়ে দেখেছি। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে (৪-৯ সেপ্টেম্বর) অসহযোগের প্রস্তাব স্বীকৃত হলেও তিনি ঐ প্রবাহে আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। বিষয়-নির্বাচনী সভার তাবৎ মুসলমান সদস্যদের মধ্যে একমাত্র জিন্নাই ছিলেন এর বিরোধী। তিলকের অবর্তমানে এ ব্যাপারে তখনও অ্যানি বেসান্ত ও শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ছাড়াও দেশবন্ধু এবং বিপিনচন্দ্র পালের মত নেতারা তাঁরই পথের পথিক।

বিগত কয়েক বৎসরের প্রথা অনুসারে একই শহরে একই সময়ে (৭ই সেপ্টেম্বর) লীগেরও বিশেষ অধিবেশন। ফেব্রুয়ারী মাসেই জিন্না তার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তুরস্কের প্রতি অবিচার ও অত্যাচারের জন্য জিন্না ইংরেজদের প্রতি আস্থার অভাব ঘোষণা করলেন। আধুনিক ও সংবিধাননিষ্ঠ জিন্না খিলাফৎ ও গান্ধী-প্রস্তাবিত অসহযোগের বিরোধী হলেও হয়ত কিছুটা প্রতিনিধিদের অভিমতের প্রতি গণতান্ত্রিক মর্যাদাবশতঃ এবং হয়তো বা অংশতঃ রাজনৈতিক গগনের নবোদিত সূর্য গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধার কারণে অধিবেশনে যে ভাষণ দিলেন তা বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। সেকালের[১] প্রথা অনুসারে সেই অধিবেশনে একদিকে যেমন গান্ধী, মোতিলাল, লাজপৎ রায়, দেশবন্ধু, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও আবুল কালাম আজাদের মত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ উপস্থিত, তেমনি অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন সৌকত আলী, জাফর আলী খাঁ, আজমল খাঁ ও ফজলুল হকের মত লীগ নেতৃবৃন্দ। গান্ধীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন প্রসঙ্গে জিন্না বললেন :

"দেশবাসীর সম্মুখে খিলাফৎ সম্মেলনের সমর্থন নিয়ে মহাত্মা গান্ধী তাঁর অসহ-যোগের কর্মসূচী উপস্থাপিত করেছেন। এবারে আপনাদেরই স্থির করতে হবে যে আপনারা ঐ কর্মসূচীর মূলনীতি অনুমোদন করেন কিনা ? আর করলে বিস্তারিত-ভাবে এর কার্যক্রম স্বীকার করেন কিনা তাও ভেবে দেখতে হবে। এই পরিকল্পনাকে রূপ দেবার সময় আপনাদের প্রত্যেকের উপর ব্যক্তিগত আঘাত পড়বে। তাই একমাত্র আপনাদের উপরই কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পূর্বে নিজ নিজ শক্তির পরিমাপ করার এবং প্রশ্নটির সব দিক নিয়ে চিন্তা করার দায়িত্ব বর্তাচ্ছে। তবে একবার যদি আপনারা সামনের দিকে কুচকাওয়াজ করার সিদ্ধান্ত নেন তাহলে কোন অবস্থাতেই যেন আর পশ্চাদপসরণ না করেন (না, না, কখনই না)…আমি আর

আপনাদের আটকে রাখতে চাই না। তবে বসে পড়ার পূর্বে কেবল এইটুকু বলতে চাই যে মনে রাখবেন—সম্মিলিত হলে আমরা খাড়া থাকব আর বিভাজিত হলে ধরাশায়ী হব (সাধু, সাধু এবং করতালি)।"[২]

কিন্তু এর সার্ধ তিন মাস পরই (২৮শে ডিসেম্বর) নাগপুর কংগ্রেসে জিন্নার ভিন্ন মূর্তি। দেশবন্ধু বাংলার দলবলসহ অসহযোগের বিরোধিতা করতে অনেক তোড়জোড় করে নাগপুরে উপস্থিত হলেও গান্ধীর প্রভাব-বলয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। অভিজাত এবং সংবিধাননিষ্ঠ জিন্না ও তাঁর নেতৃত্বে প্রভাবিত মুষ্টিমেয় কিছু নেতার "গেঁয়ো মানুষদের ক্ষেপানোর এই মেঠো কর্মসূচী"র সাফল্যে গভীর সন্দেহ। জিন্না তাই বিধিবদ্ধভাবে অসহযোগের বিরোধিতা করলেন। তিনি কংগ্রেসের প্রস্তাবিত নূতন সংবিধানের লক্ষ্য—শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায়ে স্বরাজ অর্জনের আদর্শেও অবিশ্বাসী। কারণ তার মতে রক্তপাত ছাড়া স্বাধীনতা আসবে না এবং দেশবাসীর যেহেতু হিংসার শরণ নেবার ইচ্ছা বা ক্ষমতা কোনটাই নেই, তাই বর্তমান অবস্থায় নির্ভেজাল স্বাধীনতার কথা বলা হঠকারী ব্যাপার। তিনি সেইজন্য মালব্যজীর সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বাধীনতার সমর্থক।[৩]

প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুসারে নাগপুর কংগ্রেসে গান্ধী-প্লাবন সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করলেও জিন্না সাহস ও স্বভাবোচিত ব্যক্তিত্বসহকারে এককভাবে অসহযোগের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। সেই বিরোধিতা অনেক তীব্র, তীক্ষ্ণতায় কুলীশ-কঠোর। জিন্নার মতে অসহযোগের কর্মসূচী দেশের পক্ষে কেবল বিপজ্জনকই নয়, এর জনক গান্ধী বরাবরই সংগঠনে বিভাজন ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছেন তাই প্রস্তাবিত কর্মসূচী দেশকে সর্বনাশের অভিমুখে নিয়ে যাবে। মাত্র কয়েক মাস পূর্বে কলকাতাতে যাঁকে তিনি লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর মত "মহাত্মা" অভিধায় সম্বোধন করেছিলেন, এবার তাঁকে কেবল "মিস্টার গান্ধী" রূপে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের প্রকাশ্য অধিবেশনে উল্লেখ করলেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মহম্মদ আলীর নামের পূর্বেও তিনি "মৌলানা" যোগ করেননি। প্রতিনিধিরা তাঁর বক্তৃতায় বার বার বাধা দিয়ে গান্ধীজীকে মহাত্মা ও মহম্মদ আলীর নামের পূর্বে মৌলানা ব্যবহারের জন্য পীড়াপীড়ি করলেন। কিন্তু জিন্না অবিচল। মহম্মদ আলী তাঁর সংবিধাননিষ্ঠাকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বিদ্ধ করে অহসযোগের সমর্থন করলেন।[৪] দেশবন্ধু ও লাজপৎ রায় তো গান্ধীর প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেনই। অসহযোগের বিরুদ্ধে জিন্নার মন্তব্যে ক্ষিপ্ত মৌলানা সৌকত আলী জিন্নার প্রতি কটূক্তি করতে করতে মুষ্টিবদ্ধ হাতে তাঁর দিকে তেড়ে গেলেন, যদিও অন্যেরা বাধা দেওয়ায় জিন্নাকে আর সর্বজনসমক্ষে প্রহৃত হতে হয়নি।

প্রতিনিধিদের সমর্থনের অভাব উপেক্ষা করেও গান্ধী-ব্যক্তিত্বের সেই প্রবল প্লাবনের মধ্যেও জিন্না নিজের বিশ্বাসের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে দ্বিধাবোধ করেননি: "আমার পথই যথার্থ—সাংবৈধানিক পথই যথার্থ।"[৫]

কংগ্রেসের অসহিষ্ণু[৬] প্রতিনিধিদের অপমানজনক এবং অগণতান্ত্রিক আচরণে ক্ষুব্ধ দুঃখিত জিন্না অধিবেশন বর্জন করে সেই রাতেই চলে গেলেন। একই স্থানে আহূত মুসলিম লীগ অধিবেশনে তাঁর অভিমতের কি দশা হবে অনুমান করে নিয়ে তাতে যোগদান করার জন্যও অপেক্ষা করলেন না। এইভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে সাংগঠনিকভাবে তাঁর দুই দশকের সম্পর্কের উপর যবনিকাপাত হল। সঙ্গে সঙ্গে জিন্নার রাজনৈতিক জীবনেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের অবসান ঘটল।

কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা জিন্না সুখে দুঃখে যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রায় বিশ বছর ওতপ্রোত হয়ে ছিলেন, তাঁর পক্ষে এতদিনের সম্পর্কচ্ছেদ করা সহজ ছিল না। আমরা দেখেছি যে নিজের লিবারেল ও সংবিধাননিষ্ঠ বিশ্বাসের জন্য কংগ্রেসের নূতন অর্থাৎ গান্ধীনেতৃত্বের সঙ্গে জিন্নার আদর্শগত মতভেদ ছিল। গান্ধীনেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য ছিল ইংরাজী আদব-কায়দাদুরস্ত অভিজাতদের বদলে ভারতীয় গ্রামীণ সংস্কৃতির বনিয়াদ সাধারণ মানুষ—নিরক্ষর অর্ধশিক্ষিত কৃষক-মজুরদের গণ-আন্দোলন ও প্রত্যক্ষ অহিংস সংগ্রাম। মোতিলাল ও দেশবন্ধুর মত অনেকের পক্ষে নূতন যুগের চাহিদা অনুসারে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনকে রূপান্তরিত করা সম্ভব হলেও জিন্নার কাছে এটা ছিল অভাবনীয়। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে এত আয়ের আইন-ব্যবসা ছেড়ে দিলে কিছুদিন পূর্বে জাত কন্যা এবং ধনীর দুলালী অর্থব্যয়ে দরাজহস্ত স্ত্রীর ভরণপোষণের কি ব্যবস্থা হবে—এ প্রশ্নও তাঁর মনে এসময় জেগেছিল কি না আমাদের পক্ষে বলা দুরূহ।

যাই হোক, আমরা এও দেখেছি যে জিন্নার মত দীর্ঘদিনের অসাম্প্রদায়িক কংগ্রেস নেতার বদলে নূতন নেতার ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন[৭] নিয়ে আরব্ধ সংবিধান বহির্ভূত আন্দোলনে মৌলানা মহম্মদ আলী, সৌকত আলী এবং তাঁদের মত আরও অনেক মূলতঃ সাম্প্রদায়িক এবং প্যান-ইসলামবাদী নেতাদের বেশী করে কোল দেবার জন্য জিন্নার মনে স্বাভাবিক গান্ধী-বিরোধও জেগেছিল। এছাড়া নেতৃত্ব এবং ব্যক্তিত্বের সংঘাত তো ছিলই, যার কারণ জিন্নার তুলনায় ভারতের রাজনীতিতে সেদিনকার নেতা গান্ধীর নেতৃত্ব মেনে নিয়ে পিছনের সারিতে সরে যাওয়া তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না। হয়ত বা ভবিষ্যতে "গান্ধীর সত্যে"র আবিষ্কার-প্রয়াসী এরিখ এরিকসনের মত কোন মনোবিজ্ঞানী জিন্নার জীবনের এইসব দিকের

উপর আলোকপাত করতে সমর্থ হবেন। তবুও এইভাবে একেবারে ভিন্ন মেরুতে চলে যাবার তাৎকালীন রাজনৈতিক কারণ থাকা স্বাভাবিক। অতঃপর আমরা তার অনুসন্ধান করার চেষ্টা করব।

নাগপুরের ঘটনার কিছুদিন পূর্বে হোমরুল লীগ থেকে জিন্না ও তাঁর সমক্ষমতাবলম্বীদের পদত্যাগ প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানিয়ে গান্ধী তাঁকে অসহযোগের পতাকাতলে সমবেত হবার অনুরোধ করেছিলেন। জবাবে জিন্না জানান: "আপনি অনুগ্রহপূর্বক প্রস্তাব করেছেন যে 'দেশের সামনে যে নবীন জীবনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে আমি যেন তাতে অংশগ্রহণ করি।' আপনার এই প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ জানাই। 'নবীন জীবন' বলতে আপনি যদি আপনার কর্মপদ্ধতি ও কর্মসূচীর প্রতি ইঙ্গিত করে থাকেন, তাহলে আমার ভয় হচ্ছে যে আমি তা গ্রহণ করতে অক্ষম। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এ আমাদের ধ্বংসের অভিমুখে নিয়ে যাবে।...আপনার কর্মপদ্ধতি ইতিমধ্যেই সেই সব প্রতিষ্ঠানে বিভাজন এবং দলাদলি সৃষ্টি করেছে যার সঙ্গে আপনি যুক্ত হয়েছেন। দেশের জনজীবনেও আপনার অবদান অনুরূপ। কেবল হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যেই নয়—হিন্দু ও হিন্দু, মুসলমান ও মুসলমান, এমন কি পিতা-পুত্রের মধ্যেও বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে এবং দেশের সর্বত্র জনসাধারণ বেপরোয়া হয়ে উঠছে। আপনার চরমপন্থী কর্মসূচী এখনকার মত প্রধানতঃ অনভিজ্ঞ যুবক সম্প্রদায় এবং অজ্ঞ ও নিরক্ষরদের মনে সাড়া জাগিয়েছে। এসবের তাৎপর্য হল আগাগোড়া গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা। এর পরিণামে যে কি হবে তা ভাবতেও আমার হৃদ্‌কম্প হচ্ছে।...জাতীয়তাবাদীদের সামনে একমাত্র পথ হল সম্মিলিত হয়ে যথাসম্ভব শীঘ্র পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বজনমান্য কোন কর্মসূচী অনুসারে কাজে লেগে পড়া। এজাতীয় কর্মসূচী কোন ব্যক্তিবিশেষ চাপিয়ে দিতে পারেন না, দেশের তাবৎ জাতীয়তাবাদী নেতাদের অনুমোদন ও সমর্থন চাই এর পিছনে। আর এই লক্ষ্যের পরিপূর্তির জন্য আমি এবং আমার সহকর্মীরা কাজ করে যাব।"[৮]

পূর্বোক্ত পত্রে জিন্নার তদানীন্তন সামগ্রিক মনঃস্থিতির চাবিকাঠি থাকলেও এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে পত্রের "আপনার কর্মপদ্ধতি ইতিমধ্যেই সেইসব প্রতিষ্ঠানে" অংশ লক্ষণীয়। গান্ধী, কংগ্রেস ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি জিন্নার কঠোর বিরূপতা ও উদ্ধৃত পত্রাংশের ভাষার উষ্মার রহস্য খুব সম্ভব ঐখানে নিহিত। লীগের কলকাতার বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীর সঙ্গে পূর্বোক্ত ধরনের সৌজন্যমূলক ব্যবহার করার মাত্র সাড়ে তিন মাসের মধ্যে জিন্নার আচরণে এমন পরিবর্তন ঘটে যাবার

একটি উল্লেখযোগ্য কারণ ঐ সময়ে ঘটে, যে তথ্য বহুল প্রচারিত নয়।

ঘটনাটি হল অল ইণ্ডিয়া হোমরুল লীগ নিয়ে। আমরা পূর্বেই দেখেছি এর প্রতিষ্ঠাত্রী এবং সভানেত্রী শ্রীমতী অ্যানি বেসান্তের গতিবিধির উপর ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপনের পর জিন্না এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে এর অন্যতম নেতা হয়ে ওঠেন। স্বায়ত্তশাসনের জন্য প্রতিষ্ঠানটি সমগ্র দেশে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করে। কালক্রমে জিন্না এর বোম্বে শাখার সভাপতি হন এবং পরবর্তীকালে লিবারেল নেতারূপে পরিচিত জয়াকর হন এর সম্পাদক। ১৯১৯-২০ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধী যখন উদীয়মান জনপ্রিয় জননেতা তখন শ্রীমতী বেসান্তের পদত্যাগের পর জিন্নাই হোমরুল লীগের এক সভায় পরবর্তী সভাপতি হিসাবে গান্ধীর নাম প্রস্তাব করেন। সভাপতি হবার কিছুদিন পরই ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে তিলকের ঘোষণাপত্রের পাশাপাশি গান্ধী যে বিবৃতি দেন তাতে হোমরুল লীগকে তাঁর কর্ম-সূচীর পরিপূর্তির বাহন হিসাবে কাজে লাগাবার ইঙ্গিত থাকায় প্রতিষ্ঠানের পুরাতন নেতারা প্রমাদ গণেন। আর তেসরা অক্টোবর বোম্বেতে অনুষ্ঠিত হোমরুল লীগের সাধারণ সভায় যখন প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে (ভারতীয় ভাষায়) স্বরাজ্য সভা রাখার এবং এর মূল নীতিতেও (creed) পরিবর্তন করার প্রস্তাব করা হয়, তখন জিন্না, জয়াকর, যমুনাদাস দ্বারকাদাস, মঙ্গলদাস পাকবাসা ও কানহাইয়ালাল মুন্সী প্রমুখ প্রতিষ্ঠানের পুরাতন নেতারা এর তীব্র বিরোধিতা করেন। কিন্তু গান্ধীর জনপ্রিয়তার জন্য এবং সম্ভবতঃ মোতিলাল নেহরুর বাগ্মিতার সমর্থন পাওযায় বহু বাদ-বিবাদের পর এই প্রতিবাদ ১০৯ বনাম ৪২ ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে যায়। জিন্না এবং আরও কয়েকজন সভার সভাপতি গান্ধীর অবৈধানিক নির্দেশের প্রতিবাদে সভা বর্জন করেন। পরে (২৫শে অক্টোবর ১৯২০) জিন্নাসহ অনেকে এ ঘটনার প্রতিবাদে হোমরুল লীগ থেকে পদত্যাগ করে এক প্রতিবাদপত্র পাঠিযে বলেন : "আমাদের…মত এই যে লীগের যে সংবিধান গ্রহণ করা হযেছে…তা ইতিপূর্বে লীগ অনুসৃত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং কর্মপদ্ধতি থেকে মূলগত ভাবে পৃথক।…আমরা এও মনে করি যে সংবিধানের এইসব পরিবর্তন এমন পদ্ধতিতে করা হয় যা লীগের নিয়ম-কানুনের পরিপন্থী। আমরা বলতে চাই যে উক্ত পদ্ধতির সপক্ষে আপনি যে নির্দেশ (ruling) দেন তা একাধারে ভ্রান্ত ও একদেশদর্শী।… তাই অতীব দুঃখের সঙ্গে আমরা লীগের সাধারণ সভাপদ এবং আর যে সব পদে আসীন আছি তার থেকে পদত্যাগ করছি।"[৯]

অবশ্য গান্ধীর পক্ষেরও বক্তব্য ছিল। অধিকাংশ সদস্যের সমর্থনে গান্ধীর ভূমিকার

শক্তি তো প্রত্যক্ষ হয়েই ছিল। এছাড়া স্বরাজ্য সভা বা হোমরুল লীগের সংযুক্ত সাধারণ সম্পাদক হিসাবে ১৮ই অক্টোবর বোম্বে ক্রনিকালে প্রকাশিত জওহরলাল নেহরুর সম্পাদককে লিখিত পত্রেও[১০] ইতিহাস ও সংবিধানের দিক থেকে গান্ধীর ভূমিকার যৌক্তিকতার প্রদর্শন করা হয়েছিল। তবুও গান্ধী-জিন্না সংঘর্ষের যে অশনি-সংকেত ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে গুর্জর সভায় গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর জিন্নার ইংরাজীতে প্রদত্ত ভাষণকে কেন্দ্র করে একবার এবং ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে দিল্লীর "যুদ্ধ সম্মেলনে" গান্ধীর সরকারী প্রস্তাবকে সমর্থন ও জিন্নার তার প্রতি তীব্র বিরোধকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয়বার দেখা দিয়েও ঘটনাচক্রে তিরোহিত হয়েছিল, হোমরুল লীগের অধিবেশনকে কেন্দ্র করে তা এবার বজ্র-বিদ্যুৎ সহযোগে প্রকাশ পেল। নাগপুর কংগ্রেসে আসিতে অসিতে দ্বৈরথ প্রথম সংঘর্ষেরই ব্যাপ্তি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে দুই মহারথীর এই সংঘাত আধুনিক ভারতের ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তিত করে, তার সম্বন্ধে পরে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা যাবে। বর্তমানের মত এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে হোমরুল লীগের এই পরিণতির জন্য জিন্না গান্ধীকে ক্ষমা করতে পারেন নি। কলকাতার প্রায় তিন মাস পরে নাগপুরের কংগ্রেস অধিবেশনে এবং তারপরও তাঁর প্রবল গান্ধীবিরোধী ভূমিকার অন্তরালে এই বিরূপ মানসিক প্রতিক্রিয়ার বিশেষ প্রভাব থাকাই স্বাভাবিক।

॥ ৮ ॥

জিন্না কংগ্রেস ছেড়ে চলে গেলেও ভারতের রাজনীতি থেকে বিদায় নেননি। গান্ধী ও তার নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ হলেও যথার্থ অর্থে তিনি শিভলরাস ইংরেজ ভদ্রলোক। তাই পুণার ফার্গুসন কলেজে গোখলের ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকীতে অসহযোগের ডাকে সাড়া দিয়ে ছাত্রদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জনের প্রকাশ্য নিন্দা করলেও, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে সরকার অসহযোগবিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের যে তালিকা তৈরী করছিলেন তাতে তিনি নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে দিতে সম্মত হননি। এছাড়া জয়াকরসহ গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে বড়লাটের মাধ্যমে সরকারের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ারও চেষ্টা তিনি করেন, যদিও শেষ অবধি অসহযোগনিষ্ঠার কারণে গান্ধী তাতে সম্মত হননি।[১]

তাঁর ভদ্রলোক বৃত্তির অপর একটি নিদর্শন তাঁর এবং মালব্যজী ও জয়াকর প্রভৃতি কর্তৃক আহূত বোম্বের সর্বদলীয় সম্মেলন উপলক্ষে পাওয়া যায়। ১৯২২

খ্রীষ্টাব্দের ১৪-১৬ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত সম্মেলনের শেষে সম্মেলনের সভাপতি স্যার শঙ্করণ নায়ার সংবাদপত্রে প্রদত্ত একটি বিবৃতিতে কিছু ভুল তথ্য দেবার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। সম্মেলনের অপর দুই সম্পাদক জয়াকর ও নটরাজনের সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে জিন্না স্যার শঙ্করণের বিবৃতির প্রকাশ্য খণ্ডন করেন।[২] এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে কংগ্রেস ছাড়ার পরও ঐ প্রতিষ্ঠান এবং গান্ধীজীর প্রতি অভিমানে দূরে সরে না গিয়ে অসহযোগের পরবর্তী রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূর করার জন্য পূর্বোক্ত সম্মেলনের প্রস্তাবাবলী (আন্দোলন প্রত্যাহার ও দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার উপায় উদ্ভাবনের জন্য গোলটেবিল বৈঠক) নিয়ে অপর দুই সম্পাদকসহ জিন্না বড়লাটের সঙ্গে বার বার পত্র ও তারবার্তা বিনিময় করেন। ঐ সম্মেলনের তরফ থেকে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের দোসরা ফেব্রুয়ারী তিন সম্পাদক গান্ধীজীকে যে পত্র লেখেন তাতে তাকে "মহাত্মাজী" রূপে সম্বোধন করা হয় এবং পত্রে হস্তাক্ষরকারীদের মধ্যে প্রথমজন ছিলেন জিন্না।[৩]

ইতিমধ্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক মোড় নেওয়া শুরু করেছে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে খিলাফৎ ও অসহযোগের প্রবল উদ্দীপনায় মুসলমানরা বহুস্থানে হিন্দুদের মনোভাবের সমাদর করার জন্য বকর-ঈদের সময় স্বেচ্ছায় গো-কোরবাণী বর্জন করেছিলেন এবং অসহযোগী নেতা হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে দিল্লীর জুম্মা মসজিদে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে সমবেত মুসলমানদের সামনে তাঁর বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[৪] কিন্তু ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে কেরলের খিলাফতি মোপলা মুসলমানরা প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু প্রতিবেশীদের প্রতি সন্দেহপরায়ণ হয়ে তাঁদের গৃহে লুটপাট অগ্নিসংযোগ এবং এমন কি জোর করে ধর্মান্তরিত করার কাজও করেন। আর মৌলানা হসরৎ মোহানীর মত জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতাও মোপলাদের ঐসব দুষ্কৃতির সাফাই গান। এর প্রতিক্রিয়ায় কারামুক্ত হয়ে শ্রদ্ধানন্দ "শুদ্ধি" আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং পণ্ডিত মালব্যের নেতৃত্বে শুরু হয় হিন্দুদের "সংগঠন" আন্দোলন। মুসলমানদের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়ায় শুরু হয় "তবলিগ" ও "তঞ্জিম" আন্দোলন। খিলাফতের স্বল্পকালীন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য মিলিয়ে যায় এবং ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের শেষে মুলতানের দাঙ্গায় হিন্দুদের উপর হত্যা লুণ্ঠন ও অন্যবিধ অত্যাচারের কালো মেঘ নেমে আসে। তারপর নানাস্থানে দফায় দফায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটতে থাকে, উভয় সম্প্রদায়ই যার শিকার হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রভূত যুক্তি ও তথ্য সহকারে রাজেন্দ্রপ্রসাদ দেখিয়েছেন যে সম্ভবতঃ কোন স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষের গোপন অঙ্গুলিহেলনে তখনই ভারতবর্ষে

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দিয়েছে যখনই সকল সম্প্রদায় ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য মুখর হয়েছেন।[৫]

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও দুঃসময়ের আবির্ভাব ঘটে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ৮-১০ জুলাই করাচীতে অনুষ্ঠিত খিলাফৎ সম্মেলনের প্রস্তাবে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে স্বরাজ খিলাফতীদের আদৌ বিবেচ্য নয়, তাঁরা মূলতঃ প্যান-ইসলামী সাম্প্রদায়িকতাবাদী।[৬] ডিসেম্বরে আহমেদাবাদে এই পর্যায়ে শেষবারের মত বিগত কয়েক বৎসরের ঐতিহ্য অনুসরণ করে কংগ্রেস ও লীগের অধিবেশন একই জায়গায় ও একই সময়ে হয়। লীগের অধিবেশনে মৌলানা হসরৎ মোহানী সভাপতিত্ব করলেও একথা প্রকট হয়ে ওঠে যে লীগ গণসংগ্রামের পথে আর অগ্রসর হতে অক্ষম। লীগের ঐ অধিবেশনে কংগ্রেস অথবা এমন কি খিলাফৎ বা জমায়েত-উল-উলেমা-ই-হিন্দের সম্মেলনের মত আইন অমান্যের (civil disobedience) প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। লীগের এইভাবে পিছিয়ে পড়ার কারণ আবিষ্কার প্রসঙ্গে মৌলবী সঈদ তুফায়েল আহমদ বলেন যে কারণ লীগের জন্ম-ইতিহাসে নিহিত। তাই লীগ যা-ই করতে যাক না কেন, সিমলায় বড়লাটের কাছে আগা খাঁর নেতৃত্বে দরবারের মানসিকতার উর্ধ্বে উঠতে পারেনি। "লীগের রাজনীতি হল শুধু এই—হিন্দুরা যেসব অধিকার ও পদ অর্জন করবে, তাতে মুসলমানদের ভাগ নির্ধারিত করতে হবে। একে যথার্থ রাজনীতি বলা চলে না। যথার্থ রাজনীতির কারবার সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অধিকার নিয়ে এবং এই ক্ষেত্রে রাজনীতি ধর্মের মতই শক্তিশালী। এই শক্তির অভাবের কারণ মুসলিম লীগের কোন সদস্যকে কোন রকম আঘাতের সম্মুখীন হবার জন্য প্রবুদ্ধ করা যায় না। নিজের মধ্যে তাই তিনি উচ্চগ্রামের দৃঢ়চিত্ততা ও সাহসও খুঁজে পান না।"[৭]

এইখানে উল্লেখযোগ্য যে মুসলিম রাজনীতির পুনর্বার সাম্প্রদায়িক রূপ নেবার পরিপ্রেক্ষিতে জিন্না কিন্তু ঐ প্রবাহে গা ভাসাননি। জাতীয়তাবাদী এবং ধর্মনিরপেক্ষ জিন্নার পক্ষে ঐ সময়ে খিলাফতী বা মুসলিম লীগের সুরে সুর মেলানো সম্ভব হয়নি। অপর দিকে গান্ধী-নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগী কংগ্রেসে ফিরে যাওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি নূতন মডারেট রাজনৈতিক দল গঠন করার জন্য জয়াকর এবং মোতিলালের মত সমভাবে ভাবিত বন্ধু ও সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। কিন্তু তাঁরা কেউই এ ব্যাপারে উৎসাহ না দেখানোর জন্য জিন্নার সে ইচ্ছা অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়। ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে জিন্না হয়ে পড়েন এক বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্ব।

সাময়িক সংগ্রামের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে মুসলিম লীগও প্রায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে লীগের লখনউ অধিবেশন কোরামের অভাবে বাতিল করতে হয়। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মার্চ নবীন তুরস্কের নেতা কামাল পাশা খলিফার পদ রদ করে দিয়ে খিলাফৎ আন্দোলনের মূলে কুঠারাঘাত করেন। এর ফলে মুসলিম রাজনীতি এমন বিভ্রান্ত ও দিশাহারা হয়ে পড়ে যার জের দীর্ঘদিন ধরে থাকে। ইতিপূর্বে চৌরীচেরায় গণহিংসার জ্বালামুখীর বিস্ফোট দেখার পাঁচদিন পর গান্ধী দেশ প্রস্তুত নয় বলে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেছেন (১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯২২)। অতঃপর তিনি কারারুদ্ধ হলেও অসহযোগী এবং খিলাফতী—উভয় নেতাদেরই সমালোচনার পাত্র হন। খিলাফতীদের বিশেষ ক্ষোভ – গান্ধী মুসলমানদের প্রতারণা করেছেন।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে জিন্না বোম্বাই মুসলিম আসনের নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুনর্নির্বাচিত হন। রাউলাট আইনের প্রতিবাদে পদত্যাগের পর এই তাঁর পুনরায় সংসদীয় কার্যকলাপে যোগদান করা। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী দিল্লীতে নবগঠিত পরিষদের প্রথম সভায় যোগ দেবার পরই ২৩ জন নির্দলীয় সদস্যদের একটি গোষ্ঠী নিজের নেতৃত্বে গঠন করেন। তারপর মোতিলাল ও দেশবন্ধুর স্বরাজী দলের ৪২ জন সদস্যের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে পরিষদে এমন এক জাতীয়তাবাদী দলের গঠনে অগ্রণী হবার ভূমিকা গ্রহণ করেন, যে দল স্বরাজীদের অসহযোগ আন্দোলনের অনুপূরক সর্ববিষয়ে সরকারের বিরোধিতা করার নীতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত পরিষদে গঠনমূলক বিরোধীর ভূমিকা অবলম্বন করে। এর ফলে তদানীন্তন সরকারকে বেশ কিছুদিন পরিষদের সভায় বিব্রত হতে হয়। এ ব্যাপারে তাঁর অন্যান্য সঙ্গীরা ছিলেন পণ্ডিত মালব্য, বিপিনচন্দ্র পাল, পুরুষোত্তম ঠাকুরদাস, ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, এন. সি. কেলেকার প্রমুখ সেকালের নেতৃবৃন্দ। ঐ পর্যায়ে তাঁর সংসদীয় কার্যকলাপের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান হল সৈন্যবাহিনীর ভারতীয়করণ, ভারতীয় মুদ্রায় সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় বিলাতী পণ্য কেনার (রুপি টেণ্ডার) প্রস্তাব এবং বিপিনচন্দ্র পালের ভারতকে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসিত উপনিবেশের মর্যাদা দেবার প্রস্তাবের জোরালো সমর্থন। মে মাসের ২৪-২৫ লাহোরে অনুষ্ঠিত লীগের বিশেষ অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে পরবর্তী তিন বৎসরের জন্য লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন।

খিলাফতের ব্যর্থতার পর মুসলমান সমাজের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা এবং অসহযোগ-আন্দোলন-উত্তর কংগ্রেসের সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে তোলার জন্য লীগের

সভাপতিরূপে জিন্নার অভিভাষণে ঐকান্তিক প্রয়াস করার নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। অধিবেশনের প্রাক্কালে জনৈক সাংবাদিককে দেওয়া সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে অপরাপর বিষয়ের মধ্যে জিন্না বলেন যে তাঁর উদ্দেশ্য হবে: "…নিখিল ভারত মুসলিম লীগের মাধ্যমে যথোপযুক্ত সময়ে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের মতই পুনরায় হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সম্পূর্ণ বোঝাপড়া কায়েম করা।"

অতঃপর তিনি বলেন যে, "আমি যতদূর বুঝেছি লীগ কোনমতেই এমন কোন নীতি বা কর্মসূচী গ্রহণ করবে না, যা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বিন্দুমাত্র বিরোধী হতে পারে।…পক্ষান্তরে আমার বিশ্বাস লীগ এমন পন্থা অনুসরণ করবে যা জাতীয় স্বার্থের পরিপুষ্টির অনুকূল হয়, যদিও এর জন্য মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ স্বার্থের কথা বিস্মৃত হওয়া চলবে না।"[৮]

সভাপতির ভাষণে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন: "মহাত্মা গান্ধীর অভিপ্রেত কাউন্সিল বয়কট করার কার্যসূচী কার্যকরী অথবা (জাতীয় স্বার্থে) অনুকূল হয়নি…যে খিলাফৎ সংগঠন খাড়া করা হয়েছিল তাও এর তুলনায় ভাল কিছু করতে সক্ষম হয়নি …। গত তিন বৎসরের যুদ্ধের পরিণামে আমরা অবশ্য ভারতবর্ষে স্বরাজ প্রাপ্তির অনুকূলে এক প্রকাশ্য আন্দোলন গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছি। ভারতে অবিলম্বে ঔপনিবেশিক দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হোক—এই বক্তব্যের সপক্ষে এক নির্ভীক ও যতিবিরতিহীন দাবি উঠেছে।"[৯]

বক্তৃতার উদ্ধৃত অংশের দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। কারও চাপ ছাড়াই এবং ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এযাবৎ গান্ধীর সঙ্গে তীব্র মতভেদ থাকা সত্ত্বেও জিন্না স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গান্ধীজীকে আবার "মহাত্মা" অভিধায় উল্লেখ করছেন এবং অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও এর অন্যতম চারিত্রধর্ম যা আবার এর শক্তিরও আধার, অর্থাৎ প্রকাশ্য গণআন্দোলন ও তজ্জনিত জনজাগরণের স্বীকৃতি দিয়েছেন।

ঐ ভাষণে তিনি আরও বলেন, "স্বরাজ অর্জনের এক অপরিহার্য শর্ত হল হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য…আমি এই কথা বলতে চাই যে, যেদিন হিন্দু ও মুসলমান মিলিত হবে সেইদিনই ভারতবর্ষ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন পাবে।[১০]

গান্ধীজীও জিন্নার হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের এই ঐকান্তিক আগ্রহের স্বীকৃতি দেন ইয়ং ইণ্ডিয়াতে ২৯শে মে তারিখে প্রকাশিত তাঁর এক বিখ্যাত সুদীর্ঘ প্রবন্ধে।"[১১]

সেই অধিবেশনে মুসলিম লীগ স্থির করে যে প্রতিষ্ঠান "…স্বরাজের জন্য প্রয়াস করবে। স্বরাজের সংজ্ঞা দেওয়া হয় সম্পূর্ণভাবে 'সাধারণ ও সামান্য স্বার্থের' বিষয়

সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন স্বল্পসংখ্যক বিষয় ছাড়া 'সম্পূর্ণভাবে আত্ম-নিয়ন্ত্রিত' (অটোনমাস) প্রদেশসমূহের স্বেচ্ছামূলক (ফেডারাল) ঐক্যবন্ধন। 'সকল সম্প্রদায়কে পরিপূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা' দেওয়া হবে এবং ভারতীয় মুসলমানদের জন্য 'পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা' বজায় থাকবে, কারণ যৌথ নির্বাচনব্যবস্থা 'বিবাদ ও অনৈক্যের উৎস' এবং এ প্রথা 'উপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করতে সম্পূর্ণভাবে অপারগ।"[১২] এছাড়া লীগের ঐ অধিবেশনে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার জন্য জিন্নার সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হয় এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনে স্থানে স্থানে সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নিয়ে কনসিলিয়েটারি বোর্ড গঠনেরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

জিন্না এই প্রথম মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনব্যবস্থার অপরিহার্যতার কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করলেন, যদিও আমরা দেখব যে পরে একাধিকবার সুযোগ হলেই পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা পরিহার করার জন্য তিনি উৎসুক হয়েছেন। যাই হোক, গোড়ার দিকে এর তীব্র বিরোধ করলেও ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে জিন্না পৃথক মুসলিম নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতিনিধি হিসাবেই এতবার কেন্দ্রীয় পরিষদে নির্বাচিত হয়ে আসছিলেন। ঐসব নির্বাচনের অপেক্ষাকৃত নিরাপত্তা কি তাঁকে পৃথক নির্বাচনের অনুকূল করেছিল? অথবা কংগ্রেস ছাড়ার পর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একমাত্র মুসলিম লীগই তাঁর আশ্রয় হবার জন্য তার অধিকাংশ সদস্য ও সমর্থকদের ধ্যানধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন জিন্না? সম্ভাব্য তৃতীয় কারণটি কি এই যে ইতিমধ্যে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে এবং তদনুসারে পাঞ্জাব ও বঙ্গ উভয় প্রদেশেই মুসলমানরা একক সংখ্যাগরিষ্ঠরূপে প্রমাণিত হওয়ায় ঐসব প্রদেশের ব্যাপারে লীগের প্রগতিশীল অংশের সঙ্গে সঙ্গে জিন্নাও লখনউ চুক্তির উক্ত দুই প্রদেশের আসন বণ্টন ব্যবস্থায় আর সন্তুষ্ট নন? অথবা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে যেমন হয়— অল্পাধিক সব কারণগুলির সমন্বয়েই তাঁর ঐ ভূমিকা—এ কথা সুস্পষ্ট-ভাবে বলার মত প্রমাণ আমাদের হাতে নেই।

যাই হোক, সে বছরের কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা মহম্মদ আলী কৃত তদানীন্তন লীগ ও তাঁর নেতৃত্বের এক বিরূপ সমালোচনার উত্তরে সংযত ভাষায় জিন্না বলেন :

"সবাই ভাল ভাবে জানেন যে আমি পৃথক নির্বাচন-প্রথা ও সাম্প্রদায়িক প্রতি-নিধিত্ব-ব্যবস্থার প্রেমীদের দলে নই। কিন্তু এ ব্যাপারে মুসলিম জনমত এমন প্রবল যে আমাদের হয়ত অন্ততঃ সাময়িক ভাবে একে অপরিবর্তনীয় সত্য বলে স্বীকার করে নিতে হবে। এর ভিত্তিতে মুসলমানরা যেখানে যেখানে সংখ্যালঘু সেখানে তাঁদের

যথেষ্ট এবং কার্যকরী প্রতিনিধিত্ব দিতে হবে।...আমি তাই আশা করি যে হিন্দুরা আমাকে ভুল বুঝবেন না, কারণ আজও আমি পোড় খাওয়া জাতীয়তাবাদী এবং মুসলমানদের যদি সংগঠিত করতেই হয় তাহলে তা জাতীয় অগ্রগতির বা স্বার্থের বিনিময়ে হবে না। পক্ষান্তরে এ হবে তাঁদের অন্যান্য ভারতবাসীদের সমপর্যায়ে আনার উদ্দেশ্যে।"[১৩]

২৫শে অক্টোবর যে অর্ডিন্যান্সের বলে বাংলা সরকার কংগ্রেস ও স্বরাজ্য দলের কার্যালয় এবং তার নেতাদের বাড়ি খানাতল্লাসী করে সুভাষচন্দ্র প্রমুখ চল্লিশজনকে বিনা বিচারে আটক রাখে, গান্ধী এবং আরও অনেকের সঙ্গে জিন্নাও তার তীব্র প্রতিবাদ করেন।[১৪] ২১শে নভেম্বর কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ আলী সরকারের এই দমননীতির পরিপ্রেক্ষিতে কর্তব্য নির্ধারণের জন্য সকল দল এবং বিশেষ করে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে যাঁরা কংগ্রেস ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁদের একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। আরও অনেকের সঙ্গে জিন্নাও এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সম্মেলন "সকল রাজনৈতিক দলকে পুনরায় কংগ্রেসে সম্মিলিত করার শ্রেষ্ঠ পন্থা উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানসহ স্বরাজ প্রাপ্তির এক পরিকল্পনা রচনার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি নিয়োগ করে যাকে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চের মধ্যে তার প্রতিবেদন পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।"[১৫] ডিসেম্বরের শেষে বোম্বেতে অনুষ্ঠিত লীগের অধিবেশনেও বাংলার অর্ডিন্যান্সের নিন্দা করে হিন্দুদের সঙ্গে সংযুক্ত মোর্চা গড়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়। জিন্নাও এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। লীগের ঐ অধিবেশনে তাঁর এই মর্মের প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, "বিধানসভাসমূহ, অন্যান্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী চাকরিতে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে তাঁদের দাবি নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠিত হোক।"[১৬]

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী জিন্না কেন্দ্রীয় পরিষদে বাংলায় বিগত বছর অক্টোবরে জারি করা অর্ডিন্যান্সের এবং বিপ্লবীদের প্রতি সরকারী নীতির বিরোধিতা করলেন। মার্চে অর্ডিন্যান্সের ঐ ধারাসমূহ আইনে পরিণত করার জন্য এক বিল এলে তারও বিরোধিতা করলেন এবং অধিকাংশ সদস্যের বিরোধিতায় সে বিল বাতিল হয়ে গেল। এছাড়া রঙ্গচারী, সম্মুখম্ চেট্টি প্রমুখের সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে জাতীয়তাবাদীদের দৃষ্টিকোণ থেকে একাধিক বিলের প্রবর্তন বা বিরোধিতা করলেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধে কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্যদের নিয়ে ইণ্ডিপেনডেণ্ট পার্টি নামে জাতীয়তাবাদীদের এক নূতন গোষ্ঠীর জন্ম হয় এবং জিন্না তার নেতা নির্বাচিত হন। বাজেট ও ফাইন্যান্স বিলে স্বরাজ্য দলের সদস্য মোতিলাল নেহরু ও বিঠলভাই

প্যাটেলের বিরোধিতা করলেন। আবার বিঠলভাই পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। দেশবন্ধু ও রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের তিরোধানে তাদের প্রতি শোকাঞ্জলি নিবেদন করলেন। মদ্য উৎপাদন এবং এর আমদানি ও বিক্রির বিরুদ্ধে এক বিলের সমর্থন করলেন। এছাড়া সরকারের শাসন সংস্কার অনুসন্ধান কমিটির সদস্য হিসাবে সংখ্যাগুরু গোষ্ঠীর প্রতিবেদন সমর্থন করার পরিবর্তে সংখ্যালঘুদের প্রতিবেদন সমর্থন করেন।[১৭] কেন্দ্রীয় পরিষদেও সংখ্যালঘু অভিমত সমর্থন প্রসঙ্গে মোতিলালের সংশোধনী প্রস্তাবের সমর্থন করেন এবং তা গৃহীত হয়। এই প্রসঙ্গে দেশের সাংবিধানিক সমস্যার সমাধানের জন্য এক রয়াল কমিশনের নিয়োগ প্রস্তাব করতঃ সংবিধান সম্বন্ধে নিজ আদর্শ ব্যক্ত করেন।

ঐ বৎসরের রাজনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে দিল্লীতে জানুয়ারী মাসে গান্ধীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য এবং মুসলমানরা যেসব প্রদেশে সংখ্যালঘু সেখানে তাদের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। সম্মেলনে মোতিলাল, আলী ভ্রাতৃদ্বয়, আজাদ, শ্রীমতী বেসান্ত, শ্রীমতী নাইডু, শ্রদ্ধানন্দ, কুঞ্জরু, চিন্তামণি ও জয়াকর প্রমুখ নেতারা অংশগ্রহণ করেন। ২২শে মে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে বোঝাপড়া সৃষ্টির জন্য জয়াকরের সহযোগিতা চেয়ে তাঁকে এক পত্র লেখেন। ডিসেম্বরের ৩০-৩১শে আলী ভ্রাতৃদ্বয়, ডাঃ কিচলু এবং আসফ আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দসহ আলীগড়ে মুসলিম লীগের বাৎসরিক অধিবেশনে যোগ দেন। লীগের ঐ অধিবেশনে মুসলমানদের জন্য বহুবিধ রক্ষাকবচসহ স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। জিন্না ঐ সম্মেলনে স্বরাজ্য দলের বাধাসৃষ্টিকারী ও আইন-অমান্যকারী ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে জিন্নার সার্বজনীক জীবনের ক্রিয়াকলাপ মূলতঃ সংসদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কেন্দ্রীয় পরিষদে তিনি ভারতীয় শ্রমিক সংগঠন, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, কানপুর কংগ্রেসে লালা লাজপৎ রায়ের বক্তৃতার বিবরণযুক্ত তার পাঠানোয় বিলম্ব, মধ্যবিত্তদের কর্মহীনতা, দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের অবস্থা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে শাসন-সংস্কারের যৌক্তিকতা প্রভৃতি বিষয়ে বলেন। এছাড়া ভারতের শাসন-সংস্কারের জন্য রাজকীয় কমিশন নিয়োগ করার দাবিও পুনরায় উত্থাপন করেন এবং বলেন যে এর সদস্যরা যেন ভারতীয় জনমত কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হয়। তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে চৌঠা এপ্রিল বোম্বেতে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্টির সভায় যোগদান করা (এখানে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা হয়) এবং দিল্লীতে ২৯-৩১শে ডিসেম্বর লীগের অধিবেশনে যোগ দেওয়া উল্লেখযোগ্য। নভেম্বরে জিন্না

বোম্বের মুসলমান (নগর) কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসাবে পুনর্বার কেন্দ্রীয় পরিষদে নির্বাচিত হন।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের সংসদীয় কার্যকলাপের কথা ছেড়ে দিলে জিন্না কয়েকটি গুরুত্ব-পূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ২০শে মার্চ দিল্লীতে মুসলিম সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন, যেখানে মুসলমানদের দাবিসমূহের চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়। রাজ-নীতির ক্ষেত্রে এর জনপ্রিয় নাম দিল্লীর মুসলিম প্রস্তাব। ২৯শে মার্চ পূর্বোক্ত প্রস্তাব প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে এক বক্তব্যের মাধ্যমে এই অভিযোগ করেন যে হিন্দু বা মুসলমান —কোন পক্ষই মুসলমান নেতাদের যৌথ নির্বাচন প্রথার পূর্ণ তাৎপর্য অনুধাবন করছেন না। মে মাসে বোম্বেতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ঐ প্রস্তাবসমূহ অনু-মোদন করে।[১৮] এই প্রস্তাবের সারমর্ম হল : "এই শর্তে তাঁরা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহে যৌথ নিবাচনপ্রথায় রাজী যে (ক) সিন্ধুকে এক পৃথক প্রদেশে পরিণত করতে হবে, (খ) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানকে অন্যান্য প্রদেশের সমমর্যাদা দেওয়া হবে, (গ) পাঞ্জাব ও বঙ্গে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব জনসংখ্যা-ভিত্তিক হবে এবং (ঘ) কেন্দ্রীয় পরিষদে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব মোট সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের কম হবে না।" চৌধুরী খলিকুজ্জমা বলেছেন, "স্যার শফী অবশ্য জিন্নার এই যুক্ত নির্বাচন প্রথা মেনে নেওয়ায় অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন এবং আমরা দেখব যে পরবর্তীকালে এই কারণে তিনি পাঞ্জাবে 'শফী লীগ'-এর প্রতিষ্ঠা করেন।"[১৯]

৩১শে অক্টোবর জিন্না বড়লাটকে প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কার কমিশনে অন্ততঃ দুজন ভারতীয় সদস্য নেবার জন্য অনুরোধ জানান। ৮ই নভেম্বর বড়লাট সাইমন কমিশন নিয়োগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এর সকল সদস্য শ্বেতাঙ্গ হওয়ায় প্রতি-বাদে জিন্না একে বয়কট করার সিদ্ধান্ত করলেন এবং ইংলণ্ডের শ্রমিক দলকে তার-বার্তার দ্বারা সেকথা জ্ঞাপন করলেন। কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে সাইমন কমিশন বয়কট করার পদক্ষেপ নেবার জন্য জিন্নার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট তদানীন্তন ভারত-সচিব বার্কেনহেড লর্ড উইলিংডন এবং স্যার জন সাইমনকে এমন কৌশল অবলম্বন করার পরামর্শ দেন যাতে জিন্নাকে "উচিত শিক্ষা দেওয়া যায়'। ডিসেম্বরের ৩০শে থেকে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী পর্যন্ত কলকাতায় লীগের ১৯তম প্রকাশ্য বাৎসরিক অধিবেশনে[২০] লীগকেও সাইমন কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকার প্রস্তাব গ্রহণের জন্য তিনি অনুপ্রাণিত করেন। জিন্নার প্রভাবে লীগের ঐ অধিবেশনে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির

সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য লীগ কাউন্সিল কর্তৃক একটি উপসমিতি গঠন করার প্রস্তাবও স্বীকৃত হয়। লীগ অধিবেশনে স্যার আলী ইমাম যখন এই উক্তি করেন যে, "মুসলমানরা ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার ব্যাপারে সমানাধিকারের ভিত্তিতে অংশগ্রহণ করতে চায়", জিন্না তখন তা হল "ন্যূনতম" এই মন্তব্য করেন। লীগের ঐ অধিবেশনে "দিল্লী মুসলিম প্রস্তাব"ও অনুমোদিত হয় যাতে শর্তসাপেক্ষে পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থা বর্জনের স্বীকৃতি ছিল এবং শফী লীগ তার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য নন্দিত হয়।[২১] লীগের ঐ অধিবেশনে সরোজিনী নাইডু ও অ্যানী বেসান্ত সম্মানিত অতিথি রূপে যোগ দিয়েছিলেন। সভাপতির অভিভাষণে জিন্না বলেন, " পণ্ডিত মালব্যকে আমি স্বাগত জানাই এবং কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার মঞ্চ থেকে হিন্দু নেতারা আমাদের প্রতি যে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেছেন, তা আমি পরম সমাদরে গ্রহণ করছি। আমার কাছে তাঁর এই প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকারের প্রদেয় তাবৎ সুযোগ-সুবিধার থেকে অধিক মূল্যবান। সুতরাং তাঁদের বন্ধুত্বের হাত যেন আমরা গ্রহণ করি।"[২২] এইভাবে জিন্নার নেতৃত্বে লীগ পুনরপি জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের কাছাকাছি আসে।

॥ ৯ ॥

জিন্নার ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের সংসদীয় কার্যকলাপের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল লালা লাজপৎ রায়ের প্রস্তাবের উপর বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ভারতের স্বাধীনতার সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন এবং হিন্দুদের মধ্যে অনগ্রসর শ্রেণীর অবস্থার উন্নতির জন্য জয়াকরের প্রস্তাবের সপক্ষে অভিমত জ্ঞাপন।

রাজনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে সাইমন কমিশনের বয়কটের সিদ্ধান্তের কথা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। বৎসরের প্রথম দিকে জিন্না কোমর বেঁধে এ কাজে লেগেছিলেন। কলকাতায় লীগের অধিবেশনের সমাপ্তির কিছুদিন পরই জিন্নার প্রত্যক্ষ কর্মক্ষেত্র বোম্বেতে কমিশনের সদস্যদের প্রথম পদার্পণের কথা ছিল। বয়কটের ব্যাপারে জিন্নার ভূমিকা সম্বন্ধে চাগলা নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন: "বোম্বেতে আমরা একটি কমিটি গঠন করেছিলাম, যার সম্পাদক ছিলাম আমি এবং জিন্না ছিলেন সভাপতি। আর আমাকে এ কথা বলতেই হবে যে কমিশনকে বয়কটের ব্যাপারে জিন্না পাথরের মতই দৃঢ় ছিলেন। কেউ কেউ প্রস্তাব করেছিলেন যে বয়কট কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই হবে, সামাজিক ক্ষেত্রে নয়। জিন্না এতে রাজী হননি এবং নিজের ভূমিকা থেকে তিলমাত্র বিচলিত হননি। তিনি বলেছিলেন

যে বয়কট মানে বয়কট এবং একে সর্বাত্মক হতে হবে। বয়কট প্রচারে আমরা বহু সভা করেছিলাম।”[১]

সাইমন ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের তেসরা ফেব্রুয়ারী সদলবলে বোম্বেতে এলে সর্বাত্মক বয়কটের সম্মুখীন হন। এই ঘটনাপ্রসঙ্গে গান্ধী তাঁর ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় লেখেন যে, “সংগঠকদের এই বিপুল সাফল্যে আমি আমার অভিনন্দন জানাই।...এ ব্যাপারে লিবারেল, নির্দলীয় এবং কংগ্রেসীরা একই মঞ্চে সম্মিলিত হয়েছেন দেখে আমার আত্মা শান্তি পেয়েছে।”[২]

তবে ঐ বছরের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা হল নেহরু কমিটির রিপোর্ট প্রণয়ন এবং তার বিবেচনার জন্য সর্বদলীয় সম্মেলন।

ভারতবাসীর শাসন-সংস্কার দাবি প্রসঙ্গে এদেশবাসীর অনৈক্যের কথা ইংরেজ শাসকেরা প্রায়ই বলতেন। সাইমন কমিশন নিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন ভারত সচিব লর্ড বার্কেনহেড ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে খোলাখুলিই চ্যালেঞ্জ জানালেন যে পারলে তাঁরা একটা সর্বজনগ্রাহ্য সংবিধান রচনা করুন। এর প্রত্যুত্তরে ডাঃ আন্সারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ডিসেম্বর ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের মাদ্রাজ কংগ্রেসে দেশের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার জন্য একটি সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান করার সিদ্ধান্ত হয়। কংগ্রেস কর্তৃক সাইমন কমিশন বয়কট করার আন্দোলন চালাবার সঙ্গে সঙ্গে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে দিল্লীতে সর্বপ্রথম ঐ সর্বদলীয় সম্মেলন আহূত হয়। জিন্না ঐ সম্মেলনে যোগ দিয়ে লক্ষ্য করেন যে জয়াকর, মালব্য ও লাজপৎ রায় প্রমুখের প্রভাবে সম্মেলন কংগ্রেস কর্তৃক স্বীকৃত বিগত বৎসরের দিল্লীর মুসলিম প্রস্তাবের প্রতিকূল ভূমিকা গ্রহণ করতে চলেছে। রাজনৈতিক দরাদরি এমন বিকট রূপ ধারণ করে যে কংগ্রেসের অন্যতম সম্পাদক জওহরলাল নেহরু সৈয়দ মাহমুদকে ১৭.৩. ১৯২৮ তারিখে লিখিত এক পত্রে মন্তব্য করেন, “এ ছিল দুই তরফের কিছুসংখ্যক চরমপন্থীদের লড়াই, জিন্না ও তাঁর দলবল একদিকে এবং হিন্দুমহাসভা গোষ্ঠী অপর দিকে ...উভয় গোষ্ঠীর প্রতিই আমি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ি।”[৩] সম্মেলনের সমাপ্তির পরও এ ব্যাপারে একটা বোঝাপড়ায় উপনীত হবার জন্য তিনি একটানা দশদিন ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেন যাতে দিল্লীর মুসলিম প্রস্তাবের শর্তাধীন (পূর্ব অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য) যুক্ত নির্বাচন-প্রথার সুপারিশ গৃহীত হয়। মার্চে তাই লীগ কাউনসিল দিল্লীতে তাঁর সভাপতিত্বে মিলিত হয়ে এক প্রস্তাবের মাধ্যমে এই বলে খেদ প্রকট করে যে হিন্দুমহাসভা লীগের প্রস্তাবকে কার্যতঃ বাতিল করেছে।

বোম্বেতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের তৃতীয় বৈঠকে (১৯শে মে) ২৯টি রাজনৈতিক

দলের উপস্থিত প্রতিনিধিদের সম্মতিক্রমে মোতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে পরবর্তী ১লা জুলাইয়ের মধ্যে সংবিধানের মূল নীতির খসড়া রচনার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি নিযুক্ত হয়।[৪] জিন্না তখন বিদেশযাত্রী এবং লীগের অপর কোন প্রতিনিধি ঐ সম্মেলনে যোগদান করেননি। নানা দৃষ্টিভঙ্গীর নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর কমিটি তার রিপোর্ট প্রস্তুত করে। এই নেহরু রিপোর্ট সম্বন্ধে আরও জনমত সংগ্রহের জন্য ২২শে ডিসেম্বর ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় এক সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলন (convention) আহূত হয়। এও স্থির হয় যে কংগ্রেস ও লীগের বাৎসরিক অধিবেশনও ঐ সময়ে কলকাতায় হবে যাতে বিগত বৎসরের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে উভয় প্রতিষ্ঠান পারস্পরিক আলোচনার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে।

সর্বাধিক বিতর্কিত প্রসঙ্গ নির্বাচন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে নেহরু কমিটির সুপারিশ ছিল নিম্নরূপ :

"(১) ভারতবর্ষের সর্বত্র যৌথ এবং মিশ্র নির্বাচক-মণ্ডলী থাকবে ; (২) প্রতিনিধি সভায় (কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ) কোন আরক্ষিত আসন থাকবে না ; এর একমাত্র ব্যতিক্রম হবে মুসলমানরা যেসব প্রদেশে সংখ্যালঘু সেখানকার মুসলমান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অমুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে। এই জাতীয় আরক্ষণ হবে মুসলমানরা যেসব প্রদেশে সংখ্যালঘু এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সংখ্যালঘু অমুসলমানদের জনসংখ্যার হারের সঙ্গে কঠোরভাবে সামঞ্জস্য রেখে। মুসলমান বা অমুসলমান—যেখানেই তাঁদের আসনের ব্যাপারে সংরক্ষণ দেওয়া হবে সেখানে তাঁরা অতিরিক্ত আসনের জন্যও প্রতিদ্বন্দিতা করতে পারবেন ; (৩) (ক) পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশে কোন সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হবে না, (খ) পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশ ছাড়া অন্যান্য প্রদেশে জনসংখ্যার ভিত্তিতে মুসলমান সংখ্যালঘুদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হবে এবং তাঁদের অতিরিক্ত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করারও অধিকার থাকবে ; (গ) অনুরূপভাবে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অমুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষিত রাখা ছাড়াও তাঁদের অতিরিক্ত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার দেওয়া হবে ; (৪) এই আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা দশ বছরের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য থাকবে ; (৫) আর্থিক ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তদন্ত করে নেবার পর সিন্ধুকে বোম্বাই থেকে পৃথক একটি প্রদেশে পরিণত করা হবে ; (৬) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সহ তাবৎ নূতন প্রদেশে পুরাতন প্রদেশগুলির মতই শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে।"[৫]

লক্ষ্য করলে স্পষ্ট হবে যে নেহরু রিপোর্টের সুপারিশের সঙ্গে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে

বর্ণিত দিল্লীর মুসলিম প্রস্তাবের (২০শে মার্চ ১৯২৭) মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। অথচ ঐ মুসলিম প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করেছিল এবং ঐ প্রস্তাবের ভিত্তিতেই মুসলিম লীগ কংগ্রেসের আহ্বানে সর্বদলীয় সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল। সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যে কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গীতে এ জাতীয় মৌলিক পরিবর্তন ঘটার কারণ আবিষ্কার করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে দেশের কোথাও না কোথাও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হওয়াতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠছিল। এর সঙ্গে সঙ্গে একদিকে আর্য সমাজ এবং মদনমোহন মালব্য প্রমুখের শুদ্ধি এবং অন্যদিকে গোঁড়া মুসলমানদের তবলীগ ও তঞ্জীম আন্দোলন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ও অবিশ্বাসের ভাব সৃষ্টির কারণ হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে "১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরের প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় পরিষদের যে নির্বাচন হয় তার ফলে দেশের কোন রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক দল অধিকাংশ ভারতীয় ভোটারদের তরফে কথা বলার অধিকারী—এমন প্রমাণ পাওয়া গেল না। প্রত্যুত: তাদের মধ্যে কোন দলই সংখ্যাগুরু হিন্দু অথবা মুসলমান ভোটারদের মুখপত্র হবার দাবি করার যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের শাসন সংস্কার আইন অবশ্য শতকরা মাত্র চার ভাগ নাগরিকদের ভোটের অধিকার দিয়েছিল। তবে একথা অনুমান করলে ভুল হবে যে রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি ভোটারদের তুলনায় জনসাধারণের মধ্যে অধিক জনপ্রিয় ছিল। বরং সাধারণ মানুষের তুলনায় ভোটাররা ঐসব সংগঠন সম্বন্ধে অধিকতর ওয়াকিবহাল ছিলেন। স্বরাজ্য দল কংগ্রেসের পূর্ণ সমর্থন নিয়ে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় বহুলাংশে জনসমর্থন হারিয়েছিল। অধিকাংশ হিন্দু ভোটারদের মন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল, সখেদে স্বীকার করতে হয়েছিল যে খিলাফৎ আন্দোলন এক প্রচণ্ড ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং এর কারণ হিন্দু জনসাধারণের দৃষ্টি হিন্দু মহাসভার উপর পড়ল। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং নিখিল ভারত খিলাফৎ কনফারেন্স তখনও হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য হাতড়ে বেড়াচ্ছে। ভোটাররা কিন্তু নির্দলীয় প্রার্থীদের সাম্প্রদায়িক ভূমিকার দ্বারা প্রভাবিত হল। সুতরাং সঙ্গত কারণেই স্বরাজ্য দল মাদ্রাজে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করল, যেখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আত্মপ্রকাশ করেনি। কিন্তু পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের মত যেখানে হিন্দু মুসলমান পথেঘাটে পরস্পরের মাথা ফাটাচ্ছিল সেখানে স্বরাজ্য দল শোচনীয় ভাবে পরাজিত হল। বিভিন্ন আইন সভায় মুসলমানদের অবস্থাও ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ল—কোন মুসলমান

প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করার দাবি ধোপে টিকল না।

"তবে কেন্দ্রীয় পরিষদে হিন্দু ও মুসলমান জনপ্রতিনিধিরা সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর ভিত্তিতে বিভক্ত হননি। স্বরাজ্য দল ছিল কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিনিধি এবং জনকয়েক মুসলমান সদস্য তখনও ঐ দলে ছিল। জিন্নার নিজের গোষ্ঠীতে দু'জন হিন্দু এবং জনাকয়েক মুসলমান সদস্য। কিন্তু স্বরাজ্য দল বহির্ভূত প্রায় সব হিন্দু মিলিত হয়ে হিন্দু মহাসভার নেতা মদনমোহন মালব্য ও লাজপৎ রায়ের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী দলরূপে সংগঠিত হলেন। অধিকাংশ মুসলমান সদস্য অসংগঠিত গোষ্ঠীরূপে পৃথক পৃথক আসন গ্রহণ করলেন।"[৬]

এই পটভূমিকায় দিল্লীতে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে সর্বদলীয় সম্মেলন (conference) বসল। মুসলিম লীগ প্রতিনিধিরা প্রথম থেকেই লক্ষ্য করলেন যে সম্মেলন দিল্লী মুসলিম প্রস্তাব মেনে নিয়ে এগোচ্ছে না, বরং সেই প্রস্তাবের সুপারিশ-সমূহও বিতর্কের বিষয়। তাছাড়া ইতিপূর্বে এজাতীয় দরকষাকষি হয়েছে সাধারণতঃ কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগের মধ্যে। কিন্তু এই সম্মেলনের প্রায় ৭০টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের মধ্যে খ্রীষ্টান, শিখ, পার্শী এবং হিন্দুদের বহু গোষ্ঠী উপ-গোষ্ঠী ও এমন কি রাজনীতির ক্ষেত্র বহির্ভূত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ছিলেন। সম্মেলনে হিন্দু মহাসভা এবং শিখ লীগের প্রতিনিধিরা অত্যন্ত সরব এবং আর সবাইও নিজের কোলে ঝোল টানতে সমভাবে উন্মুখ। কংগ্রেসী প্রতিনিধিরা ইতিপূর্বে মুসলমানদের কাছে প্রতিশ্রুত সুযোগ-সুবিধার কাটছাট করে অপর সবাইকে সন্তুষ্ট করার জন্য ব্যগ্র। কিংকর্তব্যবিমূঢ় লীগ প্রতিনিধিরা এই পরিস্থিতিতে লীগের পরামর্শ চাইলেন এবং তাড়াহুড়ো করে ডাকা লীগ কাউন্সিলের এক সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে সম্মেলনের লীগ প্রতিনিধিরা লীগের প্রস্তাব স্বীকার করিয়ে নেবার জন্যে জোর দেবেন এবং এই হবে তাঁদের সম্মেলনের পরবর্তী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকার শর্ত। এই শর্ত পালিত না হওয়ায় লীগের প্রতিনিধিরা সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের মাঝখানে (১১ই মার্চ) সম্মেলন পরিত্যাগ করেন এবং সম্মেলনের কাজকর্মের সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখেননি।

সম্মেলনে অতঃপর যে দুজন মুসলমান প্রতিনিধি রয়ে গেলেন তাঁরা হলেন স্যার আলী ইমাম এবং শোয়েব কুরেশী, যাঁরা উভয়েই ছিলেন কংগ্রেসী ভাবাপন্ন। এঁদের মধ্যে স্যার আলী ইমাম অসুস্থতার জন্য শেষ অবধি সব অধিবেশনে যোগ দিতে পারেননি এবং কুরেশী কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে লিখিতভাবে ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছিলেন।[৭] এ অবস্থায় অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিদের দ্বারা মুসলিম স্বার্থ

কতটা রক্ষিত হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

বঙ্গদেশ ও পাঞ্জাবে মুসলমানদের আসন সংরক্ষণের জন্য হিন্দু মহাসভা ও শিখ লীগ রাজী হয়নি এই যুক্তিতে যে ওখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। মুসলমানদের বক্তব্য—সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও ঐ দুই প্রদেশে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের আইনের ধারার জন্য মুসলমান ভোটারদের সংখ্যা কম এবং তাই নামে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও জনপ্রতিনিধির ক্ষেত্রে মুসলমানরা সংখ্যালঘিষ্ঠ। সম্মেলনে আসন বণ্টন প্রাপ্তবয়স্কদের মতাধিকারকে ভিত্তি করে নির্ধারিত হলেও তা যে শীঘ্র এদেশে প্রবর্তিত হবে—এ ভরসা মুসলমানদের ছিল না। (১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের শাসন-সংস্কার আইন মুসলমানদের এই আশঙ্কাকে সত্য প্রমাণ করে।) সুতরাং নেহরু রিপোর্ট সমস্যার সমাধান করতে সমর্থ হল না।[৮]

জিন্না নেহরু রিপোর্ট রচনার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। দিল্লীতে সর্বদলীয় সম্মেলনে (মার্চ) যোগ দেবার পর তেসরা এপ্রিল তিনি ইংলণ্ডে রওনা হন। ইতি-মধ্যে তাঁর স্ত্রী তাঁকে ত্যাগ করে মায়ের সঙ্গে ইউরোপে চলে গেছেন। বিদেশে থাকা-কালীন গুরুতররূপে অসুস্থ স্ত্রী রুট্টির চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার জন্য যথাসাধ্য ব্যবস্থা করে ইউরোপের কয়েকটি দেশভ্রমণের পর ২৬শে অক্টোবর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তবে দেশের মাটিতে পা রাখার পূর্বেই, মনে হয় এডেনের ঠিকানায় লেখা মোতিলাল নেহরুর দোসরা আগস্টের[৯] এক চিঠি পান যাতে এই উল্লেখ আছে যে খসড়া রিপোর্টের গুরুত্বপূর্ণ অংশও তাঁকে পাঠানো হল এই উদ্দেশ্যে যে তিনি যেন এ ব্যাপারে নিজ অভিমত গঠন করতে পারেন। অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে মোতিলাল তাঁকে লেখেন যে, "আপনি বোম্বেতে এ সম্বন্ধে যে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করবেন, তার উপরই এই রিপোর্ট এবং প্রত্যুত সমগ্র সংবিধানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।" জিন্নার যোগ দেবার সুবিধার জন্য নেহরু রিপোর্ট বিবেচনা করার জন্য লখনউ-এর সভা মোতিলাল ২৫শে আগস্ট থেকে কয়েক দিনের জন্য পিছিয়ে দেন এবং তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান যে, "আপনার সঙ্গে আলোচনা করার জন্য আমাকে সুযোগ দেবার পূর্বে আপনি এই রিপোর্টের বিরুদ্ধে কোন মতামত দেবেন না।" নেহরু কমিটির অন্যতম সদস্য সুভাষচন্দ্রের মোতিলাল লিখিত এই চিঠির মর্ম সম্বন্ধে জানা না থাকায় সম্ভবতঃ রিপোর্ট সম্বন্ধে লীগ কাউন্সিলের কোন অভিমত জানতে না পেরে তাঁর ১৭ই নভেম্বরের স্বহস্ত লিখিত পত্রে জিন্নার কাছে এক উদ্বেগভরা চিঠি লেখেন।[১০] ভারতবর্ষের তদানীন্তন রাজনীতিতে জিন্নার প্রভাব সম্বন্ধে উপলব্ধি করার জন্য এই দুটি ঘটনার উল্লেখই যথেষ্ট।

বলা বাহুল্য দেরিতে দেশে ফেরার জন্য জিন্নার পক্ষে লখনউ-এর সভায় যোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে ফেরার পর থেকেই তিনি নেহরু রিপোর্ট সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কারণ সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের দিক থেকে এর অসীম গুরুত্ব ছিল। ২৫শে নভেম্বর এক পত্র লিখে তিনি লীগ সম্পাদককে ঐ রিপোর্ট সম্বন্ধে লীগের মনোভাব স্থির করার জন্য তৎপর হতে পরামর্শ দেন। স্যার শফীর লীগ তো নেহরু রিপোর্টের সুপারিশের বিরুদ্ধে ছিলই, জিন্নার লীগও এ ব্যাপারে বিভক্ত ছিল। জিন্না স্বয়ং নেহরু রিপোর্টের বিরুদ্ধে ছিলেন। ২২শে ডিসেম্বর লীগের ২৪জন প্রতিনিধির তরফ থেকে কলকাতার সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলনে তিনি বক্তব্য পেশ করেন।

সংক্ষেপে জিন্নার প্রস্তাব ছিল নিম্নরূপ :

"( ) কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব এক-তৃতীয়াংশের কম হবে না; (২) নেহরু রিপোর্টে প্রস্তাবিত প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার স্বীকৃত না হলে পাঞ্জাব ও বঙ্গ প্রদেশ জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন পাবে এবং তার থেকে বেশী নয়। তবে দশ বছর পর এর পুনর্বিচার করা যেতে পারে; (৩) বাদবাকী সব ক্ষমতা থাকবে প্রদেশগুলির হাতে, কেন্দ্রের হাতে নয়।"[১১]

একথা সত্য যে বেশ কিছু বিশিষ্ট মুসলিম নেতা যথা মৌলানা আজাদ, ডাঃ আন্সারী, স্যার আলী ইমাম, মাহমুদাবাদের রাজা সাহেব (একই সময়ে একই শহরে অনুষ্ঠিত লীগের বাৎসরিক অধিবেশনের সভাপতি) এবং ডাঃ কিচলু প্রমুখ নেহরু রিপোর্টের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু একথাও সত্য যে সাধারণ ভাবে মুসলিম জনমত এর বিরুদ্ধে ছিল এবং তার প্রতিফলনের বিবরণ আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে পাব। সৈয়দ আহমদের অনুগামী নবাব মহসীন-উল-মুল্কের পরামর্শে এবং ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড মিণ্টোর কাছে আগা খাঁর দরবারের পর ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানরা পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার যে সুবিধা পেয়েছিলেন এবং যা ক্রমশঃ উভয় সম্প্রদায়ের ভিতর বিভেদকে সুদৃঢ় করছিল, তার বিলোপনের একটা রাস্তা বহু বিরোধিতা সত্ত্বেও জিন্না বার করেছিলেন ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের দিল্লীর মুসলিম প্রস্তাবের মাধ্যমে। কংগ্রেস এবং অবিভক্ত লীগ উভয় প্রতিষ্ঠানই তা স্বীকার করে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা রদের মাধ্যমে ভবিষ্যতের বৃহত্তর বিভেদের সম্ভাবনা দূরীকরণের পথে অগ্রসর হতে পারত। তাই সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলনের প্রতিনিধিদের কাছে জিন্না তাঁর কুশলী আইনজীবীর যাবতীয় কলা প্রয়োগ করে ব্যাকুল মিনতি জানালেন :

"আমরা যা চাই তা হল—আমাদের লক্ষ্য সাধিত না হওয়া পর্যন্ত হিন্দু ও

মুসলমানেরা সম্মিলিতভাবে পথ পরিক্রমা করবে। সুতরাং দেখা জরুরী যে আপনারা কেবল মুসলিম লীগকেই সঙ্গে পাননি, ভারতবর্ষের মুসলমানদেরও সহযোগী রূপে পেয়েছেন এবং একথা আমি মুসলমান হিসাবে বলছি না, বলছি একজন ভারতবাসী রূপে। আর আমি এটা দেখতে চাই যে স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের সঙ্গে সাত কোটি মুসলমান যেন সমান তালে পা ফেলে চলেন। আপনারা কি জনকয়েকের সহযোগিতাতেই তুষ্ট হবেন? আপনারা কি আমার একজাতীয় কথা শুনে সন্তুষ্ট হতে পারেন যে কেবল আমি আপনাদের সঙ্গে আছি? ভারতবর্ষের মুসলমানরা আপনাদের সঙ্গে একসাথে চলুন—এ আপনারা চান কি চান না? শিখ, খ্রীষ্টান ও পার্শী কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিন্দুমাত্র অসম্মান না করে আমি বলতে চাই যে আপনাদের একথা মনে রাখতে হবে ভারতবর্ষের দুটি প্রধান সম্প্রদায় হল হিন্দু ও মুসলমান। তাই এই দুই সম্প্রদায়কে পরস্পরের প্রতি সদ্ভাবসম্পন্ন ও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে—তাঁদের বুঝতে হবে যে তাঁদের মধ্যে কোন স্বার্থসংঘাত নেই এবং তাঁরা এক সার্বজনীন মঙ্গলের অভিমুখে সম্মিলিতভাবে কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে চলেছেন।...তাই আমি চাই যে আপনারা স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু বর্ণিত দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়কবৃত্তির উচ্চ শিখরে উঠুন। সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরুদের কোন কিছু দিতে সমর্থ নয়। সুতরাং আমি যেন আপনাদের ভাষায় যাকে "এইসব ছোটখাটো ব্যাপার" বলেছেন তার জন্য দাবি না করি—এসব কথা আমাকে বলে কোন লাভ নেই। এসব যদি ছোটখাটো ব্যাপারই হয়, তাহলে মেনে নিতে দোষ কি?"[১২]

একাধিক দেশের সংবিধানের নজির উল্লেখ করে তিনি বললেন যে, সংখ্যালঘুরা সর্বদা সংখ্যাগুরুদের আতঙ্কে দিনযাপন করে। ধর্মীয় সংখ্যাগুরুরা তাঁর মতে সচরাচর নিপীড়ক ও অত্যাচারী হয়। সুতরাং সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দাবি করার অধিকার সর্বদাই আছে। অতঃপর তিনি বললেন:

"এসব বড় বড় প্রশ্ন যার সমাধান করতে হলে উচ্চকোটির রাষ্ট্রনায়কসুলভ মানসিকতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রয়োজন। আবার আমি তাই আপনাদের অনুরোধ জানাচ্ছি যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে আপনারা এ ব্যাপারে ভাল করে খুঁটিয়ে বিচার করুন। আমি যা বলেছি তাতে কোন পক্ষকে কোন রকম শাসানী দেওয়া হয়েছে বলে যেন দয়া করে মনে করবেন না এবং আমি আশা করি যে আমাকে ভুল বোঝা হবে না। আজ যদি আপনারা এ প্রশ্নের সমাধান না করেন, তবে আগামী কাল তা করতে হবে এবং ইতিমধ্যে আমাদের জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হবে। আমরা সবাই এই দেশের সন্তান। আমাদের সম্মিলিতভাবে থাকতে হবে, মিলেমিশে কাজ

করতে হবে। আমাদের মধ্যে যে যে বিষয়েই মতভেদ থাকুক না কেন, আমরা যেন তার অধিকন্তু আর পারস্পরিক দ্বেষ সৃষ্টি না করি। যদি আমরা সহমত হতে না পারি, আমরা যেন ভিন্নমত পোষণ করার ব্যাপারে সহমত হতে পারি এবং যেন বন্ধু হিসাবে এখান থেকে যেতে পারি। আমার কথা বিশ্বাস করুন যে হিন্দু ও মুসলমানরা মিলিত হতে না পারলে ভারতবর্ষের অগ্রগতি হবে না। তাই একটা আপোস নিষ্পত্তি করার ব্যাপারে কোনরকম যুক্তি-তর্ক, দর্শন অথবা বাদ-বিবাদ যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য প্রত্যক্ষ করার চেয়ে আর কিছু আমাকে তেমন সুখী করতে পারবে না।"[১৩]

মুসলিম দাবির ওকালতি করলেও তখনও জিন্না জাতীয়তাবাদী এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রবক্তা। কিন্তু সম্মেলনের অপর তিন প্রধান বক্তার মধ্যে কংগ্রেসের প্রতিনিধি মহম্মদ আলী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উগ্র ও ওজস্বিনী ভাষায় নেহরু রিপোর্টের বিরুদ্ধে এবং মুসলিম দাবির সপক্ষে বক্তব্য পেশ করেন। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের পর এই প্রথম জিন্না ও মহম্মদ আলী একই মঞ্চ থেকে নিজ নিজ ভঙ্গী ও ভাষায় একই দাবি উত্থাপন করেন। দ্বিতীয় বক্তা তেজবাহাদুর সপ্রু জিন্নার প্রস্তাব মেনে নেবার সুপারিশ করলেও তৃতীয়জন অর্থাৎ হিন্দু স্বার্থের প্রতিনিধি জয়াকর এর তীব্র বিরোধিতা করলেন। সম্মেলনের কংগ্রেসী প্রতিনিধিদের একাংশও তাঁর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেননি এবং কী মানসিক চাপ ও উদ্বেগের মধ্যে জিন্নাকে তাঁর ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে তা অনুধাবন করবার পরিবর্তে তাঁরা চিৎকার করতে থাকেন যে জিন্না মুষ্টিমেয় সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মুসলমানদের প্রতিনিধি এবং তাই তাঁকে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। সভার রাত্রি পর্যন্ত আলোচনার পরও জিন্নার একটি সংশোধনী প্রস্তাবও গৃহীত হল না। সম্ভবতঃ অমুসলমানদের প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করার জন্য লীগ ও খিলাফৎ কমিটির প্রতিনিধিরা জিন্নার সংশোধনী প্রস্তাবের সপক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকেন, যদিও আহমদিয়া মুসলমান প্রতিনিধিরা সংশোধনী প্রস্তাবের সপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। আহত হৃদয়ে জিন্না সম্মেলন থেকে বিদায় নিলেন। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী জিন্নার জনৈক পার্শী সুহৃদ পরদিবস যখন রেল স্টেশনে জিন্নাকে দিল্লীতে রওনা করে দিতে গেলেন তখন তাঁর হাত ধরে সজলচক্ষে জিন্না বললেন, "জামসেদ, এবার আমাদের পথ আলাদা হয়ে গেল।"[১৪] প্রকাশ্যে জিন্নার চোখে জল আসার যে বিরলসংখ্যক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় এ তার অন্যতম।

নেহরু রিপোর্টের ব্যর্থতার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তদানীন্তন কংগ্রেস-লীগ নেতা

এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তানের অন্যতম প্রবক্তা চৌধুরী খলিকুজ্জমাঁ মন্তব্য করেছেন : "হিন্দু নেতৃত্ব তাঁদের প্রিয় বিষয় যৌথ নির্বাচন প্রবর্তনের সুযোগ হারাল এবং এর প্রতি শ্রীযুক্ত জিন্নার নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ প্রথমে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ আনুগত্য প্রকাশ করেছিল ও পরবর্তীকালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। ভারতবর্ষের হিন্দু যুবকরা যেন মুসলমানদের ভারত বিভাজনের জন্য দায়ী করার পূর্বে তাঁদের সেই সময়কার নেতৃবৃন্দের এই বিরাট ভ্রান্তি সম্বন্ধে চিন্তা করেন।"[১৫]

রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই ঘটনা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, "এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে মুসলমানদের সঙ্গে বোঝাপড়া হল না। এর ফলে সম্মেলন শেষ হবার পরই মুসলমানদের এক সর্বদলীয় সম্মেলন হল যাতে বহুসংখ্যক কংগ্রেসী মুসলমানও যোগ দেন।...এরপর মুসলমানদের এক প্রভাবশালী দল স্পষ্টতঃ কংগ্রেস থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। এইভাবে যে সমস্যার সমাধানের জন্য ঐ সম্মেলন তা সফল হবার বদলে আরও জটিল হয়ে উঠল এবং এর কুপরিণাম পরে দৃষ্টিগোচর হল।"[১৬]

এ প্রসঙ্গে অপর একটি নিরপেক্ষ অভিমত প্রণিধানযোগ্য "...নেহরু কমিটি এবং সর্বদলীয় সম্মেলনের সামনে এক উভয়সঙ্কট দেখা দিল : ত্রিশজন মুসলমান নেতার ফর্মুলাকে যদি এক সুপ্রতিষ্ঠিত এবং অপরিবর্তনীয় তথ্য হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলে হিন্দু মহাসভা ও শিখ লীগ কর্তৃক বয়কটের সমস্যা দেখা দেয়। আর মুসলিম ফর্মুলা যখন বড় বেশী হল লীগের জিন্না গোষ্ঠীর বক্তব্য তখন হিন্দু মহাসভা ও শিখ লীগের বয়কটের ঝুঁকি নিয়ে লাভ কি? কংগ্রেস ঐ ফর্মুলা ইতিপূর্বে স্বীকার করে নিলেও তার নেতারা ফর্মুলার প্রতি আনুগত্য অবিচল রাখলে সম্মেলন ভেঙে যেত। কারণ প্রতিনিধিরা প্রচণ্ডভাবে তার বিরোধী ছিল। আজ এতদিন পরে যখন ঘটনা ঘটে যাবার পর বিজ্ঞ সাজা সহজ তখন মনে হয় যে হিন্দু মহাসভার ছাপযুক্ত বিকল্প যার ন্যায়শাস্ত্রসম্মত অন্তর্নিহিত তত্ত্ব মুসলমানদের কাছে ভরসাজনক প্রতীয়মান হতে পারে না তা গ্রহণ করার পরিবর্তে সম্মেলন ভেঙে যাবার ঝুঁকি নেওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হত।"[১৭]

সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলনে যোগদানকারী মাহমুদাবাদের রাজা, জিন্না, ডাঃ কিচলু, চাগলা, লিয়াকৎ আলী, খলিকুজ্জমাঁ, আক্রাম খাঁ প্রমুখ লীগের প্রতিনিধিদের তাঁদের প্রয়াসের ফলাফল লীগের কাছে বিজ্ঞাপিত করার কথা ছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে যে লীগের বাৎসরিক অধিবেশনও ঐ সময়ে কলকাতায় হচ্ছিল। সম্মেলন থেকে শূন্য হাতে প্রত্যাবর্তনকারী প্রতিনিধিরা ২৯শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় লীগের বিষয় নির্বাচনী

সমিতিতে যোগ দিয়ে দেখলেন যে সেখানেও নেহরু রিপোর্ট নিয়ে তীব্র মতানৈক্য।[১৮] শর্তসাপেক্ষে নেহরু রিপোর্ট গ্রহণ করা একেবারেই বাতিল করা এবং দু-চারটি শব্দের হেরফের করার পর গ্রহণ করা—এই তিন অভিমত লীগের বিষয় নির্বাচনী সমিতির সভায় সমান তীব্রতার সঙ্গে আলোচিত হতে লাগল। পরের দিন ভোররাত (তিনটে) পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হল না। ৩০শে ডিসেম্বর বেলা দশটায় লীগের প্রকাশ্য অধিবেশনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে স্থির হয়েছিল। কিন্তু লীগ প্রতিনিধিদের মধ্যে নেহরু রিপোর্টকে কেন্দ্র করে বাদ-বিবাদের ফলে এমন হতাশা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল যে প্রকাশ্য অধিবেশনে উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। নির্বাচিত সভাপতির (মাহমুদাবাদের রাজা) অনুপস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি জিন্না বাৎসরিক অধিবেশন স্থগিত বলে ঘোষণা করলেন।

॥ ১০ ॥

ইতিমধ্যে মুসলমান সমাজের ভিতর নেহরু রিপোর্টের বিরুদ্ধে আর একটি প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, যার কথা অতঃপর বলা প্রয়োজন।

ছতারীর নবাব, সালেমপুরের রাজা প্রমুখ নেহরু রিপোর্টের বিরোধী শফী লীগের নেতা এবং তালুকদার ও জমিদারেরা সম্মিলিত ভাবে দিল্লীতে মুসলিম সর্ব-দলীয় সম্মেলন আহ্বান করেন ঐ রিপোর্ট বিবেচনা করার জন্য। সম্মেলনের সভাপতিত্বের জন্য নির্বাচন করা হয় আগা খাঁকে যাঁর নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিমণ্ডল ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড মিণ্টোর সঙ্গে দেখা করার পর মুসলিম লীগের জন্ম এবং যাঁদের "দাবি"র পরিপূর্তির জন্য পরবর্তীকালে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার সূত্রপাত। সম্মেলনের তারিখ নির্ধারিত হয় ৩১শে ডিসেম্বর যাতে জিন্নার নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগের কলকাতা অধিবেশনে যোগদানকারীদের পক্ষে সেই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করা সহজ না হয়। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে লীগে জিন্নার যোগদান এবং নেতৃত্ব আগা খাঁ ও নবাব মহসীন-উল-মুল্ক প্রমুখের নেতৃত্বের প্রভাব থেকে ঐ প্রতিষ্ঠানকে মুক্ত করার কারণ হয়েছিল। সুতরাং দিল্লীর মুসলিম সর্বদলীয় সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও চারিত্রধর্ম সম্বন্ধে বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

স্বভাবতই জিন্নার নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ ঐ সম্মেলনে যোগ দেবার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে। কলকাতার লীগ অধিবেশনে মহম্মদ করিম চাগলা কর্তৃক উত্থাপিত এতদসম্পর্কিত প্রস্তাবে বলা হয় যে লীগের "দৃঢ় অভিমত হল এই যে সম্প্রদায়ের

সামনে সমুপস্থিত প্রতিটি সঙ্কটের সময়ে যদি এজাতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী ও অ্যাডহক প্রতিষ্ঠান গজিয়ে ওঠে তবে তা মুসলিম স্বার্থের পক্ষে বিপজ্জনক হবে।" চাগলা এই দাবিও করেন যে "...লীগই মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি এবং মন্তব্য করেন যে ঐ সম্মেলন আহ্বান করা লীগকে অপমান করার সমতুল্য। কারণ লীগ বিশ বৎসরেরও অধিক কাল যাবৎ মুসলিম স্বার্থের রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছে।"[১] লীগের অধিবেশনে দিল্লার ৩১শে ডিসেম্বরের প্রস্তাবিত সম্মেলনে কিছুসংখ্যক প্রতিনিধির যোগদানের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে গেলেও জিন্না-লীগের অনেকে ঐ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। ৩০শে লীগের প্রকাশ্য অধিবেশন ক্ষীণ উপস্থিতির জন্য স্থগিত হয়ে যাবার এও এক কারণ।

এদিকে মৌলানা মহম্মদ আলী খোলাখুলি কংগ্রেস-নীতি বিরোধী মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীর ভূমিকায় আসরে নেমে পড়েছেন। কলকাতার সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলনে তাঁর তীব্র ভাষায় নেহরু রিপোর্টের বিরোধিতা করার প্রসঙ্গে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বার বার যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, টি. প্রকাশম্ প্রমুখ কংগ্রেস এবং সি. ওয়াই চিন্তামণি প্রমুখ লিবারাল প্রতিনিধিদের ছাড়াও আরও অনেকের কাছ থেকে বাধাপ্রাপ্ত হন। ঘটনাচক্রে বাধাপ্রদানকারীরা সবাই ছিলেন হিন্দু। ২৩শে ডিসেম্বরের ঐ ঘটনার পর মহম্মদ আলী আর সম্মেলনে প্রত্যাবর্তন করেননি। এরপর তিনি বিহার-উড়িষ্যা মুসলিম সর্বদলীয় সম্মেলন ও নিখিল ভারত খিলাফৎ কনফারেন্সে নেহরু রিপোর্ট এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রায় জেহাদ ঘোষণা করে মুসলিম-মানসকে বিচ্ছিন্নতাবাদের অনুকূল করার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের বিরূপ করে তোলার ভূমিকা গ্রহণ করেন। নিখিল ভারত খিলাফৎ কনফারেন্সে তো তিনি ভারতের সবাইকে ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের নিদান দেন।[২] সংযুক্ত প্রদেশের সর্বদলীয় মুসলিম সম্মেলনে তাঁর ভাই সৌকত আলীও হিন্দুদের বিরুদ্ধে অনুরূপ ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন।

ইতিপূর্বে (২১শে ডিসেম্বর ১৯২৮) বাংলার খিলাফৎ কমিটির সভা মহম্মদ আলী জোরজবরদস্তি করে পণ্ড করার পর নেহরু রিপোর্টের সমর্থকদের বাদ দিয়ে এর বিরোধীদের নিয়ে মনোমত প্রতিনিধিমণ্ডল গঠন করেন। আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের অগণতান্ত্রিক গায়ের জোরনির্ভর কার্যকলাপের ফলে[৩] পাঞ্জাব বিহার ও সীমান্ত প্রদেশের খিলাফৎ কমিটিগুলির নেহরু রিপোর্টের প্রতি অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি পুষ্ট হবার সুযোগ পায়নি। কৌশলে কেবল নেহরু-রিপোর্টের বিরোধীদের প্রতিনিধি নির্বাচন করায় ধীর ও শান্ত বুদ্ধির স্যার আবদার রহিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাংলার

মুসলিম সর্বদলীয় সম্মেলন সভাপতির পরামর্শ—"একে (নেহরু রিপোর্ট) পুরোপুরি বাতিল করা এক মারাত্মক রাজনৈতিক ভ্রান্তি হবে"—অগ্রাহ্য করে। অর্থাৎ মুসলমানদের ভিতর নেহরু রিপোর্টকে কেন্দ্র করে এক সাম্প্রদায়িক হিস্টিরিয়া জাগ্রত করার প্রক্রিয়াও সে সময়ে দেশে চলছিল।

এইভাবে নানা প্রদেশের মুসলিম সর্বদলীয় সম্মেলনের পর দিল্লীর সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয় ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিনে। এতে যোগ দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাসমূহের একশোর বেশী সদস্য, মুসলিম লীগের শফী গোষ্ঠীর প্রতিনিধিবর্গ, জমায়েত-উল-উলেমা এবং অপর কয়েকটি মুসলিম প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির দল। বলা বাহুল্য অনেকের বক্তৃতা ইত্যাদির পর সিদ্ধান্ত যা হবার ছিল তা-ই হল। অর্থাৎ এখনই পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার সুযোগ ছেড়ে দেবার সময় আসেনি। কখন এবং কি শর্তে যৌথ নির্বাচন সম্ভব সে সম্বন্ধে সম্মেলন মৌন রইল। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা ফেডারেল ধরনের হবে এবং সংবদ্ধ রাজ্যগুলিকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও বাদবাকী (residuary) ক্ষমতা দেওয়া হবে বলার সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা হয় যে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের দিল্লীর মুসলিম প্রস্তাবের অনুসরণে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদে মুসলমানদের জন্য রক্ষাকবচের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং ভবিষ্যৎ সংবিধানে সরকারী চাকরির ক্ষেত্রেও মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণ করতে হবে।

নেহরু রিপোর্টের সমর্থন ও বিরোধিতার অন্তর্দ্বন্দ্বে জিন্না-লীগ পর্যুদস্ত। দিল্লীর সর্বদলীয় মুসলিম সম্মেলনের দ্বারা আসর সরগরম করার চেষ্টা করলেও শফী লীগের অবস্থাও সুবিধার নয়। বাস্তব অবস্থার খাতিরে এবং মধ্যস্থদের প্রয়াসে উভয় লীগের ভিতর পরস্পরের কাছাকাছি আসার প্রবণতা দেখা গেল। দলছুট শফী লীগের কার্যকরী সমিতি জিন্না-লীগে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিল এবং জিন্নার সভাপতিত্বে উভয় গোষ্ঠীর সম্মিলিত সভা হল। ঐ সভা জিন্নাকে লীগের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন মতাবলম্বীদের সঙ্গে আলোচনা করে লীগের আগামী প্রকাশ্য অধিবেশনে (কলকাতায় যা মুলতুবী হয়েছিল) মুসলিম দাবি সম্পর্কে একটি সর্বজনগ্রাহ্য প্রস্তাব পেশ করার দায়িত্ব দিল।

ইতিমধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে এক গভীর শোকাবহ ঘটনা ঘটেছে। ২০শে ফেব্রুয়ারী তাঁর ২৯তম জন্মদিনে জিন্নার সহধর্মিণী রত্তনবাই বা রুট্টি দীর্ঘ রোগভোগের পর ইহলোক ত্যাগ করে জিন্নাকে নিঃসঙ্গতার সমুদ্রে নিক্ষেপ করে গেছেন।

২৮শে মার্চ ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে লীগের ঐ প্রকাশ্য সম্মেলন আহূত হয়েছিল।

মুসলিম রাজনীতির বিবদমান গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে মনের এই অবস্থায় এত অল্প সময়ের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে এক সর্বজনগ্রাহ্য ফর্মুলা উদ্ভাবন করার মত দুরূহ কাজে আত্মনিয়োগ করা কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। লীগের ঐ অধিবেশনে ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার প্রসঙ্গে মুসলিম স্বার্থরক্ষাকল্পে জিন্নার বিখ্যাত চোদ্দ দফা (আসলে পনের দফা। কিন্তু পঞ্চদশ দফা পঞ্চম দফারই বিস্তারিত ব্যাখ্যা বলে চোদ্দ দফা বলা হয়।) অনুমোদিত হয়। দফাগুলি নিম্নরূপ :

১. ভবিষ্যৎ সংবিধান ফেডারেল ধরনের হবে এবং বাদবাকী (residual) ক্ষমতা প্রদেশগুলির হাতে থাকবে। সংবিধানে নির্দেশিতব্য কয়েকটি সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারের উপরই মাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

২. সকল প্রদেশকে একই ধরনের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হবে।

৩. দেশের যাবতীয় আইনসভা এবং নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে এই জাতীয় এক সুনির্দিষ্ট নীতির আধারে পুনর্গঠিত করতে হবে যাতে প্রতিটি প্রদেশের সংখ্যালঘুরা যথেষ্ট ও কার্যকরী প্রতিনিধিত্ব পান অথচ কোন প্রদেশের সংখ্যাগুরু যেন সংখ্যালঘু অথবা এমন কি সমমর্যাদাসম্পন্ন গোষ্ঠীতে পরিণত না হয়।

৪. কেন্দ্রীয় আইন সভায় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব মোট সদস্য-সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের কম হবে না।

৫. সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলির প্রতিনিধিত্ব বর্তমানের মতই পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থার মাধ্যমে হতে থাকবে। তবে যে-কোন সম্প্রদায়ের যে-কোন সময়ে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার বদলে যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকার থাকবে।

৬. ভবিষ্যতে প্রদেশগুলির সীমার কোনরকম পরিবর্তন করার প্রয়োজন দেখা দিলে তা এমন ভাবে করা হবে না যাতে পাঞ্জাব, বঙ্গ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ব্যাহত হয়।

৭. সকল সম্প্রদায়কে পরিপূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতার অর্থাৎ ধর্মীয় বিশ্বাস, উপাসনা, আচার-অনুষ্ঠান পালন, প্রচার, সভা-সম্মেলন ও শিক্ষার নিশ্চয়তা দিতে হবে।

৮. কোন আইনসভা বা নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের মোট সদস্যদের তিন-চতুর্থাংশ যদি এই কারণে কোন বিল, প্রস্তাব বা তার অংশবিশেষের বিরোধিতা করেন যে তা সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতিকূল, তাহলে তা স্বীকৃত হবে না। এ সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দেবার জন্য অবশ্য আবার কোন কার্যকরী উপযুক্ত বিকল্প ব্যবস্থার উদ্ভাবন করা যেতে পারে।

৯. সিন্ধুকে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী থেকে পৃথক করা হবে।

১০. উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানে অন্যান্ত প্রদেশের মত শাসন সংস্কার প্রবর্তন করতে হবে।

১১. যাবতীয় সরকারী এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাকরিতে অন্যান্ত ভারতবাসীর সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদেরও উপযুক্ত অংশ দেবার নির্দেশ সংবিধানে রাখতে হবে, অবশ্য এক্ষেত্রে তাদের কাজের যোগ্যতার প্রতিও উপযুক্ত দৃষ্টি রাখতে হবে।

১২. মুসলিম ধর্ম, সংস্কৃতি ও ব্যক্তিগত (personal) আইন সংরক্ষণের জন্ত সংবিধানে ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়া মুসলিম শিক্ষা-ব্যবস্থা, ভাষা, ব্যক্তিগত আইন, দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশেরও উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা চাই এবং ঐসব প্রতিষ্ঠান সরকার ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে সাহায্যের উপযুক্ত অংশ পাবেন।

১৩. কেন্দ্রে অথবা প্রদেশে এমন কোন মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হবে না যার অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ সদস্য মুসলমান নন।

১৪. ভারতীয় ফেডারেশনের সদস্য অঙ্গরাজ্যগুলির সম্মতি ব্যতিরেকে কেন্দ্রীয় আইনসভা সংবিধানের কোন পরিবর্তন করবে না।[৪]

জিন্নার রাজনৈতিক জীবনে এবং আধুনিক ভারতের ইতিহাসে চোদ্দ দফার স্থান গুরুত্বপূর্ণ বলে এ সম্পর্কে আর একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

এর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক কৌশলে রোপিত ভেদনীতির বীজ—পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার বিরোধিতার স্থায়ী সমাপ্তি। জিন্না বা মুসলিম লীগ এরপর আর কখনও যৌথ নির্বাচনের সপক্ষে কোন কথা বলেননি। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের নাগপুর অধিবেশনের শেষে কংগ্রেস ছাড়তে বাধ্য হবার পর অসাম্প্রদায়িক ও জাতীয়তাবাদী জিন্নার ভূমিকায় ক্রমশঃ পরিবর্তন দেখা দিতে লাগল। ইতিপূর্বে (ষষ্ঠ অধ্যায়) মহম্মদ আলীর বিবৃতির প্রতিবাদ প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে জিন্না পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা আপাততঃ বজায় রাখার সপক্ষে মৃদুকণ্ঠে ওকালতি করেছেন। একদিক থেকে অবশ্য তাঁর উপায়ান্তরও ছিল না। কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর আর যে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক রইল এবং যার প্রথম সারির নেতা তিনি তা হল মুসলিম লীগ। সুতরাং তার অধিকাংশ সদস্য ও সমর্থকদের মনোমত ভূমিকা না নিলে সে দলেও তাঁর স্থান কোথায়? ভোটার ও সমর্থকদের মুখাপেক্ষা হয়ে চলা—রাজনৈতিক নেতাদের এই ট্র্যাজিডি কেবল একালের বৈশিষ্ট্যই নয়। ঐ বছর (১৯২৪) ডিসেম্বরে লীগ অধিবেশনে জিন্নাকে আমরা "মুসলিম দাবি" উত্থাপন করতে দেখেছি। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয়

সম্মেলনেও জিন্না মুসলমানদের স্বার্থরক্ষায় প্রবক্তা। অর্থাৎ পাকেচক্রে জিন্না কেবল মুসলমান সমাজের নেতায় পর্যবসিত, যদিও তখনও তিনি তাঁর নেতৃত্বাধীন সম্প্রদায়-বিশেষের ভারতবাসীর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার জন্য আন্দোলন করছেন জাতীয়তা-বাদের চৌহদ্দির মধ্যেই।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দেও তিনি লীগ নেতৃত্বের একাংশের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও বোম্বের লীগ অধিবেশনে কংগ্রেসের বহু হিন্দু নেতাদের আমন্ত্রণ জানান এবং লীগ প্রতিনিধিদের সামনে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপিত করার সুযোগ দেন। অনুরূপভাবে গান্ধীর সভাপতিত্বে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন জিন্না। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের লীগ অধিবেশনে কংগ্রেসের সঙ্গে মিলেমিশে শাসন সংস্কারের জন্য কাজ করার সিদ্ধান্ত এবং সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলনে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের জন্য ঐকান্তিক আহ্বান ইত্যাদিও এই মানসিকতার লক্ষণ। পরে আমরা দেখব যে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দেও জিন্না নিজেকে "প্রথমে ভারতবাসী, তারপর মুসলমান" বলেছেন। তখনও তাঁর বিশ্বাস, "মুসলমানদের স্বার্থ উপেক্ষা করলে কোন ভারতবাসী কখনও তার স্বদেশের সেবা করতে সমর্থ হবেন না। কারণ মুসলমানদের উৎসাহ দিয়ে এবং তাদের রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক তৈরী করলেই কেবল আপনারা আপনাদের স্বদেশের সেবা করতে সক্ষম হবেন।"[৫] এমন কি ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন সাধারণ নির্বাচনের প্রচার উপলক্ষে জিন্না ও তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল পরস্পরের প্রতি চোখা চোখা বাক্যবাণ নিক্ষেপ করছেন, তখনও জিন্না ভারতবর্ষের স্বায়ত্তশাসনই[৬] যে তাঁর লক্ষ্য—একথা বলেছেন। সাম্প্রদায়িক ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে এরকম জাতীয়তাবাদের ক্ষণপ্রভার ঝিলিক জিন্নার জীবন ও কর্মে এরপরও দেখা যাবে। তবুও একথা যথার্থ যে কলকাতার সর্বদলীয় সম্মেলনের ব্যর্থতার পর কুণ্ঠিত চরণে এবং কিছুটা বিলম্বে জিন্নার বিংশ শতাব্দীতে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার জনক আগা খাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দিল্লীর সর্বদলীয় মুসলিম সম্মেলনে যোগদান তাঁর জীবনে আর এক দফা পালা বদলেরই দ্যোতক। মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদীদের শিবিরে জিন্নার যোগদানে উল্লসিত আগা খাঁ এ সম্বন্ধে মন্তব্য করেন, "ঐ সম্মেলনের বৈশিষ্ট্য ছিল বহুদিন পর জিন্নার পুনর্বার তাঁর সমধর্মাবলম্বী মুসলমানদের সঙ্গে সহমত হওয়া। ঐ সহমত অবশ্য আপাততঃ ব্যক্তিগত এবং প্রকাশ্য স্বীকৃতিবিহীন ছিল। কিছু পূর্বেই শ্রীযুক্ত জিন্না কলকাতায় কংগ্রেসের সভায়[৭] যোগদান করেছিলেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেম যে কংগ্রেস বা অপর কোন তথাকথিত নিখিল ভারত প্রতিষ্ঠানে তাঁর কোন স্থান নেই। কারণ

সেগুলি আসলে হিন্দু প্রভাবিত প্রতিষ্ঠান। শেষ অবধি আমরা তাঁকে স্বমতে আনতে সমর্থ হয়েছিলাম।"[৮]

ডাঃ আন্সারী, তাসাদ্দুক আহমদ খান শেরওয়ানী, ডঃ মহম্মদ আলম, ডঃ সৈয়দ মাহমুদ, চাগলা প্রমুখ মুসলিম নেতারা নেহরু রিপোর্টের সমর্থন ও চোদ্দ দফার বিরোধিতা করলেও মৌলানা মহম্মদ আলী এবং লীগের অধিবেশনে সমবেত প্রতিনিধিদের অধিকাংশের সমর্থনে চোদ্দ দফা স্বীকৃত হয়। এর মাধ্যমে মুসলমানদের অন্যান্য এবং বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের জন্য যেভাবে খাড়া করে দেওয়া হয়, ব্রিটিশ শাসকরা তার পূর্ণমাত্রায় সুযোগ নিয়েছিলেন। শরীফ-অল-মুজাহিদের মতে, "চোদ্দ দফা সমসাময়িক মুসলিম আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্যোতক ছিল বলে সেগুলি কেবল ভারতের ভবিষ্যৎ গোলটেবিল বৈঠকে (১৯৩০-৩২) মুসলিম দাবির ভিত্তি হয়ে ওঠেনি, সংবিধান সম্বন্ধে আলোচনা এবং তার প্রণয়নের জন্য লণ্ডনে আহুত সেগুলি মুসলিম ভারতের ম্যাগনা কার্টাতে পরিণত হয়।"[৯] জামালুদ্দীন আহমদের মতে, "দফাগুলি খুঁটিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে কোন না কোন প্রকারে ওগুলিতে পরবর্তীকালে পাকিস্তান সৃষ্টির বীজ অন্তর্নিহিত ছিল।...কায়েদ-এ-আজম যেমন সাবলীল এবং যুক্তিযুক্তভাবে চোদ্দ দফা থেকে পাকিস্তানের দাবিতে উত্তরণ করেন এবং এর ফলে যেভাবে সমগ্র উপমহাদেশের জন্য এক অদ্বিতীয় রাজনৈতিক কাঠামো খাড়া করার ব্যাপারে ব্যর্থতার দায়িত্ব হিন্দু নেতাদের উপর বর্তায় তা প্রবল রাজনৈতিক ভূয়োদর্শনের দ্যোতক।" রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেছেন, "শ্রীযুক্ত ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ বা বাঁটোয়ারাতে (দফা) ঐগুলিকে একরকম হুবহু গ্রহণ করা হয়।"[১০]

॥ ১১ ॥

কিন্তু চোদ্দ দফা সত্ত্বেও বিবদমান মুসলমান রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা জিন্নার পক্ষে সহজ হল না। এক দিকে জিন্নার লীগে তখনও নেহরু রিপোর্ট গ্রহণ করার সপক্ষে এক প্রবল গোষ্ঠী বিদ্যমান, অন্য দিকে শফী লীগ সাম্প্রতিক মুসলিম সর্বদলীয় সম্মেলনের বাইরে এক পাও যেতে প্রস্তুত নয়। কোনমতে যদি পরস্পরবিরোধী মতাবলম্বী দুই গোষ্ঠীকে একটা বোঝাপড়ার জন্য একত্র করা গেল তো "যে-কোন মূল্যে পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থার জন্য শফী লীগের জেদাজেদির ফলে তাদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়ে গেল।"[১১] উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে মনোমালিন্য এমন

তীব্র হয়ে উঠল যে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জিন্নার লীগের প্রকাশ্য অধিবেশনে (মার্চ ১৯২৯) জিন্নার সাময়িক অনুপস্থিতিতে (তিনি তখন শফী লীগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আপোষ মীমাংসার জন্য আলোচনা করেছিলেন বলে শর্তাধীনে নেহরু রিপোর্টের সমর্থক ডাঃ আলমকে সাময়িক ভাবে অধিবেশনের সভাপতিত্ব করার জন্য মনোনয়ন করা হয়েছিল) নেহরু রিপোর্টের বিরোধীরা জোরজবরদস্তি করে অধিবেশন-প্রাঙ্গণে ঢুকে মারধর করে রিপোর্টের সমর্থকদের তাড়িয়ে দিয়ে সভাস্থল দখল করে।[২] কিছুক্ষণের মধ্যেই জিন্না সভাস্থলে আসায় আপাত শান্তি স্থাপিত হয় বটে, তবে পুনর্বার অশান্তির আশঙ্কায় জিন্না অধিবেশন সমাপ্তির ঘোষণা করেন।[৩]

ইতিমধ্যে জাতীয়তাবাদের পতাকাতলে মুসলমানদের আবার একত্র করার জন্য এবং সাম্প্রদায়িক মানসিকতার বিরুদ্ধে তাঁদের সঙ্ঘবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের নেতৃবৃন্দ এলাহাবাদে একত্র হয়ে ন্যাশনালিস্ট মুসলিম পার্টি গঠন করেন। ডাঃ আন্সারী এর সভাপতি এবং খলিকুজ্জমাঁ সম্পাদক হন। কিন্তু দানা বাঁধার পূর্বেই দলের অকালমৃত্যু ঘটে। সরোজিনী নাইডুর মধ্যস্থতায় বোম্বেতে কংগ্রেস ও মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে সামঞ্জস্য আনার জন্য জিন্না ও আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে গান্ধীর একটি সাক্ষাৎকার হয়।[৪] কিন্তু তাও ফলপ্রসূ হয়নি।

চাগলাও একটা বোঝাপড়ার জন্য জিন্নাকে মতিলাল নেহরুর (সে বছরের কংগ্রেস সভাপতি) সঙ্গে দেখা করার প্রস্তাব করে এক পত্র লেখেন। তার জবাবে ৫ই আগস্ট জিন্না চাগলাকে লেখেন, "আমার আশঙ্কা হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নামে পরিচিত প্রশ্নটির সমাধান ততদিন পর্যন্ত সম্ভবপর হবে না, যতদিন না আমরা সবাই যারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য কাজ করছি তাঁরা এই কথা উপলব্ধি করি যে এটি এক জাতীয় সমস্যা এবং নিছক সাম্প্রদায়িক বিবাদ নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় ও নেতারা যতক্ষণ পর্যন্ত না এই মোদ্দা কথাটা বুঝতে পারছেন এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটি সমাধানের জন্য ব্রতী হচ্ছেন ততদিন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে কোন জাতীয় কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভবপর হবে না।"[৫] লক্ষণীয় এখানেও জিন্না বলছেন যে তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করছেন এবং হিন্দু-মুসলিম মত-ভেদকে সাম্প্রদায়িক নয়, জাতীয় সমস্যার আখ্যা দিচ্ছেন।

এদিকে সাইমন কমিশনের কাজ ১৪ই এপ্রিল সমাপ্ত হয়। কিন্তু তার অল্প কয়েকদিন পরই (মে ১৯২৯) কমিশন নিয়োগকারী টোরী দলের বল্ডুইন সরকার নির্বাচনে পরাজিত হয় এবং শ্রমিক দলের রামসে ম্যাকডোনাল্ড ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী

হন। ভারতে শাসন-সংস্কার প্রবর্তন সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত উৎসাহী শ্রমিক সরকার আলোচনার জন্য বড়লাট আরউইনকে (জুন, ১৯২৯) ইংলণ্ডে আহ্বান করে। দীর্ঘ আলোচনান্তে ভারতবর্ষে ফিরে ৩১শে অক্টোবর তিনি ঘোষণা করেন যে সাইমন কমিশনের প্রতিবেদন নিয়ে আলাপ-আলোচনা করার জন্য ব্রিটিশ সরকার দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি সহ প্রমুখ ভারতীয় নেতাদের নিয়ে লণ্ডনে এক গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করতে মনস্থ করেছে। বড়লাটের ঘোষণাপত্রের একাধিক স্থলে ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের মর্যাদা দেওয়াই যে ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য —একথা বলা হয়েছিল। অক্টোবরে বড়লাট জিন্নাকে এই মর্মে এক পত্রও দিয়েছিলেন। কংগ্রেস, লীগ এবং লিবারেলসহ তাবৎ রাজনৈতিক দলের নেতারা বড়লাটের ঘোষণাকে স্বাগত জানান।

গান্ধী, মালব্য, সপ্রু প্রমুখ নেতারা আশা ব্যক্ত করেন যে লণ্ডনের ঐ আলোচনা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের ভিত্তি মেনে নিয়ে হবে। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের কথা এই পরিপ্রেক্ষিতে এই জন্য প্রাসঙ্গিক যে নেহরু রিপোর্ট অনুসারে সংবিধানের মূল নীতি এবং শাসন-সংস্কারের সুপারিশ রচিত হয়েছিল ভারতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এই অনুমানকে ভিত্তি করে। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের কলকাতা কংগ্রেস নেহরু রিপোর্টের সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের আদর্শ সাময়িকভাবে—মাত্র এক বছরের জন্য গ্রহণ করে। সুভাষচন্দ্র এবং জওহরলাল প্রমুখ কংগ্রেসের তরুণ নেতৃবর্গ এবং পূর্ণ স্বাধীনতাকে কংগ্রেসের লক্ষ্য রূপে অবিলম্বে ঘোষণা করার আন্দোলনকারীদের চাপে কলকাতা কংগ্রেসে স্থির হয়েছিল যে পরবর্তী এক বৎসর অর্থাৎ ৩১শে ডিসেম্বর ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইংরেজ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন না দিলে কংগ্রেস সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানাবে ও তার জন্য সংগ্রাম শুরু করবে। সেই সময়সীমা অতিক্রম হতে আর দুই মাস মাত্র বাকী ছিল।

বড়লাট এ ব্যাপারে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ আলোচনা করতে আগ্রহী ছিলেন। বিঠলভাই প্যাটেল ও জিন্নাও চাইছিলেন যে বড়লাটের সন্ধির জন্য প্রসারিত হাতের যেন মর্যাদা করা হয় এবং এই ভাবে বৈধানিক উপায়ে শাসন-সংস্কারের পথে যেন এগিয়ে যাওয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে জিন্না ইতিপূর্বে (১৯শে জুন) ইংলণ্ডের নূতন প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর পূর্ব-পরিচিত ম্যাকডোনাল্ডকে এক দীর্ঘ পত্র লিখে ভারতীয় নেতাদের নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান এবং অবিলম্বে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন দেবার সপক্ষে ব্রিটিশ সরকারের অভিপ্রায় ঘোষণার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কারণ তাঁর মতে এর কমে পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে ক্রমশঃ জাগ্রত জনমতকে

সন্তুষ্ট করা সম্ভব হবে না। ম্যাকডোনাল্ড জিন্নার চিঠির এক অনুকূল উত্তর দেন ১৪ই আগস্ট। সুতরাং বড়লাটের ঘোষণা তাঁর প্রস্তাবেরই প্রতিধ্বনি মনে করে এ ব্যাপারে জিন্নার বিশেষ আগ্রহী হবার কারণ ছিল।

বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য গান্ধী যাতে উদ্যোগী হন তার জন্য জিন্না বিঠলভাই প্যাটেলের সঙ্গে ৩০শে নভেম্বর সবরবতী আশ্রমে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন। কিন্তু ২৩শে ডিসেম্বরের পূর্বে বড়লাটের পক্ষে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করা সম্ভবপর হয়নি। আলোচনায় বিঠলভাই ও জিন্নার সঙ্গে ভারতীয় প্রতিনিধিদলে ছিলেন গান্ধী, কংগ্রেস সভাপতি মোতিলাল ও সপ্রু। মোতিলাল ও গান্ধী বড়লাটের কাছে প্রতিশ্রুতি চাইলেন যে ভারতবর্ষকে অবিলম্বে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়া হবে—এই ভিত্তিতে বৈঠকে আলোচনা চলবে। বড়লাট সেরকম কোন প্রতিশ্রুতি দেবার ব্যাপারে অক্ষমতা জানালেন। স্বভাবতই আলোচনা ভেঙে গেল। যে আলাপ-আলোচনায় বসার জন্য জিন্না পর্দার অন্তরালে অনেক পরিশ্রম করেছিলেন এবং যার দ্বারা শাসন-সংস্কারের লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য তিনি বেশ কিছুটা আশা করেছিলেন, তা এই ভাবে ব্যর্থ হওয়াতে সঙ্গত কারণেই জিন্না ক্ষুব্ধ হবেন—একথা অনুমান করা যায়।

এর কয়েক দিন পরই রাবীর তটে লাহোরে জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের শর্তযুক্ত নেহরু রিপোর্টকে "রাবীর জলে বিসর্জন" দেবার সিদ্ধান্ত নেবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ স্বাধীনতাই কংগ্রেসের লক্ষ্য—একথা ঘোষণা করা হল। এই লক্ষ্যপ্রাপ্তির জন্য কংগ্রেস সদস্য ও কর্মীরা আইনসভার সদস্যপদ ইত্যাদি বর্জন করে আইন অমান্য, কর দেওয়া বন্ধ করা এবং ঐ জাতীয় প্রত্যক্ষ অহিংস সংগ্রাম শুরু করবেন স্থির হল।

কংগ্রেসের আইনসভা বর্জন এবং আইন অমান্যের সিদ্ধান্তের সম্বন্ধে ভারতবর্ষের মুসলমান-সমাজে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। খলিকুজ্জমা এবং তাঁর মত যাঁরা তখনও পর্যন্ত কংগ্রেস ও লীগ উভয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কংগ্রেস অধিবেশন থেকে স্ব স্ব স্থানে ফেরার পথে তাঁরা প্রস্তাবিত আন্দোলন থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। এ সম্বন্ধে খলিকুজ্জমাঁর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য: "আমার মনে হল যে এরকম প্রবল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হতে দিয়ে তিনি (মোতিলাল) তাঁর পুত্রের প্রতি ভালবাসার বেদীমূলে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। স্ব স্ব স্থানে যাবার জন্য ডাঃ আন্সারী, তসদ্দুক এবং আমি অপমানিত, নিরাশাপীড়িত ও ক্রুদ্ধ অন্তরে সন্ধ্যাবেলায় লাহোর থেকে রওনা হচ্ছিলাম।...

নেহরু রিপোর্টকে রাবীর জলে বিসর্জিত করার পর আমরা আর ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করার দায়িত্ব নেবার অবস্থায় ছিলাম না। কারণ মুসলমানরা এ লড়াইকে কেবল হিন্দুদের সংগ্রাম বলে বিবেচনা করতে বাধ্য।"৬

মহম্মদ আলীও আইন অমান্য আন্দোলন থেকে মুসলমানদের দূরে থাকার পরামর্শ দিয়ে বললেন, "শ্রীযুক্ত গান্ধী সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিন্দুমহাসভাপন্থীদের প্রভাবে কাজ করছেন। তিনি হিন্দুধর্মের প্রভুত্ব এবং মুসলমানদের আত্মসমর্পণের জন্য কাজ করেছেন।"৭ স্বাধীনতার অর্থ তৃতীয় পক্ষ ব্রিটিশ শক্তির অপসারণ। তাঁদের মধ্যস্থতা বিনা বিবদমান গোষ্ঠীগুলি নিজেদের চেষ্টায় একটা আপোস রফা করতে পারবেন, পারস্পরিক অবিশ্বাসের জন্য এ ভরসা বহু মুসলমান নেতার মধ্যেই ছিল না। আত্মরক্ষার তাগিদে তাঁরা তাই মধ্যস্থ ব্রিটিশের উপস্থিতির সমর্থক এবং সেই কারণে স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন।

লিবারেল ও বিধাননিষ্ঠ জিন্নার এ আন্দোলনকে ভাল চোখে না দেখার এক অতিরিক্ত কারণ ছিল। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শাসন-সংস্কারের অভিমুখে অগ্রসর হবার উদ্যোগ করার জন্য কয়েক মাস যাবৎ যে পরিশ্রম তিনি করেছিলেন, তা ব্যর্থ হওয়ায় একে তিনি তাঁর নিজের ব্যক্তিগত পরাজয় রূপে নিয়েছিলেন। তাঁর এই ক্ষোভ ও হতাশার যে কারণ ছিল না, তা বলা যায় না। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুরে গান্ধীনেতৃত্বে কংগ্রেস তথা ভারতীয় রাজনীতির যে রূপান্তরের সূচনা তার মোদ্দা কথা হল জনতা-মুখী হওয়া। লাহোর কংগ্রেসে যেন রূপান্তরের পূর্ণাহুতি হল। কেবল পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবই পুরাতন ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ নয়, ভবিষ্যতে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন আর বড়দিনের বন্ধে হবে না—দরিদ্র দেশবাসীর পক্ষে যাতে অহেতুক শীতবস্ত্র ইত্যাদি যোগাড় করার জন্য হয়রান না হতে হয় তার জন্য তাঁদের অনুকূল সময়ে হবে ইত্যাদি সিদ্ধান্ত এবং আলোচনা কংগ্রেস তথা ভারতীয় রাজনীতির ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্বন্ধ বিচ্ছেদ। আর ব্রিটিশ লিবারেল ঐতিহ্যে লালিত-পালিত জিন্না গান্ধীর প্রত্যক্ষ গণ-সংগ্রামের ভাষা ও কলা-কৌশল জানেন না। সুতরাং এ জাতীয় রাজনীতিতে তিনি কোনরকম ভূমিকা গ্রহণে অক্ষম। স্ত্রীর সঙ্গে প্রথমে বিচ্ছেদ এবং পরে তাঁর মৃত্যুতে নিঃসঙ্গ জিন্নার জীবনে রাজনীতি চলে গেলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হবে কেবল আইনের পেশা তা পূর্ণ করতে পারবে না। এ পরিস্থিতিকে স্বীকার করে নেওয়া তাঁর সত্তার—অস্তিত্বের অবলুপ্তি। স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ ভাষায় কংগ্রেসের স্বাধীনতা প্রস্তাবকে "রাজনৈতিক হিস্টিরিয়া" আখ্যা দিয়ে জিন্না গান্ধীর প্রতি তীব্র আক্রমণ করে বললেন, "ফ্রান্সের

বুরবঁদের মত গান্ধীর ধাতই কোন কিছু শিখতে বা ভুলতে অসমর্থ এবং তাঁর অতীতের হিমালয়-সদৃশ ভ্রান্তিও বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে তাঁর চোখ খুলে দিতে অক্ষম।"৮ তবে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রতি এই জাতীয় মানসিকতার শিকার কেবল জিন্নাই হননি, তাঁর চারিত্র্যধর্মযুক্ত আরও কিছু কিছু ভারতীয় নেতাও অনুরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন। জিন্নাকে লেখা সপ্রুর ৫।১।১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের চিঠি এর এক অন্যতম নিদর্শন।

বলা বাহুল্য কংগ্রেসের নিষ্ঠাবান মুসলমান নেতা ও কর্মীরা কিন্তু পূর্ণোদ্যমে এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। জমায়েত-উল-উলেমা নেহরু রিপোর্টের বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে সাময়িক ভাবে কংগ্রেস থেকে দূরে সরে গেলেও আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদানের মাধ্যমে আবার কংগ্রেসের কাছাকাছি এল। অনুরূপ ভাবে পাঞ্জাবের অর্হর পার্টি এবং বাদশা খান ও তাঁর ভাই ডাঃ খানসাহেবের নেতৃত্বাধীন খুদা-ই-খিদমদগার বা লাল কুর্তা বাহিনী সীমান্ত প্রদেশে এ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ সবরমতী আশ্রম থেকে ৭৮ জন সহকর্মী সহ ২৪১ মাইল দূরবর্তী দাণ্ডীর উদ্দেশ্যে গান্ধীর কুচ করার পর তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী "হিন্দুস্থান উথল পড়েগা" সত্য প্রমাণিত হল। ইতিপূর্বে ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসের সঙ্কল্পবাক্য পাঠ ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতার দ্বিতীয় গণ-আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। লবণ আইন ভঙ্গ এবং খাজনা বন্ধ করার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পরবর্তী বার মাস ভারতবাসী দেশ-বিদেশের মানুষের সপ্রশংস দৃষ্টির সামনে যে নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করে, তার বিস্তারিত উল্লেখের অবকাশ এখানে নেই।

সপ্রুর উৎসাহে ইতিমধ্যে আর এক দফা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ব্যর্থ প্রচেষ্টা করলেন জিন্না। সংগ্রামরত কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা না থাকলেও নানা ধর্ম ও প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধি ২৬শে ফেব্রুয়ারী এক সর্বদলীয় সম্মেলনে দিল্লীতে একত্র হলেন। কংগ্রেসকে বাদ দিয়েও তাঁদের পক্ষে কোন সমাধান সূত্র আবিষ্কার করা সম্ভব হল না।

মার্চের ৭ তারিখে কেন্দ্রীয় পরিষদে শাসন পরিষদের ব্যয়-বরাদ্দের দাবিতে প্রশাসকদের আইন সভার প্রতি দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে জিন্না বললেন, "হিন্দুরা আমাদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করুন বা না-ই করুন, আমরা এগিয়ে যেতে চাই এবং আমরা এদেশে মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের জন্য যথেষ্ট রক্ষাকবচ ব্যবস্থাযুক্ত দায়িত্বশীল সরকার চাই।" ১০ই মার্চ সর্দার প্যাটেলের গ্রেপ্তার ও দণ্ডদানের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় পরিষদে মদনমোহন মালব্যের প্রস্তাবের উপর বলতে

গিয়ে গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলনের পুনরায় নিন্দা করেন এবং মুলতুবী প্রস্তাবের উপর ভোটদানে বিরত থাকেন। সেপ্টেম্বরের ভিতর লর্ড আরউইনের সঙ্গে একাধিক পত্র বিনিময় হয় প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকের স্থান ও তারিখ নিয়ে। তিনি যে ধরনের রাজনীতিতে অভ্যস্ত তার একমাত্র সাধন ঐ বৈঠক আরম্ভ হওয়ায় বিলম্ব দৃষ্টে তাঁর উদ্বেগ ও ব্যাকুলতা ঐ চিঠিগুলিতে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। আরউইন ও জিন্না দৃষ্টিভঙ্গীর অভিন্নতার জন্য পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে পরস্পরের গুণগ্রাহী এবং আস্থাভাজনও হয়ে ওঠেন। ১৩ই সেপ্টেম্বর তদানীন্তন ভারতসচিব ওয়েজউড বেনকে জিন্নাকে সাক্ষাতের সুযোগ দানের অনুরোধ জানানোর প্রসঙ্গে বড়লাট আরউইন তাঁর সম্বন্ধে লেখেন ." বেশ কিছুদিন যাবৎ আমি জিন্নার কার্যকলাপ লক্ষ্য করেছি এবং যদিও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী সর্বদা সরকারের সঙ্গে অভিন্ন নয়, তবু এরকম সূক্ষ্ম বুদ্ধি অথবা স্বাধীন দৃষ্টিকোণবিশিষ্ট কম ভারতবাসীর সঙ্গেই আমার পরিচয় ঘটেছে।"

ইতিমধ্যে সপ্রু ও জয়াকরের কংগ্রেসের সঙ্গে সরকারের একটা আপোস রফা করবার প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। অন্তর্দ্বন্দ্বে ছিন্নবিচ্ছিন্ন তদানীন্তন লীগের রাজনীতির প্রতি জিন্না বীতশ্রদ্ধ ছিলেনই। অপরাপর রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠার উপেক্ষায় অধিকন্তু হিসাবে তিনি আহত। সম্যক রাজনৈতিক কার্যকলাপের অভাবে নিঃসঙ্গ জিন্না এই দৌত্যের সঙ্গে যুক্ত না থাকায় যেন আরও বিচ্ছিন্ন। গোলটেবিল বৈঠক-রূপী তাঁর উপযুক্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপের সূত্রপাত এই দৌত্যের ফলে বিলম্বিত হচ্ছে দেখে বিচলিত জিন্না এই সময়ে (১৮ই আগস্ট) বড়লাটকে এক চিঠি লিখে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের সম্বন্ধে "দৃঢ় ও সুনিশ্চিত" হবার পরামর্শ দেন।[৯] ব্রিটিশ সরকারকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করার জিন্নার প্রথম প্রয়াস হিসাবে পত্রটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

অতঃপর গোলটেবিল বৈঠক আহূত হল এবং বলা বাহুল্য সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম-রত কংগ্রেসের কোন প্রতিনিধি এতে আহূত হননি বা যোগ দেননি। ১২ই নভেম্বর লণ্ডনে এর সূত্রপাত এবং প্রায় দশ সপ্তাহ পরে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের সমাপ্তি। ব্রিটিশ ভারত থেকে বড়লাট কর্তৃক মনোনীত ৫৮ জন প্রতিনিধির মধ্যে জিন্নাও অন্যতম। মনোনীত জমিদারগোষ্ঠী, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, সাম্প্রদায়িক নেতৃবর্গ এবং লিবারেলদের মধ্যে সপ্রু, জয়াকর, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ছাড়াও আগা খাঁ, স্যার শফী, আলী ভ্রাতৃদ্বয় এবং ডঃ আম্বেদকর ও ডাঃ মুঞ্জেও প্রভৃতি প্রতিনিধিদলে ছিলেন। এছাড়া দেশীয় রাজন্যবর্গের ১৬ জন এবং ইং-লণ্ডের রাজনৈতিক দলসমূহের ১৩ জন প্রতিনিধিও বৈঠকে অংশ গ্রহণ

করেছিলেন।

বৈঠকের সাধারণ সভায় ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের সপক্ষে বলা ছাড়াও জিন্না ব্রিটিশ ও ভারত সরকারের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে "সফল হবার দৃঢ়সঙ্কল্পযুক্ত' সহযোগিতা দেবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। এর ফেডারেল কাঠামো সম্পর্কিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপসমিতির সদস্যরূপে প্রস্তাবিত ফেডারেশনের নানা দিক সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেন। এছাড়া প্রতিরক্ষা এবং সিন্ধু সম্পর্কিত উপ-সমিতির সদস্যরূপে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। সীমান্ত প্রদেশে শাসন-সংস্কারের পক্ষেও ঐ বৈঠকে ওকালতী করেন। আলোচনা প্রসঙ্গে বৈঠকে অংশগ্রহণকারী ব্রিটিশ সরকার, দেশীয় রাজন্যবর্গ, হিন্দু এবং মুসলমান—এই চারটি "পক্ষের" মধ্যে রফা হওয়া উচিত মন্তব্য করে ভারতের রাজনীতিতে মুসলমানদের এক নূতন ভূমিকার প্রতি ইঙ্গিত করার সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রতিনিধিত্বকে কেবল মুসলমানদের মধ্যে সীমিত করেন। পরবর্তী কালে পাকিস্তানের বীজ স্বরূপ মুসলমানদের এই নূতন ভূমিকা—তাদের একটি স্বতন্ত্র "পক্ষ" মনে করা আরও বিকশিত হয়। বক্তৃতা প্রসঙ্গে জিন্না সরকারকে একবার এই প্রচ্ছন্ন শাসানিও দিয়েছিলেন যে সাত কোটি মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের পক্ষে সন্তোষজনক সমাধান না করলে তারাও অতঃপর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবে।

অনেক আলাপ-আলোচনা সত্ত্বেও বৈঠকে নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হল না। সম্ভবত ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের ইচ্ছা ছিল না এবং পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের প্রতিনিধিদের—যাদের পক্ষে কখনই সহমত হওয়া সম্ভব নয়—আমন্ত্রণ করে একত্র করা তারই দ্যোতক। সম্ভবতঃ ভারতের সর্বাপেক্ষা জনসমর্থন-পুষ্ট প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা বৈঠকে অংশগ্রহণ না করায় ব্রিটিশ সরকার কোন সিদ্ধান্ত নিতে ভরসা করেননি। কারণ বৈঠকে বার বার অনুপস্থিত কংগ্রেসের দাবির কথা উঠেছিল। সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্পর্কে এক ভাসা ভাসা বিবৃতি দিলেন:

"মহামান্য সম্রাটের সরকারের অভিমত এই যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভাসমূহের উপর ভারত শাসনের দায়িত্ব দেওয়া উচিত। তবে তার পূর্বে কিছু কিছু দায়-দায়িত্ব এবং সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য ও অধিকার রক্ষার জন্য অন্যবিধ বিশেষ স্থিতিজনিত যে সব রক্ষাকবচ প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করতে হবে।

"অন্তর্বর্তীকালে এজাতীয় যেসব বৈধানিক রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা হবে,

এবং তার জন্য যেসব সংরক্ষিত অধিকার বিধিবদ্ধ ও প্রযুক্ত হবে তার ফলে নূতন সংবিধানের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে স্বদেশের শাসনকার্য পরিচালন করার জন্য যে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হবে তাতে যেন কোন রকম বাধা না পড়ে তা দেখাও মহামান্য সম্রাটের সরকারের প্রাথমিক কর্তব্য হবে।"[১০]

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলীর বর্ণনা শেষ করার পূর্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের উল্লেখ করা দরকার। ৩০শে ডিসেম্বর এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত লীগের (ইতিমধ্যে শফী-লীগ মূল অর্থাৎ জিন্না-লীগের সঙ্গে মিশে গেছে) বাৎসরিক অধিবেশনে জিন্না সহ গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারী মুসলমান নেতাদের প্রশংসা করার সঙ্গে সঙ্গে জিন্নার মনোনীত সভাপতি কবি (ব্যারিস্টার এবং ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে তখন পর্যন্ত লীগের সক্রিয় কর্মী) ডঃ মহম্মদ ইকবাল এই উপমহাদেশে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের ভিতর বা বাইরে একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করেন।[১১] ইকবালের ঐ বক্তব্যের সংবাদ গোলটেবিল বৈঠকের হিন্দু ও শিখ প্রতিনিধিদের কাছে পৌছানর পর তাঁরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন এবং বৈঠকে মুসলমানদের প্রস্তাবসমূহ সম্বন্ধে তাঁদের সন্দিহান করে তোলে। বৈঠকের মুসলমান সদস্যরা ইকবালের প্রস্তাবে গুরুত্ব না দিলেও রামগোপালের মতে, "...প্রতিনিধিদের আশেপাশে সমবেত একদল মুসলমানের চিন্তায় এ প্রস্তাব আলোড়ন সৃষ্টি করল। মুসলমান প্রতিনিধিদের তাঁরা ইকবালের বক্তৃতাকে গোলটেবিল বৈঠকে মুসলিম দাবির ভিত্তিরূপে উপস্থাপিত করার জন্য অনুরোধ করলেন। বৈঠকে প্রতিনিধিদের কাছ থেকে খুব একটা মনোযোগ লাভে অসমর্থ হবার পর তাঁরা নিজেদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে এই আদর্শ প্রচারে ব্রতী হলেন।"[১২] পাকিস্তান শব্দের জনক চৌধুরী রহমৎ আলী ও তাঁর কেমব্রিজ গ্রুপের সূত্রপাতের এই কাহিনী সম্বন্ধে পরে বলা হবে।

॥ ১২ ॥

প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের শেষে প্রধানমন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তার একটু পরিশিষ্ট ছিল এবং তা হল এই : "...যাঁরা বর্তমানে আইন অমান্য আন্দোলনে ব্যাপৃত তাঁদের কাছ থেকে যদি ইতিমধ্যে বড়লাটের আবেদনে সাড়া আসে, তাহলে তাঁদের সাহায্য নেবারও ব্যবস্থা করা হবে।" এর সূত্র ধরে বড়লাট ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী এক বিবৃতি দিয়ে গান্ধীসহ আইন অমান্য আন্দোলনে গ্রেপ্তার নেতাদের নিঃশর্তে মুক্তি দিয়ে এবং কংগ্রেসের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে

নিয়ে ঐ প্রতিষ্ঠানের নেতাদের ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব বিবেচনা করার অনুরোধ জানালেন। অতঃপর গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হল এবং মার্চের করাচী কংগ্রেসে স্থির হল যে প্রতিষ্ঠানের একক প্রতিনিধি হিসাবে গান্ধী দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করবেন। মাঝখানে আবার দমননীতি শুরু করা এবং গান্ধীর অনুরোধে ডাঃ আন্সারীকে গোলটেবিল বৈঠকে আমন্ত্রণ করতে রাজী হয়েও সরকার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার জন্য গান্ধীর ঐ বৈঠকে যোগদানের ব্যাপারে সমস্যা দেখা দিলেও শেষ অবধি তিনি ১৪ই সেপ্টেম্বর থেকে ঐ বৈঠকে যোগ দিলেন, যদিও তা শুরু হয়ে গিয়েছিল তার এক সপ্তাহ পূর্বেই।

এই অবকাশে মুসলিম ন্যাশনালিস্ট পার্টির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যার সৃষ্টি হয়েছিল জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের দ্বারা ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম সাম্প্রদায়িকতামূলক মুসলিম সর্বদলীয় সম্মেলনের প্রত্যুত্তর হিসাবে একই বৎসর জুলাই মাসে। জিন্না লীগের কেউ কেউ এর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হলেও জিন্না স্বয়ং কিন্তু এর থেকে দূরে ছিলেন। মুসলিম ন্যাশনালিস্ট পার্টি কয়েকটি প্রদেশে দানা বাঁধা শুরু করেছিল এবং ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে লখনউ-এ এর বাৎসরিক সম্মেলনের সভাপতি স্যার আলী ইমাম ঘোষণা করলেন : "...যদিও তিনি স্বয়ং একদা সেই রাজনৈতিক মতাবলম্বীদের সঙ্গে ছিলেন যাঁরা পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার উপর খুবই গুরুত্ব দিতেন এবং তিনি লর্ড মিণ্টোর কাছে দরবারকারী মুসলিম প্রতিনিধিমণ্ডলের অন্যতম সদস্যও ছিলেন, গভীর ভাবে বিচার-বিবেচনা করার পর তিনি এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা কেবল ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পরিপন্থীই নয়, এ প্রথা প্রত্যক্ষভাবে স্বয়ং মুসলমানদের পক্ষে ক্ষতিকারক।[১]

কিন্তু একথা দুঃখজনক হলেও সত্য যে জমায়েত-উল-উলেমা, অহ্‌রর পার্টি এবং মুসলিম ন্যাশনালিস্ট পার্টির সম্মিলিত প্রয়াস সত্ত্বেও অন্ততঃ শিক্ষিত মুসলমান সমাজের মধ্যে জাতীয়তাবাদকে ধর্মীয় বিবেচনার উর্ধ্বে স্থাপনা করার ব্যাপারে খুব একটা প্রগতি করা সম্ভবপর হয়নি। রামগোপাল মন্তব্য করেছেন, "প্রত্যুতপক্ষে যেসব মুসলমানেরা পাশ্চাত্য শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং ধর্মের ক্ষেত্রস্থ মানুষদের তুলনায় যাঁরা গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার ধ্যান-ধারণার সঙ্গে বেশী পরিচিত ছিলেন তাঁরা সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের দিকে হেলে পড়লেন।"[২] একটু অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও এই আপাত বিরুদ্ধ মানসিকতার কারণ আবিষ্কারে ডঃ রামমনোহর লোহিয়ার বিশ্লেষণী বুদ্ধির সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। তাঁর মতে, "সাযুজ্য

অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিম্ন জাতি অথবা অল্প-শিক্ষিতদের প্রবণতা এবং শাসক ও অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত জাতিসমূহের প্রবণতা হল সংঘাত—এটা বোধহয় এক রকম প্রাকৃতিক বিধানের সমতুল্য। সম্ভবতঃ সঙ্কটকালে সাযুজ্য অস্তিত্বলুপ্তিতে পর্যবসিত হয় এবং সংঘাত কঠোর ভূমিকা নেবার ফলে স্বকীয়তা বজায় রাখতে সমর্থ হয়।”[৩]

জিন্না কিন্তু প্রথম গোলটেবিল বৈঠক সমাপ্ত হবার পর ভারতে প্রত্যাবর্তন করেননি। মনে মনে ইংলণ্ডে স্থায়ীভাবে থাকার প্রস্তুতি নিয়ে সেবার তিনি বিলাত গিয়েছিলেন এবং বৈঠক সমাপ্ত হওয়ার পর তার জন্য প্রস্তুতি করছিলেন। শফী লীগের সঙ্গে আভ্যন্তরীণ বিবাদ মিটে গেলেও স্বদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁর কাছে শ্বাসরুদ্ধকারী মনে হচ্ছিল। একই কারণে গোলটেবিল বৈঠকেও তিনি নিঃসঙ্গ বোধ করছিলেন এবং মাঝে মাঝে তদনুরূপ আচরণও করেছেন। এ সম্বন্ধে স্যার মীর্জা ইসমাইলের সাক্ষ্য প্রণিধানযোগ্য: “তিনি (জিন্না) কারও সঙ্গে সহমত হতেন না, শেষ পর্যন্ত এমনকি তাঁর মুসলমান প্রতিনিধিমণ্ডলের সঙ্গেও না। অধিকাংশ বিষয়েই তাঁর নিজস্ব মতামত ছিল এবং একগুঁয়ে হয়ে তিনি সেই সব অভিমত আঁকড়ে থাকতেন।...মুসলমান প্রতিনিধিমণ্ডলের নেতা স্যার শফীকে একবার উঠে দাঁড়িয়ে বলতে হয় যে জিন্না নিজের অভিমত ব্যক্ত করছেন, প্রতিনিধিমণ্ডলের নয়।”[৪] মুসলমান প্রতিনিধিদের নেতা সরকারীভাবে যিনিই হোন না কেন, বাস্তব ক্ষেত্রে এর নেতৃত্বের উপর কব্জা করেছিলেন জমকালো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আগা খাঁ। প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে জিন্নার ভূমিকা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে রামগোপাল বলেছেন: “মুসলমান প্রতিনিধিদের মধ্যে জিন্না একক সংখ্যালঘু ছিলেন; তিনি ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি যৌথ নির্বাচনের ভিত্তিতে একটা বোঝাপড়ায় উপনীত হবার জন্য আলোচনা করতে প্রস্তুত ছিলেন।”[৫]

বিলাতে থাকা স্থির করে ২৫শে মার্চ তাঁর আসামের অনুগামী আবদুল মতিন চৌধুরীকে সেকথা জানিয়ে লেখেন,”...পরবর্তী দুই তিন বৎসর লণ্ডন ভারতের শাসন-সংস্কারের নাটকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পটভূমি হতে চলেছে।”[৬] জুন মাসে প্রিভি কাউন্সিলে আইন-ব্যবসা করার ব্যবস্থা পাকা করে বিলাতে পাকাপোক্ত ভাবে থাকার জন্য ভগ্নী ফতিমা ও কন্যা দীনাকে বিলাতে আনার ব্যবস্থা করলেন এবং লণ্ডনের ভাড়াবাড়ি ছেড়ে দিয়ে হ্যাম্পস্টেডে একটি বাড়ি কিনে গুছিয়ে বসলেন।

প্রিভি কাউন্সিলে আইন ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে বহুদিনের অভ্যাসের কারণ জিন্নাকে ভারতের রাজনীতির সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতে হয়েছিল। লীগের আবদুল মতিন চৌধুরী, মাদ্রাজের জাস্টিস পার্টির স্যার এ. পি. পাত্র প্রমুখের সঙ্গে

পত্রালাপ এ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য। ভারতের নূতন বড়লাট লর্ড উইলিংডন (বোম্বের ছোটলাট হিসাবে তাঁর বিরুদ্ধে জিন্নার প্রকাশ্য সংঘর্ষের কাহিনী স্মরণীয়) পুরাতন বিবাদ ভুলে গিয়ে ভারতে রওনা হবার পূর্বে ২১শে মার্চ লণ্ডনে জিন্নার বাড়ি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। অনুমান করা যায় জিন্নার মুসলমান নেতা রূপে রূপান্তরই এই অস্বাভাবিক সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারের মূলে। দুজনের মধ্যে ভারতবর্ষের রাজনীতির কথা অবশ্যই আলোচিত হয়ে থাকবে। পরবর্তীকালে প্রায়শঃ উইলিংডনের সংখ্যালঘু স্বার্থের দোহাই দিয়ে তাবৎ জাতীয়তাবাদী দাবির বিরোধিতা করার প্রবণতার অন্যতম সূত্র হয়ত জিন্নার সঙ্গে এই যোগাযোগে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

তাঁর গুরু দাদাভাই নৌরজীর মত জিন্না ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য হবার জন্যও চেষ্টা করলেন। প্রথমে "আদর্শে মিল আছে" বলে শ্রমিক দলের দরজায় করাঘাত করলেন। কিন্তু গোলটেবিল বৈঠকে তাঁর ভূমিকায় অসন্তুষ্ট প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড এ ব্যাপারে সাহায্য করা তো দূরের কথা, এমন কি তাঁর সঙ্গে দেখা করার "সময় করে উঠতে পারলেন না।" অতঃপর আগা খাঁর সহায়তা নিয়ে রক্ষণশীল দলের দ্বারস্থ হলেন। সে দলের মনোনয়ন পাবার জন্য "কংগ্রেসের বিপ্লবী ভূমিকার একমাত্র কার্যকরী আভ্যন্তরীণ প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম দাবিসমূহের প্রতি (ঐ দলের) ক্রমবর্ধমান আগ্রহের উপর ভরসা করতে পারবেন বলে আশা করলেন।"[৭] কিন্তু সে দলও তাঁকে পার্লামেণ্টের জন্য কোন নির্বাচন ক্ষেত্রের সুবিধা করে দিতে প্রস্তুত হল না। আশাহত জিন্নার মনে আর একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল—প্রিভি কাউন্সিলের বিচারক হওয়া কিন্তু এ ব্যাপারেও শেষ অবধি ভাগ্যদেবী তাঁর প্রতি প্রসন্ন হননি।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে একটি মোকর্দমা উপলক্ষে তিনি ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন। সে সময়ে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের সামনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতা ও তাতে অংশগ্রহণকারী হিন্দু নেতাদের আচরণে তাঁর হতাশার কথা তিনি ব্যক্ত করেন। সিমলাতে গিয়ে কেন্দ্রীয় পরিষদের সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে দেশের মুসলিম নেতৃত্বে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তার কথা তাঁর ভূতপূর্ব সহকর্মীরা জানান। নিজের বাসস্থান ভারতবর্ষ নয়, ইংলণ্ড—এই মর্মের তথ্যযুক্ত নূতন পাসপোর্ট নিয়ে ইংলণ্ডে ফিরে যাবার মুখে বোম্বের মুসলিম স্টুডেণ্টস ইউনিয়নের সংবর্ধনার প্রত্যুত্তরে জিন্না মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদকে প্ররোচনাদানকারী এক প্রতিভাষণ দিলেন এবং সেই বক্তৃতা প্রসঙ্গে সমগ্র হিন্দু সমাজকে বুদ্ধিহীন আখ্যা দিয়ে ধিক্কৃত করলেন।[৮] তাঁর

এক কালের রাজনৈতিক অনুগামী এবং আইন ব্যবসায়ের শিষ্য মহম্মদ করীম চাগলা প্রকাশ্য বিবৃতিতে ভূতপূর্ব গুরুর সাম্প্রদায়িকতাবাদী মানসিকতার তীব্র সমালোচনা করলেন।

জিন্না দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকেরও প্রতিনিধি মনোনীত হয়েছিলেন এবং পূর্ব-বৎ পূর্ণোদ্যমে নানা উপসমিতির আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ফেডারাল স্ট্রাকচার উপসমিতিতে প্রস্তাবিত আইন সভার উভয় অংশের ক্ষমতা বণ্টন, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক কারণের জন্য দুটি "হাউস" রাখার যৌক্তিকতা, প্রস্তাবিত সংবিধানে রাজন্যবর্গের স্বার্থকে গুরুত্ব দেবার অযৌক্তিকতা, প্রস্তাবিত ফেডারেল সরকার ও প্রদেশের মধ্যে রাজস্ব বণ্টন, ফেডারেল আদালত প্রভৃতি বিষয়ে তিনি নিজ অভিমত ব্যক্ত করেন। ফেডারেল স্ট্রাকচার উপসমিতির ৪৫তম বৈঠকে প্রস্তাব করেন, "সংবিধান সম্পর্কে বা তার অন্তর্গত কোন বিষয়ে কোন রাজ্যের সঙ্গে মতদ্বৈধ হলে তার নিরাকরণ করবে ফেডারেল আদালত—প্রাদেশিক আদালতসমূহ নয়।"

পূর্বোক্ত সমিতির ১৬ই নভেম্বরের সভায় মন্তব্য করেন, "মুসলিম দাবিসমূহ এবং রক্ষাকবচগুলি সংবিধানের অঙ্গীভূত না হওয়া পর্যন্ত তা আমাদের নিকট গ্রহণীয় হবে না।" ২৬শে নভেম্বর ঐ উপসমিতির সভায় বলেন, "যতক্ষন না মুসলমানদের জন্য এমন রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করছেন যা তাঁদের মনে পরিপূর্ণ ভাবে নিরাপত্তা ও ভারত সরকারের ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্পর্কে বিশ্বাসের ভাব সৃষ্টি করে, এবং যতক্ষণ না আপনারা তাঁদের সহযোগিতা ও স্বেচ্ছামূলক স্বাকৃতি প্রাপ্ত হন, ততক্ষণ আপনারা ভারতবর্ষের জন্য যে সংবিধানই রচনা করুন না কেন, তা চব্বিশ ঘণ্টার বেশী কাজ করবে না।"

২৭শে নভেম্বরের সভায় উক্ত উপসমিতির সভাপতির সঙ্গে এই অভিযোগ করে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হন যে তিনি হিন্দু ঘেঁষা দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছেন। ইতিপূর্বে ১৪ই অক্টোবর সপ্রু ও গান্ধীর সঙ্গে এবং ২৩শে অক্টোবর জাফরুল্লা খাঁ ও স্যার শফীর সঙ্গেও উক্ত উপসমিতির বৈঠকে নানা প্রসঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়।[৯]

তবে প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের মত দ্বিতীয় বৈঠকেরও বাস্তবিক নায়ক জিন্না ছিলেন না। সে মর্যাদা পান ভারতবর্ষের অর্ধনগ্ন বিদ্রোহী ফকীর গান্ধী। তাঁর দিকেই সবার দৃষ্টি। সংবাদপত্র এবং এমন কি সাধারণ ব্রিটিশ নরনারী সবার সপ্রশংস দৃষ্টি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং ব্যবস্থাকে প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ প্রদানকারী গান্ধীর দিকে। স্বভাবতই জিন্নার অহমিকা এতে আহত হল।

প্রথম বৈঠকের মত দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকও একই কারণে অর্থাৎ প্রতিনিধি-

দের পরস্পরবিরোধী ভূমিকা ও দাবির জন্য সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে কোন সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান সূত্র আবিষ্কারে ব্যর্থ হয়। অবশ্য এই ব্যর্থতার বীজ প্রতিনিধি মনোনয়নের মধ্যেই নিহিত ছিল। উদাহরণ স্বরূপ কংগ্রেস ও গান্ধীর প্রয়াস সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের কোন প্রতিনিধিকে মনোনীত করা হয়নি, যদিও হিন্দুদের বিভক্ত করার জন্য তপশিলী সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক প্রতিনিধি ছিলেন এবং ভেদনীতিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে ডঃ আম্বেদকর তপশিলীদের জন্যও পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থার দাবি করেন। গোলটেবিল বৈঠক এবং সংবিধানসম্মত পন্থায় ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্তির ব্যর্থতার এক গুরুত্বপূর্ণ কারণ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের ভেদনীতি—এ সত্য পদে পদে লক্ষিত হবে।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক প্রসঙ্গে খলিকুজ্জমাঁর জবানীতে জিন্নার এক ভূমিকার কথা উল্লেখযোগ্য যদিও অপর কোন সূত্র থেকে তার প্রত্যক্ষ সমর্থনসূচক প্রমাণ মেলে না।[১০] খলিকুজ্জমাঁ বলেছেন: "মুসলমানরা কংগ্রেসের তাঁদের তরফ থেকে কথা বলার দাবি খণ্ডন করেছিলেন এবং নিজ দাবিতে অবিচল ছিলেন। এই ভাবে একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। কিছুদিন পর মিস্টার জিন্না আমাকে বলেছিলেন যে একটি পর্যায়ে এমন কি স্যার শফীও যৌথ নির্বাচনের প্রস্তাবে রাজী হয়েছিলেন যদি অবশ্য পাঞ্জাব ও বাংলায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিশ্চয়তা থাকে। তিনি জানান যে তিনি স্বয়ং এই প্রস্তাব নিয়ে গান্ধীজীর কাছে গিয়েছিলেন। কিন্তু মালব্যজী এবং অপরাপর হিন্দু ও শিখ প্রতিনিধিদের প্রতিরোধের ফলে গান্ধীজী হিন্দু ও শিখ জনমতের প্রকাশ্য অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে যাবার ব্যাপারে তাঁর অক্ষমতার কথা জ্ঞাপন করেন।"[১১]

কালে-ভদ্রে কোন কাজে ভারতবর্ষে যাওয়া ছাড়া ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ পর্যন্ত জিন্না বিলাতেই ছিলেন। এই সময়ে ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে ছিন্নভিন্ন মুসলিম লীগের নেতৃত্ব নিজের হাতে নিয়ে তার মাধ্যমে মুসলিম রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপায়নের জন্য জিন্নার কাছে যেসব নেতা আগ্রহ করতেন তার মধ্যে সস্ত্রীক লিয়াকৎ আলী খাঁ এবং আসামের আবদুল মতিন চৌধুরী প্রমুখ। কিন্তু ভারতবর্ষের তদানীন্তন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে হতাশ ও বীতশ্রদ্ধ জিন্নার মনে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কোন ইচ্ছা জাগেনি। তাঁর ঐ সময়কার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় আবদুল মতিন চৌধুরীকে লিখিত কয়েকটি পত্রে।[১২] ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ তাঁকে লেখেন:

"ওখানে আমি এখন কি যে করতে পারি তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। আপনি অতি সঙ্গত প্রস্তাবই করেছেন—আমার আইন সভায় প্রবেশ করা উচিত। কিন্তু সেখানেও যে খুব একটা কিছু করা যাবে এমন আশা করা যায় কি? এই সব প্রশ্নের কারণ আমার মনে এখনও এই ধারণা বিদ্যমান যে ভারতবর্ষে আমার সেবার কোন অবকাশ নেই। তবু আমাকে সখেদে এই কথার পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে যে হিন্দুরা সঠিক অবস্থা উপলব্ধি না করা পর্যন্ত ভারতবর্ষকে বাঁচাবার জন্য কিছু করার উপায় নেই।" ২৭শে এপ্রিল তাঁকে লেখেন, "আমাকে ভারতবর্ষে যেতে বলা হয়েছিল—কিন্তু কি করতে? নির্দিষ্ট কোন কিছু করার প্রস্তাব নেই। এছাড়া ওখানে এখন তেমন কিছু করারও নেই। মতপার্থক্য ও মতভেদ অনেক বেশী গভীর এবং প্রত্যহ এই বিভেদ আরও শোচনীয় রূপ ধারণ করছে। ভারতে জনমত বলে যেটুকু আছে তাও এলোমেলো। এখন বেশ কিছুদিন এ অবস্থার সংশোধন করা যাবে না।... লোকে বলে না—প্রতিটি দেশ নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী সরকার পায়। আমরাও এর ব্যতিক্রম নই।"

হিন্দু নেতৃত্বের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ জিন্না ক্রমশঃ নিছক মুসলমান নেতায় পর্যবসিত হচ্ছেন—তার নিদর্শনও এই সময়ে পাওয়া যায়। বোম্বের মুসলিম স্টুডেন্টস ইউনিয়নের যে বক্তৃতার প্রকাশ্য সমালোচনা চাগলা করেন, তার কথা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের দোসরা মার্চ আবদুল মতিন চৌধুরীকে যে "ব্যক্তিগত ও গোপনীয়" পত্র জিন্না লেখেন তাতেও এই মানসিকতার প্রতিচ্ছবি: "মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে।...হাতের তাস কিভাবে খেলতে হয় তা যদি মুসলমান নেতারা জানেন তাহলে নিঃসন্দেহে সম্প্রদায় যা চান তা পাবেন। আর এ চাহিদাও খুব একটা কিছু নয়।...কেন্দ্রেও দায়িত্ব নেওয়া হবে যদি আমরা যেসব রক্ষাকবচ চাই তা সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয়।" ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর আবদুল মতিন চৌধুরীকে যে সংক্ষিপ্ত চিঠিটি লেখেন তার শেষ ছত্রটি পরবর্তীকালে দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন রূপে প্রতিপাদিত হয়, "জনসাধারণই যখন বিভক্ত তখন আর কি আশা করা যেতে পারে? এ ভারতবর্ষের বিধিলিপি।"

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক থেকে প্রত্যাবর্তন করা মাত্র গান্ধী জানতে পারলেন যে সরকারী নীতির পরিবর্তন ঘটেছে—জওহরলাল, সীমান্ত গান্ধী প্রমুখ নেতারা আবার কারাগারের অন্তরালে। অনতিবিলম্বে গান্ধীও বন্দী হলেন এবং স্বভাবতই কংগ্রেস আবার যুদ্ধের পথ গ্রহণ করল। যেসব ভারতীয় নেতা কারাগারের বাইরে ছিলেন তাঁরা দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সাম্প্র-

দায়িক সমস্যার সমাধানের সূত্র খুঁজে বার করার যে চেষ্টা আরম্ভ করলেন, তার অন্যতম নিদর্শন হল ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের আগস্টে মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এলাহাবাদের ঐক্য সম্মেলন। এতে হিন্দু ছাড়াও লীগপন্থী ও জাতীয়তাবাদী মুসলমান এবং শিখ প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ সম্বন্ধে খলিকুজ্জমাঁ বলেছেন: "ঐক্য সম্মেলন যে প্রশ্নটি নিয়ে সর্বাগ্রে আলোচনা করে তা হল কেন্দ্রীয় সরকারে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব। হিন্দুরা শতকরা ২৫ ভাগ দিয়ে আরম্ভ করেন এবং শতকরা ৩২ ভাগ মেনে নেবার জন্য পাঁচদিন সময় নষ্ট করেন। মুসলমানরা তবুও অসন্তুষ্ট ছিলেন। এর পরদিন অর্থাৎ ১৭ই আগস্ট লণ্ডন থেকে রয়টার এক তারবার্তায় জানাল যে, বাঁটোয়ারার দ্বারা মুসলমানদের কেন্দ্রীয় পরিষদের শতকরা ৩৩⅓ ভাগ আসন দেওয়া হয়েছে এবং বোম্বাই থেকে সিন্ধুকে এক পৃথক প্রদেশে পরিণত করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে। সুতরাং ঐ সম্মেলনের কপাল পুড়ল।"[১৩]

সাম্রাজ্যবাদী ভেদনীতির এই ভূমিকা সম্বন্ধে প্যারেলালের মন্তব্যও প্রণিধানযোগ্য: "...এলাহাবাদের ঐক্য সম্মেলনে হিন্দু ও মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে প্রায় একমত হয়েছিলেন এবং সিন্ধুর পুনর্গঠন একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ অনির্ধারিত বিষয়রূপে বিবেচ্য ছিল। প্রস্তাব ছিল—সিন্ধুকে (বোম্বাই থেকে) পৃথক করে এক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে পরিণত করা হবে এবং পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থার বদলে যৌথ নির্বাচন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে। কিন্তু যে-মুহূর্তে সম্মেলনের মুসলমান প্রতিনিধিরা এই শর্তে যৌথ নির্বাচন-ব্যবস্থায় রাজী হয়েছেন যে সিন্ধুকে একটি পৃথক প্রদেশে পরিণত করা হবে, ভারত সচিব স্যর স্যামুয়েল হোর অস্বাভাবিক তৎপরতার সঙ্গে যৌথ নির্বাচন ছাড়াই ঐ দাবি মেনে নিলেন। এর পরিণামে ঐ সম্মেলন ব্যর্থ হল।"[১৪]

ম্যাকডোনাল্ডের ১৭ই আগস্টের ঘোষণায় এছাড়া প্রাদেশিক বিধানসভাসমূহে পাঞ্জাবে জমিদার ও তোমানদারদের প্রতিনিধিসহ মুসলমানদের এক ধরনের নামমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিলেও (জনসংখ্যার ভিত্তিতে মুসলমানদের শতকরা ৫৫ ভাগ আসন পাবার কথা) বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না দিয়ে ইউরোপীয়ান (জনসংখ্যার শতকরা ০.০১ ভাগের জন্য শতকরা ১০ ভাগ আসন) ও ইঙ্গ-ভারতীয়দের মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে তাদের জন্য ৩০টি আসন নির্ধারণ করা হয়। পাঞ্জাবে হিন্দুদের আসন জনসংখ্যার অনুপাতে হ্রাস করে শিখ ও অন্যান্য স্বার্থের পুষ্টিসাধন করা হয়। অনুরূপ ভাবে বঙ্গেও হিন্দুদের জন্য জনসংখ্যার ভিত্তিতে শতকরা

৪৪·৮ ভাগ আসন না দিয়ে ৩২ ভাগ আসন নির্ধারিত করা হয়। মুসলমানরা যেসব প্রদেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ, বিধান সভায় সেখানে তাঁদের জনসংখ্যার তুলনায় বেশী আসন দেওয়া হয় এবং সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে হিন্দুরাও জনসংখ্যার অনুপাতে বেশী আসন পান। এছাড়া অতঃপর কেবল শিখ ও ভারতীয় খ্রীষ্টানদের জন্যই পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থা করা হয়নি (ইউরোপীয়ান ও ইঙ্গ-ভারতীয়দের জন্য তো বটেই), হিন্দুদের থেকে তপশিলীভুক্ত জাতিদের পৃথক করে তাঁদের জন্যও পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থা করা হয়। সংক্ষেপে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঐক্যকে ছিন্নভিন্ন করার সম্ভাব্য সকল রকমের ব্যবস্থা করা হয়।

কারাপ্রাচীরের অন্তরালে বন্দী মহাত্মা গান্ধী তপশিলীভুক্ত জাতিদের হিন্দু-সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করার এই অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে আমরণ অনশন শুরু করে নিজের প্রাণকে বিপন্ন করেন। এর ফলে দেশে এক প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়। আম্বেদকর সহ তাবৎ হিন্দু নেতাদের ভিতর সংবুদ্ধি জাগ্রত হয় এবং তপশিলীভুক্ত জাতিদের জন্য সংখ্যার অনুপাতে অধিক সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থাযুক্ত তাঁদের "পুণা চুক্তি"র ফলে সরকার তাদের জন্য পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নেন।

ম্যাকডোনাল্ডের ঘোষণার যে ধারার (সংশ্লিষ্ট পক্ষরা যদি নিজেদের মধ্যে কোন বোঝাপড়ায় উপনীত হতে পারেন তাহলে তদনুসারে ঘোষণার প্রাবধানে পরিবর্তন করা যেতে পারে) পরিপ্রেক্ষিতে "পুণা চুক্তি" ও তপশিলীভুক্ত জাতিদের জন্য পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থা বর্জিত হয়েছিল, তদনুসারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতারা সকলের গ্রহণযোগ্য একটা সমাধানসূত্র খুঁজে বার করার জন্য তেসরা নভেম্বর এলাহাবাদে পণ্ডিত মালব্যের সভাপতিত্বে এক সম্মেলনে মিলিত হন। কয়েক দিনের চেষ্টায় এই সমাধানসূত্র স্বীকৃত হয় যে শর্তসাপেক্ষ যৌথ নির্বাচন-ব্যবস্থার বিনিময়ে মুসলমানদের কেন্দ্রীয় পরিষদে শতকরা ৩২ ভাগ আসন দেওয়া হবে এবং কেন্দ্র থেকে অতিরিক্ত রাজস্ব সহায়তা চাওয়া না হলে সিন্ধু এক পৃথক প্রদেশে পরিণত হবে। এ ছাড়া পাঞ্জাব ও বঙ্গে মুসলমানরা শতকরা ৫১ ভাগ আসন পাবেন এবং হিন্দুরা যেসব প্রদেশে সংখ্যালঘু সেখানে তাঁদের জন্য ম্যাকডোনাল্ডের ঘোষণার তুলনায় কিছু কিছু অধিক সংখ্যক আসন বরাদ্দ করা হবে। কিন্তু সম্মেলন চলাকালীন ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর ভারতসচিব স্যার স্যামুয়েল হোর ঘোষণা করেন যে কোন রকম শর্ত ছাড়াই তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে মুসলমানদের জন্য কেন্দ্রে শতকরা ৩৩⅓

ভাগ আসন এবং অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সাহায্যসহ সিন্ধুকে স্বতন্ত্র প্রদেশরূপে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং স্বভাবতই সাম্রাজ্যবাদী সরকারের চালের কাছে ভারতীয়দের অপর একটি ঐক্য-প্রয়াসও ব্যর্থ হয়ে গেল।

তৃতীয় বা শেষ গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের কোন প্রতিনিধি ছিলেন না। কংগ্রেস তখন আবার সরকারের সঙ্গে সংগ্রামরত এবং গান্ধী নেহরু আজাদ প্রমুখ নেতারা কারানির্বাসিত। জিন্নাও তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক থেকে নির্বাসিত—তাঁকে প্রতিনিধি রূপে মনোনীতই করা হয়নি। আগা খাঁ, জাফরুল্লা খাঁ, সপ্রু, জয়াকর, আম্বেদকর এবং পাত্র প্রমুখেরা যেখানে হার্ডিঞ্জ, আরউইন, অ্যাটলী ও জেটল্যাণ্ড প্রভৃতির সঙ্গে ভারতের সাংবিধানিক প্রশ্ন নিয়ে পাঞ্জা লড়ছেন, জিন্নাকে সেখানে সুপরিকল্পিত ভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। এমন কি লিনলিথগোর সভাপতিত্বে গঠিত পার্লামেণ্টের জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতেও তাঁকে আহ্বান করা হয়নি। এই উপেক্ষা জিন্নার অহমিকাকে নিঃসন্দেহে প্রবল ভাবে আঘাত করে থাকবে। তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকের অবসানে (২৪শে ডিসেম্বর ১৯৩২) আসন বণ্টন সম্বন্ধে ভারত সচিব যে ঘোষণা করেন তার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঐ বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে শাসন-সংস্কারের আইন রচিত হতে কিন্তু আরও আড়াই বছর সময় লাগল। ভারত সচিব এতদসংক্রান্ত শ্বেতপত্র ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে পার্লামেণ্টে পেশ করলেন এবং ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে নূতন ভারত-শাসন আইন বিধিবদ্ধ হল।

॥ ১৩ ॥

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জিন্না ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করলেন। তবে প্রথমেই একেবারে স্থায়ীভাবে নয়। বেশ কিছুদিনের জন্য মাঝে মাঝে লণ্ডনে ফিরে গেছেন। তারপর পাকাপোক্ত ভাবে আবার বোম্বেতে বসতি।

দেশে ফেরার কারণ হিসাবে তাঁর গুণগ্রাহী এবং অনুগামী সস্ত্রীক লিয়াকৎ আলী খাঁ এবং আবদুল মতিন চৌধুরীর প্রয়াসের কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের এবং অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত ও শক্তিহীন মুসলিম লীগের কিছু কিছু নেতার জিন্নার কাছে ঐ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হাতে নিয়ে মুসলমানদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেবার আবেদন অবশ্যই তাঁর মনে সাড়া জাগিয়েছিল। উদ্ধারকর্তা হবার বাসনা সুযোগ পেলে কার মনেই না জাগে? অপর একটি সম্ভাব্য কারণ—তাঁর পিছনে

কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং জনমতের সমর্থন আছে, এর নিদর্শন পেশ করা। তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে এবং জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটির সামনে তাঁর উপেক্ষা হয়ত তাঁকে এইভাবে শক্তিসম্পন্ন হবার জন্য উদ্বুদ্ধ করে থাকবে। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষে অনুষ্ঠিত কলকাতার সর্বদলীয় সম্মেলনে তিনি কার প্রতিনিধি—এ প্রশ্ন তাঁর বিরোধীরা তুলেছিলেন। তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে অনিমন্ত্রিত থাকার আঘাত হয়ত তাঁর মনে সেই পুরাতন ক্ষতের স্মৃতি জাগিয়ে তুলেছিল। বার বার একই কারণে আঘাত পাওয়া স্বভাবতই তিনি এড়াতে চাইবেন। এছাড়া আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল তাঁর বিলাত ছাড়ার। এ সম্বন্ধে তাঁর এক কালের জুনিয়ার ব্যারিস্টার চাগলা লিখেছেন, "প্রিভি কাউন্সিলে তাঁর আশানুরূপ পশার জমেনি। কারণ মূলতঃ তিনি আইনজ্ঞের (lawyer) বদলে উকিল (advocate) ছিলেন। আর প্রিভি কাউন্সিলে সবল ব্যক্তিত্ব ও অপরকে স্বমতে আনার মত ওকালতীর ক্ষমতার অতিরিক্ত কিছু চাই।"[১]

তাঁর দেশে ফেরার পূর্বে মুসলিম লীগের বিবদমান দুই গোষ্ঠীর নেতারা (পেশওয়ারের মিঞা আবদুল আজীজ ও খাঁ বাহাদুর হাফিজ হিদায়েৎ হোসেন) পৃথক পৃথক ভাবে নিজ গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য সমাপ্ত করে জিন্নার সভাপতিত্বে (মার্চ মাসে জিন্না লীগের স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন) পুনর্গঠিত লীগের অঙ্গীভূত হয়ে যান। জিন্না দিল্লীতে ঐক্যবদ্ধ লীগ কাউন্সিলের সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক বিপুল ভাবে সংবর্ধিত হন। সভাশেষে এক সংবাদপত্র প্রতিনিধির কাছে বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, "লীগ বেশ স্বাস্থ্যসম্পন্ন ও সুস্থই আছে। আর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে ভারতের স্বার্থ সাধনের জন্য মুসলমানরা আর সব সম্প্রদায়ের তুলনায় পিছিয়ে থাকবে না।" ছিন্নভিন্ন লীগের কর্মীদের মধ্যে আত্ম-বিশ্বাস জাগ্রত করে তাঁদের বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানের নূতন কর্ণধারের পক্ষে এজাতীয় উক্তি করাই স্বাভাবিক। তাই পূর্বোক্ত বিবৃতিতে তিনি বললেন, "আমরা কি এই শেষ মুহূর্তেও লড়াই শেষ করতে পারি না এবং প্রত্যাসন্ন বিপদের সামনেও কি অতীত বিস্মৃত হওয়া একেবারেই অসম্ভব ?" দেশবাসীর বিবেকের কাছে পূর্বোক্ত আবেদন জানিয়ে তিনি নিজের বিশ্বাসের পুন-রুক্তি করলেন: "...হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পূর্ণ সহযোগিতা ও মৈত্রী স্থাপনার চেয়ে আর কোন কিছু আমার কাছে তেমন সুখকর নয় এবং আমার এই বাসনা-পূর্তির ব্যাপারে আমার মনে হয় মুসলমানদের অবিচল সমর্থন রয়েছে।...জাতীয় স্বায়ত্ত-শাসনের দাবি জ্ঞাপন করার ব্যাপারে মুসলমানরা অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায়

কোন অংশে পিছিয়ে নেই। সুতরাং মোদ্দা প্রশ্ন হল : মুসলমানদের আমরা কি পূর্ণতঃ ভরসা দিতে পারি যে তাঁরা যে সমস্ত রক্ষাকবচের উপর এতটা গুরুত্ব দেন, সেগুলি ভারতবর্ষের সংবিধানে স্থান পাবে ?"[২]

লক্ষণীয়, ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দেও ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কথা তিনি অন্ততঃ বলছেন না। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ঐ বছরের সেপ্টেম্বর মাসেও তিনি বলেছেন যে, "আমি প্রথমে ভারতবাসী, তারপর মুসলমান।"[৩] এর পাঁচ মাস পরও ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে তিনি নিজের বিশ্বাসের পুনরুক্তি করে বলেছিলেন, "...হিন্দু ও মুসলমানরা যত দিন না ঐক্যবদ্ধ হয় ততদিন ভারতবর্ষের পক্ষে আশার কিছু নেই—একথা আপনাদের বলতে পারি এবং আমরা (উভয় সম্প্রদায়ই) বিদেশী প্রভুত্বের অধীন থাকব।"[৪] সে সময় পর্যন্ত তিনি যা চাইছেন তা হল মুসলমানদের জন্য কিছু কিছু রক্ষাকবচ এবং ভবিষ্যৎ সংবিধানে তার স্থায়ী স্বীকৃতি। তবে এসময়ে এটাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তাঁর গোলটেবিল বৈঠকের ভূমিকা অনুসরণে জিন্না ভারতের রাজনীতিতে কেবল মুসলমানদের নেতা—তাদের স্বার্থের সংরক্ষক। এ সম্বন্ধে চাগলা লিখেছেন, "এই সময়ে হাইকোর্টের বার লাইব্রেরীতে তাঁর সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছিল, তার কথা মনে পড়ছে। মুসলিম লীগকে পুনর্জীবিত করার জন্য তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে কাজ করতে বলেছিলেন। আমি জবাব দিয়েছিলাম যে সেটা অসম্ভব। আমি এও বলেছিলাম আমাদের যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আসলে কাজ করা উচিত তা হল হিন্দু ও মুসলমানদের নিয়ে এক সম্মিলিত রাজনৈতিক দল গঠন এবং এই দল কংগ্রেস এবং (হিন্দু) মহাসভার মাঝামাঝি থেকে কাজ করবে। ...জিন্না উত্তরে বলেছিলেন যে আমি আদর্শবাদী কিন্তু তাঁকে কাজ করতে হবে তাঁর আশেপাশে যেসব উপাদান রয়েছে তার সহায়তায়। সেই সময়ে আমার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে সাম্প্রদায়িক মঞ্চ থেকে কাজ করা এবং সাম্প্রদায়িক পদ্ধতির সহায়তায় নিজের নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে তিনি মনঃস্থির করে ফেলেছেন।"[৫]

নির্বাচনে প্রথম অংশগ্রহণ করা অবধি জিন্না কেন্দ্রীয় পরিষদে বোম্বাই-এর মুসলমান আসনের প্রতিনিধি এবং তিনি বিলাতে থাকলেও ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী ঐ একই আসন থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য তাঁর বন্ধুরা তাঁর কাছ থেকে মনোনয়নপত্র ইত্যাদি আনিয়ে দাখিল করেছেন।[৬] এছাড়া ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় কংগ্রেস ছাড়ার পর থেকে যে রাজনৈতিক দল তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে, নূতন করে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে আবার স্থান করে নেবার জন্য তার

ভরসা ছেড়ে ঐ বয়সে (৫৮ বছর) আর কোথাও যাবার ব্যাপারে ঝুঁকি না নেবারই কথা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজের নিরাপত্তার জন্য তাঁর মুসলিম সাম্প্রদায়িক স্বার্থের প্রবক্তা হওয়াই স্বাভাবিক।

যাই হোক, পূর্বোক্ত এক অনুচ্ছেদে সংবাদপত্র প্রতিনিধির কাছে বিবৃতি দান প্রসঙ্গে জিন্না যে "আসন্ন বিপদের" প্রতি সঙ্কেত করেছিলেন, তার প্রতি এবার দৃষ্টিপাত করা যাক। এই বিপদ হল নূতন ভারতশাসন আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে যে শ্বেতপত্র বিবেচিত হচ্ছিল এবং যা অবলম্বন করে শীঘ্রই ভারতের কেন্দ্রীয় পরিষদে প্রস্তাব উঠবে তার ধারাগুলি। ম্যাকডোনাল্ডের বাঁটোয়ারায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত আসন সংখ্যা ঘোষণা করে দেশবাসীর মনোযোগ ভিক্ষান্ন নিয়ে টানাহেঁচড়ার উদ্দেশ্যে নিয়োগ করলেও যে শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা উঠেছিল তাতে ভারতবাসীর হাতে সত্যকার ক্ষমতা হস্তান্তরের ইচ্ছার কোন প্রতিফলনই ছিল না। ভোটার হবার যোগ্যতা ছিল সীমাবদ্ধ এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ছোটলাট বা বড়লাটের অনুগ্রহে কাজ করবেন। ফলত ক্ষমতা ব্রিটিশরাজের হাতে ন্যস্ত থাকবে।

বলা বাহুল্য দেশের যাবতীয় রাজনৈতিক দল সহ লীগ এবং জিন্নাও শ্বেতপত্রের এই অগণতান্ত্রিক প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। ইতিমধ্যে নভেম্বরে জিন্না বোম্বাই-এর মুসলিম আসন থেকে কেন্দ্রীয় পরিষদে পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন এবং পূর্ববৎ নানা সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিয়ে গঠিত তাঁর ইণ্ডিপেনডেন্ট গোষ্ঠীর নেতাও হয়েছেন। সুতরাং শ্বেতপত্রের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কনস্‌টিটিউশনালিস্ট জিন্না কেন্দ্রীয় পরিষদরূপী চমৎকার মঞ্চ পেয়ে গেলেন।

তবে সে সম্বন্ধে বলার পূর্বে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। কারণ পরবর্তীকালের ভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান। বাঁটোয়ারায় জনসংখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যযুক্ত আসন নির্ধারিত না হওয়ায় ভারতবর্ষের কোন সম্প্রদায় অথবা তার নেতারা সন্তুষ্ট ছিলেন না। পক্ষান্তরে এর ভিত্তিতে আসন্ন নির্বাচনরূপী প্রলোভন উপস্থিত করে সাম্রাজ্যবাদ তার অভিসন্ধি—ভারতবাসীদের মধ্যে এই নিয়ে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও বিবাদ খাড়া করার ব্যাপারেও কৃতকার্য হয়েছিল। সুতরাং অধিক সংখ্যক ভারতবাসীর নৈতিক সমর্থনপ্রাপ্ত সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের পক্ষে এ ব্যাপারে মনঃস্থির করা সহজ হয়নি। নানা স্বার্থের আকর্ষণ-বিকর্ষণে বিব্রত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি অবশেষে বোম্বেতে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৭-১৮ জুন মিলিত হয়ে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে

"না গ্রহণ না বর্জন" নীতি গ্রহণ করে।

কংগ্রেসের পার্লামেণ্টারী বোর্ডের তদানীন্তন সভাপতি মালব্যজী এবং পার্লামেণ্টারী বোর্ড ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মাধব শ্রীহরি আনে ওয়ার্কিং কমিটির এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। কারণ তাঁদের মতে এতে হিন্দুস্বার্থ মারাত্মক ভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। এর প্রতিবাদে তাঁরা নিজ নিজ পদ থেকে ইস্তফা দেন এবং এমন কি গান্ধীজী কর্তৃক উদ্ভাবন করা এক ফর্মুলায় তাঁদের এবং তাঁদেরই মত অপরাপর কংগ্রেস নেতাদের বিবেকের অনুশাসনে চলার ছাড দেওয়া সত্ত্বেও তাঁরা পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারে সম্মত হননি। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি অত্যন্ত খেদের সঙ্গে তাঁদের পদত্যাগ গ্রহণ করে যে উচ্চ নৈতিক কারণে তাঁরা পদত্যাগ করেছেন, তার প্রশংসা করে। এর পর ১৮-১৯ আগস্ট তাঁরা কলকাতায় সমভাবে ভাবিত কংগ্রেস কর্মীদের এক সভা আহ্বান করে আইন সভার ভিতরে এবং বাইরে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা এবং শ্বেতপত্রের প্রস্তাবসমূহের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কংগ্রেসেরই আদর্শে এক নূতন দল গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৭] প্রত্যুতঃ ঐ (কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী) দল পৃথক ভাবে কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং এর ১১ জন নির্বাচিত সদস্য সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ছাড়া আর সব প্রশ্নে কংগ্রেসের (বা স্বরাজ্য দলের, কারণ কংগ্রেসের পার্লামেণ্টারী কার্যকলাপ ঐ নামেই চলত) ৪৪ জন সদস্যের সঙ্গেই মিলেমিশে কাজ করতেন।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা দ্বারা সাম্রাজ্যবাদ অপর এক ক্ষেত্রেও ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে ক্ষীণবল করার ব্যাপারে সাফল্য লাভ করে। কেন্দ্রে এবং মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশসমূহে মুসলমানদের জন্য আইনসভার আসনে জনসংখ্যার তুলনায় অধিক আসন বরাদ্দ করায় এবং হিন্দুরা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হওয়ায় রাজনৈতিক চেতনাযুক্ত মুসলিম জনমত বাঁটোয়ারার সপক্ষে চলে যায়। বাঁটোয়ারার প্রতি কংগ্রেসের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী সত্ত্বেও কংগ্রেস নেতৃত্বের অধিকাংশ হিন্দু হওয়ায় রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মুসলিম জনমত নূতন করে কংগ্রেস বিরোধী হয়ে ওঠে। এর পরিণামে একদিকে জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা কংগ্রেসের হিন্দু নেতাদের একাংশের চোখে সন্দেহের পাত্র হয়ে পড়েন এবং অন্যদিকে তাঁদের পক্ষে মুসলিম প্রতিষ্ঠানের প্রার্থী হিসাবে ছাড়া আসন্ন নির্বাচনে জয়ী হবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হয়।

রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মুসলিম জনমতের ইচ্ছা—মুসলিম স্বার্থে মুসলিম ভোট যেন ভাগ হয়ে না যায়—এর মর্যাদা রাখতে মুসলিম ইউনিটি বোর্ড কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচনে উত্তর ভারতের বহু মুসলমান আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং

কোথাও কোথাও মুসলিম লীগের বিরোধিতা সত্ত্বেও মোট এক-তৃতীয়াংশ আসনে সাফল্য অর্জন করে। তবে বোর্ড জিন্নার বিরুদ্ধে কোন প্রার্থী দেয়নি এই যুক্তিতে যে কংগ্রেসও মালব্য ও আনের বিরুদ্ধে দলীয় প্রার্থী দাঁড় করায়নি। যাই হোক, কোন মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এযাবৎ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এমন সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়নি। মুসলিম ইউনিটি বোর্ডের সদস্যরা তাঁদের জাতীয়তাবাদী চারিত্র-ধর্মের অনুসরণে কেন্দ্রীয় পরিষদে কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে মোটামুটি কংগ্রেস ও স্বরাজ্য দলের সঙ্গে সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দিলেও পরে আমরা দেখব যে এই বোর্ড মুসলিম লীগে আত্মবিসর্জন করে কংগ্রেস ও মুসলমানদের সঙ্গে বিচ্ছেদ প্রায় সম্পূর্ণ করে। জিন্না অবশ্য যথারীতি স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন এবং ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় পরিষদে তাঁর নেতৃত্বাধীন ২২জনের ইণ্ডিপেনডেণ্ট পার্টিতে মুসলমান ছাড়াও অন্য সম্প্রদায়ের সদস্যরাও ছিলেন।

ফেব্রুয়ারী মাসে জিন্না কেন্দ্রীয় পরিষদে নূতন ভারত শাসন আইন সংক্রান্ত শ্বেতপত্র সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনটি ধারাযুক্ত নিম্নোক্ত মর্মের সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন:

"১. সম্বন্ধিত বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক এর কোন বিকল্প সম্বন্ধে সহমত না হওয়া পর্যন্ত এই পরিষদ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা মেনে নিচ্ছে।

"২. প্রাদেশিক সরকারসমূহের পরিকল্পনা সম্বন্ধে এই সভার (House) অভিমত এই যে তা একান্তভাবে অসন্তোষজনক এবং হতাশাব্যঞ্জক। কারণ এতে একাধিক অসন্তোষজনক ধারা রয়েছে। বিশেষ করে দ্বিতীয় চেম্বার, গভর্নরদের অসাধারণ ও বিশেষ ক্ষমতাবলী, পুলিস আইন সম্পর্কিত ধারাসমূহ এবং গুপ্তচর বিভাগসমূহ। এর ফলে প্রশাসক ও আইনসভার যথার্থ নিয়ন্ত্রণ ও দায়িত্ব শিথিল হয়ে পড়ে। তাই যতক্ষণ না এইসব আপত্তিকর দিকগুলি বিদূরিত হচ্ছে প্রাদেশিক সরকারের পরিকল্পনা ভারতীয় জনমতের কোন অংশকেই সন্তুষ্ট করতে সমর্থ হবে না।

"৩. কেন্দ্রীয় সরকার বা নিখিল ভারত ফেডারেশন গঠনের পরিকল্পনা সম্বন্ধে এই সভার সুস্পষ্ট অভিমত হল এই যে ব্রিটিশ ভারতের অধিবাসীদের কাছে এটা মূলতঃ খারাপ এবং সম্পূর্ণরূপে গ্রহণের অযোগ্য। এই সভা তাই ভারত সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছে যে তার তরফে মহামান্য সম্রাটের সরকারকে যেন পরামর্শ দেওয়া হয় এই পরিকল্পনার ভিত্তিতে কোন আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা যেন না করা হয়। এই সভা ভারত সরকারের কাছে এই আবেদনও জানাচ্ছে যে কেবল ব্রিটিশ

ভারতে যাতে যথার্থ ও পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে বিবেচনা করার জন্য যেন অবিলম্বে প্রয়াস শুরু করা হয় এবং এই উদ্দেশ্যে আর কাল হরণ না করে ভারতীয় জনমতের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সমগ্র পরিস্থিতির পর্যালোচনা করার ব্যবস্থা করা হয়।”[৮]

আরও একাধিক সংশোধনী প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও কুশাগ্র রাজনৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন আইনজ্ঞ জিন্নার সংশোধনী প্রস্তাবই গৃহীত হয়। এর কারণ হল এই যে ভোটের জন্য প্রস্তাবটির প্রথম ধারাটিকে অপর দুটি ধারা থেকে পৃথক করা হয়। কংগ্রেসের সংশোধনী প্রস্তাব নিজ দলের ৪৪ জন সদস্য ছাড়া আর কারও সমর্থন না পেয়ে বাতিল হয়ে যায়। তাই স্বভাবতই কংগ্রেস সদস্যরা জিন্নার সংশোধনী প্রস্তাবের প্রথম ধারার উপর ভোট গ্রহণের সময় নিরপেক্ষ থাকেন এবং সরকারী ও নির্বাচিত ইউরোপীয় সদস্যদের সমর্থন পেয়ে তা স্বীকৃত হয়। এইভাবে পাকেপ্রকারে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা আইনসভার স্বীকৃতিলাভে সমর্থ হয়। আবার সরকারী সদস্যরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধারার বিরুদ্ধে ভোট দেন এবং এবার কংগ্রেস সদস্যরা জিন্নার সংশোধনী প্রস্তাবের ঐ অংশের সমর্থন করায় তা সহজে গৃহীত হয়ে যায়। এই সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করানো এবং সেই উপলক্ষে কেন্দ্রীয় পরিষদে তাঁর বক্তৃতা পার্লামেণ্টারিয়ান হিসাবে তাঁর সাফল্যের অন্যতম নিদর্শন।

এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তৃতার অংশবিশেষ উল্লেখনীয় :

“আমার সংশোধনী প্রস্তাবে···সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়সমূহ কর্তৃক এর কোন বিকল্প স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। সম্ভবতঃ আমাদের হিন্দু বন্ধুরা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় সন্তুষ্ট নন। তবে এর সঙ্গে সঙ্গে এই সভাকে জানিয়ে দিতে চাই যে মুসলমান বন্ধুরাও এর প্রতি সন্তুষ্ট নন।··· আর ব্যক্তিগতভাবে বলতে গেলে বলব যে আমরা যতক্ষণ আমাদের নিজেদের পরিকল্পনা রচনা করতে না পারছি ততক্ষণ আমার আত্মমর্যাদার সন্তুষ্টি কোনমতেই হবে না।···তাহলে কেন আমি এই পরিকল্পনাকে স্বীকার করে নিচ্ছি?···এইজন্য আমি স্বীকার করছি যে একটা পারস্পরিক বোঝাপড়ায় উপনীত হবার জন্য যা কিছু করা দরকার এযাবৎ আমরা তা করেছি।···সুতরাং আমি পছন্দ করি আর না-ই করি আমি একে স্বীকার করে নিয়েছি। কারণ একে স্বীকার করে না নিলে সংবিধান অনুসারী কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারে না।···প্রশ্নটি সংখ্যালঘু সম্পর্কিত এবং বিষয়টি রাজনৈতিক।···সংখ্যালঘু বলতে একাধিক বিষয়ের সমাহার বোঝায়। কোন কোন ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের দেশের অন্যান্য নাগরিকদের থেকে ভিন্ন

ধর্ম থাকে। তাঁদের ভাষা পৃথক হতে পারে। জাতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকতে পারে। আর ধর্ম সংস্কৃতি জাতি ভাষা চারুকলা সঙ্গীত এবং ঐ জাতীয় আরও অনেক উপাদানের সম্মিলনে কোন রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের পৃথক অস্তিত্বের ভিত্তি রচিত হয়। তখন সেই পৃথক সত্তা নিজের জন্য রক্ষাকবচ দাবি করে। সুতরাং নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক প্রশ্ন হিসাবে এই সমস্যার সম্মুখীন হওয়া উচিত। এ প্রশ্নকে এড়িয়ে গেলে চলবে না, এর সমাধান করতে হবে।"[৯]

জিন্নার বক্তৃতার উপরোক্ত অংশে স্পষ্ট হয়েছে যে তিনি নূতন ভারত শাসন আইনের সপক্ষে ছিলেন না। কেন্দ্রীয় পরিষদের পরবর্তী কালের বক্তৃতাতেও তাঁর একই অভিমতের প্রতিধ্বনি শোনা যায়ঃ

"আমি বিশ্বাস করি যে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের অভিমুখে প্রগতি করার ব্যাপারে ব্রিটিশ ভারত গত ৫০ বছর যাবৎ যা কিছুর প্রতীক এবং যা কিছুর বিকাশ সাধন করেছে এটা তার সে সব কিছুকে জলাঞ্জলি দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। কোন প্রদেশের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়নি। প্রস্তাবিত শর্তে দেশীয় রাজন্যবর্গ কেন্দ্রীয় ফেডারেশনের অঙ্গীভূত হতে চান কি না সে বিষয়ে ব্রিটিশ সরকার কোন নৃপতির সঙ্গে পরামর্শ করেননি। আমার আপত্তির অপর একটি কারণ হল এই যে এই পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়া সম্ভব নয়।"[১০]

এপ্রিলের শেষভাগে তিনি আর এক দফা দীর্ঘ সময় (অক্টোবরের শেষ ভাগ পর্যন্ত) বিলাতে ঘুরে এসে মুসলিম লীগকে শক্তিশালী করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এদিকে বর্ষাকালে তাঁর বিলাতে থাকাকালীন নূতন ভারতশাসন আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রসঙ্গ শেষ করার পূর্বে ঐ বছরের গোড়ার দিকে (২৩শে জানুয়ারী থেকে মাঝখানে সাময়িক বিরতি ছাড়া ১লা মার্চ পর্যন্ত) কংগ্রেস সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানসূত্র খুঁজে বার করার জন্য জিন্নার আলোচনার কথা উল্লেখযোগ্য। সীতারামাইয়ার মতে এ আলোচনা, "কোন নির্দিষ্ট পরিণাম বিনাই সমাপ্ত হয় এবং দেশবাসীর মনে এর জন্য প্রভূত হতাশার সৃষ্টি হয়।"[১১] কংগ্রেসের সরকারী ইতিহাসকার এত সংক্ষেপে বিষয়টির উল্লেখ শেষ করলেও ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ জিন্না ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ কোন বোঝাপড়ায় উপনীত হতে পারলে কেন্দ্রীয় পরিষদে নূতন ভারতশাসন আইন সম্পর্কিত বিতর্কে তার প্রতিফলন হত এবং প্রত্যুত এই উদ্দেশ্যেই ডাঃ আন্সারীর উদ্যোগে তাড়াহুড়ো করে দিল্লীতে এই আলোচনার আয়োজন করা হয়েছিল।

জিন্নাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ—এমন কি কেন্দ্রীয় পরিষদের বিতর্ক ও আগা খাঁর নিমন্ত্রণ বাদ দিয়ে এই আলোচনায় সাগ্রহে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

যাই হোক এ সম্বন্ধে কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিজের বক্তব্য[১২] শোনা যেতে পারে। তিনি জানিয়েছেন যে উভয়ে এই বিষয়ে রাজী হন যে ম্যাকডোনাল্ড রোয়েদাদে মুসলমানদের জন্য যে আসন সংখ্যা নির্ধারিত হয়েছে, যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে তা বজায় রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে মুসলমান ভোটারদের যোগ্যতার মান শিথিল করতে হবে। কিন্তু জিন্না দাবি করলেন যে এ প্রস্তাবে পণ্ডিত মালব্যেরও সম্মতি চাই। রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই যুক্তি দেখিয়ে এ দাবি মেনে নিতে নিজের অসমর্থতা জ্ঞাপন করলেন যে এ আলোচনা কংগ্রেস ও লীগের সভাপতিদের মধ্যে হচ্ছে বলে তৃতীয় কোন দলের নেতার সম্মতির নিশ্চয়তা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এছাড়া জিন্নার এই দাবিও কংগ্রেস সভাপতির পক্ষে স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব হয়নি যে মুসলিম লীগই মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান। জিন্নার অন্যতম জীবনীকার সঈদ এ সম্বন্ধে বলেছেন, "এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না যে মুখ্য অংশগ্রহণকারী রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও মহম্মদ আলী জিন্না তাঁদের আলোচনাকে সফল পরিণতিতে পৌঁছে দেবার জন্য উৎসুক ছিলেন। অধিকাংশ কংগ্রেস কর্মী এবং মুসলিম লীগের দক্ষিণপন্থী অংশেরও সেই ইচ্ছা ছিল। অবিশ্বাস ছিল পাঞ্জাব ও বঙ্গের হিন্দুদের মধ্যে! আর শিখরা ছিলেন বাঁটোয়ারার তীব্রতম সমালোচক।"[১৩]

রাজেন্দ্রপ্রসাদের আপত্তির কারণ দুটি একটু খতিয়ে বিচার করা যেতে পারে। এই অধ্যায়েই আমরা দেখেছি যে হিন্দুদের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে পণ্ডিত মালব্য কংগ্রেস ছেড়ে তাঁর কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী দল প্রতিষ্ঠা করে স্বতন্ত্রভাবে কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও কি ভাবে তিনি ও তাঁর দল প্রত্যুত কংগ্রেসেরই উপদল হিসাবে কাজ করছিলেন। হিন্দু মহাসভার সঙ্গে মালব্যজীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথাও সর্বজনবিদিত এবং মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারেও ঐ প্রতিষ্ঠানের আপোস-বিরোধী ভূমিকার কথাও কোন গোপন তথ্য ছিল না। সুতরাং কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় পুষ্ট হিন্দু মহাসভা প্রভাবিত নেতার ভবিষ্যৎ ভূমিকা সম্বন্ধে নিশ্চয়তার দাবি করে জিন্না খুব একটা অযৌক্তিক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন —এমন কথা বলা যায় না। জিন্নার দ্বিতীয় দাবি সম্বন্ধে এই মন্তব্য করাই যথেষ্ট যে যদিও কাগজেকলমে তা মেনে নেওয়া জাতীয়তাবাদের ভূমিকা সমন্বিত কংগ্রেসের পক্ষে আত্মহত্যারই সমতুল্য, তবু অতীতে (এবং প্রকারান্তরে ভবিষ্যতেও)

কংগ্রেস মুসলিম লীগকে বারবার কার্যতঃ এই মর্যাদাই দিয়ে এসেছিল এবং ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের আইন অনুযায়ী প্রাদেশিক বিধানসভাসমূহের যে নির্বাচন হয়েছিল তাতে যে রাজনৈতিক দল মুসলমানদের সর্বাধিক সমর্থন পায় তা হল মুসলিম লীগ।

॥ ১৪ ॥

১৯৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দ ভারতবর্ষের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে জিন্নার জীবনেও এক সংক্রান্তি-কাল। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা এবং ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারতশাসন আইনে তার সমাবেশ নির্ধারিত আসন-সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের—বিশেষ করে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস সৃষ্টি করেছে। এক সম্প্রদায়ের নেতারা অপরাপর সম্প্রদায়ের নেতাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সমালোচনায় অবতীর্ণ। সাম্রাজ্যবাদী কৌশলের ফলে ম্যাকডোনাল্ডের প্রস্তাবের সংশ্লিষ্ট পক্ষের সম্মতিভিত্তিক বিকল্প খুঁজে পাবার সম্ভাবনা তিরোহিত। এই পরিবেশে প্রাদেশিক আইনসভাসমূহের নির্বাচন প্রত্যাসন্ন হয়ে ওঠে। এর সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতার ছিটেফোঁটা প্রাপ্তির সম্ভাবনায় এই "গৃহবিবাদ"ও তুঙ্গে ওঠার উপক্রম হয়।

তবে নির্বাচন প্রসঙ্গে যাবার পূর্বে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জিন্নার অপর ক্ষেত্রস্থ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কৃতির উল্লেখ করা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় আইনসভায় বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া ছাড়াও লাহোরে গিয়ে শহীদগঞ্জে মসজিদের কর্তৃত্ব নিয়ে মুসলমান ও শিখ সম্প্রদায়ের আন্দোলন যে বিস্ফোরক স্থিতিতে উপনীত হচ্ছিল, তার উপশমে জিন্না অশেষ পরিশ্রম করেন। জিন্নার এক জীবনীকারের (হেক্টর বলিথো) মতে এই উপলক্ষে তিনি জীবনে সর্বপ্রথম সাধারণ মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি পুনঃস্থাপনার এই মিশনে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্বসম্প্রদায়ের সদস্যদের আন্দোলনের পথ ছেড়ে বৈধানিক পথ ও আইনের সহায়তা গ্রহণ করার পরামর্শ দেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেন, "অপর এক ভ্রাতৃস্থানীয় সম্প্রদায়ের নিরন্তর বিরোধিতা করা অথবা তাঁদের উপর চাপ দেবার কোন প্রশ্ন ওঠে না। অতাতে তাঁরা আমাদের বিরুদ্ধে লড়েছেন এবং আমরাও তাঁদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। কিন্তু শিখেরা এক মহৎ সম্প্রদায়। তাই তাঁদের সঙ্গে কোন সম্মানজনক আপোস নিষ্পত্তির মত অপর কিছুই আমাকে অত সন্তুষ্ট করতে পারবে না এবং এই উদ্দেশ্যে আমরা যে-কোন রকমের প্রয়াস করতে প্রস্তুত আছি।"[১]

সাম্প্রদায়িক বিবাদে জিন্নার মধ্যস্থতা করার প্রয়াস বহুলাংশে সফল হয় এবং

পাঞ্জাবের ছোটলাট তাঁর প্রচেষ্টার প্রকাশ্য প্রশংসা করে বলেন, "অবস্থার উন্নতিসাধনে শ্রীযুক্ত জিন্না যে প্রচেষ্টা করেছেন, তার জন্য আমি তাঁর কাছে অতীব কৃতজ্ঞ। তিনি যে কাজ করেছেন এবং এখনও করছেন তার জন্য আমি তাঁকে ভূয়সী প্রশংসা জানাই। শ্রীযুক্ত জিন্না তাঁর প্রথম দায়িত্ব সাফল্য সহকারে পালন করেছেন এবং মুসলমানদের আন্দোলনকে একান্তভাবে বৈধানিক এবং আইননির্ভর পথে নিয়ে এসেছেন। এইভাবে তিনি সরকার যে পদক্ষেপ নেবার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় ছিল তা সম্ভবপর করে তুলেছেন।"[২]

এপ্রিলের প্রথম ভাগে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জমায়েৎ-উল-উলেমা-ই-হিন্দের সম্মেলনে পুনর্গঠিত লীগের নেতা হিসাবে জিন্না আসন্ন নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধে নিজের ধারণা ব্যক্ত করেন।[৩] তখন তিনি একান্তভাবেই মুসলিম স্বার্থের প্রবক্তা (ঐ বক্তৃতায় তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের পৃথকভাবে সংগঠিত হবার পরামর্শ দেন কারণ "একবার উভয়েই সংগঠিত হলে, তারা পরস্পরকে ভাল করে বুঝবে এবং সে অবস্থায় আমাদের বোঝাপড়ায় উপনীত হবার জন্য বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হবে না।") এবং সম্ভবতঃ বেশ কয়েক বৎসর পর ভারতবর্ষের রাজনীতিতে প্রমুখ অংশ নিচ্ছেন বলে তাঁর উক্তিতে কিছুটা অতিরিক্ত সতর্কতা ও দ্বিধার ছাপ বিদ্যমান। তবুও তাঁর বক্তব্যে দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁর তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং সে বিষয়ে গঠনমূলক ভূমিকা পালনে তাঁর ইচ্ছার পরিচয় সুস্পষ্ট। "তিনি বলেছিলেন যে ভারতবর্ষের আট কোটি মুসলমান ভারতমাতার স্বাধীনতার জন্য ইচ্ছুক এবং এমনকি অপর যে কোন সম্প্রদায়ের তুলনায় অধিক পরিমাণে উদ্‌গ্রীব।...যাবতীয় রাজনৈতিক দলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সরকার যে এসব শাসন-সংস্কার চাপিয়ে দিয়েছেন তার কারণ হল ভারতবাসীরা ঐক্যবদ্ধ নয় এবং তাঁরা তাঁদের ঘরোয়া বিবাদের নিষ্পত্তি করতে পারেন না।"

উক্ত বক্তৃতায় আগামী দিনের জ্বলন্ত সমস্যা—প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন-ব্যবস্থা বনাম সংখ্যালঘু স্বার্থ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, "প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থার...অর্থ হল...সংখ্যাগুরুদের শাসন এবং তাই স্বভাবতই সংখ্যালঘুদের মনে আশঙ্কা যে সংখ্যাগুরুরা কি করবেন। সংখ্যাগুরুদের পীড়নকারী হবার সম্ভাবনা থাকে। ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব মানুষকে মদমত্ত করে থাকে। তাই গণতান্ত্রিক সংবিধান-সঙ্গত যে-কোন ব্যবস্থায় সংখ্যালঘুদের জন্য রক্ষাকবচের ব্যবস্থা থাকা অপরিহার্য। 'আমরা কি অগ্রসর হতে মনস্থ করেছি এবং আমাদের চিন্তা-ভাবনাকে ভারতবর্ষের স্বার্থসংশ্লিষ্ট অপেক্ষাকৃত বৃহৎ সমস্যাবলীর প্রতি নিবদ্ধ করছি? অন্ততঃ সাময়িক

ভাবেও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কিত বিতর্ক বন্ধ করুন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে আমরা ওর থেকে ভাল আপোস নিষ্পত্তি করতে পারব।" গণতন্ত্রে সংখ্যালঘুদের সমস্যা সম্বন্ধে জিন্নার এই উক্তিকে যথার্থই আর্ষদৃষ্টিসম্পন্ন বলা যেতে পারে। আমরা দেখব যে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীর নির্বাচনের পরই এ সমস্যা প্রবল হয়ে কি ভাবে জিন্না ও লীগকে বিচ্ছিন্নতাবাদের অভিমুখে নিয়ে যায়।

১১ই এপ্রিল বোম্বেতে সৈয়দ ওয়াজির হোসেনের সভাপতিত্বে লীগের অধিবেশনে ভারতশাসন আইনের নানাবিধ ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য এর নিন্দা করা সত্ত্বেও এর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অংশকে একবার পরখ করে দেখার উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক আইনসভাসমূহের আসন্ন নির্বাচনে লীগ অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উক্ত অধিবেশনে জিন্নার সভাপতিত্বে ৩৫ জনের একটি পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠন করার সঙ্গে সঙ্গে লীগের নির্বাচনের ঘোষণাপত্রও রচিত হয়। এতে বলা হয়:

"বিভিন্ন বিধানসভায় আমাদের প্রতিনিধিরা যেসব মূল নীতি অবলম্বনে কাজ করবেন তা হল: (১) বর্তমানের প্রাদেশিক এবং প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় সংবিধানের পরিবর্তে অবিলম্বে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনমূলক সংবিধান চাই, (২) ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিধানসভায় মুসলিম লীগের সদস্যরা জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের প্রচলিত সংবিধানের মধ্যেই যতটুকু কল্যাণসাধন করতে পারেন তার উদ্দেশ্যে ঐসব আইনসভাকে কাজে লাগাবেন। যতদিন পর্যন্ত পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা রয়েছে ততদিন আইনসভাসমূহে মুসলিম লীগ দল গঠন করতেই হবে। তবে যেসব দল বা দল-সমূহের সঙ্গে লীগের লক্ষ্য ও আদর্শের মোটামুটি সামঞ্জস্য আছে তাদের সঙ্গে অবাধ সহযোগিতা চলবে।"[৪]

লীগের ঐ কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী বোর্ড আসন্ন নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোদ্ধৃত চোদ্দ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করে:

"১. মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকারসমূহ রক্ষা করা। একান্ত ভাবে ধর্মীয় বিষয়সমূহ সম্বন্ধে জমায়েৎ-উল-উলেমা-ই-হিন্দ্ এবং মুজাহিদদের অভিমতের উপর যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হবে।

২. যাবতীয় দমনমূলক আইনের প্রত্যাহারের জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা করা হবে।

৩. যেসব বিধি-বিধান ভারতবর্ষের স্বার্থের প্রতিকূল এবং যা জনসাধারণের মৌলিক স্বাধীনতার পরিপন্থী এবং যার পরিণামে দেশের আর্থিক শোষণ হতে পারে তার বিরোধিতা করা হবে।

৪. প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনযন্ত্রের উচ্চ ব্যয়হার হ্রাস করে জাতিগঠনমূলক

বিভাগসমূহের জন্য যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ করা হবে।

৫. ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর জাতীয়করণ করা ও সামরিক ব্যয়বরাদ্দ হ্রাস করা।

৬. কুটীর শিল্পসহ যাবতীয় শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা।

৭ দেশের আর্থিক বিকাশের স্বার্থে মুদ্রাব্যবস্থা, বিনিময়ের হার ও মূল্য নির্ধারণব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ।

৮. গ্রামীণ জনসাধারণের সামাজিক, শিক্ষাগত ও আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন।

৯. কৃষকদের ঋণের বোঝা হ্রাস করার জন্য ব্যবস্থাগ্রহণ।

১০. প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হবে।

১১. উর্দু ভাষা ও লিপিকে সংরক্ষণ দান ও তার প্রসার।

১২. মুসলমানদের সাধারণ অবস্থার উন্নয়নের জন্য উপায় উদ্ভাবন।

১৩. বর্তমানের প্রচণ্ড করভার হ্রাস করার ব্যবস্থাগ্রহণ।

১৪. দেশের সর্বত্র সুস্থ জনমত এবং সামান্য রাজনৈতিক চেতনা গড়ে তোলা।"[৫]

খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে বিশেষ করে মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রথম কর্মসূচীটি ছাড়া এতে এমন কোন কর্মসূচী নেই যার সঙ্গে ধর্ম-নিরপেক্ষ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী কোন ভারতবাসীর অসহমত হবার কারণ থাকতে পারে।

লীগের নির্বাচনসম্পর্কিত ভূমিকা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে রামগোপাল বলেছেন:

"এ সময়ে মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িকতার কথা একরকম বলেনই নি এবং নির্বাচনের কর্মসূচীর ব্যাপারে নিজেকে প্রায় কংগ্রেসের সমপর্যায়ে উন্নীত করে।[৬] কংগ্রেসও কখনও লীগের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল না এবং নির্বাচন যতই এগিয়ে আসতে লাগল লীগের প্রতি কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গী আরও অনুকূল হয়ে উঠল। এমন একটা ধারণার সৃষ্টি হতে দেওয়া হল যে প্রতিষ্ঠান দুটি পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না। সংযুক্ত প্রদেশে কংগ্রেস ও লীগ নির্বাচন-প্রচারে পরস্পরকে সাহায্য করবে এমন একটা প্রকাশ্য বোঝাপড়ায় উপনীত হল।"[৭]

লীগের ঐ অধিবেশনে প্রস্তাবিত ফেডারেল ব্যবস্থার প্রতি যে বিরূপতা ব্যক্ত করা হয় তাতে প্রস্তাবের রচয়িতা জিন্নার উদার মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজেন্দ্রপ্রসাদ এ সম্বন্ধে বলেছেন, "...এই জন্য ফেডারেল পরিকল্পনার বিরোধিতা করা হয়েছিল যে এর অভিসন্ধি ছিল ভারতবর্ষের অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য—সম্পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠাকে যাতে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিলম্বিত ও রুদ্ধশ্বাস করে

দেওয়া যায়। এর বিরোধিতার কারণ ছিল এই যে ভারতবর্ষের স্বার্থে এর রূপায়ন সম্ভব নয়। ফেডারেল সংবিধান মেনে নেওয়া বা অন্য প্রকারে মুসলমানদের স্বার্থের হানি হবে—এ ধারণা কারও মনে ছিল না।"[৮]

লীগের ঐ অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে জিন্না বললেন, "হিন্দু ও মুসলমানদের লক্ষ্য বহুলাংশে এক। যেকোন হিন্দু জাতীয়তাবাদীর মত মুসলমানরাও স্বদেশের হিতের প্রতি জাগরূক এবং তার মুক্তির জন্য সংগ্রাম করতে উদগ্রীব।" নূতন আইনে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসননীতির স্বীকৃতি এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যালঘুদের জন্য প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচের আবশ্যকতার উপর জোর দিয়ে দেশবাসীর কর্তব্যনির্ধারণ প্রসঙ্গে অতঃপর তিনি বলেন, "···তাদের কাছে একমাত্র সংবিধানসম্মত আন্দোলনের পথ খোলা। এর···অর্থ হল আইন সভায় তারা এমন ভাবে কাজ করবেন যাতে ব্রিটিশ সরকারকে তাঁদের ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করতে হয়। কিন্তু···এ কাজ একা মুসলমানদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। দুটি প্রধান সম্প্রদায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করলেই কেবল এ উদ্দেশ্য সাধন সম্ভবপর।" কিন্তু এ ব্যাপারে "সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান" কংগ্রেসের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না বলে খেদ ব্যক্ত করে জিন্না বললেন, 'আমি সাহস করে বলতে পারি যে মুসলমানদের কাছে আবেদন না করা পর্যন্ত কংগ্রেস যে লক্ষ্যে উপনীত হতে চায় এবং আমরাও চাই সেখানে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে না।' ···মুসলমানদের সঙ্গে যতদূর সম্পর্ক, জিন্না বললেন যে শুধু স্ব-সম্প্রদায়ের প্রতিই নয়, দেশের প্রতিও তাঁদের কর্তব্য আছে।[৯]

এ সম্বন্ধে উলপার্ট বলছেন, "স্যার সৈয়দ (ওয়াজির) হোসেনের সভাপতির অভিভাষণে জিন্নার চিন্তাধারার প্রতিধ্বনি ছিল। তিনি প্রস্তাব করেন যে কংগ্রেস-লীগ সম্মিলিত ভাবে দেশের আর সব 'প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল'কে এই উদ্দেশ্যে আমন্ত্রণ জানাবে যে 'তারা যেন পারস্পরিক সম্মতির এমন একটা ন্যূনতম কর্মসূচী নির্ধারণ করেন যাতে আমরা মিলিত ভাবে কাজ করতে পারি···ভারতবর্ষের জন্য একটা সংবিধান রচনা করতে পারি।' বলাবাহুল্য ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের লখনউ চুক্তির অনুসরণে এ জাতীয় পদক্ষেপ নেবার কথা তাঁর মাথায় এসেছিল। লীগের নির্বাচনী ইস্তাহারে লখনউ চুক্তির সময়কার অনুকূল পরিবেশের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয় যে সেই সময় থেকে মুসলমানরা "ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য অপরাপর ভ্রাতৃপ্রতিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছে।" আরও বলা হয় যে, "তাঁরা যদি এই দাবি জানিয়ে থাকেন যে সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে সংখ্যালঘু হিসাবে তাঁদের অধিকার সম্বন্ধে রক্ষাকবচের ব্যবস্থা থাকুক তাহলে তা সাম্প্র-

দায়িকতা নয়। বিশ্ব-ইতিহাস সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল যে কোন ব্যক্তি একথা উপলব্ধি করবেন যে এ এক স্বাভাবিক দাবি এবং সংখ্যালঘুদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও আন্তরিক সহযোগিতা পাবার জন্য এটা অপরিহার্য। কারণ সংখ্যালঘুদের মধ্যে এই অনুভূতির সৃষ্টি হওয়া দরকার যে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও নিরাপত্তাসহকারে তাঁরা সংখ্যাগুরুদের উপর নির্ভর করতে পারেন।"[১০]

উলপার্ট আরও বলেছেন, "তিনি (জিন্না) এমন কি এতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন যে চার দফার এক কর্মসূচী এই আশা নিয়ে রচনা করেছিলেন যে তার দ্বারা জওহরলালের কংগ্রেস, লিবারেলদের এবং সম্ভবতঃ এমন কি (হিন্দু) মহাসভাপন্থীদেরও একটি গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে আকৃষ্ট করা সম্ভব হবে এবং সে বৈঠক হবে এবারে ভারতবর্ষের মাটিতে :

১. প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এক গণতান্ত্রিক দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা।

২. যাবতীয় অতীব দমনমূলক আইন প্রত্যাহার এবং মতপ্রকাশ, সংবাদপত্র ও সংগঠনের স্বাধীনতার ব্যবস্থা।

৩. অবিলম্বে কৃষকদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া, সরকার কর্তৃক শিক্ষিত এবং শিক্ষার সুযোগে বঞ্চিত ব্যক্তিদের জন্য কর্মসংস্থান। দৈনিক কাজের সময় ৮ ঘণ্টা করা এবং শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ।

৪. অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন।"[১১]

স্বভাবতই জিন্নার প্রাক্-নির্বাচনী প্রকাশ্য বক্তৃতাতেও কংগ্রেসের সঙ্গে এই ভাবে মানিয়ে চলার মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। "তাঁর বক্তৃতাগুলির মূল বক্তব্য ছিল—মুসলমানদের আন্দোলন কারও বিরোধী নয়। তাদের আন্দোলন যাবতীয় ভ্রাতৃপ্রতিম সম্প্রদায়ের প্রতি মৈত্রীর দ্যোতনাযুক্ত এবং যদি তাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের মোটামুটি মিল দেখা যায় তাহলে লীগ যে-কোন গোষ্ঠী বা গোষ্ঠী সমুদায়ের সঙ্গে সহযোগিতা ও মিলেমিশে কাজ করতে ইচ্ছুক। বোম্বেতে তিনি ঘোষণা করলেন যে মুসলিম লীগ ভারতবর্ষের জনসাধারণের জন্য পূর্ণ জাতীয় স্বায়ত্ত-শাসন চায়। হিন্দু মুসলমান ও অপরাপর সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য ও সম্মানজনক বোঝাপড়াই হচ্ছে সেই একমাত্র চক্র-নাভি যার উপর নির্ভর করে ৩৮ কোটি ভারতবাসীর জাতীয় স্বায়ত্ত-শাসনের ভিত্তি রচিত হতে পারে এবং তা চলতেও পারে।"[১২] জিন্নার এই মানসিকতার নিদর্শন হিসাবে তাঁর নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি বিশেষ ভাবে স্মরণীয় : "মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের আদর্শের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই—উভয়ের

আদর্শই হল ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা। এমন কোন আত্মমর্যাদাশীল ভারতবাসী থাকতে পারেন না যিনি বিদেশী প্রভুত্ব পছন্দ করেন বা যিনি স্বদেশের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসন না চান।"[১৩]

"জিন্নার কেন্দ্রীয় (পার্লামেন্টারী) বোর্ড কর্তৃক সৃষ্ট যে মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে মুসলিম লীগের প্রার্থীরা ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, তা প্রায় কংগ্রেসেরই অনুরূপ ছিল···এর (লীগের কর্মসূচীর) প্রত্যেকটিই দীর্ঘকাল যাবং কংগ্রেসের জাতীয় দাবির অপরিহার্য অঙ্গ ছিল এবং গভর্নর ম্যালকম হেলির প্রশ্রয়ে সৃষ্ট সংযুক্ত প্রদেশের এগ্রিকালচারালিস্ট পার্টির মত অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল মুসলিম রাজনৈতিক দলগুলির কাছে ঐসব কর্মসূচী ছিল অবাঞ্ছনীয়। তবে লীগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকার সঙ্গে কংগ্রেসের একটি ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল যা জিন্নার সঙ্গে নেহরু ও সুভাষ বসুর মৌলিক মত-পার্থক্যের কারণ। লীগ "ব্যক্তিগত সম্পত্তি কেড়ে নেবার যে কোন আন্দোলনে"র প্রবল বিরোধী ছিল। ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের সমস্যার সমাধানের জন্য জওহরলাল যতই সমাজবাদী সমাধানের উপর উত্তোরোত্তর বিশ্বাস ন্যস্ত করছিলেন, জিন্না ততই পূর্বের তুলনায় অধিকমাত্রায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির দুর্গের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করছিলেন। জমি ও ঘর-বাড়ির প্রতি তাঁর ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ এবং নিজের ক্রমাগত স্ফীত বিষয়-সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থার প্রতি তাঁর ক্রমশঃ অধিকমাত্রায় সময় নিয়োগ প্রত্যুতঃ কিছুদিনের জন্য তাঁর রাজনীতির প্রতি আকর্ষণের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। অদৃষ্টের পরিহাসে তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনের শেষ দশ বছর ভারতবর্ষের মাটিতে স্থায়ী ভাবে প্রোথিত তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়সম্পত্তির প্রতি প্রবল আকর্ষণ এবং তার প্রতি তাঁকে যে পরিমাণ মনোযোগ ও উদ্যম নিয়োগ করতে হয় তা প্রায় তাঁর পাকিস্তানের প্রতি অনুরাগের সমতুল্য হয়ে ওঠে।"[১৪]

॥ ১৫ ॥

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের শেষ অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতিতে নেহরু এবং তাঁর সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর যে উল্লেখ আছে, তার প্রভাব জিন্নার কর্মপদ্ধতির বিবর্তনের ইতিহাস বোঝার পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে প্রায় ছিন্নভিন্ন এবং মৃতপ্রায় মুসলিম লীগের কর্ণধার হয়ে প্রাদেশিক বিধানসভা-সমূহের নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে জিন্না তাতে যে নবজীবনের সঞ্চার করেন, তার

উল্লেখ করা প্রয়োজন।

পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে বিবদমান দুই স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের মত আচরণকারী মিঞা আবদুল আজীজ এবং খাঁ বাহাদুর হাফিজ হিদায়েৎ হোসেনের লীগের সংযুক্তি হয় তাঁকে কেন্দ্র করে। কিন্তু জনসমর্থনপুষ্ট রাজনৈতিক সংগঠন রূপে সেই লীগ অথবা তার পূর্বেরও মুসলিম লীগের অবস্থা কেমন ছিল? এ সম্বন্ধে খলিকুজ্জমাঁর সাক্ষ্য স্মরণীয়:

"...এ সময়ে (১৯৩৪ খ্রীঃ) লীগ একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল। সরকারী খেতাবধারী ভদ্রলোক, নবাব, জমিদার এবং জী হুঁজুরেরা লীগে প্রভুত্ব করতেন। তাঁরা সাধারণতঃ সদিচ্ছাপরায়ণ ব্যক্তি হলেও মুসলমানদের স্বার্থে তাঁরা ততটুকুই অগ্রসর হতে ইচ্ছুক ছিলেন যাতে সামাজিকভাবে অথবা সরকারী দরবারে তাঁদের গায়ে আঁচ না লাগে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে এর জন্মলগ্ন থেকে মুসলিম লীগের কার্যকলাপ বরাবরই কোন ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাজনৈতিক তৎপরতার মধ্যে সীমিত ছিল। এমন কি এর বাৎসরিক অধিবেশনগুলিও অনুষ্ঠিত হত সুসজ্জিত শামিয়ানার নীচে বা কোন বড় হলঘরে যেখানে বিশেষ আমন্ত্রণ লিপি পাঠিয়ে কিছু-সংখ্যক সম্মানীয় অতিথিকে প্রবেশ করতে দেওয়া হত। মুসলিম লীগে প্রকাশ্য জনসভার ব্যাপার ছিলই না। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় যখন এর প্রতিষ্ঠা হয় তখন থেকে ১৯১০ খ্রীঃ পর্যন্ত এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় ছিল আলীগড়ে এবং লীগ ছিল সেখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পুচ্ছস্বরূপ। সে সময়কার লীগকে এক স্বতন্ত্র মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ আলীগড় তখন রাজনৈতিক সহ মুসলমানদের তাবৎ কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দু। প্রধান কার্যালয় লখনউ-এ স্থানান্তরিত করার পর লীগ রাজনৈতিক ব্যাপারে মাথা ঘামানো শুরু করল বটে, তবে বেশ নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে। সদস্যতা এবং বার্ষিক চাঁদা থেকে এর আয় এমন হত না যে এমন কি এর দপ্তরটুকু ঠিকমত চালানো যায়—জনসাধারণের মধ্যে কাজ করার মত টাকা তো দূরের কথা। মাহমুদাবাদের রাজা যে বার্ষিক ৩০০০ টাকা অনুদান দিতেন তাতে কোনমতে লীগের খরচ চলত। ঐ ছিল তার স্থায়ী আয়ের প্রধান সূত্র।

"খিলাফৎ আন্দোলনের দিনে এর অস্তিত্ব ছিল কেবল কাগজে-কলমে। যেখানে যেখানে খিলাফৎ সম্মেলন বা কংগ্রেসের অধিবেশন হত মুসলিম লীগও সেখানে মিলিত হত। খিলাফৎ শেষ হয়ে যাবার পর একদল নূতন নবাব এই সুলক্ষণযুক্ত শিশুটির অভিভাবকত্ব গ্রহণ করলেন। কারণ এর মাধ্যমে সম্মান ও খেতাব পাবার

বিপুল সুযোগ তাঁদের হস্তগত হল। মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক দুর্গের এই সব রক্ষাকর্তাদের আত্মত্যাগের নিদর্শন ছিল লীগের বাৎসরিক অধিবেশনে যোগ দেওয়া এবং এত কষ্ট করে রেলের প্রথম শ্রেণীর কামরায় সফর করে তাঁদের শহরে পদার্পণ করে তাঁদের অতিথি হয়ে সুসজ্জিত সর্বসুবিধাযুক্ত গৃহে থেকে ও অত্যুৎকৃষ্ট খাদ্যসম্ভারে ক্ষুন্নিবৃত্তির পর তাম্বূল চর্বণ করতে করতে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ার জন্য যে শহরে অধিবেশন হচ্ছে সেখানকার ঐ জাতীয় সম্মানভাজন আয়োজকদের মুখে নিজেদের ভূয়সী প্রশংসা শ্রবণ। অধিবেশনের পর তার বিবরণী যথারীতি সংবাদপত্রে পাঠানো হত। কিন্তু তার বহু পূর্বেই ব্রিটিশ কর্মচারীরা তাঁদের গোপন সূত্র থেকে সভায় কে কি বলেছেন তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পেয়ে যেতেন। অধিবেশনের সমাপ্তির পরই সে বছরের মত প্রতিষ্ঠানের সব কাজ সমাপ্ত হয়ে যেত এবং ভারত সরকারের মহাফেজখানার বিবরণে লিপিবদ্ধ হওয়া ছাড়া অধিবেশনে কে কি বলেছেন সে সম্বন্ধে কেউ খেয়ালও করতেন না।"[১]

মুসলিম লীগরূপী ভগ্নস্তূপের এই মাল-মশলা নিয়ে জিন্না এক নূতন ইমারৎ তৈরী করার কাজ শুরু করলেন। লক্ষ্য—প্রাদেশিক আইনসভাসমূহের আগামী নির্বাচনে মুসলমানদের এক শক্তিশালী মিলিত ফ্রন্ট খাড়া করা, যাতে ভবিষ্যৎ শাসন-ব্যবস্থায় মুসলমানদের যথাযোগ্য স্থান থাকে এবং তার বলে যাতে মুসলমানরাও পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনের লক্ষ্যে উপনীত হতে পারেন। বোম্বের লীগ অধিবেশনেই তাই স্থির হল যে প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন খরচ চালাবার জন্য ৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা হবে। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে লীগের জন্য তরুণ স্বেচ্ছা-সেবক সংগৃহীত হল। এ প্রচেষ্টা অসহযোগ আন্দোলনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বয়কটের দ্বারা গান্ধীর কংগ্রেসে নূতন রক্ত আমদানির চেষ্টা এবং তিলক স্বরাজ্য ফাণ্ডের জন্য ১ কোটি টাকা সংগ্রহের সঙ্গে তুলনীয়। এ ছাড়া লীগের ঐ অধিবেশন থেকে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠল। কংগ্রেস ও রাজনীতিকে জনমুখী করার গান্ধীর প্রয়াসের সঙ্গে রুচিতে না মেলা অভিজাত জিন্নার ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করার অন্যতম কারণ। জিন্না অতঃপর বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে গান্ধীর সেই পথই গ্রহণ করলেন। লাহোরে শহীদগঞ্জ মসজিদের আন্দোলন প্রসঙ্গে মুসলিম জন-সাধারণের সঙ্গে জিন্নার যে প্রথম পরিচয়, বোম্বে অধিবেশন এবং তারপর তা ক্রমশঃ দৃঢ় হতে হতে পর বৎসর লখনউ-এর লীগের বাৎসরিক অধিবেশনে জিন্না একরকম গণনায়কের ভূমিকা গ্রহণ করলেন, যদিও তা বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের।

লিয়াকৎ আলী খাঁ এবং আবদুল মতীন চৌধুরীর মত তরুণ গুণগ্রাহীরা ইতি-

পূর্বেই জিন্নার শিবিরে ছিলেন। লীগের অধিবেশনের পরই জিন্না ব্যাপকভাবে ভারত ভ্রমণ করে বিভিন্ন প্রদেশে মুসলমান সমাজের সর্বজনমান্য নেতাদের লীগের পতাকাতলে সমবেত করার প্রয়াস আরম্ভ করলেন। সর্বাগ্রে পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের প্রবক্তা কবি ইকবালকে নিজের সঙ্গী করলেন, যাঁকে তিনি ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদের লীগ অধিবেশনের সভাপতিত্বে বরণ করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে গোলটেবিল বৈঠকের সময়ে ইকবালের সঙ্গে একাধিকবার মিলিত হয়ে মুসলিম রাজনীতি সম্বন্ধে মতবিনিময় করেন এবং ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর সঙ্গে এ ব্যাপারে একাধিক পত্র বিনিময় হয়। পরবর্তী কালে জিন্না স্বীকার করেন যে ভারত ব্যবচ্ছেদ যে অপরিহার্য এই বিশ্বাস তাঁর মনে সৃষ্টি করার ব্যাপারে ইকবাল এক নিশ্চিত ভূমিকা পালন করেন।[১] "সারে জাঁহা সে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা"-এর কবি ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম নানা ধর্মের অধিবাসীদের বাসভূমি ভারতের অঙ্গচ্ছেদ করে এক মুসলমান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করবেন এবং ১৯৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে জিন্নাকে সক্রিয় ভাবে এর জন্য প্রভাবিত করে এই দেশ বিভাগ করতঃ পাকিস্তান নামক ঐস্লামিক রাষ্ট্রের সৃষ্টিতে তাঁকে অনুপ্রাণিত করবেন—এও ইতিহাসের এক বিচিত্র পরিহাস।

যাই হোক, পাঞ্জাবের অদ্বিতীয় নেতা স্যার ফজল-ই-হাসান জিন্নার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না বলে জিন্নার আহ্বানে সাড়া দিতে ইতস্তত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যু জিন্নার পথ প্রশস্ত করে দিল। ইকবাল ও রাজা গজনফর আলীসহ পাঞ্জাবের মোট এগারজন বিশিষ্ট মুসলিম নেতা লীগ পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সদস্যপদ স্বীকার করলেন। এই ভাবে বঙ্গে ঢাকার নবাব, শহীদ সুরাবর্দী, ইস্পাহানী প্রমুখ আটজন, উত্তর প্রদেশের নবাব ইসমাইল খাঁ, মাহমুদাবাদ ও সালিমপুরের রাজাদ্বয়, সৌকত আলী ও খলিকুজ্জমাঁ প্রমুখ সাতজন এবং মাদ্রাজ, সিন্ধু, বিহার, সেণ্ট্রাল প্রভিন্স দিল্লী, আসাম ও বোম্বের প্রমুখ মুসলমান নেতাদের তিনি নিজ সহযাত্রী করেন। ব্যতিক্রম ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের খান ভ্রাতৃদ্বয় এবং মৌলানা আজাদ, রফি আহমদ কিদওয়াই, আসফ আলী এবং বিহারের ডাঃ মামুদ, অধ্যাপক আবদুল বারী প্রমুখের মত কংগ্রেসের প্রথম সারির মুসলিম নেতৃবৃন্দ যাঁরা কোন অবস্থাতেই জিন্নার সহযাত্রী হতে প্রস্তুত ছিলেন না। জিন্নার এই সময়কার সফরে বাংলার নাজিমুদ্দীন এবং বোম্বের চুন্দ্রীগড় প্রমুখও তাঁর সঙ্গে যোগদান করেন এবং কালক্রমে তাঁরা ভারত ও পাকিস্তানের শাসনকার্য নির্বাহের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

আইন অমান্য আন্দোলনের বন্দী জওহরলাল পত্নীর অসুস্থতার জন্য ১৯৩৫

খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে কারামুক্ত হয়েই অসুস্থ স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে থাকার জন্য সুইজারল্যাণ্ডে যান। স্ত্রীর মৃত্যুর পর কিছুদিন ইউরোপে ঘোরার পর ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পরের মাসে লখনউ কংগ্রেসে রাজেন্দ্র প্রসাদের উত্তরাধিকারী রূপে কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ফৈজপুর কংগ্রেসে তিনি পুনর্বার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন। অর্থাৎ প্রাদেশিক আইনসভাসমূহের নির্বাচনের প্রাক্কালে নির্বাচনযুদ্ধ পরিচালনার সময় এবং নির্বাচনোত্তর কালে মন্ত্রীমণ্ডল গঠনের সময়ে নেহরু কংগ্রেসের সারথি। এ প্রসঙ্গে আরও স্মরণীয় যে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের কংগ্রেসের সময়ে গান্ধীজী প্রত্যক্ষ রাজনীতি ছেড়ে প্রধানতঃ গঠনকর্মে আত্মনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় অতঃপর জওহরলালজীই কংগ্রেসের অদ্বিতীয় নেতা হওয়ায় কংগ্রেসের তরফ থেকে নির্বাচন পরিচালনা এবং তার পরিণামে মন্ত্রীমণ্ডল গঠনের ব্যাপারে তাঁর ভূমিকাই সর্বপ্রধান ছিল।

কংগ্রেসে সেই ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সুভাষচন্দ্র প্রমুখ তরুণতর নেতাদের সঙ্গে সঙ্গে জওহরলাল প্রগতিপন্থী রূপে পরিচিত। ভারতীয় রাজনীতিতে সমাজবাদ-সাম্যবাদ ইত্যাদির প্রসঙ্গ প্রবর্তনের ব্যাপারেও তিনি একজন পথিকৃৎ। ১৯৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে থাকার সময়ে তিনি সমাজবাদী এবং গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হন। তাই কংগ্রেস সভাপতি হবার পর বিভিন্ন সভা-সমিতিতে এই সব বিষয় সম্বন্ধে মন্তব্য করতে থাকেন। কংগ্রেস সহ দেশের আরও অনেক রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী ও নেতাদের ভিতর সমাজবাদ ও গণতন্ত্রের পরিপন্থী কোন ভূমিকা লক্ষ্য করেছেন মনে করলেই জওহরলাল তার প্রকাশ্য সমালোচনা করতেন। আর সাধারণ নির্বাচন তো প্রায় বাগযুদ্ধের ব্যাপার যার জন্য ১৯৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জওহরলাল কৃত এইসব সমালোচনা ব্যাপক হয়ে ওঠে।

এই প্রসঙ্গে জওহরলালের ব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গেও কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। ধনীর দুলাল, দেশ-বিদেশে উচ্চশিক্ষিত সুদর্শন তরুণ জওহরলাল স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধনার জন্য জাতীয়তাবাদীদের হৃদয়-সম্রাট রূপে বন্দিত হতেন। কিন্তু তথাকথিত দাম্ভিক অহঙ্কারী এবং কোপন স্বভাবের জন্য বিশেষ করে অন্তরঙ্গ পরিচিত মহলে তাঁর সমালোচকের সংখ্যাও কম ছিল না। আমরা কিন্তু তাঁর বিপুল সংখ্যক গুণগ্রাহী ও সমালোচকদের বাদ-প্রতিবাদের গহন অরণ্যে প্রবেশ করার দুঃসাহস করি না। আমাদের বর্তমান আলোচনার জন্য তাঁর দুই ঘনিষ্ঠ গুণগ্রাহী সহকর্মী আজাদ ও সীতারামাইয়ার মন্তব্যের অংশবিশেষ এবং নেহরুর

স্বকীয় চরিত্র-চিত্রণের কিছুটা উদ্ধৃত করব। নেহরু সম্বন্ধে "আমার প্রিয়তম সুহৃদদের মধ্যে একজন এবং ভারতের জাতীয় জীবনে তাঁর অবদান অদ্বিতীয়" মন্তব্য করে আজাদ বলেছেন, "…সময় সময় তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে তিনি এত প্রভাবিত হয়ে পড়েন যে পরিস্থিতির বাস্তব দিকের তিনি সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেন না।… কখনও কখনও তিনি আবেগতাড়িত হয়ে যান।"৩ সীতারামাইয়া বলেছেন, "…জওহরলাল বরাবরই দ্বিবিধ মানসিকতা চালিত হয়েছেন। এর প্রথমটি হল এক ধরনের শ্রেষ্ঠত্ববোধের মনোভাব যার জন্য তিনি নিজেকে ভারতবর্ষের আর সবার থেকে উঁচু দরের মানুষ বলে মনে করেন। দ্বিতীয়টি হল এক ধরনের হীনম্মন্যতা—এই বুঝি তাঁকে গান্ধীর নীচে স্থান দেওয়া হল।"৪

নেহরুর আত্মচিত্রণ উচ্চকোটির শিল্পকর্ম এবং তাঁর চরিত্রবৈশিষ্ট্য অধ্যয়নের চাবিকাঠি স্বরূপ। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর নিজের সম্বন্ধে তিনি লেখেন, "একটুখানি মোচড় দিলেই জওহরলাল হয়ত একজন ডিক্টেটরে পরিণত হয়ে শ্লথ গতিসম্পন্ন গণতন্ত্রের সব সাজ-সরঞ্জাম ঝেঁটিয়ে একপাশে সরিয়ে দেবেন। তখনও হয়ত তিনি গণতন্ত্র ও সমাজবাদের ভাষা ও শ্লোগান প্রয়োগ করবেন। কিন্তু আমরা সকলে জানি যে ফ্যাসিবাদ কেমন ভাবে এই ভাষায় পুষ্ট হয়েছে এবং তারপর অপ্রয়োজনীয় বস্তুরূপে একে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।…জওহরলাল ফ্যাসিস্ট হতে পারবেন না। কিন্তু তবুও তাঁর ভিতর ডিক্টেটার হবার যাবতীয় উপাদান রয়েছে—প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হবার উপযুক্ত দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, উদ্যম, অহমিকা, সাংগঠনিক ক্ষমতা, যোগ্যতা, দার্ঢ্য আর জনসমুদ্রের প্রতি তাঁর প্রবল ভালবাসা, অপরের প্রতি অসহিষ্ণুতা এবং দুর্বল ও অক্ষমদের প্রতি কিছুটা উপেক্ষা।"৫

জিন্নার সম্বন্ধে নেহরুর অনীহা এত প্রবল ছিল যে গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজীকে জিন্নার কথা শুনতে হচ্ছে এও তার সহ্য নয়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর গান্ধীকে লিখিত এক পত্রে জিন্না সম্বন্ধে ব্যঙ্গভরে জওহরলাল মন্তব্য করেন: "আমার প্রিয় বন্ধু জিন্নার চোদ্দ দফারূপী বিশুদ্ধ আবোলতাবোল যদি কিছুক্ষণের জন্যও আমাকে শুনতে হত, তাহলে আমাকে দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপে পালিয়ে বাঁচার কথা চিন্তা করতে হত—যেখানে হয়ত এমন কিছু মানুষের দেখা পাবার সম্ভাবনা যাদের এতটুকু বুদ্ধি বা অজ্ঞতা আছে যে তাঁরা চোদ্দ দফার আলোচনা করেন না।"৬ ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন আইনে জিন্নার চোদ্দ দফার অধিকাংশ যখন স্থান পায় তখন জওহরলাল জিন্না সম্বন্ধে নিজের অভিমত পরিবর্তন করেছিলেন কি

না, তা জানা নেই।

জওহরলালের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এই আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক নয়। কারণ গান্ধীর পরই যাঁর সঙ্গে জিন্নার ভিন্ন মানসিকতাজনিত বিরোধ প্রবল হয়ে ওঠে এবং যাঁর কারণে তিনি ক্রমশঃ আরও আপোষবিহীন সাম্প্রদায়িকতবাদী ভূমিকা গ্রহণ করেন তিনি হলেন নেহরু। তবে জিন্নাও কম দাম্ভিক ও অহঙ্কারী ছিলেন না। এ সম্বন্ধে তিনটি উদাহরণ দেওয়াই যথেষ্ট হবে। তাঁর বিখ্যাত দম্ভোক্তি, "আমি পাকিস্তান লাভ করেছি আমার সচিব ও তাঁর টাইপরাইটারের সাহায্যে"[৭] তো প্রায় চিরায়ত উক্তিতে পরিণত হয়েছে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে কলকাতায় মুসলিম লীগের অধিবেশনে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে সেই অভিনব আন্দোলনের জনককে স্বীকৃতি দেবার ঔদার্য না দেখিয়ে অথবা সোজাসুজি সেই কর্মসূচীকে গ্রহণ না করে ব্যক্তিগত অহমিকা চালিত হয়ে শাসকদের আত্ম-সংশোধন করার জন্য সতর্ক করে দেবার সময়ে জিন্না বলেন, "...তা না হলে জনসাধারণের সামনে অসহযোগের নীতি গ্রহণ করা ছাড়া অপর কোন পথ খোলা থাকবে না—তবে সে অসহযোগ যে শ্রীযুক্ত গান্ধীর কর্মসূচীই হবে, এমন কোন কথা নেই।"[৮]

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আক্টোবর লীগের লখনউ অধিবেশনের বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে লীগের নীতি (creed) সম্বন্ধে খলিকুজ্জমাঁর সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। সংশোধনী প্রস্তাবের বক্তব্য ছিল, লীগের নীতি হল, "ভারতবর্ষে যথার্থ গণতান্ত্রিক রাজ্যসমূহের রূপে পূর্ণ (complete) স্বাধীনতা অর্জন।" জিন্না এর বিরোধিতা করে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সংশোধনী প্রস্তাবের প্রতিকূল যুক্তিজাল বিস্তার করতেই থাকলেন। অবশেষে লীগের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কিছু নেতা যখন তাঁর কাছে আবেদন করলেন যে তিনি যেন লীগের বিলুপ্তির কারণ না হন তখন, "তিনি অনেকটা উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন : 'ঠিক আছে, আমি বলছি সম্পূর্ণ (full) স্বাধীনতা, পূর্ণ স্বাধীনতা নয়।'" এ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রসঙ্গে খলিকুজ্জমাঁ বলেছেন, "এই ছিলেন শ্রীযুক্ত জিন্না—এর থেকে তাঁর সমগ্র আভ্যন্তরীণ চরিত্রের আভাস পাওয়া যায়। কখনও তিনি পরাজয় স্বীকার করবেন না। জনসভায় হোক অথবা অন্যত্র, এক চূড়ান্ত ঔদাসীন্যভরে তিনি পরাভবকে বিজয়ে পরিণত করবেন।"[৯]

এর উপর জওহরলাল এবং তাঁর সমাজবাদী-গণতান্ত্রিক "বুলি" সম্বন্ধে জিন্নার সবিশেষ অবজ্ঞার কারণ কেবল ইতিপূর্বে উল্লেখিত তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তিনিষ্ঠাই নয়।

যাঁর পিতার সঙ্গে জিন্না সমান স্তরে রাজনীতি করেছেন, তাঁর "উন্নাসিক" পুত্রকে জিন্না আমল দিতেই প্রস্তুত ছিলেন না। বিশেষ বিংশ শতাব্দীতে এই দ্বিতীয় বার যখন মুসলিম পুনর্জাগরণের ভাগীরথী প্রবাহিত হবার সূচনা দেখা দিয়েছে এবং এর ভগীরথ স্বয়ং জিন্না, যাঁর রাজনৈতিক নেতৃত্বের সম্ভাবনা একদা যেন শূন্য থেকেই নিক্ষিপ্ত গান্ধীর কারণে বিনষ্ট হয়েছিল। ইতিহাসে ব্যক্তিরও যে বিশিষ্ট ভূমিকা আছে, তা গান্ধী-জিন্না বিরোধের মত নেহরু-জিন্না বিরোধেও প্রমাণিত হয়।

যাই হোক, আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাভিলাষী দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সভাপতি জওহরলাল ও জিন্না পরস্পরকে বাছাই করা সুতীক্ষ্ণ বাক্যশায়কে বিদ্ধ করার উল্লাসে মত্ত হলেন। পুনর্গঠিত লীগের নেতা হিসাবে লীগের নির্বাচনী ইস্তাহার এবং নিজের ব্যক্তিগত ভূমিকা এবং বক্তৃতা-বিবৃতি ইত্যাদির মাধ্যমে জিন্না সম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কংগ্রেসের প্রতি যে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেছিলেন, তাকে রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে কলকাতায় ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর এক জনসভায় জওহরলাল ঘোষণা করলেন, "যতই উদার চেহারা নিয়ে দেখা দিক না কেন, আমরা কোন সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর উপর নির্ভর করতে যাব না।"[১০]

যে-কোন দলের রাজনৈতিক নেতার নির্বাচনী-বক্তৃতা সাধারণতঃ অন্তঃসারশূন্য ও বাহ্বাস্ফোটে পূর্ণ হয়। পূর্বোক্ত ঘটনার পর জিন্না ও নেহরু নির্বাচনী বক্তৃতা-সমূহ যেন তদতিরিক্ত পরস্পরকে বাক্যের ছুরিকাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করার উদ্দেশ্যযুক্ত হয়ে দাঁড়াল। এই চাপান-উতোরের প্রক্রিয়ায় নেহরু বললেন, "দেশে মাত্র দুটি শক্তিই বিদ্যমান, কংগ্রেস ও সরকার।" জবাবে জিন্না "এদেশে এক তৃতীয় পক্ষও আছে এবং তা হল মুসলমানদের" বলার সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করলেন, "আমরা কোন দলের তল্পিবাহক হব না। সমান অংশীদার রূপে আমরা কাজ করতে প্রস্তুত আছি।" (৩।১।১৯৩৭)। ১০ই জানুয়ারী জওহরলাল এক বিবৃতিতে জিন্নার মানসিকতাকে "মধ্যযুগীয় ও সেকেলে" আখ্যা দিয়ে দাবি করলেন, "মুসলিম লীগের অধিকাংশ সদস্যদের চেয়ে আমি অধিক মাত্রায় মুসলমান জনসাধারণের সম্পর্কে আসি।" জিন্না হুঙ্কার ছাড়লেন, "জনসাধারণের সমর্থনবিহীন অপর সম্প্রদায়ের জনকতক ভাগ্যসন্ধানী এবং সবকিছু বিশ্বাস করতে প্রস্তুত মানুষ নিয়ে অসাম্প্রদায়িকতার তকমা আঁটায় লীগ আস্থা রাখে না।" (১৯।১।১৯৩৭)। জওহরলাল জবাব দিলেন, "কংগ্রেসে এমন মুসলমান আছেন, যাঁরা হাজার জিন্নার প্রেরণাস্থল।" (৯।২।১৯৩৭)। জিন্না জওহরলালকে "পিটার প্যান", "ডিক্টেটার" ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে মন্তব্য করলেন যে তিনি সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের মত আচরণ

করছেন। জওহরলালও অনুরূপ ভাষায় জিন্নার প্রত্যুত্তর দিলেন।[১১]

নেহরু জিন্নার বাগ্‌যুদ্ধ সম্বন্ধে উলপার্ট মন্তব্য করেছেন, "...তাঁর জীবনের এ এক অতীব মারাত্মক ভ্রমাত্মক কার্য যা দ্বেষ ও রূঢ়তা চালিত হয়ে তিনি করেছিলেন। ইকবালের চেয়েও নেহরু বেশী করে লীগকে এক নূতন গণমুখী কর্মকৌশল নিতে প্ররোচিত করেন। এর পিছনে ছিল জিন্নাকে তাঁর বৈঠকখানার রাজনীতি ছেড়ে যেসব লক্ষ লক্ষ মুসলিম জনসাধারণ দিনের অধিকাংশ সময় গ্রামের ক্ষেতখামারে জীবিকা অর্জনের জন্য কাজ করেন তাঁদের কাছে পৌঁছানোর জন্য জিন্নাকে খোঁচা দেওয়া এবং চ্যালেঞ্জ জানানো। সেইসব জনসাধারণকে আন্দোলিত করার, তাঁদের জাগরুক করে মুসলিম নেতৃত্বের পিছনে পিছনে মিছিল করে চলতে অনুপ্রাণিত করার একটিই মাত্র সম্ভাব্য উপায় লীগের কাছে ছিল। ইসলাম বিপন্ন, একমাত্র দীনই (ধর্ম) বিবেচ্য—এই অতঃপর হয়ে উঠল মুসলিম লীগের একমেব ভূমিকা।"[১২]

॥ ১৬ ॥

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের রাজেন্দ্রপ্রসাদ-জিন্না আলোচনা ব্যর্থ হবার পিছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল—মুসলমানদের যথার্থ প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান কোন্‌টি? ফেডারেশন, গভর্নরদের বিশেষ ক্ষমতা, ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন আইনের সীমাবদ্ধতা ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রশ্নও ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বিশেষ গুরুত্ব পায়। দেখা গেল তাবৎ দুর্বলতা সত্ত্বেও এবং মুসলিম ভোটের শতকরা মাত্র ৪·৭ ভাগ পাওয়া সত্ত্বেও একমাত্র লীগই সর্বভারতীয় দৃষ্টিতে সঙ্গত ভাবে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের দাবি করতে পারে। কারণ কংগ্রেসের এত ধর্মনিরপেক্ষতার কথা সত্ত্বেও ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ১৪৩ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৬ জন মুসলমান ছিলেন। এঁদের মধ্যে তিনজন খুদা-ই-খিদমদগার প্রভাবিত সীমান্ত প্রদেশের, একজন বিহার এবং অপরজন উত্তর প্রদেশ থেকে। ষষ্ঠ সদস্য মৌলানা আজাদ ছিলেন ভূতপূর্ব সভাপতি রূপে। কংগ্রেস স্বয়ং নিজের দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন ছিল। তাই মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত প্রাদেশিক আইনসভাসমূহের ৪৮২টি আসনের মধ্যে মাত্র ৫৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এইজন্য উপরের স্তরে জিন্না ও জওহরলালের বাগ্‌-যুদ্ধ সত্ত্বেও উভয় দলের প্রাদেশিক স্তরের নেতারা মনে করতেন যে কংগ্রেস ও

লীগের শক্তি মিলিত হলে সরকারী আশীর্বাদপুষ্ট প্রার্থীদের পরাজিত করা সম্ভবপর হতে পারে।

"নির্বাচনের ফলাফল প্রতিটি দলের সামনে আয়নার মত খাড়া হয়ে নিজের সম্বন্ধে নিজ ধারণায় কোথায় কোথায় ত্রুটি ছিল তা স্পষ্ট দেখিয়ে দিল। বঙ্গ ছাড়া মুসলিম লীগ আর সব মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে ধরাশায়ী হয়েছিল। আর ঐ প্রদেশেও মুসলিম লীগ মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট ১১৯টি আসনের মধ্যে মাত্র ৪০টি পায়। পাঞ্জাবে বৃহত্তম দল হয়ে দাঁড়ায় সম্প্রতি পুনঃসংগঠিত মুসলমান ও হিন্দু জমিদারদের ইউনিয়নিস্ট পার্টি। লীগ ওখানে ৮৬টি মুসলমান আসনের মধ্যে মাত্র ২টি পায়। তার অবস্থা কংগ্রেসের চেয়ে কোন অংশে ভাল হয়নি, কারণ কংগ্রেসের আসন সংখ্যাও ছিল দুই।...হিন্দুদের জন্য নির্ধারিত ৪৪টি সাধারণ আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১০টিতে বিজয়ী হয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় এবং এই কথা প্রমাণ করে যে হিন্দুদের তরফ থেকে কথা বলার অধিকার কংগ্রেসেরই বেশী।

"বঙ্গে যে মুসলিম লীগ ৪০টি আসন পেয়েছিল তা নিখিল ভারত মুসলিম লীগের হুবহু প্রতিরূপ নয়। এ হল প্রাদেশিক মুসলিম লীগ, যে প্রতিষ্ঠান যৌথ নির্বাচনেরই পক্ষে নিজের একক কণ্ঠস্বর বার বার তুলেছে।...তাড়াহুড়া করে সংগঠিত কৃষক প্রজা পার্টিও...লীগের তুলনায় ভাল ফল করে। প্রজা পার্টি কৃষকদের রায়তী স্বত্বের আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিল এবং এই দলের নেতৃত্ব প্রধানতঃ মুসলমানদের হাতে থাকলেও পার্টি মুসলমান নাম গ্রহণ করেনি অথবা মুসলমান ভোটারদের দরবারে মুসলিম প্রতিষ্ঠান হিসাবে উপস্থিত হয়নি। এর থেকে এই সত্য প্রতিপাদিত হয় যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের আলাপ-আলোচনায় স্বতঃনিযুক্ত মুসলমান নেতাদের পক্ষ থেকে যে জাতীয় প্রচার করা হত ভোটারদের মন তাতে সাড়া দিতে প্রস্তুত নয়। এছাড়া কৃষক প্রজা পার্টির নেতা ফজলুল হক যখন স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য অপর দলের সহযোগিতার জন্য ইচ্ছুক হলেন, তখন তিনি লীগের বদলে কংগ্রেসেরই কাছে যাওয়াই পছন্দ করেছিলেন...

"উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস একক বৃহত্তম দল হয়েছিল এবং নির্বাচনে লীগের ভরাডুবি ঘটেছিল। পরে কয়েকজন নির্দলীয়ের সহায়তায় কংগ্রেস ঐ প্রদেশে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করতে সমর্থ হয়েছিল। সিন্ধুতেও লীগ হাতে কিছুই পায়নি। কংগ্রেস ঐ প্রদেশে মুসলিম আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে কিছু 'জাতীয়তাবাদী' মুসলমানদের সাহায্য করেছিল। আর কিছু নির্দলীয়দের সঙ্গে মিলিত হয়ে এঁরা ঐ প্রদেশে এক কংগ্রেসী মানসিকতাযুক্ত মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করেছিলেন।

"উত্তর প্রদেশে নির্বাচনের প্রাক্কালে লীগের মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করার দাবী কংগ্রেস একরকম মেনে নিয়েছিল। কংগ্রেস সাকুল্যে ৯টি মুসলিম আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেই আত্মতৃপ্ত ছিল এবং (মোট ৬৬টি আসনের মধ্যে) বাকী সব আসন মুসলিম লীগকে ছেড়ে দিয়েছিল। নির্বাচনে কংগ্রেস ঐ ৯টি আসনেই পরাজিত হয় এবং এই ভাবে লীগ মুসলমানদের প্রতিনিধি—কংগ্রেসের এই পরোক্ষ স্বীকৃতি বাস্তবে প্রমাণিত হয়। তবে এই ঘটনা ছাড়া মুসলিম লীগ কর্তৃক কংগ্রেসের আস্থার মর্যাদা পূর্ণতঃ বা প্রধানতঃ সপ্রমাণ করা সম্ভবপর হয়নি। লীগ মাত্র ২৭টি আসনে বিজয়ী হয়, বাকীগুলি নির্দলীয় মুসলিম প্রার্থীরা পান। কংগ্রেস অধিকাংশ হিন্দু আসনে জয়লাভ করে এবং একক ভাবে সরকার গঠন করার শক্তি অর্জন করে। নির্বাচনযুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার মুখে কংগ্রেস সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ছিল না এবং ঐ দলের প্রাদেশিক নেতৃবর্গের মুসলিম লীগের সঙ্গে নির্বাচনের ব্যাপারে একটা মিতালী করার অন্যতম কারণ ছিল ভবিষ্যতে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করার সময় লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন করার সম্ভাবনা।"[৪]

ছোটলাটরা তাঁদের বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োগ করে জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত মন্ত্রীদের গণতান্ত্রিক অধিকার কুণ্ঠিত করবেন না—তাঁদের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি দাবী এবং বন্দীমুক্তি ইত্যাদির প্রশ্নে কংগ্রেস পাঁচটি প্রদেশে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও অবিলম্বে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করেনি। অথচ গান্ধী ও কংগ্রেস সভাপতি জওহরলালের মত নেতারা কংগ্রেসের মন্ত্রীমণ্ডল গঠনের ব্যাপারে উৎসাহী না হলেও অধিকাংশ নেতা ক্ষমতা সীমিত হলেও তা পাবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। ছোটলাটদের কাছ থেকে কোন সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি না পেলেও অবশেষে ওয়ার্কিং কমিটির ৭ই জুলাই-এর প্রস্তাবানুসারে কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডল গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথম অধ্যায়ে মৌলানা আজাদের মন্তব্যে আমরা দেখেছি যে উত্তর অর্থাৎ তদানীন্তন সংযুক্ত প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল গঠনকে কেন্দ্র করে যেহেতু ভারত বিভাগের বীজ বপিত হয়েছিল, তাই সে সম্বন্ধে আমরা একটু বিশদ ভাবে আলোচনা করব।

সংযুক্ত প্রদেশের সরকারের আশীর্বাদপ্রাপ্ত জমিদারদের এগ্রিকালচারিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে মোটামুটি একই রকম রাজনৈতিক আর্থিক ও সামাজিক কর্মসূচীভিত্তিক নির্বাচনী ইস্তাহারের ভিত্তিতে গুটিকয়েক মুসলিম আসন ছাড়া কংগ্রেস প্রধানতঃ সাধারণ আসনে এবং লীগ মুসলমান আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল, এ আমরা দেখেছি। স্বয়ং জওহরলালের স্বীকারোক্তি আছে যে লীগের প্রার্থী প্রতিক্রিয়াশীল না হলে এবং সে আসনে কংগ্রেসের প্রার্থী না থাকলে তিনি নির্বাচনী প্রচারে লীগের

প্রার্থীর সমর্থন করেছিলেন, যদিও নিখিল ভারতীয় স্তরে জিন্নার সঙ্গে তাঁর প্রবল বাগ্‌যুদ্ধ চলছিল। আমরা এও দেখেছি যে কংগ্রেস তাবৎ মুসলিম আসনে পরাজিত হলেও সাধারণ আসনে ভাল ফল করেছিল এবং মুসলিম লীগ ২০টি মুসলমান আসনে জয়ী হয়েছিল। স্বভাবতই তাই নির্বাচনের পরে মুসলিম লীগের তদানীন্তন নেতা এবং নির্বাচনের অব্যবহিতপূর্ব পর্যন্ত কংগ্রেস নেতা খলিকুজ্জমাঁর সঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেসের নেতা গোবিন্দবল্লভ পন্থের নির্বাচনপূর্ব বোঝাপাড়া অনুসারে কোয়ালিশন মন্ত্রীমণ্ডল গঠন সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা হয়, যদিও একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে কংগ্রেসের অপর কারও সাহায্য বিনাই মন্ত্রীমণ্ডল গঠনের ক্ষমতা ছিল। কিন্তু জুলাই-এর প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত কংগ্রেসের হাইকমাণ্ড মন্ত্রীমণ্ডল গঠনের অনুমতি না দেওয়ায় প্রদেশে ছোটলাটের মনোনীত অস্থায়ী সরকার সংখ্যালঘু সরকার হিসাবে গঠিত হয় এবং কংগ্রেসের নির্বাচনযুদ্ধের সাথী হিসাবে লীগ ছতারীর নবাবের সেই মন্ত্রীমণ্ডলে যোগ দেবার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে দলের চরিত্র ও আদর্শবাদের পরিচয় দেয়। শুধু তাই নয়, লীগের সদস্য সালেমপুরের রাজা সেই মন্ত্রীমণ্ডলে যোগ দেওয়ায় খলিকুজ্জমাঁ উদ্যোগী হয়ে তাঁকে বহিষ্কৃত পর্যন্ত করেন। ইতিমধ্যে ঐ প্রদেশে একটি মুসলিম আসন শূন্য হয় যাতে লীগ প্রার্থী বিজয়ী হয়েছিলেন। জিন্না এই মর্মে প্রকাশ্য ঘোষণা করেন যে ঐ আসন লীগের এবং কংগ্রেস যেন ওখানে প্রার্থী দেবার চেষ্টা না করে। তবু জিন্নার নির্দেশকে একরকম অগ্রাহ্য করে প্রদেশের মুসলিম লীগ বোর্ড আসনটি বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা রফি আহম্মদ কিদওয়াইকে ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৫] ইতিমধ্যে প্রাদেশিক লীগে আভ্যন্তরীণ বিবাদের কারণ লীগকে নির্বাচনযুদ্ধে জয়ী করার অন্যতম নায়ক কংগ্রেসী ভাবাপন্ন জমায়েৎ-উলেমার সৈয়দ আহম্মদ সহ আরও কিছু কর্মী লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। পদত্যাগকারীদের মধ্যে লীগের জনৈক বিধানসভা সদস্য হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিমও[৬] ছিলেন যিনি পুরাতন কংগ্রেসী। সংযুক্ত প্রদেশে কংগ্রেস সেই মুসলমান বিধানসভা সদস্যকে নিজ দলে গ্রহণ করায় এইভাবে কংগ্রেসী শিবিরে দুইজন মুসলমান বিধানসভা সদস্য হয়ে যায়।

কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই সংযুক্ত প্রদেশের মুসলিম লীগ নেতৃত্ব আশা করে যে তাঁদের প্রতিনিধিও মন্ত্রীমণ্ডলে থাকবেন। যদিও ইতিমধ্যে বুন্দেলখণ্ডের এক মুসলিম আসনের উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস-লীগ বিবাদ বেশ জোর ধরেছে। যাই হোক, প্রদেশে নির্মীয়মান কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলে লীগ নিজের তরফ থেকে খলিকুজ্জমাঁ ছাড়াও প্রাদেশিক লীগের

সভাপতি নবাব মহম্মদ ইসমাইল খাঁর নাম প্রস্তাব করে। গোপালের মতে: জিন্না নিজে অবশ্য কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন বা যাকে তিনি 'যুক্তফ্রন্ট' আখ্যা দিতেন, তার পক্ষে ছিলেন।" এ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত সদস্য মৌলনা আজাদ গোবিন্দবল্লভ পন্থ সহ কংগ্রেস সভাপতি জওহরলালের কাছে গেলে তিনি কোয়ালিশনে তাঁর তীব্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও দীর্ঘ আলোচনার অন্তে অবশেষে রাজী হন এই শর্তে যে "আমরা সংযুক্ত প্রদেশের মুসলিম লীগ দলকে কঠোর শর্ত দেব এবং তারা যদি তা ষোল আনা মেনে নেয় তাহলে তাদের ভিতর থেকে দুইজনকে মন্ত্রীমণ্ডলে নেব।···তবে আমরা তাদের নিজ মূল প্রতিষ্ঠান লীগের সঙ্গে সকল প্রকার সম্বন্ধ বিচ্ছেদের কথা বলিনি···আমরা আশা করেছিলাম যে সংযুক্ত প্রদেশের মুসলিম লীগ মূল প্রতিষ্ঠান থেকে পৃথক হয়ে যাবে···খলিক (খলিকুজ্জমাঁ) দুটি ছাড়া আর সব শর্তে রাজী হয়েছিল এবং এই দুটি হল—লীগের পার্লামেণ্টারী বোর্ডের অবলুপ্তি এবং উপনির্বাচনে পৃথক প্রার্থী না দেওয়া···খলিক বলেছিল যে ব্যক্তিগত ভাবে সে এতে রাজী কিন্তু এরকম করার অধিকার তার নেই। তবে সে এ কথাও জানিয়েছিল যে যে-কোন দিনই এমনটা ঘটতে পারে।"[৭]

জিন্নার সম্মতি ব্যতিরেকেই[৮] খলিকুজ্জমাঁ আপোষের জন্য এতটা হাত বাড়িয়েছিলেন। লখনউ-এ তাঁর সঙ্গে আলোচনার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য মৌলানা আবার জওহরলালের কাছে গেলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে কিছু কিছু কংগ্রেস কর্মীদের চাপের জন্য (জওহরলালের স্বীকারোক্তি অনুসারে তাঁরা জাতীয়তাবাদী মুসলমান এবং সম্ভবতঃ মন্ত্রীত্বের পদাভিলাষী) জওহরলাল বলেন যে বাকী দুটি শর্তও আগাম মেনে না নিলে বোঝা-পড়া হবে না। তাই স্বভাবতই আলোচনা ভেঙে গেল।

ঘটনার যে বিবরণ মৌলানা আজাদ দিয়েছেন তার সঙ্গে পূর্বোক্ত তথ্যের কিছু কিছু বিরোধ থাকলেও একটি মূল বিষয়ে ঐক্য আছে এবং তা হল এ ব্যাপারে জওহরলালজীর ভূমিকা। কিন্তু ডঃ গোপাল এর এক ভিন্ন বয়ান দিয়েছেন[৯] এবং তিনি জওহরলালকে তাঁর "হিরো" রূপে বর্ণনা করেছেন বলে এ প্রসঙ্গে তার বক্তব্যের বিচার করা দরকার। মৌলানার গ্রন্থের লিপিকার হুমায়ুন কবীর পুস্তকের পাণ্ডুলিপি জওহরলালজীকে দেখিয়েছিলেন এবং তিনি এক পত্রের মাধ্যমে তা কোন রকম পরিবর্তন বিনাই প্রকাশ করার পরামর্শ দেন। এছাড়া লোকসভার এক বিতর্ক প্রসঙ্গে (২৩শে মার্চ ১৯৫৯) এই গ্রন্থের কোন কোন বক্তব্য স্মৃতি থেকে লিখিত বলে সঠিক নয়—এই মর্মে পরোক্ষভাবে বলা ছাড়া মন্ত্রীমণ্ডল গঠনের এই ঘটনার বিবরণের কোন রকম প্রকাশ্য প্রতিবাদ নেহরু করেননি। একে অবশ্য ডঃ

গোপাল তাঁর স্বভাবসুলভ ভদ্রতা বশে ব্যাখ্যা করেছেন। সদ্য পরলোকগত বিশিষ্ট সহকর্মীর প্রতি নিছক সৌজন্যবশতঃ জওহরলাল মৌন থেকে এমন গুরুতর অপবাদের বোঝা নিজের ঘাড়ে নেবেন, একথা বিশ্বাস করা দুরূহ। যাই হোক সমঝোতা না হবার কারণ সম্বন্ধে ডঃ গোপালের বক্তব্য : "…লীগের সঙ্গে যে কোন রকমের কোয়ালিশনের তাৎপর্য কংগ্রেসের পক্ষে হিন্দু চারিত্রধর্ম (orientation) স্বীকার করে নেওয়া এবং সকল ভারতবাসীর পক্ষ থেকে কথা বলার অধিকার বর্জন করা।" তাছাড়া, "জওহরলাল এ ব্যাপারে খুব উৎসাহাও ছিলেন না। কারণ কংগ্রেসী মন্ত্রামণ্ডলকে ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা করতে হবে এবং এর পথে জমিদারী স্বার্থের প্রতিভূ লীগের সঙ্গে কোন রকম চুক্তি করার জন্য বাধা আসুক এ তিনি চাইছিলেন না।"

একটু খতিয়ে দেখলেই পূর্বোক্ত যুক্তি দুটির অন্তঃসারশূন্যতা ধরা পড়বে। ইতিপূর্বে উল্লিখিত রাজেন্দ্রপ্রসাদকে লেখা চিঠিতে জওহরলাল লীগের দুজন মুসলমান মন্ত্রী নেবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের রফি আহমদ কিদওয়াইকেও মন্ত্রীমণ্ডলে নেবার কথা জানিয়েছিলেন। সুতরাং কংগ্রেসকে কেবল হিন্দুদের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার কথা উঠতে পারে না। লীগ নেতৃত্ব জমিদারদের সমর্থক ছিল— এ যুক্তিতেও ধার নেই। কারণ সরকারী আশীর্বাদপ্রাপ্ত জমিদারদের এগ্রিকালচারলিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও লীগ জোট বেঁধেছিল এবং শুধু লীগের কর্মসূচীই কংগ্রেসের অনুরূপ ছিল না, ক্ষেত্রবিশেষে জওহরলাল স্বয়ং লীগের প্রার্থীর অনুকূলে প্রচার করেছিলেন (রাজেন্দ্রপ্রসাদকে লিখিত জওহরলালের পূর্বোক্ত পত্র দ্রষ্টব্য)। এছাড়া ঐ সময়ে কংগ্রেসেও যে জমিদারসহ বিত্তবানদের প্রবল প্রভাব ছিল, একথা ডঃ গোপাল তাঁর নেহরু জীবনীতে স্বীকার করেছেন এবং এই কারণে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল জমিদারী উন্মূলন আইন ঐ সময়ে তো করতেই পারেনি। এ কাজ হয় স্বাধীনতার বেশ কয়েক বছর পর। কিন্তু জমির সমান বা ন্যায়সঙ্গত পুনর্বণ্টন স্বাধীনতার এত বছর পরও সম্ভবপর হয়নি। অবিভক্ত বঙ্গে হক্ সাহেবের সঙ্গে কংগ্রেসের কোয়ালিশন বা এমন কি মন্ত্রামণ্ডলের বাইরে থেকেও তাঁর মত কৃষক-দরদী নেতার মন্ত্রীসভাকে সমর্থন সম্ভব না হবার অন্যতম কারণ ছিল ঐ প্রদেশে কংগ্রেস-নেতৃত্বের ভূমির মধ্যস্বত্বভোগী "ভদ্রলোক"দের চারিত্রধর্ম। কারণ হক্ সাহেবের কৃষক প্রজা পার্টি ভাগচাষীদের অধিকার রক্ষা এবং তাদের ঋণের বোঝা কমানোর জন্য ঋণ সালিশী বোর্ড ইত্যাদি গঠন করার যে কর্মসূচী নিয়েছিল তা স্বভাবতঃ বহু কংগ্রেস নেতার স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। কংগ্রেস নেতৃত্বের এই

মধ্যস্বত্বভোগী চারিত্রধর্ম অন্যান্য অনেক প্রদেশেই ছিল।

কংগ্রেস নীতিগতভাবে কোয়ালিশনের বিরোধী ছিল—এ যুক্তিও ধোপে টেকে না। কারণ প্রথমে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এবং তার কিছুদিন পর আসামে কংগ্রেস অন্য দল বা নির্দলীয়দের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। তবে সত্যের খাতিরে একথা স্বীকার করতে হবে যে এ ব্যাপারে একা জওহরলালকে দায়ী করা চলে না। রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর আত্মকথায় বলেছেন যে, "ঐ সময়ে প্রদেশের প্রমুখ কংগ্রেসীরা এতে রাজী হলেন না।"[১০] তাঁদের মধ্যেই এতজন মন্ত্রীত্বের পদাকাঙ্ক্ষী থাকতে উমেদারের সংখ্যা আর বাড়ান কেন? সেই সময়কার সংযুক্ত প্রদেশের একজন যথার্থ আদর্শবাদী ও চরিত্রবান কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, পরে যিনি দীর্ঘকাল প্রদেশের মন্ত্রীপদ অলঙ্কৃত করেন তিনি বর্তমান লেখকের প্রশ্নের উত্তরে যা লিখেছেন, তাতেও এই সত্যের সমর্থন পাওয়া যায়। তাঁর বক্তব্য: "নির্বাচনে কংগ্রেস প্রবল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল। আর কংগ্রেসের স্বার্থপরায়ণতা বৃদ্ধি পেল। জওহরলালও ঐ প্রবাহে ভেসে গেলেন। অথবা বলা যায় যে কংগ্রেসের "অহং"-এর সর্বোচ্চ মাত্রা ছিল তাঁর ভিতরেই। এই কারণে সে সময়ে মুসলমানদের উপেক্ষা করা হয়েছিল। আর তার দুষ্পরিণামও হল প্রবল। পাকিস্তানের জন্মের মূলে এই কারণ। দীর্ঘদিন যাবৎ আমার এই অভিমত পাকিস্তান সৃষ্টির মূল দায়িত্ব আমাদের—হিন্দু সম্প্রদায়ের। অর্থাৎ কংগ্রেসেরও।"[১১]

এ ব্যাপারে সব দায়িত্ব জওহরলালের উপর চাপিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে প্রচার করাও মৌলানার পক্ষে উচিত হয়নি। এই ব্যর্থ আলোচনা থেকে যা স্পষ্ট হয় তা হল পারস্পরিক বিশ্বাস এবং ক্ষমতা ভাগ করে ভোগ করার ইচ্ছার অভাব। নচেৎ জওহরলাল লীগকে "কঠোর শর্ত" দেবার কথা ভাবতেন না এবং খালিকুজ্জমা এতটা এগোতে রাজী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সহযোগিতার হাত প্রত্যাখ্যান করা হত না। শুধু তা-ই নয়, মৌলানাও প্রাদেশিক লীগকে নিম্নোক্ত অবমাননাকর শর্ত দিতেন না:

"সংযুক্ত প্রদেশের বিধানসভায় মুসলিম লীগ দল এক স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসাবে কাজ করা থেকে বিরত থাকবে।

প্রাদেশিক বিধানসভার মুসলিম লীগ দলের বর্তমান সদস্যরা কংগ্রেস দলের অঙ্গীভূত হবেন। তাঁরা কংগ্রেস দলের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলার অধীনে আসবেন।

এই সব সদস্য সহ বিধানসভার যাবতীয় কংগ্রেস সদস্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত নীতিসমূহ এবং বিধানসভার সদস্যদের কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত

কংগ্রেসের ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংগঠনের নির্দেশাবলী বিশ্বস্ততা সহকারে পালন করবেন।

সংযুক্ত প্রদেশের মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের অবলুপ্তি সাধন করা হবে এবং তারপর কোন উপনির্বাচনে উক্ত বোর্ড কর্তৃক কোন প্রার্থী খাড়া করা হবে না। অতঃপর বিধানসভার কোন আসন খালি হলে কংগ্রেস সেই আসনে যে প্রার্থীকে মনোনয়ন দেবে মুসলিম লীগ দলের সমস্ত সদস্য তাঁকে সক্রিয় ভাবে সমর্থন করবেন।"[১২]

এর সঙ্গে সঙ্গে ষোল আনা দলীয় সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মন্ত্রী হবার জন্য খলিকুজ্জমাঁকে কংগ্রেসের শপথ বাক্য লিখিত ভাবে স্বীকার করে দলের পুরোপুরি সদস্য হবার জন্য যে প্রস্তাব দেওয়া হল, তার পরিণাম যা হবার তা-ই হল। প্রাদেশিক লীগ নেতারা এই সব শর্তকে স্বহস্তে মৃত্যুপরোয়ানায় হস্তাক্ষর করা বা রাজনৈতিক হারাকিরী করা মনে করলেন এবং আলোচনা ভেঙে গেল। শুধু তাই নয়, এরপর নির্দলীয় ও লীগের পাঁচজন বিধানসভা সদস্যকে কংগ্রেসে গ্রহণ করায় ঐ প্রদেশে মুসলিম জনমতের সর্বাধিক প্রতিনিধি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান লীগ নেতৃবৃন্দের মনে কংগ্রেসের প্রতি অবিশ্বাস ও ঘৃণা পুঞ্জীভূত হল। লীগ নেতৃত্বের মনে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন জাগল যে সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম আসনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হবার পর মন্ত্রীমণ্ডলে মুসলমান প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে এ জাতীয় মনোভাব গ্রহণ করা কতটা নীতিসম্মত? আর দল ভাঙানর এই খেলাই বা কতটা সুনীতিসঙ্গত? তাঁদের মনে এই ধারণা দৃঢ়মূল হওয়া আরম্ভ করল যে চিরকালের সংখ্যালঘু হবার জন্য প্রচলিত পদ্ধতিতে ভারতবর্ষে ক্ষমতার ভাগ পাওয়ার সম্ভাবনা কোন দিনই তাঁদের হবে না। ক্ষমতাপ্রাপ্তির ইচ্ছার জন্য লীগ-নেতৃত্বকে নিন্দা করা যায় না। কারণ ক্ষমতাপ্রাপ্তির জন্যই রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনও এক অর্থে ক্ষমতাধীশ ইংরেজদের বদলে ভারতীয়দের ক্ষমতাপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষার পরিণতি। আর গান্ধী-নেহরুর মত অত প্রভাবশালী নেতাদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে ক্ষমতাপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষার জন্য গভর্নরদের প্রতিশ্রুতির জন্য অপেক্ষা না করেই কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডল গঠনের উদাহরণ তো চোখের সামনেই ছিল।

লীগকে সমান মর্যাদা দিয়ে তার সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে নিতে অনিচ্ছার এই ঘটনা প্রসঙ্গে ভারতের তদানীন্তন রাজনীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং কেন্দ্রীয় পরিষদে ইংরেজ গোষ্ঠীর নেতা স্যার পার্সিভ্যাল গ্রীফিথস পরে মন্তব্য করেন: "অপরাপর দলকে বাদ দেবার এই একদেশদর্শী নীতি গ্রহণের পূর্ণ অধিকার কংগ্রেস দলের ছিল এবং সে দল হয়ত একথা ভেবে থাকতে পারে যে তারা স্বাভাবিক পরিষদীয় পদ্ধ-

তিরই অনুসরণ করছে। তবে সন্দেহাতীত ভাবে ঐ পদক্ষেপ ছিল এক বিপজ্জনক কৌশলগত ভ্রান্তির পরিচায়ক। কংগ্রেস-লীগের কোয়ালিশনকে অস্বাভাবিক বা কার্যকরী করার অনুপযুক্ত মনে করার মত সামাজিক বা আর্থিক নীতির ক্ষেত্রে কোন রকম উল্লেখযোগ্য মতবিরোধ ছিল না। তাই সঙ্গত অথবা অসঙ্গত—যে কারণেই হোক, মুসলমানদের তারপর মনে হল যে কংগ্রেস মূলতঃ হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলেই কেবল তাদের মন্ত্রীপদ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়।"[১৩]

॥ ১৭ ॥

সাম্রাজ্যবাদীদের অন্যতম নীতি হচ্ছে শাসিতদের মধ্যে বিভেদের সুযোগ নেওয়া। সুতরাং এই গোলযোগে তারাই বা হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন কেন? ইংরেজ সরকার ভাল ভাবেই জানত যে ছোটলাটদের কাছ থেকে কংগ্রেস তাঁদের বিশেষ অধিকার প্রয়োগ না করার যে আশ্বাস চেয়েছে তার উদ্দেশ্য হল জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজকর্মে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধিদের হস্তক্ষেপ না করার গণতান্ত্রিক প্রতিশ্রুতি। কিন্তু জল ঘোলা করার উদ্দেশ্যে এর বিরোধ প্রসঙ্গে এবং বিশেষ অধিকারের সপক্ষে ভারত সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড বললেন, "মন্ত্রীমণ্ডলের দ্বারা সংখ্যালঘুদের স্কুলের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া স্পষ্টতঃ কংগ্রেসের কর্মপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কারণ এ জাতীয় পদক্ষেপ আইনের পরিধির অন্তর্গত এবং আদৌ সংবিধানসঙ্গত কার্যকলাপ ছাড়া অপর কিছু আখ্যা দেওয়া চলতে পারে না। সুতরাং গভর্নরদের আর সংখ্যালঘু স্বার্থ রক্ষা করাব উপায় থাকবে না। প্রত্যুতপক্ষে এ জাতীয় কাজ করার সম্ভাবনা সংবিধানের পরিধির মধ্যে থেকে যাবে একথা উপলব্ধি করেই পার্লামেণ্ট রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করেছে।"[১] বলাই বাহুল্য যাঁদের উত্তেজিত করার জন্য পূর্বোক্ত ধরনের প্ররোচনা, তাঁরা তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন। কংগ্রেসের তরফ থেকে লীগের প্রতি অবিশ্বাস লীগের নেতাদের মনেও কংগ্রেসের প্রতি অবিশ্বাসের জন্ম দিল। ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হবার ক্ষোভ ও আক্রোশ তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তা বিদ্বেষে পরিণত হল। সাম্রাজ্যবাদী কৌশল সেই অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়ে লীগ-নেতৃত্ব এবং তাঁদের মাধ্যমে মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশের মনে এই ধারণার সৃষ্টি করতে সাহায্য করল যে কংগ্রেসের দাবির মূলে সংখ্যালঘুদের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক—প্রত্যুতঃ সর্বপ্রকারের উৎসাদনের অভিসন্ধি। আর তাঁদের এই সম্ভাব্য সঙ্কটে পরিত্রাতা হলেন ইংরেজ গভর্নরের দল ও তাঁদের

বিশেষাধিকারসমূহ।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারতশাসন আইনেই অবিশ্বাস ও বিরোধের বীজ নিহিত ছিল। প্রাদেশিক—বিশেষ করে সংযুক্ত প্রদেশের মন্ত্রীমণ্ডল গঠনের ব্যাপারে কংগ্রেসের "কৌশলগত ভ্রান্তি" অনুকূল পবনের কাজ করে এই ভুল বোঝাবুঝি ও বিরোধের আগুনকে লেলিহান করে তুলল। বিরোধের ক্ষেত্রকে দুই ভাগে ভাগ করে আমরা প্রথমে এর সাংবিধানিক দিকের কথা আলোচনা করব।

হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহে এবং বিশেষ করে সংযুক্ত প্রদেশের মন্ত্রীমণ্ডলে লীগ প্রতিনিধিত্বের আশা পোষণ করেছিল কেবল নির্বাচন-পূর্ব সমঝোতার জন্য নয়, সাংবিধানিক প্রাবধানের জন্যও বটে। এ বিষয়ে আইনের ধারা সংখ্যা ৫২ (১) (খ)-তে বলা হয়েছিল যে, "নিজের দাযিত্ব পালনের ব্যাপারে গভর্নরের নিম্নোক্ত বিশেষ দায়িত্বসমূহ থাকবে এবং তা হল: সংখ্যালঘুদের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা।" বলা বাহুল্য "সংখ্যালঘুদের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ" কথাটির বিস্তারিত ব্যাখ্যার অভাবে ভুল বোঝাবুঝির যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। এর লীগ প্রচারিত ভাষ্য হল— ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের আইন অনুসারে মুসলিম জনপ্রতিনিধিদের ভিতব থেকে মুসলমান মন্ত্রী নিয়োগের অধিকার গভর্নরদের। যে যে হিন্দুপ্রধান প্রদেশে লীগ যথেষ্ট সংখ্যক আসন পায় সেখানে সংখ্যালঘু মুসলমান মন্ত্রী নিয়োগ করতে হবে গভর্নরকে এবং লীগ সদস্যদের ভিতর থেকে।

মন্ত্রীদের নিয়োগের ব্যাপারে গভর্নরদের প্রদত্ত নির্দেশের অষ্টম ধারায় বলা হয়: "আমাদের গভর্নর তাঁর মন্ত্রীমণ্ডল নিয়োগের সময নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে তাঁর মন্ত্রীদের বাছাই করার জন্য সবিশেষ প্রয়াস করবেন। মন্ত্রীদের তিনি সেই ব্যক্তির পরামর্শে বাছাই করবেন (এতে বাস্তবে যতটা সম্ভবপর গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যরা থাকবেন) তাঁর বিচারে যিনি সম্মিলিত ভাবে আইনসভায় বিশ্বাস অর্জনে সর্বাধিক সমর্থ। তবে এইভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করার সময়ে সর্বদাই তিনি তাঁর মন্ত্রীদের ভিতর যৌথ দায়িত্বের মানসিকতা অভিবৃদ্ধির কথা স্মরণ রাখবেন।" অর্থাৎ এর উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ ধাঁচের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সরকার গঠন যার পরিণামে মন্ত্রী-মণ্ডলীর যৌথ দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর হয়। এতদনুসারে গভর্নররা অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহের বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের দল হিসাবে কংগ্রেসকে মন্ত্রীমণ্ডল গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু এর ফলে কংগ্রেসের সামনে অপর একটি সমস্যা খাড়া হল। ক্ষমতালোভে বঞ্চিত ক্ষুব্ধ ও হতাশাপীড়িত লীগনেতৃত্ব তাঁদের স্বধর্মীদের এই কথা বলা শুরু করলেন যে দলীয় সরকারের কংগ্রেসের ব্যাখ্যা

অনুসারে অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহের বিধানসভায় শাসকগোষ্ঠীতে সর্বদাই হিন্দুরা থাকবেন আর বিরোধীগোষ্ঠীতে থাকবেন মুসলমানরা। আর এ জাতীয় পরিস্থিতিতে বিরোধী অর্থাৎ মুসলমান সংখ্যালঘুরা কদাপি শাসকগোষ্ঠীতে পরিণত হবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারবেন না। তাহলে এদেশে মুসলিম সংখ্যালঘুদের ভবিষ্যৎ কি? তাঁরা রাজনৈতিক ক্ষমতা পাবেন কি ভাবে?

লীগ নেতৃত্ব গভর্নরদের প্রতি প্রদত্ত নির্দেশের দশম ধারার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যেখানে বলা হয়েছে: "আমাদের গভর্নর সংখ্যালঘুদের ন্যায়-সঙ্গত স্বার্থ সুরক্ষিত করার তাঁর বিশেষ দায়িত্বের ব্যাখ্যা এইভাবে করবেন যাতে সংখ্যাল্পতা অথবা শিক্ষা বা আর্থিক ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা কিংবা অপর কোনবিধ কারণে যে সব জাতীয় ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা বিধানসভায় বিশেষ প্রতিনিধিত্বপ্রাপ্ত এবং যাঁরা যৌথ রাজনৈতিক কাযকলাপের উপর নিজেদের কল্যাণসাধনের জন্য পূর্ণতঃ নির্ভর করতে অসমর্থ, সামান্যতঃ তাঁদের কোন অসুবিধা না হয় কিংবা তাঁদের মনে আশঙ্কা, উপেক্ষা বা উৎপীড়নের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণের উদ্রেক না হয়। তবে সংখ্যা-গরিষ্ঠদের সঙ্গে কোন বিষয়ে নিছক ভিন্ন মত পোষণ করার জন্য কোন গোষ্ঠী তাঁর সংরক্ষণের অধিকারী হবেন না।"

গভর্নররা মনে করলেন যে সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার তাঁদের বিশেষ দায়িত্ব কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্তির দ্বারা পালিত হয়েছে। তাঁদের ভূমিকার সমর্থনে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের আইনের পূর্বসূরী জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটির প্রতিবেদনের সেই অংশ (প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ১১) ছিল যাতে এ জাতীয় পরিস্থিতির অনুমান করে বলা হয়েছিল, "ভারতবর্ষে··· দল বলতে আমরা যা বুঝি তার অস্তিত্ব নেই এবং এমন কোন উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক অভিমতের সংগঠন নেই যাকে গতিশীল আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। তার পরিবর্তে আমরা হিন্দু-মুসলমানদের যুগ যুগের বিরোধিতার সম্মুখীন হই এবং এগুলি কেবল দুটি ধর্মমতের নয়, দুই ভিন্ন সভ্যতার প্রতিনিধি।" প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা ৬২ ৬৩-তে বলা হয়েছিল: "তবে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে ভবিষ্যতে প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলী-গুলির দুটি দিক থেকে অতীতের তুলনায় অধিকতর অসুবিধা দেখা দেবে। প্রথমতঃ তারা আর সরকারী সদস্যদের উপর নির্ভর করতে পারবে না যার সম্বন্ধে সাইমন কমিশন বলেছে যে, আজকের আইনসভায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ভার-অসাম্য হ্রাস করার পক্ষে এ সহায়ক এবং এর অস্তিত্বের ফলে মন্ত্রীদের স্বপদে বহাল থাকা অপেক্ষাকৃত কম সঙ্কটজনক হয়েছে।" দ্বিতীয়তঃ ইতিপূর্বেই আমরা যেমন উল্লেখ

করেছি প্রতিটি মন্ত্রীমণ্ডল যৌগিক ধরনের (composite) হবে। আইনসভাগুলির প্রতিনিধিত্ব হবে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে এবং গভর্নরকে তাঁকে দেওয়া নির্দেশ অনুসারে দেখতে হবে যে গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা যেন যথাসম্ভব তাঁর মন্ত্রী-মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হন। এইভাবে গঠিত মন্ত্রীসভার লক্ষ্য হবে প্রতিনিধিত্বমূলক হওয়া—যদিও ইংলণ্ডের ধরনে নয়। সেদেশে কোন একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা এমন কি কোয়ালিশন দল দ্বারা এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এখানে এতদ্ব্যতিরেকে সংখ্যালঘুদের যোগদান দ্বারাও মন্ত্রীমণ্ডল প্রতিনিধিত্বমূলক হওয়া দরকার।"

পূর্বোক্ত সাংবিধানিক প্রাবধানিক পরিপ্রেক্ষিতে অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ-সমূহে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল গঠন এবং তৎপরবর্তী মুসলিম লীগের তীব্র প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বিবেচনা করতে হবে।

কিন্তু কংগ্রেসও ছিল নিরুপায়। লীগের ভূমিকার সঙ্গে আপোষ করার অর্থ নিজের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়ে এত দিনের ইতিহাসকে অস্বীকার করা। কংগ্রেস তাই লীগের ভূমিকার বদলে মুসলমান জনসাধারণকে নিজের ধর্ম-নিরপেক্ষতার ভূমিকা বোঝাতে কংগ্রেস সভাপতি জওহরলালজীর উদ্যোগে "মুসলিম গণসংযোগের কর্মসূচী" গ্রহণ করল।

এই প্রসঙ্গে কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের তদানীন্তন রাজনৈতিক দলগুলির চারিত্রধর্ম সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা যেতে পারে। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের চরিত্র ছিল অভিজাত। এর কারণ বিভিন্ন সম্প্রদায় জাতি (cas'e) অথবা গোষ্ঠীতে যাঁরা নিজ নিজ বিশিষ্ট অবদানের জন্য নেতৃস্থানীয় হতেন, তাঁরাই কংগ্রেসেরও নেতা হতেন। খলিকুজ্জমাঁর বিবরণে আমরা দেখেছি যে লীগের চরিত্রও একই ধরনের ছিল, তফাত ছিল কেবল এইটুকু যে ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্মক্ষেত্র শুধু মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। হিন্দু মহাসভা অথবা দেশের আর সব প্রধান রাজনৈতিক প্রতি-ষ্ঠানের অবস্থাও ছিল একই ধরনের। যাই হোক, গান্ধী তাঁর গণমুখী অসহযোগ আন্দোলনের দ্বারা সর্বপ্রথম ভারতীয় রাজনীতির এই অভিজাত ধারার পরিবর্তন করে অন্তত স্থানীয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বহুলাংশে সাধারণ মানুষের ভূমিকাকে শক্তিশালী হয়ে ওঠার পথ করে দেন। কিন্তু কংগ্রেস সহ তাবৎ রাজনৈতিক দলের নিখিল ভারতীয় নেতৃত্ব তো বটেই এমনকি প্রাদেশিক এবং জেলার নেতৃত্বও ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ এবং তার পরও বহুলাংশে অভিজাতই থেকে যায়।

কংগ্রেসের চরিত্রকে আরও গণমুখী করার জন্য গান্ধী ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রচলিত

রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে গঠনকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। সাধারণ মানুষদের মধ্যে তাদের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হয়ে থেকে খাদি কুটীর শিল্প প্রমুখ কর্মসূচীর দ্বারা তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য কাজ করে এবং হরিজন নারী-জাতি ও আদিবাসীদের প্রতি যে বৈষম্য চলছিল তা দূরীকরণের জন্য চেষ্টা করে তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা জাগাবার দ্বারা গান্ধী একেবারে ভিত্তি-ভূমিতে এক গণ-নেতৃত্ব সৃষ্টির প্রয়াস শুরু করে ভারতীয় রাজনীতিকে অভিজাত প্রভাবমুক্ত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু জওহরলাল সহ তখনকার কংগ্রেস নেতৃত্বের একটা বড অংশের এই আদর্শের প্রতি ঔদাসীন্য ও উপেক্ষার ফলে (কারণ তাঁরা নিজেরাই ঐ অভিজাত রাজনীতির সৃষ্টি) গান্ধীর এ প্রয়াস তেমন ব্যাপক বা ফলবতী হয়নি। এছাড়া এ জাতীয় জীবন-সাধনা অভিজাত বা আন্দোলনমূলক রাজনীতির মত অত সহজও নয়। পরবর্তীকালে তাই কংগ্রেসের অভিজাত রাজনীতির শোচনীয় পরিণাম ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও দুর্নীতি দেখে গান্ধীকে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে কংগ্রেসকে ভেঙে দিয়ে গণমুখী রাজনীতির (বিনোবার মতে লোক-নীতি) বাহন লোকসেবক সঙ্ঘ গড়ার পরিকল্পনা রচনা করতে হয়। অবশ্য আকস্মিক মৃত্যুর জন্য পরিকল্পনা রচনা ছাড়া এ ব্যাপারে আর কিছুই তিনি করে যেতে পারেননি। যাই হোক, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জওহরলাল লীগের রাজনীতির দুর্বলতা—তাঁর অভিজাত চারিত্রধর্ম সম্বন্ধে সচেতন হয়ে গণসমর্থনের জন্য গণসংযোগের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন—এ তাঁর দূরদৃষ্টিরই পরিচায়ক। কিন্তু স্বয়ং অভিজাত রাজনীতিধর্মী হবার জন্য তিনি রাজনীতিকে গণমুখী করার উদ্দেশ্যে প্রারব্ধ গান্ধীর গঠনমূলক কর্মসূচীর তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেননি। তাই তাঁর কর্মসূচী গান্ধীর মত কোন প্রত্যক্ষ আর্থিক বা সামাজিক প্রশ্নের সমাধানের প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে কেবল প্রচার ও বক্তৃতা ইত্যাদিতেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং নেহরুর এই প্রয়াসের ব্যর্থতার কারণও এইখানে।

তবু কংগ্রেসের মুসলিম গণসংযোগের কর্মসূচীতে লীগনেতৃত্ব আতঙ্কিত হল এই কথা ভেবে যে এর মাধ্যমে তাদের প্রভাবের একমেব আধারকেই ক্ষয় করে দেবার "ষড়যন্ত্র" হচ্ছে। তাঁরা তাই ভীষণ ভাবে এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন। লীগের ভিতর কট্টর সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব তো বরাবর ছিলই এবং জিন্না প্রমুখ অপেক্ষাকৃত মডারেটদের অনেক দিন ধরে তাদের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে হয়েছে। ইতিমধ্যে অপর একটি ব্যাপার ঘটেছে। মৌলানার উদ্যোগে আহূত এলাহাবাদের ১৭ই মে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের উলেমা সম্মেলন লীগের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে নিঃশর্তে

কংগ্রেসে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় লীগ-নেতৃত্বের মনে তার নিজস্ব ক্ষমতার আঁধার-ভূমির অবক্ষয়ের আশঙ্কা জাগার সঙ্গে সঙ্গে লীগকে বেশী করে কট্টরপন্থীদের হাতে তুলে দেবার কারণ হয়েছে। স্বভাবতই জিন্না আজাদের এই কার্যকে কোনদিনই ক্ষমা করতে পারেননি। যাই হোক, অতঃপর সেই কট্টর গোঁড়া ও প্রাচীনপন্থীরা কংগ্রেসবিরোধী জেহাদে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন। "ইসলাম বিপন্ন" —এই হল তাঁদের ধূয়ো এবং এইটাই হল মন্ত্রীমণ্ডল গঠনোত্তর বিরোধের দ্বিতীয় বা প্রচার-যুদ্ধের দিক।

এ কথা ঐতিহাসিক তথ্য যে জওহরলাল এবং তাঁর মত দু চারজন উদার গণতান্ত্রিক মানসিকতাসম্পন্ন নেতা ছাড়া কংগ্রেসের আর কেউ নিজ প্রতিষ্ঠানের মুসলিম গণসংযোগের কর্মসূচীর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেননি। জওহরলালজীও সংগঠক ছিলেন না বলে এই কর্মসূচী উপস্থাপিত করা এবং এর সপক্ষে ভাসা ভাসা ধরনের আবেগমূলক কিছু বক্তৃতা ও বিবৃতি দেওয়া ছাড়া বিধিবদ্ধ ভাবে এর রূপায়ণের জন্য আর কিছু করতে না পারায় এ কর্মসূচী নিছক শ্লোগান ও প্রচারের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। প্রবল ঢক্কানিনাদ সত্ত্বেও মুসলিম গণসংযোগের যেটুকু রাজনৈতিক কর্মসূচী কংগ্রেস আরম্ভ করেছিল, লীগের সর্বাত্মক আক্রমণের ফলে অত্যল্প কালের মধ্যেই তা সমাপ্ত হয়ে গেল। কারণ ভয়, আশঙ্কা, ঈর্ষা প্রমুখ মানুষের নিম্নতর পর্যায়ের স্ব-ভাবের প্রতি আবেদন চিরকালই তার মহত্তর স্ব-ভাবের প্রতি আবেদনের তুলনায় ত্বরিৎ ও ব্যাপক ফলপ্রসূ হয়ে থাকে।

প্রচারযুদ্ধরূপী লীগের আক্রমণ হল দ্বিমুখী। প্রথমতঃ মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে "বিপন্ন ইসলাম"কে রক্ষা করার জন্য একটা জেহাদী মানসিকতা সৃষ্টি এবং দ্বিতীয়তঃ লীগের ছত্রছায়াতলে মুসলিম-শক্তিকে সংহত করার প্রয়াস। জেহাদী মনোবৃত্তি গড়ে তোলার ভূমিকা সম্বন্ধে সংযুক্ত প্রদেশের লীগ পরিষদ দলের নেতা খালিকুজ্জমাঁর জবানবন্দী উল্লেখনীয়: "কৌশলের দিক থেকে আমি এই কথা ভাবলাম যে বিধানসভায় কংগ্রেসের সরাসরি বিরোধিতার দ্বারা আমরা কেবল মুসলিম লীগেই নবপ্রাণ সঞ্চার করতে সমর্থ হব না, মুসলিম জনসাধারণের মধ্যেও নবোদ্দীপনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হব। কারণ ইতিমধ্যেই তাঁরা অতীব অধীর ও চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন এবং আমাদের কংগ্রেস-রাজনীতির বিরোধিতা গণ-মনকে মুসলিম লীগকেন্দ্রিক করার সূত্রপাত করবে। কারণ তাঁরাও শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, উভয় সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও যেসব পরিবর্তন ঘটছিল তা লক্ষ্য করছিলেন।"[২] স্থানান্তরে তিনি বলেছেন, "...বিধান-

সভার মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গেল এবং কোন বিল বা মোশানকেই বিনা বিরোধিতায় স্বীকার করা হত না। মুলতুবী প্রস্তাব একটা প্রথা হয়ে দাঁড়াল। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা পরাজিত হতাম। কিন্তু এই লড়াই আমাদের দুর্বল করার পরিবর্তে বিধানসভার মধ্যে আমার সহকর্মীদের মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করত এবং বিধানসভার বাইরে মুসলমান সম্প্রদায়ের মনোবলকেও প্রভাবিত করত।"[৩]

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিধানসভার বিতর্ক ছাড়াও উত্তর প্রদেশের কয়েকটি উপনির্বাচন মুসলিম-মানসে এই দুয়োরাণীর পুত্রসুলভ মানসিকতাসঞ্জাত সঙ্গী—বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রসারে সহায়ক হয়েছিল। মন্ত্রীমণ্ডল গঠনের পূর্বে বুন্দেলখণ্ডের উপনির্বাচনে লীগ প্রার্থীর সপক্ষে আল্লা ও কোরাণের দোহাইযুক্ত উর্দু ইস্তাহার বিলি করা হয়েছিল এবং এতে এমন কি জিন্নার নামও যুক্ত করা হয়েছিল। অবশ্য জওহরলালের চিঠির উত্তরে জিন্না জানিয়েছিলেন যে তাঁর অজ্ঞাতসারে এবং সম্মতি ব্যতিরেকে তাঁর নাম ঐ ইস্তাহারে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া ঐ নির্বাচনে মুসলিম ভোট পাবার জন্য মোল্লা-মৌলভীদেরও কাজে লাগানো হয়।[৪] কিন্তু বিজনোর উপনির্বাচনের সময় লীগের সাম্প্রদায়িকতাবাদী প্রচার তুঙ্গে উঠেছিল।[৫] ইসলাম বিপন্ন, কংগ্রেস ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর, কংগ্রেসী রাজত্বে আল্লার বদলে গান্ধীর সামনে প্রণতি করতে হবে, কংগ্রেস উর্দু ভাষা ও তার লিপির লোপ করবে, তাজিয়া ও গো-কোরবানী বন্ধ হয়ে যাবে এবং সবাইকে পাজামার বদলে ধুতি পরতে বাধ্য করা হবে ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবর্ধনকারী অপপ্রচার হতে থাকে। এর সঙ্গে আগে পরে যুক্ত হয় জাতীয় পতাকা (গোড়ায় কংগ্রেস দলের হলেও ক্রমশঃ ঐতিহাসিক কারণে জনমানসে তা জাতীয় পতাকার মর্যাদা পায়), বিধানসভায় বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত।[৬] কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলসমূহ কর্তৃক সরকারী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের প্রোৎসাহন[৭] দিয়ে মুসলিম সংস্কৃতিকে খর্ব করা এবং এমন কি কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল কর্তৃক প্রবর্তিত গান্ধীজীর বৃত্তিমূলক বুনিয়াদী শিক্ষা, বিদ্যামন্দির (পৌত্তলিকতার প্রভাবযুক্ত অভিযোগে) নামে সরকারী বিদ্যালয় স্থাপন এবং আরও কিছু কিছু কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসকে হিন্দু-প্রতিষ্ঠান নাম দিয়ে তার বিরোধ। আদর্শ শাসন-ব্যবস্থাকে গান্ধী কর্তৃক "রামরাজ্য" আখ্যা দেওয়াও মুসলমানদের মধ্যে কম বিভ্রান্তি সৃষ্টির কারণ হয়নি। কংগ্রেসের জনৈক মুসলমান নেতা ঐ সময়ে রেলগাড়িতে সফরকালীন এক লীগ কর্মী দ্বারা ছুরিকাহত হলেও কোন দায়িত্বশীল লীগ-নেতা তার প্রকাশ্য নিন্দা পর্যন্ত করেননি। সংক্ষেপে সংযুক্ত প্রদেশের রাজনীতিকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস ও

লীগ একরকম প্রকাশ্য যুদ্ধের পথ গ্রহণ করে।

কিঞ্চিৎ বিলম্বে হলেও কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল লীগের সঙ্গে এই বিবাদ মিটিয়ে ফেলার জন্য নবাব মহম্মদ ইসমাইল খাঁ ছাড়াও জিন্নার সঙ্গে প্রথমে সংবাদপত্রের বিবৃতির মাধ্যমে এবং তারপর প্রত্যক্ষ পত্রযোগে বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে জিন্না আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে এমন এক অনমনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, যা অতঃপর প্রায় তাঁর স্বভাবের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সঠিক কি অভিযোগ জওহরলালের চিঠির উত্তরে জিন্না খুলে না লিখে বলবেন যে তা সর্বজনবিদিত। আর সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁর উক্তি থেকে কিছু উদ্ধৃত করে সেই-টাই তাঁর অভিযোগ কি না জানতে চাইলে তিনি বলবেন যে তাঁর বক্তব্য যথাযথভাবে উদ্ধৃত হয়নি অথবা তার অপলাপ করা হয়েছে। জিন্না নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনার বিরোধী নন। কিন্তু মতভেদের কোন্ কোন্ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা দরকার তা খুলে লিখবেন না—বলবেন এসব চিঠিতে লেখার বিষয় নয়। জওহর-লাল-জিন্নার পত্রালাপে দেখা যায় যে জিন্নার এই অদ্ভুত নেতিবাচক ভূমিকার জন্য একটা সমাধানে উপনীত হতে উৎসুক জওহরলালের শ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম। অবশেষে হতাশ হয়ে আহমেদাবাদের মুসলমানদের এক সভায় (১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৭) তিনি ঘোষণা করলেন যে মুসলিম লীগের অস্তিত্ব মাত্র কয়েকটি প্রদেশে এবং "তাও উচ্চ বর্ণের কিছু সংখ্যক মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।" সুতরাং ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কংগ্রেসের কোনরকম বোঝাপড়া সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য জিন্নার তরফ থেকে এর কঠোরতর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। তবে সেই প্রসঙ্গে যাবার পূর্বে আর দুটি বিষয়ের উল্লেখ করে নেওয়া দরকার।

প্রথমটি হল রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে জিন্নার নূতন ধারা, অতঃপর যার প্রবল প্রভাব ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পরিলক্ষিত হবে। এ সম্বন্ধে তাঁর এক আধুনিক জীবনীকার মন্তব্য করেছেন: "ঘড়ির দোলকধর্মী আলাপ-আলোচনায় তিনি চরম কুশল ছিলেন। জিন্না প্রথমে কোন বিরুদ্ধবাদীর দুর্বল দিকগুলি খুঁজে বার করতেন এবং তারপরই প্রতিপক্ষের অসুরক্ষিত দিকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন। এই প্রক্রিয়ায় ভূতপূর্ব 'শত্রু'কে নিজের ক্ষেত্রে নিয়ে আসার জন্য সর্বদাই তিনি নিজ ভূমিকার পরিবর্তন করতেন। এতে আশ্চর্যের কি আছে যে উভয়পক্ষই তাঁকে অবিশ্বাস করবেন। তবুও উভয়পক্ষ তাঁর শক্তিকে খাটো করে দেখতেন এবং এই প্রক্রিয়ায় একথা উপলব্ধি করতে পারতেন না যে তিনি প্রত্যুত তাঁর মক্কেলদের জন্য ব্রিটিশ ও কংগ্রেস প্রতি পদক্ষেপে যেসব সাংবিধানিক সুযোগ-সুবিধা দিতে ইচ্ছুক,

তা আদায় করে নেবার অত্যন্ত কুশলী ব্যবহারজীবী। যখনই কোন পক্ষ মনে করত যে এবারে তাঁকে বেশ বাগে পাওয়া গেছে, জিন্না একবার ঘুরপাক খেয়ে অবলীলাক্রমে তার আয়ত্তের বাইরে চলে যেতেন।"[৮]

দ্বিতীয় বিষয়টি হল মধ্যস্থ হবার জন্য গান্ধীর প্রতি তাঁর স্বতঃপ্রবৃত্ত অনুরোধ। এর মূলে সম্ভবতঃ জওহরলালের প্রতি তাঁর তীব্র বিরূপতা। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কংগ্রেস পরিষদ দলের নেতা এবং হবু প্রধানমন্ত্রী বালাজী খের জিন্নার সঙ্গে দেখা করেন। ঐ প্রদেশের বিধানসভায় কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও একক সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল না। খেরের উদ্দেশ্য ছিল বিধানসভার ২০ জন লীগ সদস্যের সমর্থনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া এবং লীগের দুইজন সদস্যকে নিজ মন্ত্রীমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত করা। তাঁর মাধ্যমে জিন্না ওয়ার্ধার আশ্রমে গঠনকর্মে আত্মনিয়োগকারী মহাত্মাকে একটি "বিশেষ গোপন বার্তা" জানালেন। গান্ধী ২২শে মে জবাব দিলেন :

"খের আমাকে আপনার বার্তা জানিয়েছেন। কিছু করার ইচ্ছা আমার খুবই ; কিন্তু আমি একান্ত ভাবেই অসহায়। ঐক্যে (হিন্দু মুসলিম) আমার বিশ্বাস চিরকালের মতই প্রবল। কেবল নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে আমি দিবালোকের কোন আভাসই দেখতে পাচ্ছি না। এই দুঃখজনক স্থিতিতে আমি ঈশ্বরের কাছে আলোর জন্য উচ্চ কণ্ঠে প্রার্থনা জানাচ্ছি।"[৯]

সংক্ষিপ্ত এই চিঠিটির বক্তব্য কয়েক মাস পরে দুই নেতার পত্রালোচনায় যথেষ্ট গুরুত্ব পায় বলে এর সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা বাঞ্ছনীয়। চিঠিটিতে মর্মস্পর্শী হতাশার ছাপ স্পষ্ট যা গান্ধীর স্বভাবসঙ্গত নয়। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সম্ভাবনা সম্বন্ধে তিনি নিরাশ হননি, একথা চিঠিতেই স্পষ্ট। তবে কেন তিনি আশার আলো দেখতে পাচ্ছিলেন না, যার জন্য জিন্না কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়েও কোন সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার ব্যাপারে তিনি নিজেকে অসমর্থ জ্ঞান করলেন ? বাধা কি ভিতর থেকে—তাঁর আপনজনদের কাছ থেকে ? এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও গবেষণাসাপেক্ষ। কারণ, এই পত্রের পটভূমিকা সম্বন্ধে টেণ্ডুলকর এবং গান্ধীর সম্পূর্ণ রচনাবলীর সম্পাদকেরা মৌন। অনুরূপভাবে অপর একটি ঘটনার উপরও আলোকপাত হওয়া প্রয়োজন এবং তা হল মৌলানার দেওয়া এই তথ্য যে সংযুক্ত প্রদেশে মুসলিম লীগকে মন্ত্রীসভায় না নেবার ভুল সংশোধন করার জন্য হস্তক্ষেপ করতে তাঁর অনুরোধে গান্ধী প্রথমে সম্মত হলেও পরে জওহরলালের প্রভাবে মত পরিবর্তন করেন।[১০]

তবে পরবর্তীকালে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৩৭) এরকম আভ্যন্তরীণ বাধার প্রমাণ মেলে। ২৫শে সেপ্টেম্বর জিন্নার ব্যক্তিগত বন্ধু ও তদানীন্তন কংগ্রেস নেতা দেওয়ান চমনলাল এবং অপর একজন কংগ্রেস নেতা রায়জাদা হংসরাজ গান্ধীকে এক পত্রে লেখেন যে জিন্না, "সাম্প্রদায়িক সমস্যা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সম্বন্ধে কেবল আলোচনা করতেই প্রস্তুত নন, একটা বোঝাপড়াতেও উপনীত হতে ইচ্ছুক।" পত্রের নকল কংগ্রেস সভাপতি জওহরলালকে ২৮শে সেপ্টেম্বর পাঠিয়ে তিনি তাঁকে উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন। চমনলালের পত্রে অসন্তুষ্ট নেহরু গান্ধীকে ৩০শে সেপ্টেম্বর লেখেন যে, "...এই সময়ে আপনার ও জিন্নার মধ্যে একটি সাক্ষাৎকার কেবল নিরর্থকই হবে না, ক্ষতিকারকও হতে পারে।"[১১] গান্ধী বল্লভভাইকে অক্টোবরের প্রথম পক্ষে লিখিত এক পত্রে জানান, "বর্তমানে জিন্নার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের কোন সম্ভাবনা দেখছি না। জওহরলাল এটা চায় না।"[১২] তাঁর "বিশেষ গোপন বার্তা"য় গান্ধীর সাড়া না দেওয়া জিন্নার মত আত্মম্ভরী ব্যক্তির পক্ষে যে প্রীতিপদ হয়নি, এ আমরা যথাসময়ে দেখতে পাব।

মুসলিম লীগের ছত্রছায়াতলে মুসলিম-শক্তিকে সংহত করার প্রয়াসের যে দ্বিমুখী প্রচারযুদ্ধের প্রতি ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তার অন্যতম শক্তিশালী নিদর্শন বঙ্গের কংগ্রেস-নেতাদের ভুলে ঐ প্রদেশের জনপ্রিয় নেতা ফজলুল হক্‌কে একরকম জোর করে লীগের শিবিরে ঠেলে দেবার কাহিনী ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। নির্বাচনের পর জিন্না ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে ঘুরে খিলাফতের পর দ্বিতীয় বার মুসলিম নবজাগরণের নেতা রূপে নিজের স্থান করে নেবার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় মুসলমান নেতাদের লীগের পতাকাতলে সমবেত করতে লাগলেন। তাঁর মূল বক্তব্য—যৎকিঞ্চিৎ ক্ষমতা পেয়েই যদি কংগ্রেস মুসলমানদের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান লীগের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে ভোগ না করে এক হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এই ভাবে কাজ করছে, তাহলে ইংরেজ চলে গেলে কি হবে? মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য তাই সবার মুখে যেন সম্মিলিত শ্লোগান উঠল—লীগের লখনউ অধিবেশনে চল।

লখনউ-এ ১৪ই অক্টোবর লীগের বাৎসরিক অধিবেশনে ভারতবর্ষের প্রায় সব প্রদেশ থেকে যে ৫০০০ প্রতিনিধি একত্র হয়েছিলেন, তার মধ্যে নির্বাচনের পূর্বে লীগের পতাকাতলে সমবেত নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ছিলেন লীগের পরলোকগত বিখ্যাত নেতা স্যার শফীর জামাতা মিঞাবশীর আহমদ এবং সর্বোপরি পাঞ্জাব ও বঙ্গের প্রধান মন্ত্রীদ্বয়—স্যার সেকেন্দর হায়াৎ খাঁ এবং ফজলুল হক্‌।[১৩] লখনউ-এর ঐ

অধিবেশনে স্যার সেকেন্দর ও তাঁর ইউনিয়নিস্ট পার্টিকে উদার শর্তে (স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখা সত্ত্বেও) লীগে গ্রহণ করে বর্তমান পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অঙ্গ পাঞ্জাবে লীগের দুর্গ প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করা হয়। হক্ সাহেবের মাধ্যমে[১৪] পূর্ব ভারতের অপর মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ বঙ্গেও জিন্নার প্রভাব বিস্তৃত হয়। অনুরূপ ভাবে সাময়িক ভাবে হলেও আসামের প্রধান মন্ত্রী স্যার শাদুল্লার মাধ্যমে ঐ প্রদেশ লীগের প্রভাবে আসে। সম্মেলনে একদিকে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলের প্রতি মুসলমানদের ধিক্কার এবং অপর দিকে মুসলিম সংহতির নিদর্শন জিন্না ও লীগকে যুযুধান ভূমিকা নিতে অনুপ্রাণিত করে। সভাপতির বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ১৫ই অক্টোবর জিন্না বলেন :

কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃত্ব—বিশেষ করে বিগত দশ বছরে—একান্ত ভাবে হিন্দু নীতি অনুসরণ করার ফলে ভারতবর্ষের মুসলমানদের ক্রমশঃ অধিকাধিক মাত্রায় বিচ্ছিন্নতাবাদের শিকারে পরিণত করার জন্য দায়ী। আর যখন থেকে তাঁরা সংখ্যা-গরিষ্ঠতার বলে ছয়টি প্রদেশে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করেছেন, নিজেদের উক্তি, কার্য ও কর্মসূচীর দ্বারা উত্তরোত্তর এই কথা প্রমাণ করেছেন যে তাদের হাতে মুসলমানরা কোন ন্যায়বিচার আশা করতে পারে না।…আমি জোর দিয়ে একথা বলতে চাই যে কংগ্রেস দলের বর্তমান নীতির পরিণাম হবে শ্রেণীবিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ এবং তার পরিণামে সাম্রাজ্যবাদীদের কর্তৃত্ববৃদ্ধি।"[১৫]

আদর্শ নেতার মত প্রতিনিধিদের উদ্দীপ্ত করার উদ্দেশ্যে ত্যাগ তপস্যা ও তিতিক্ষার আবেদন জানিয়ে তাঁদের সংগ্রামী বৃত্তি গড়ে তোলার জন্য অতঃপর জিন্না বললেন :

"নিজেদের সংগঠিত করুন, আপন সংহতি ও সম্পূর্ণ ঐক্য প্রতিষ্ঠা করুন। প্রশিক্ষিত এবং সুশৃঙ্খল সৈন্যদের মত নিজেদের গড়ে তুলুন।…শ্রম, কৃচ্ছ্রসাধন ও আত্মত্যাগ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহ কিছু পাবার যোগ্যতা অর্জন করে না। এমন অনেক শক্তি আছে যা আপনাদের ভয় দেখাবে, আতঙ্কিত করবে, আপনাদের উপর চাপ দেবার চেষ্টা করবে। এসবের জন্য আপনাদের হয়ত দুর্ভোগও ভোগ করতে হতে পারে। কিন্তু এইসব অত্যাচার-উৎপীড়নের অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে চলেই…এইসব অসুবিধা, কষ্ট এবং নিগ্রহের সম্মুখীন হয়ে তার প্রতিরোধ ও জয়ের মাধ্যমে, আপনাদের যথার্থ বিশ্বাস ও আনুগত্য বজায় রেখে একটি জাতির আবির্ভাব হবে। সেই জাতি হবে তার অতীত গৌরব ও ইতিহাসের উপযুক্ত এবং কেবল ভারতেই নয় বিশ্বের পটভূমিকায় নিজেদের ভবিষ্যৎ ইতিহাসকে মহত্তর ও

অধিকতর গৌরবমণ্ডিত করার জন্য বেঁচে থাকবে। ভারতবর্ষের আট কোটি মুসলমানের ভীত হবার কিছু নেই।"[১৬]

লখনউ-এ জঙ্গী সাম্প্রদায়িক মুসলিম নেতা রূপে জিন্নার যেন পুনর্জন্ম হল। খলিকুজ্জমাঁ স্বীকার করেছিলেন যে লীগের ঐ অধিবেশনের প্রথম দিনের বক্তৃতায় ঐ জাতীয় জঙ্গী সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানো হয়। জিন্নার ঐ বক্তৃতায় দ্বিজাতি তত্ত্বের আভাসও স্পষ্ট। লখনউ-এ লীগ গভর্নরদের কংগ্রেসের ইচ্ছামত মন্ত্রীসভা গড়তে দিয়ে সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার তাদের বিশেষ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য তাঁদের নিন্দা করার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, "অখিল ভারত মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য হবে ভারতবর্ষে স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাজ্যসমূহের ফেডারেশনের ভিত্তিতে এক পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, যেখানকার সংবিধানে মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের অধিকার ও স্বার্থ যথাযথ ও কার্যকরীভাবে সংরক্ষিত হবে।"[১৭] তখনও লীগ ভারত ব্যবচ্ছেদের দাবি জানাচ্ছে না, চাইছে সংখ্যালঘুদের জন্য রক্ষাকবচ। ভারতবিভাগের সপক্ষে প্রকাশ্যে ঘোষণা করার জন্য লীগ-নেতৃত্বকে আরও আড়াই বছর সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

॥ ১৮ ॥

জিন্নার ঐ যুদ্ধং দেহি বক্তৃতার বিবরণ পড়ে ১৯শে অক্টোবর গান্ধী তাঁকে লিখলেন:

"আপনার লখনউ-এর বক্তৃতা আমি মনোযোগ সহকারে পড়ার পর আমার দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে আপনার ভুল ধারণার পরিচয় পেয়ে গভীর ভাবে আহত বোধ করেছি।[১] আমার চিঠি আপনার কাছ থেকে পাওয়া আপনার এক বিশেষ ব্যক্তিগত সমাচারের উত্তর স্বরূপ ছিল। এতে আমি আমার হৃদয়ের গভীর অনুভূতি ব্যক্ত করেছিলাম। চিঠিটি ছিল একান্ত ভাবে ব্যক্তিগত। তাকে আপনি যে ভাবে ব্যবহার করেছেন তা কি উচিত হয়েছে?

"আপনার বক্তৃতা পড়ে মনে হল তা আগাগোড়াই যেন এক যুদ্ধ-ঘোষণা। আমি কেবল এইটুকু আশা করেছিলাম যে আমার মত এক বেচারাকে আপনি উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্বরূপ বিশেষ প্রয়োজনে কাজে লাগাবেন। আমার খুবই দুঃখ হয়েছে। ঝগড়া করতে হলে দুজনের দরকার হয়। আমি যদি শান্তি সংস্থাপক নাও হতে পারি তাহলেও আমাকে অন্ততঃ বিবাদের এক পক্ষ হিসাবে পাবেন না।"[২]

জিন্না যেন এই সুযোগেরই প্রতীক্ষায় ছিলেন। তাঁর প্রস্তাবকে উপেক্ষা করার জন্য গান্ধীকে মনের মত জবাব দেবার সুযোগ তিনি পেয়ে গেলেন। ৫ই নভেম্বরের চিঠিতে গান্ধীর বক্তব্য সাধারণ্যে প্রকাশ করার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করার পর জিন্না জানালেন: "আমার লখনউ-এর বক্তৃতাকে আপনি যুদ্ধঘোষণার সমতুল্য মনে করেছেন বলে আমি দুঃখিত। ও বক্তৃতা নিছক আত্মরক্ষার প্রেরণাসঞ্জাত। দয়া করে ওটি আর একবার পড়বেন এবং আমার বক্তব্য বোঝার চেষ্টা করবেন। নিঃসন্দেহে আপনি গত বার মাসের ঘটনা-প্রবাহ অনুসরণ করছিলেন না।

"আপনাকে এক 'যোগসূত্র' এবং 'শান্তি-সংস্থাপক' রূপে বিশেষ প্রয়োজনে কাজে লাগানোর সম্বন্ধে আমি বলতে চাই যে আপনি কি মনে করেন না যে এই এতগুলি মাস আপনার একেবারে নীরব থাকা আপনাকে কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে একাত্ম করেছে—যদিও আমি জানি যে আপনি ঐ প্রতিষ্ঠানের এমন কি চার আনার সদস্যও নন।"

এ চিঠির জবাব দেবার মত কিছু ছিল না এবং গান্ধী মাঝে বেশ অসুস্থও হয়ে পড়েছিলেন। তবু গান্ধী তাঁর চিঠির জবাব দেননি—নেহরুর মুখে মৌলানার কাছে জিন্না এই অনুযোগ করেছেন শোনার পরদিনই (১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের তেসরা ফেব্রুয়ারী) গান্ধী জিন্নাকে যে চিঠি লেখেন তা তাঁর স্বভাবসুলভ নম্রতা ও আন্তরিকতায় ওতপ্রোত ছিল। বিগত ২২শে মের চিঠি সাধারণ্যে প্রকাশ করার জন্য তাঁর ক্ষোভের কথা পুনর্বার জানিয়ে গান্ধী লিখলেন:

"আপনি আমার নীরবতার জন্য অভিযোগ করেছেন। আমার নীরব থাকার কারণ অক্ষরশঃ এবং যথার্থই আমার লেখায় আছে। বিশ্বাস করুন, উভয় সম্প্রদায়কে কাছাকাছি আনার জন্য যে মুহূর্তে আমি কিছু করার মত হব, পৃথিবীর কোন শক্তিই আমাকে তার থেকে বিরত রাখতে পারবে না।

"আপনার বক্তৃতা যে যুদ্ধ-ঘোষণার তুল্য ছিল—একথা আপনি অস্বীকার করছেন। কিন্তু আপনার পরবর্তীকালীন উক্তিসমূহও প্রারম্ভিক ধারণার পুষ্টি সাধন করে। যা অনুভূতির ব্যাপার তাকে আমি প্রমাণ করি কি ভাবে? আপনার বক্তৃতাগুলিতে[৩] আমি আর সেই পুরাতন জাতীয়তাবাদীকে খুঁজে পাচ্ছি না। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন আমি দক্ষিণ আফ্রিকার স্বেচ্ছানির্বাসন থেকে প্রত্যাবর্তন করি সকলেই তখন আপনার সম্বন্ধে বলতেন যে আপনি একজন নিষ্ঠাবান জাতীয়তাবাদী এবং হিন্দু ও মুসলমান—উভয় সম্প্রদায়ের আশাস্থল। এখনও কি আপনি সেই মিস্টার জিন্না আছেন? তা যদি বলেন হ্যাঁ, তবে আপনার সাম্প্রতিক বক্তৃতাগুলি সত্ত্বেও

আমি আপনার কথাই মেনে নেব।"[৪]

জিন্নার অন্তরের যে তারটি গান্ধী তাঁর অহিংস আবেদনের দ্বারা স্পর্শ করতে চাইছিলেন, তাতে সফলকাম হলেন না। জিন্না তাঁর ১৫ই ফেব্রুয়ারীর উত্তরে নিজের কৃতকর্মের সমর্থন তো করলেনই, উপরন্তু জিন্নার জাতীয়তাবাদী ভূমিকাকে পুনর্জাগরিত করার আবেদনের প্রত্যুত্তরে জানালেন, "...ও কথা বলা আপনার উচিত হয়েছে বলে কি আপনি মনে করেন? ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে জনসাধারণ আপনার সম্বন্ধে কি বলতেন এবং আজ তাঁরা আপনার সম্বন্ধে কি বলেন বা ভাবেন সে প্রসঙ্গে আমি যাব না। জাতীয়তাবাদ কোন ব্যক্তিবিশেষের একচেটিয়া সম্পত্তি নয় এবং আজকালকার দিনে এর সংজ্ঞার্থ দেওয়াও কঠিন। যাক, আমি বাদবিতণ্ডার এই প্রক্রিয়াকে আর বাড়াতে চাই না।"[৫] ঐ চিঠিতে জিন্না কেবল পত্রবিনিময় না করে সাক্ষাৎ আলোচনার দ্বারা গান্ধীকে সমস্যার সমাধানের কথা বলেন, যদিও তাঁর মতে কোন্ কোন্ বিষয়ে নিষ্পত্তি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে স্পষ্ট জবাব দিলেন না। গান্ধী ২৪শে ফেব্রুয়ারী এর উত্তর দিলেন এবং তার জবাবে জিন্না তেসরা মার্চ যে চিঠি দিলেন তাতে গোলটেবিল বৈঠকের সময়ে হিন্দু প্রতিনিধিদের চাপে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে গান্ধীর অক্ষমতার কথা উল্লেখ করে জিন্না দাবি জানালেন: "আমরা এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়েছি যেখানে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রাখা চলবে না যে অখিল ভারত মুসলিম লীগকে আপনারা ভারতবর্ষের মুসলমানদের একমাত্র প্রামাণ্য ও প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকার করেন এবং আপনারা কংগ্রেস ও দেশের অপর সব হিন্দু প্রতিষ্ঠানদের প্রতিনিধি। একমাত্র এর ভিত্তিতেই আমরা অতঃপর অগ্রসর হতে পারি এবং পরস্পরের কাছে আসার একটা ব্যবস্থার কথা ভাবতে পারি।"[৬] অতঃপর আরও কয়েকটি চিঠি ও তারবার্তার বিনিময়ের পর ২৮শে এপ্রিল উভয় নেতা বোম্বেতে মিলিত হলেন।

ব্যর্থ সেই গান্ধী-জিন্না ও জিন্না-সুভাষ (তখন কংগ্রেস সভাপতি) আলোচনার বিবরণ দেবার পূর্বে লখনউ-এ লীগের অধিবেশনের পর থেকে লীগ সংগঠনের জন্য জিন্নার গৃহীত পদক্ষেপসমূহের উল্লেখ করা প্রয়োজন। লখনউ সম্মেলনে মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের স্বার্থের সংরক্ষণকারী গণতান্ত্রিক রাজ্যসমূহের ফেডারেশন রূপে ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন এবং বন্দেমাতরম্ বিরোধ ও হিন্দির বদলে উর্দুকে সর্বসাধারণের ভাষার মর্যাদা দেবার প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নোক্ত আর্থিক কর্মসূচিও গৃহীত হয়েছিল: "...কারখানার ও অন্যান্য শ্রমিকদের কাজের সময়সীমা নির্ধারণ করা হবে; ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ; শ্রমিকদের আবাস ও স্বাস্থ্যের অবস্থার

উন্নয়ন এবং বস্তির বদলে তাদের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান নির্মাণ ; গ্রামবাসী ও শহর-বাসীর ঋণভার লাঘব করা এবং মহাজনীপ্রথার অবলুপ্তি ; আদালতের ডিক্রিপ্রাপ্ত অথবা অন্য ধরনের তাবৎ ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা।" এর সঙ্গে সঙ্গে সমউদ্দেশ্যে কর্মরত যাবতীয় রাজনৈতিক সংগঠনের সহযোগিতা নেবার নীতিও স্বীকৃত হয়।

এইসব কর্মসূচীর রূপায়নের জন্য যে গণসংগঠন প্রয়োজন তা গড়ার প্রতি এবার জিন্না নজর দিলেন। কংগ্রেসেরই মত লীগের সাধারণ সদস্যভুক্তির অভিযান শুরু হল। তবে লীগের সদস্যদের চাঁদা কংগ্রেসের অর্ধেক অর্থাৎ বার্ষিক দুই আনা নির্ধারিত হল। অত্যল্প কালের মধ্যে লীগের সম্বন্ধে মুসলমানদের মধ্যে গভীর উৎসাহের সঞ্চার হল এবং ৫ লক্ষ মুসলমান প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সদস্য হয়ে লীগের সঙ্গে মানসিক একাত্মতা বোধ করা আরম্ভ করলেন। কেন্দ্রীয় পরিষদে জিন্না এতদিন ইণ্ডিপেনডেণ্ট দলের নেতা ছিলেন, লখনউ-এর প্রস্তাবের ভিত্তিতে অতঃপর সেখানে লীগের পরিষদীয় দল গঠিত হল। বিভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ গঠন করে তাকে কেন্দ্রীয় লীগের সঙ্গে যুক্ত করা হল। এগারটির মধ্যে সাতটি প্রদেশের বিধানসভায় মুসলিম লীগ পার্টি সক্রিয় হয়ে উঠল। লীগে নূতন রক্ত সঞ্চারের জন্য জিন্না ছাত্রদের লীগ অভিমুখী করার প্রয়াস করলেন এবং ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে কলকাতায় অখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের উদ্বোধন করলেন। মুসলিম ছাত্র-সংগঠনকে সাহায্য করার জন্য তিনি পরের বছর জানুয়ারীতে আলীগড়েও গেলেন এবং হিন্দু-রাজের কবল থেকে মুসলমানদের মুক্ত করার উপর জোর দিলেন।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে কলকাতায় অনুষ্ঠিত লীগ কাউন্সিলের সভায় জিন্নার কণ্ঠস্বর গর্জন করে উঠল : "কংগ্রেস প্রধানতঃ হিন্দু প্রতিষ্ঠান।...মুসলমানরা একাধিক বার একথা স্পষ্ট করে বলেছে যে ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা ও ব্যক্তিগত আইন ছাড়াও তাদের অপর একটি সমান গুরুত্বপূর্ণ জীবন-মরণের প্রশ্ন আছে এবং তা হল এই যে তাদের ভবিষ্যৎ ও ভাগ্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকার, জাতীয় জীবন, সরকার ও প্রশাসনে উপযুক্ত অংশ পাবার উপর নির্ভরিত। শেষ পর্যন্ত তারা এর জন্য লড়াই চালিয়ে যাবে।"

লীগের কলকাতার ঐ সভাতেই কংগ্রেসশাসিত প্রদেশসমূহে মুসলমানদের উপর অনুষ্ঠিত নানা অত্যাচার সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পীরপুরের রাজা সৈয়দ মহম্মদের মেহেদীর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয় যা পীরপুর কমিটি নামে সমধিক পরিচিত।

গান্ধী যদিও "ব্যাপকতম অর্থে প্রার্থনায় ও ধর্মীয় মানসিকতায়" জিন্নার বাসগৃহে তাঁর সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, আলোচনার সম্ভাব্য অসফলতার সুস্পষ্ট আভাস ছিল গান্ধীকে লেখা জিন্নার তেসরা মার্চের পূর্বোদ্ধৃত চিঠিতে—লীগকে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান বলে মেনে নিতে হবে এবং গান্ধী হবেন কংগ্রেস ও অন্যান্য হিন্দু-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। ২৮শে এপ্রিল তিন ঘণ্টা আলোচনার পর হিন্দু-মুসলিম প্রশ্ন সম্বন্ধে আরও বিবেচনা করতে হবে—এই মর্মে এক যৌথ বিবৃতির পর আলোচনা মুলতুবী হয়। গান্ধী বললেন যে জিন্নার সঙ্গে ভবিষ্যৎ আলোচনা কংগ্রেস সভাপতিকেই করতে হবে এবং নূতন কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র ১২ই মে এ আলোচনা আবার শুরু করলেন। আগস্ট মাস পর্যন্ত দফায় দফায় আলোচনা, পত্রবিনিময় এবং লীগ ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় দুই দলের নেতাদের পৃথক পৃথক আলোচনা সত্ত্বেও শেষ অবধি কংগ্রেস ও লীগ সভাপতি-দ্বয়ের আলোচনা কোন ফল প্রসব করল না। এর কারণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে—কংগ্রেসের পক্ষে নিজেকে কেবল হিন্দুদের অর্থাৎ এক সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত করা সম্ভব নয় এবং একথাও স্বীকার করা সম্ভব নয় যে লীগই মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে জিন্না অন্যান্য কাজকর্মও চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ১৬ই আগস্ট সিমলায় অস্থায়ী বড়লাট লর্ড ব্রাবোর্নের সঙ্গে তাঁর ও স্যার সিকন্দরের গোপন আলোচনা। সিমলায় তিনি গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় পরিষদের সভায় যোগ দিতে। অস্থায়ী বড়লাটের উদ্যোগে আয়োজিত ঐ সভায় জিন্না ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন আইনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের নিয়ে ফেডারেশন পরিকল্পনা,—কংগ্রেস ও লীগ ভিন্ন ভিন্ন কারণে যার বিরোধিতা করেছে—তাকে চিরতরে বাতিল করার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে প্রভাবিত করলেন। এইভাবে অখণ্ড ভারতের একটি শক্তিশালী সাংবিধানিক সম্ভাবনার অঙ্কুরে বিনাশ ঘটানো হল। ব্রাবোর্নের দেওয়া তথ্যের আধারে তদানীন্তন ভারতসচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড লিখে গেছেন, "জিন্না এই আশ্চর্যজনক প্রস্তাব সহকারে তাঁর বক্তব্যের উপসংহার করলেন যে 'কেন্দ্রের ব্যবস্থা যেন আমরা আজকের মত অপরিবর্তিত রাখি। আর কংগ্রেসী প্রদেশসমূহে আমরা মুসলমানদের **রক্ষা করে** যেন তাদের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করি এবং আমরা তা করলে মুসলমানরাও আমাদের কেন্দ্রে **রক্ষা করবে**'।"[৭]

এই গোপন আলোচনার পটভূমিকার প্রতি কথঞ্চিৎ আলোকপাত করা প্রয়োজন।

ইউরোপে তখন হিটলারের জঙ্গী নীতি আত্মপ্রকাশ করেছে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন তোষণ নীতির দ্বারা হিটলারকে সাময়িক ভাবে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করলেও ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞরা উপলব্ধি করছেন যে আজ না হোক কাল হিটলারের সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য। এই যুদ্ধে সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষার জন্য তার বৃহত্তম অঙ্গ ভারতবর্ষ থেকে সৈন্য ও অর্থসাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য। ভারতবর্ষের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা জওহরলাল জুন মাস থেকে তাঁর ইংলণ্ড ও ইউরোপের সফরে—হয়ত বা বিরোধী শ্রমিক দলের প্ররোচনায়—প্রকাশ্যে ব্রিটিশ নীতির তীব্র সমালোচনা করছেন। যুদ্ধের ব্যাপারে অহিংসায় বিশ্বাসী গান্ধীর সক্রিয় সাহায্য পাওয়া অনিশ্চিত। এ অবস্থায় ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর একটা বৃহৎ অংশ—মুসলমান ও পাঞ্জাবীদের আনুগত্যের জন্য জিন্না এবং পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী স্যার সেকেন্দারের সমর্থন অপরিহার্য। এর জন্য যে দামই দিতে হোক না কেন, সাম্রাজ্যের স্বার্থে তা প্রয়োজনীয়।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকার জন্য ইতিপূর্বে কংগ্রেস নেতাদের মত জিন্নাও ব্রিটিশ সরকারের চোখের বালি ছিলেন। ভারতসচিব স্যার স্যামুয়েল হোর ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল তদানীন্তন বড়লাট লর্ড উইলিংডনকে লিখেছিলেন, "যেসব ভারতবাসীর সঙ্গে আমি মিলিত হয়েছি তাঁদের মধ্যে আমার মনে হয় জিন্নাকেই আমার অপছন্দ সবচেয়ে বেশী। গোলটেবিল আলোচনার সময় আগাগোড়া ভদ্রলোক নিঃসন্দেহে সর্পবৎ আচরণ করেছিলেন এবং কেউ তাঁকে বিশ্বাস করতেন বলে মনে হয় না।"[৮] জিন্না স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে অকস্মাৎ ব্রিটিশ শাসকদের কাছে তাঁর চাহিদা খুবই বেড়ে গেল। শাসকদের কাছে মূল্যবৃদ্ধির গোপন ইতিহাসের প্রথম পর্যায় সিমলার ঐ আলোচনা।

শুধু সৈন্যবাহিনীর কারণই নয়, কেন্দ্রীয় পারিষদেও জিন্না ও তাঁর মুসলীম লীগ পরিষদীয় দলের সহায়তা ব্রিটিশ সরকারের প্রয়োজন ছিল। কারণ সংখ্যায় অল্প হলেও তাঁর দলের ভূমিকা—এমন কি নিরপেক্ষ থাকাও—যে কোন ভোটাভুটির প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নিজের ভবিষ্যৎ লক্ষ্যপূর্তির স্বার্থে জিন্না প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় পরিষদে সরকারকে সে সাহায্য দিতেনও।

তাঁর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী ছিল অক্টোবরের ৮ই করাচীর প্রাদেশিক মুসলীম লীগের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করা। এই অধিবেশনকে লীগ সংগঠন পুষ্ট করার কাজে লাগিয়ে উৎসাহে উদ্দীপ্ত শ্রোতাদের জিন্না তাঁর সভাপতির ভাষণে বললেন, "বিভিন্ন শক্তি আজ দুর্নীতি এবং অসাধু প্রচারের দ্বারা মুসলমানদের ধ্বংস ও বিভক্ত

করার অপকার্যে লিপ্ত। তার বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতব্যাপী মুসলমানদের যে যুদ্ধ চলছে সে সম্বন্ধে আপনাদের সতর্ক হতে হবে এবং যে অখিল ভারত মুসলীম লীগ ভারতবর্ষের মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান তার পিছনে আপনাদের সুসংহত ভাবে স্থান গ্রহণ করতে হবে।"[৯] অদৃশ্য শত্রুদের বিরুদ্ধে জেহাদের আহ্বান জানিয়ে নিজেদের সম্ভাব্য অনুগামীদের সংগঠিত করার যে কৌশল রাজনৈতিক নেতারা সাধারণতঃ অবলম্বন করে থাকেন তা কাজে লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে জিন্না তাঁর বিরোধীদের বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল করার জন্য যোগ করলেন, "মুসলমানরা যদি তাদের জাতীয় লক্ষ্য ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্তির ব্যাপারে পরাজিত হয় তবে তা সম্ভব হবে আমাদেরই মধ্যে যেসব মুসলমান রয়েছেন, তাঁদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য...।"[১০] মুসলমানদের প্রসঙ্গে "জাতীয় লক্ষ্য" শব্দটি প্রয়োগ করার তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। তবে তার সম্যক অর্থ আরও দেড় বছর পর তাঁর লাহোর বক্তৃতায় স্পষ্ট হবে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে প্রাদেশিক মুসলীম লীগের ঐ অধিবেশনে সর্বপ্রথম এক প্রস্তাবের মাধ্যমে বলা হয় যে মুসলমানেরা এক স্বতন্ত্র জাতি (Nation) এবং এই আভাস দেওয়া হয় যে তাঁদের জন্য স্বতন্ত্র বাসভূমি প্রয়োজন। লাহোর প্রস্তাবের পূর্বসূরী ঐ প্রস্তাবের বয়ান নিম্নরূপ: "সিন্ধুর মুসলিম লীগের এই সম্মেলন বিশাল ভারতীয় উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি এবং হিন্দু ও মুসলমান নামে পরিচিত দুটি জাতির অবাধ সাংস্কৃতিক বিকাশ, তাদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি এবং রাজনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বার্থে মনে করে যে মুসলিম ও অমুসলমান অধ্যুষিত রাজ্যসমূহের ফেডারেশনের রূপে ভারতবর্ষের দুটি ফেডারেশনে বিভক্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক।"[১১] জিন্নার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভার ঐ প্রস্তাবের তাৎপর্য অনুধাবনযোগ্য।

জিন্নার জন্মস্থল করাচী সেবার তাঁকে সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা করেছিল। জেলাবোর্ড তাঁকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সংবর্ধনাও জানিয়েছিল। কিন্তু একটি বিষয়ে সিন্ধু প্রদেশ তাঁকে অত্যন্ত নিরাশ করেছিল। প্রধানতঃ মুসলমানদের দাবিতে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী থেকে পৃথক করা ঐ মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে পাঞ্জাব ও বঙ্গের মতই ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রাদেশিক বিধান-সভার নির্বাচনে মুসলীম লীগ বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি—৩৬টি মুসলিম আসনের একটিতেও লীগ বিজয়ী হয় নি। সিন্ধুতে তখন আল্লা বক্সের নেতৃত্বে ও কংগ্রেসের সমর্থনে এক কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় আসীন ছিল। তাবৎ মুসলিম শক্তিকে লীগের পতাকাতলে সংহত করার পরিকল্পনার অঙ্গস্বরূপ জিন্না চেষ্টা করেছিলেন যে অন্ততঃ পাঞ্জাবের স্যার সিকন্দরের মত সহযোগী

হয়েও যেন আল্লা বক্স লীগের সঙ্গে যুক্ত হন এবং কংগ্রেসের উপর নির্ভরতা ত্যাগ করেন। এই উদ্দেশ্যে করাচীতে থাকাকালীন বিধানসভার অনেক সদস্য ও অন্যান্যদের সঙ্গে গোপন শলা-পরামর্শ করে যবনিকার অন্তরালে অনেক কল-কাঠি নাড়ার ব্যাপারে তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। একটি পর্যায়ে সব ঠিক হয়ে গেছে মনে হলেও চরম মুহূর্তে আল্লা বক্স কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করতে অস্বীকার করেন। বলা হয় যে জিন্নার মুখের গ্রাস এইভাবে "কেড়ে নেবার" পরিকল্পনাকার ছিলেন কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের তদানীন্তন সভাপতি বল্লভভাই প্যাটেল। ১৩ই অক্টোবরের সংবাদপত্রের এক বিবৃতিতে জিন্না এজন্য আল্লা বক্স এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্গার করেন।

নভেম্বর মাসে পীরপুরের রাজা তাঁর রিপোর্ট পেশ করেন এবং দিল্লী থেকে মুসলিম লীগ কর্তৃক তা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়। একজন সদস্যবিশিষ্ট ঐ কমিটির রিপোর্টে যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ অর্থাৎ কংগ্রেসী শাসনাধীন প্রদেশ সমূহের সরকার—তাদের কোন প্রতিনিধির সাক্ষ্য না নিয়েই মুসলমানদের বিরুদ্ধে কথিত অভিযোগ সম্বন্ধে একতরফা রায় দেওয়া হয়। অভিযোগের ধরণ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কংগ্রেসী শাসনাধীন কোন প্রদেশে নিজ শাসনের এক বছরের কিছু বেশী সময়ের মধ্যে কখনও কোন পক্ষপাতের ঘটনা ঘটে নি অথবা কোন মুসলমানকে তার শিকার হতে হয় নি এমন কথা জোর করে বলা যায় না। সর্বদেশে ও সর্বকালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের পক্ষপাত এক সামাজিক ও নৈতিক ব্যাধি।[১২] আর দুর্ভাগ্যক্রমে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কংগ্রেসী শাসনের সময়ে এবং তার আগে পরে কংগ্রেস-শাসন-বহির্ভূত প্রদেশসমূহেও হয়েছে। সে সবের উস্কানীদাতা কখনও হিন্দু, কখনও বা মুসলমান। অন্যান্য অভিযোগও যুক্তির কষ্টিপাথরে খুব একটা টেঁকে না। তবে শাসন-ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তরের নেতৃত্ব অর্থাৎ মন্ত্রীমণ্ডল পরিকল্পিত ভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পক্ষপাত করেছেন, এর কোন প্রমাণ পীরপুর কমিটি ছাড়াও লীগের তরফ থেকে অভিযোগের আর যে দুটি সূত্র (ফজলুল হকের **Muslim Sufferings under Congress Rule** এবং বিহারের লীগের প্রচার সমিতির এস. এম. শরীফের **Some Grievances of the Muslim, 1938-39**) নিয়ে উচ্চকণ্ঠে সর্বত্র প্রচার করা হয়, তাতেও পাওয়া যায় নি। সংযুক্ত প্রদেশের সরকারের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল পদত্যাগ করার পর সেখানকার গভর্নর স্যার হ্যারী হেইগ অস্বীকার করেন।[১৩] মুসলিম লীগ যখন এই ব্যাপার নিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচারে পঞ্চমুখ, কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ

তখন অভিযোগগুলির সত্যতা বিচারের জন্য কোন নিরপেক্ষ বিচারকের কাছে দেবার প্রস্তাব করেন এবং এই প্রসঙ্গে ভারতের প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস গয়্যারের নাম করেন। জিন্না এ প্রস্তাব এই বলে প্রত্যাখ্যান করেন যে অভিযোগ-গুলি বড়লাটের বিচারাধীন। কিন্তু বড়লাট লিনলিথগো স্বয়ং জিন্নাকে জানান যে ঐসব অভিযোগ পরীক্ষা করে দেখার পর সেগুলির কোন ভিত্তি আছে বলে বিশ্বাস করার মত প্রমাণ তিনি পান নি।[১৪] জবাবে জিন্না কেবল এইটুকুই বলতে পেরে-ছিলেন যে মুসলমানদের অবস্থা তলে তলে খারাপ করার জন্য হিন্দুদের "প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধি" রয়েছে।[১৫] পীরপুর রিপোর্টের ভূমিকা ও সাধারণ সমীক্ষা স্বয়ং জিন্না কর্তৃক লিখিত নচেৎ তাঁর দ্বারা অনুমোদিত বলে অনুমান করা হয়। এতে বলা হয়ঃ "আমাদের বিনম্র অভিমত হল এই যে এ সমস্যা যথার্থ···। সাম্প্রদায়িক সমস্যা অসমাহিত থেকে যাবার কারণ সংখ্যালঘুদের সাম্প্রদায়িকতা নয়, সংখ্যাগুরুদের সাম্প্রদায়িকতা।"

ডিসেম্বরের ২৬শে পাটনায় বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত লীগের বাৎসরিক অধিবেশনে সমাগত হাজার হাজার শ্রোতার কাছে জিন্না তাঁর কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ মনোভাব উজাড় করে দিয়ে বললেন, "কংগ্রেস এবারে···ফ্যাসীবাদীদের রাজকীয় পদ্ধতিতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বোঝাপড়া হবার সর্ববিধ আশাকে হত্যা করেছে।" তাঁর কণ্ঠে যেন রণভেরী বাজছে, "আমরা—ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায় আমাদের পূর্ণ অধিকার আদায় করার ব্যাপারে মনস্থির করে নিয়েছি।" বিরোধী-দের উদ্দেশে তাঁর আঘাত শাণিত হয়ে উঠেছে, "কংগ্রেস এক হিন্দু প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কিছু নয়।···জনাকয়েক পথভ্রান্ত এবং কুপথে পরিচালিত মুসলমানদের উপস্থিতি ঐ প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় সংস্থায় পরিণত করতে পারে না।" নিজের মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রধানতম প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শ্রোতৃমণ্ডলীর বিরূপতা জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে এসবের মূলে কে—এই প্রশ্ন উত্থাপন করে নিজেই তার উত্তরদান প্রসঙ্গে জিন্না বললেন, "এর পিছনে কার প্রতিভা ক্রিয়াশীল? মিস্টার গান্ধী। আমার একথা বলতে কোন দ্বিধা নেই যে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হয়েছিল, তাকে নষ্ট করেছেন মিস্টার গান্ধী। কংগ্রেসকে হিন্দু পুনরুত্থানবাদের যন্ত্রে পরিণত করার জন্য যদি কোন একজন ব্যক্তিকে দায়ী করতে হয় তাহলে তিনি হলেন মিস্টার গান্ধী। তাঁর উদ্দেশ্য হল এদেশে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয় এবং হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্য পরিপূর্তির জন্য তিনি কংগ্রেসকে কাজে লাগাচ্ছেন।" কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলীর শাসনাধীন বিহারের রাজধানী

পাটনায় কোন বাধা-বিপত্তি তো দূরের কথা, হাজার হাজার শ্রোতৃমণ্ডলীর উচ্ছ্বসিত করতালিধ্বনির মাঝে জিন্না গান্ধী ছাড়াও জওহরলাল, সুভাষ, প্যাটেল ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ কংগ্রেস নেতাদের কঠোরতম ভাষায় নিন্দা-মন্দ করলেন।

কংগ্রেস ও তাঁর নেতৃবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা ছাড়াও লীগের পাটনা অধিবেশনের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল। ঐ সম্মেলনে গোঁড়া প্রতিনিধিদের বক্তব্য অগ্রাহ্য করে লীগ এক মহিলা উপসমিতি গঠন করে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানের জন্য নারী কর্মীবাহিনী সংগ্রহ করার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম মহিলাদের মধ্যে লীগের ভাবধারা প্রচারে বিশেষ ভাবে সহযোগিতা পাওয়া যায়। মুসলমানদের প্রতি কংগ্রেস শাসিত প্রদেশসমূহে "যেসব অত্যাচার হচ্ছে" তার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সংগঠিত করার জন্য অধিবেশনের এক প্রস্তাবে জিন্নাকে অধিকার দেওয়া হয়েছিল। দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীদের ব্রিটিশ ভারতের নাগরিকদের মতই গণতান্ত্রিক অধিকার পাবার জন্য সমর্থন জানানো দীর্ঘকাল যাবৎ কংগ্রেসের নীতি ছিল। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে শুরু করা হায়দ্রাবাদের প্রজা আন্দোলন ঐ রাজ্যের মুসলমান শাসকদের বিরোধী বলে পাটনায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগের তালিকায় দেশীয় রাজ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াসও যুক্ত হল। পাটনাতে জিন্না যেমন জঙ্গী ভাষা ও ভঙ্গীতে "হিন্দু কংগ্রেসে"র বিরোধিতা করে ৯ কোটি মুসলমানকে লীগের পতাকাতলে সংগঠিত হয়ে মুসলমানদের ন্যায়সঙ্গত দাবি অর্জনের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন, অধিকাংশস্থলে তার অনুকরণে এবং কোথাও কোথাও তার থেকেও জঙ্গী ভাষায় দেশের কোণে কোণে মুসলমানদের ভিতর পাটনার বাণী পৌঁছে দেবার কাজ লীগের কর্মীরা অতঃপর শুরু করলেন। সমগ্র ভারতবর্ষে—বিশেষ করে মুসলিম মধ্যবিত্ত এবং ছাত্র ও তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে লীগের ভূমিকার সপক্ষে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হল। নানা জায়গায় লীগের দপ্তর খোলা হল এবং সেখানে নিয়মিত কর্মচাঞ্চল্যও দেখা দিল।

হঠাৎ জিন্না এত জঙ্গী সাম্প্রদায়িকতাবাদীর ভূমিকা গ্রহণ করলেন কেন? কেনই বা তিনি গান্ধীর আন্তরিকতাকে উপেক্ষা করলেন এবং কংগ্রেসের সঙ্গে কোন রকম বোঝাপড়ায় উপনীত হবার মানসিকতা পরিহার করা আরম্ভ করলেন? মুসলমানদের প্রতি "হিন্দু কংগ্রেস" শাসিত প্রদেশসমূহে অনুষ্ঠিত "শতাধিক অত্যাচার" ষোল আনা ভিত্তিহীন না হলেও একে মাত্রাতিরিক্ত বাড়ানো হয়েছিল—একথা তাঁর মত তীক্ষ্ণধী নেতার না বোঝার কারণ ছিল না। তাহলে কংগ্রেস ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে তাঁর এই গোয়েবলসের ধরণে প্রচারযুদ্ধ চালাবার কারণ কি? জিন্নার চরিত্র-

ও মানসিকতা অধ্যয়ন করার জন্য এইসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। তবে সেই প্রয়াসে ব্রতী হবার পূর্বে আমরা অপর একটি তথ্যও এখানে লিপিবদ্ধ করব। এ হল হিন্দু-মহাসভার সমকালীন রাজনীতি, যা হিন্দু-সংস্কৃতি ও হিন্দুর স্বাধিকার রক্ষার নামে প্রত্যুতঃ জিন্নার এই ভূমিকাকেই পুষ্ট করেছিল।

কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু-মহাসভা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলিম-তোষণের অভিযোগ উত্থাপন করে এর বিরুদ্ধে হিন্দুদের রুখে দাঁড়াবার জন্য নিজ সভাসমিতিতে বার বার বলা আরম্ভ করল। কংগ্রেসের মুসলিম গণ-সংযোগ কর্মসূচী এবং মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদান করার জন্য আহ্বানও লীগের মত হিন্দু-মহাসভারও বিরূপতার কারণ হল। মহাসভা এর বিরুদ্ধে হিন্দু জনমত সংগঠন করার জন্য সক্রিয়ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এর ফলে লীগের পক্ষে মুসলমানদের নিজ পতাকাতলে সমবেত করা সহজসাধ্য হয়ে উঠল। আর মহা-সভার নিরন্তর মুসলিম-বিরোধিতা প্রচার এই ধারণার সৃষ্টি করল যে এই দুই ধর্মাবলম্বীরা একই জাতির (nation) অঙ্গ হিসাবে আর একত্র থাকতে পারবে না এবং এর ফলে লীগেরই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মহাসভার অধিবেশনে তার সভাপতি সাভারকার ঘোষণা করলেন, "ভারতবর্ষকে আজ আর এক অবিভাজ্য ও সুসংহত জাতি মনে করা যায় না। পক্ষান্তরে এদেশে প্রধানতঃ দুটি জাতি—হিন্দু ও মুসলমান।"[১৬] ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত মহাসভার সম্মেলনেও তিনি এই দ্বিজাতি তত্ত্বের কথা আরও জোর দিয়ে বললেন। অবশ্য তিনি ভারত বিভাজনের দাবি জানান নি। সংখ্যাগুরু বলে ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে হিন্দুদেরই প্রমুখ স্থান থাকবে—তিনি এটা ধরে নিয়েছিলেন। মুসলমানদের অধিকার সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল : "হিন্দু মহাসভা একবার যখন 'মাথা পিছু এক ভোট' নীতি কেবল স্বীকারই করে না, তদনুসারে চলে এবং জাতি (race) ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগ-রিকের জন্য একই মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ ও সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্যতাই একমাত্র মানদণ্ড চায়,...তখন আর কোন ব্যাপারে সংখ্যা-লঘুদের অধিকারের কথা উল্লেখ করা কেবল অপ্রয়োজনীয়ই নয় বরং স্ববিরোধী। কারণ এর ফলে নূতন করে আবার সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ—সংখ্যালঘু মানসিকতার প্রবর্তন হয়।"[১৭] আদর্শবাদ ও মধুর ভাষার মোড়কে মোড়া "হিন্দু-রাষ্ট্রে"র এই স্বরূপ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের কাছে মনোরম মনে হলেও মুসলমান সহ তাবৎ সংখ্যালঘুদের আতঙ্কিত করে নিজ নিজ ধর্মের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের শরণাগত হবার প্ররোচনা দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

অতঃপর ইতিপূর্বে উল্লিখিত জিন্নার ভূমিকায় আমূল পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধানের প্রয়াস করা হবে। এ সম্বন্ধে খালিকুজ্জমাঁ বলেছেন: "১৯২৩ থেকে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কংগ্রেস নেতাদের মুসলমানদের সঙ্গে বোঝাপড়া করার পথে বাধক ছিল হিন্দু গণ-চেতনা। এরপর স্বীয় অধিকার ও শক্তি-বলে মুসলিম গণচেতনা নিছক মন্ত্রিত্বের ভিত্তিতে এ ব্যাপারে একটা নিষ্পত্তিতে উপনীত হবার ব্যাপারে অনিচ্ছুক প্রতিপাদিত হল। চিরকালের জন্যই এ সুযোগ হারিয়ে গেল।"[১৮]

জিন্না মূলতঃ রাজনৈতিক নেতা [১৯] এবং রাজনৈতিক কর্মীদের জীবনধারণ ও কর্মপ্রয়াস সরকারী ক্ষমতা অধিগত করার জন্য। অবশ্য সব রাজনৈতিক দল এবং নেতাই ক্ষমতা দখলের পিছনে নিজস্ব বিশিষ্ট আদর্শবাদের প্রেরণা আছে বলে সাধারণ্যে একটা ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করে থাকেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল গঠনের প্রক্রিয়ায় জিন্না উপলব্ধি করলেন যে কংগ্রেস অন্ততঃ লীগের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে ভোগ করতে চায় না। তাহলে লীগের মাধ্যমে তাঁর ক্ষমতা লাভের উপায় কি? এবং তাঁকে ক্ষমতা পেয়ে ভোগ করতে হলে আরও যেসব সঙ্গী সাথীদের ক্ষমতার অংশ দেওয়া প্রয়োজন—যাব সম্ভাবনা না থাকলে তাঁদের সমর্থন পাওয়া যাবে না—সেই লক্ষ্য কি ভাবে সিদ্ধ করা যায়? উপায়ের সন্ধান ইকবাল দিলেন মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের মাধ্যমে। লীগের লখনউ অধিবেশনে দেখা গেল বিচ্ছিন্নতাবাদ সাধারণ মুসলমানদের লীগের পতাকাতলে সমবেত করার সঙ্গে সঙ্গে লীগের কর্মীদেব সংগঠিত করার পক্ষেও প্রবল সহায়ক। উত্তরোত্তর তাই জিন্না তাঁর কথাবার্তা এবং ব্রিটিশ ও কংগ্রেস প্রমুখ ক্ষমতাপ্রাপ্তির সংগ্রামের অন্যান্য পক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদীর এই ভূমিকাকে প্রমুখ করে তুললেন। মুসলিম জনসাধারণ, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, অভিজাত, ছাত্র-যুবক, মহিলা—সব শ্রেণীর ভিতর স্বকীয়তা ও আত্মোপলব্ধির ছদ্মবেশে এই বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রবল অনুরণন সৃষ্টি করল। জনপ্রিয়তার ভিত্তি হয়ে দাঁড়াল বিচ্ছিন্নতাবাদ। জনসমর্থন ছাড়া ক্ষমতাপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই একথা গান্ধীর গণরাজনীতির সাফল্য দেখার পর জিন্না বুঝতে পেরেছিলেন বলে নিজের অভিজাত ধরণের রাজনীতি বর্জন করে গান্ধীর ধরণে গণসংগঠন গড়ায় তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু সেই অসহযোগের দিনের মতই তাঁর অহমিকা গান্ধীর নেতৃত্ব স্বীকার করতে অনিচ্ছুক। তাই জিন্নার গণনেতৃত্ব কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ ধারণ করল—সাম্প্রদায়িক হল।

সঙ্গত প্রশ্ন উঠবে—গান্ধীও কি জিন্নার মত রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর নিয়ন্ত্রণাভিলাষী রাজ-

নৈতিক নেতা ছিলেন না ? সাধারণ ভাবে কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতাই একই পথের পথিক হওয়া সত্ত্বেও গান্ধী ও তাঁর কিছুসংখ্যক অনুগামী ছিলেন এর ব্যতিক্রম। গান্ধীর রাজনীতিতে থাকা জীবনের অপর সমস্ত ক্ষেত্রের মত এরও "অধ্যাত্মীকরণের" জন্য। এ কেবল তাঁর স্বকীয় উক্তিই নয়, তাঁর কর্মধারাও এই সত্যের দ্যোতক। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের পর যখন রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি খ্যাতির শীর্ষে তখন তিনি কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদও ত্যাগ করেন। রাজনীতি তিনি পরিহার করেন নি ঠিকই। কারণ তখনকার রাজনীতির সঙ্গে কোটি কোটি ভারতবাসীর স্বশাসনরূপী নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু ক্ষমতার রাজনীতির প্রারম্ভিক সোপান রাজনৈতিক দলের উপর নিয়ন্ত্রণ তিনি স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলেন। অতঃপর কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠানগত না হয়ে কেবল নৈতিকই রয়ে গেল।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি জনগণের অদ্বিতীয় নেতা, তখন স্বেচ্ছায় রাজনীতি বর্জন করে গঠনকর্মের দ্বারা লোকসেবা এবং লোক-সংগঠনকেই নিজের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। অতঃপর জাতীয় জীবনে কোন গভীর সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের দ্বারা প্রবলভাবে অনুরুদ্ধ না হলে (যথা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে রামগড় কংগ্রেস অথবা ক্রিপস প্রস্তাবের ব্যর্থতার পটভূমিকায় আগস্ট আন্দোলনের জন্য বোম্বাই-এর অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠক ইত্যাদি) তিনি কংগ্রেসের অধিবেশন বা ওয়ার্কিং কমিটি কিংবা কংগ্রেসের অপর কোন সভাতেও যোগ দিতেন না। তবুও ঐজাতীয় পরিস্থিতিতেও গান্ধীর মনে এমন কোন আগ্রহ দৃষ্টিগোচর হত না যে কংগ্রেস নেতৃত্ব তাঁর পরামর্শ হুবহু মেনে নিক। রাজনৈতিক নেতার পক্ষে এমন অনাসক্ত হওয়া সম্ভব নয়।

আমরা জানি যে এই পর্যায়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রশ্নে গান্ধীর পরামর্শ চাইবার পরও কংগ্রেস নেতৃত্ব ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছে। গান্ধী তখন নিঃশব্দে রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে নিজ বিশ্বাসানুসারী পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করেছেন। পরবর্তীকালে আমরা দেখব যে ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজনীতি-ব্যবসায়ী সবাই যখন ক্ষমতালাভের জন্য ক্ষমতা-কেন্দ্রের আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, গান্ধী তখন কলকাতা-নোয়াখালি-বিহারে দাঙ্গা-পীড়িত মানুষদের সেবা করে তাঁদের মধ্যে সাহস ফিরিয়ে আনার সাধনায় ভূলুণ্ঠিত মানবতার পুনর্বাসনের প্রয়াস করছেন।

জিন্না কিন্তু সেই সময়ে কেবল ক্ষমতা-কেন্দ্রেরই আশেপাশে নয়, পরবর্তীকালে আমরা দেখব যে ক্ষমতালাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষায় মাউন্টব্যাটেন ভারত ও পাকিস্তান

—উভয় নবজাত রাষ্ট্রের গভর্ণর জেনারেল হোন এ প্রস্তাবে রাজী হয়েও অশোভন ব্যস্ততা সহকারে পাকিস্তানে স্বয়ং সেই পদ অধিকার করেছিলেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বিশেষ করে ভারত বিভাজনের প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে গান্ধীর সঙ্গে জওহরলাল ও প্যাটেল প্রমুখের মতভেদ প্রকাশ্য হয়ে উঠলেও তখনও তাঁর জনসমর্থন এত প্রবল যে গান্ধীর মনে বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা থাকলে তাঁর বিদ্রোহী অনুগামীরাই সাগ্রহে তাঁকে দেশের উচ্চতম রাষ্ট্রীয় পদে বরণ করে নিতেন। গান্ধী তার বদলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জনের যন্ত্র কংগ্রেস নামক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে তার ভূমিকার পরিবর্তন করে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য এক গণ-সংগঠন বা "লোক সেবক সঙ্ঘে" পরিণত করার খসড়া রচনা করলেন তাঁর মৃত্যুর দিন।

রাজনীতি-ব্যবসায়ী হিসাবে ক্ষমতাপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ছাড়াও বয়সের ভারে ক্লান্ত হবার জন্য (তখন তিনি ষাটের ঊর্ধ্বে) হয়ত জিন্না ক্ষমতালাভের শর্ট-কাট —সাম্প্রদায়িক ভূমিকা গ্রহণ করেন। বিশেষতঃ ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তাঁর শরীর অশক্ত হয়ে পড়ছিল। যে কালব্যাধির কারণে তাঁর মৃত্যু হয়, তা ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর দেহে ধীরে ধীরে জালবিস্তার করছিল এবং ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় লাহোর অধিবেশনের পূর্বে দিল্লীতে তো বেশ কিছুদিন এর কারণে তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। দেহের এই অবস্থা সম্ভবতঃ তাঁর মনে যথাসম্ভব শীঘ্র ক্ষমতালাভের অভিলাষকে বলবতী করে থাকবে। আর তিনি দেখেইছেন যে "ইসলাম বিপন্ন" এই জিগিরের চেয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্তির সোপান—জনসমর্থন প্রাপ্ত হবার ত্বরিৎ পন্থা আর কিছু নেই।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ভিতরই তাঁর মন মোটামুটি ভারত বিভাজনের দাবির জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেও তখনই কেন যে প্রকাশ্য ভাবে এর কথা বলেন নি তার কারণ সম্ভবতঃ তাঁর ভিতরকার অদ্বিতীয় রণকৌশল নির্ধারক ব্যক্তিত্ব। তাঁর কৌশলের আভাস পাওয়া যায় ফেডারেশনের প্রস্তাব বর্জন ও দ্বিজাতি-তত্ত্ব থেকে আরম্ভ করে ধাপে ধাপে ভারতবিভাজনের প্রস্তাবের অভিমুখে যাবার মধ্যে। ধীরে ধীরে সইয়ে সইয়ে নিজের দাবি পেশ না করে হঠাৎ এতদিনের ধ্যান-ধারণার ওলট-পালট-সৃষ্টিকারী এই প্রস্তাব পেশ করলে প্রবল প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ফলে নিজের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবার আশঙ্কা ছিল। পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ের পাদটীকায় (১৫।২) বলা হয়েছে যে ইকবালকে লিখিত জিন্নার চিঠিগুলি মহাকালের হস্তাবলেপনে অদৃশ্য। কিন্তু ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর পাকিস্তান টাইমস-এ মহম্মদ শফীর যে রচনাটি প্রকাশিত হয় তাতে তিনি লিখেছেন যে তাঁর

স্পষ্টভাবে মনে আছে যে ইকবালকে লিখিত একটি চিঠিতে জিন্না জানান যে, "আমি আপনার সঙ্গে এই বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে সহমত যে ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক লক্ষ্য স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এর বাস্তব অসুবিধা হল, '...আমাদের স্বধর্মীয়রা (people) রাজনৈতিক দৃষ্টিতে অসংগঠিত, শিক্ষার দিক থেকে অনগ্রসর এবং আর্থিক ক্ষেত্রে কুত্রাপি তাদের স্থান নেই।' সুতরাং, 'আমি ধাপে ধাপে তাদের টেনে তুলতে চাই এবং তাদের দৌড়াতে বলার আগে এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে চাই যে তারা নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াতে সক্ষম।'[২০]

জিন্নার সঠিক শব্দাবলীর জন্য আমরা মহম্মদ শফীর স্মৃতির উপর নির্ভর করতে পারি বা না-ই পারি, পরোক্ষ সাক্ষ্য এবং জিন্নার এতদসংক্রান্ত মানসিকতা আমাদের উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে ব্যক্ত সিদ্ধান্তের প্রতি চালিত করে।

॥ ১৯ ॥

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগ কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে বোঝাপড়ার প্রয়াস এবং তার পৌনঃপুনিক ব্যর্থতার কাহিনীর কাল। ১লা জানুয়ারী জিন্না এক বিবৃতির মাধ্যমে হরিজনে প্রকাশিত গান্ধীজীর এই রচনার প্রতিবাদ জানালেন যে কংগ্রেস ভারতবর্ষের জনসাধারণের প্রতিনিধি। এই প্রসঙ্গে আবার তিনি মুসলমানদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ উত্থাপন করলেন। তেসরা জানুয়ারী জওহরলাল কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তির দ্বারা এ অভিযোগের তদন্ত করার প্রস্তাব করে পরের দিন জিন্নার কাছে এক চিঠির মাধ্যমে সেই বিবৃতির নকল পাঠিয়ে সেই প্রস্তাবের পুনরুক্তি করলেন। জিন্না জওহরলালের অধিকারের প্রশ্ন তুলে এ ব্যাপারে আর অগ্রসর না হলেও অতঃপর একটা ঐক্যসূত্র খুঁজে বার করার জন্য জিন্না ও জওহরলালের মধ্যে বেশ কয়েকটি পত্রবিনিময় হল। কিন্তু শেষ অবধি সেই পুরাতন নীরন্ধ্র প্রস্তর-প্রাচীরের অর্থাৎ মুসলিম লীগকে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান বলে স্বীকার করে নিতে হবে এবং কংগ্রেস কেবল হিন্দুদের প্রতিনিধি—সম্মুখীন হওয়ায় আলোচনা আর অগ্রসর হতে পারল না।

মুসলমানদের প্রতি অত্যাচারের অভিযোগ প্রসঙ্গে একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী উল্লেখযোগ্য। পাটনায় লীগের অধিবেশনে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী স্যার সিকন্দর বলেছিলেন, "এই সব (অত্যাচারের ঘটনা) যদি বন্ধ করা না হয় এবং যদি এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে দেওয়া হয় তবে তার পরিণামে কেবল আইন

অমান্যেরই (civil disobedience) সূচনা হবে না, তার থেকেও খারাপ পরিণতি ঘটবে।···প্রয়োজনে ইসলামকে রক্ষা করার জন্য পাঞ্জাবের প্রতিটি মুসলমান তাঁর জীবনোৎসর্গ করবেন।" একজন প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রীর অপর এক প্রদেশের প্রশাসনকে কেন্দ্র করে ঐজাতীয় মন্তব্য করা অসমীচীন মনে হওয়ায় চৌঠা জানুয়ারী জওহরলাল স্যার সিকন্দরকে এক পত্র লিখে উত্তর প্রদেশে এরকম কোন ঘটনার প্রমাণ দিতে অনুরোধ জানান। স্যার সিকন্দর তাঁর ১৪ই ফেব্রুয়ারীর উত্তরে একথা অস্বীকার করেন যে ঐ অধিবেশনে কোন বক্তা কংগ্রেসশাসিত প্রদেশসমূহে কোন অত্যাচার অনুষ্ঠানের অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। তাঁরা কেবল কোন কোন কংগ্রেসশাসিত প্রদেশে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাচারের উল্লেখ করেছিলেন।[১]

ইতিমধ্যে জিন্নার সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কবিশিষ্ট অস্থায়ী বড়লাট ব্রাবোর্নের মৃত্যু ঘটেছে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত লিনলিথগোর মনে গোড়ায় জিন্নার সম্বন্ধে অনুকূল ধারণা ছিল না।[২] তাছাড়া লিনলিথগো কেবল ফেডারেশনেরই সমর্থক ছিলেন না, লীগের সহযোগী হয়েও জিন্নার প্রতিদ্বন্দ্বী স্যার সিকন্দরের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এই জন্য যে তিনি ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করার প্রধান এলাকা পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী। স্যার সিকন্দরকে বড়লাট এতটা গুরুত্ব দেবেন—জিন্নার এটা পছন্দ হত না; আর স্যার সিকন্দরও জিন্নার মনোভাব জানতেন এবং ভিতরে ভিতরে তাঁর প্রতি বিরূপ ছিলেন। তিনি তাই বড়লাটকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, "জিন্নাকে আরও ফুলিয়ে দেওয়া অথবা তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করা দুরূহ হয়ে ওঠে এমন কিছু করা উচিত হবে না।"[৩] মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় পরিষদে অর্থ বিলের উপর বক্তৃতা দেবার সময় জিন্না তাই সরকার ও বড়লাটকে একরকম শাসানী দিলেন যে সরকার তাঁদের "রক্ষা না করলে" তাঁরাও কেন্দ্রে আর সরকারকে "রক্ষা" করবেন না।[৪] কারণ কেন্দ্রীয় পরিষদে মুসলিম লীগের এমন এক ভারসাম্য রক্ষাকারী স্থান ছিল যে লীগ সদস্যরা ইচ্ছা করলেই বিরোধীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সরকারী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার সহায়ক হতে পারত। কেন্দ্রীয় পরিষদকে ও মুসলিম জনমতকে নিজের অনুকূল করা ও কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ জানাবার কাজে লাগিয়ে ঐ বক্তৃতায় তিনি আরও বললেন, "আমরা যে সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী তাকে আপনারা কদাপি ধ্বংস করতে পারবেন না। ঐস্লামিক সংস্কৃতি ও চেতনা বজায় থাকবে, বজায় থাকছে এবং বজায় থেকেছে। আপনারা আমাদের চেয়ে অধিক বল সংগ্রহ করতে পারেন; আমাদের নিগ্রহ করতে পারেন; এবং আমাদের অবস্থা তার থেকেও শোচনীয় করে

তুলতে পারেন। কিন্তু আমরা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি এবং এই দৃঢ় সঙ্কল্প করেছি যে আমাদের যদি নিশ্চিহ্ন হতেই হয় তবে আমরা লড়াই করতে করতেই সেই পরিণতিতে উপনীত হব।"[৫]

১৬ই মার্চ জিন্না পীরপুর কমিটির রিপোর্টের নকল উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য বড়লাটকে পাঠালেন। ২২শে মার্চ কেন্দ্রীয় পরিষদে দেশের কোণে কোণে ব্যাপকভাবে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ হচ্ছে বলে অভিযোগ করলেন। ৮ই এপ্রিল লীগ কাউন্সিলে সভাপতির ভাষণে ঘোষণা করলেন যে তাঁর প্রতিষ্ঠান ফেডারাল ব্যবস্থা স্বীকার করে না। রাজকোটে দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের গণতান্ত্রিক অধিকার দেবার জন্য গান্ধী যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তার অঙ্গস্বরূপ রাজকোট কমিটিতে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে আপত্তি করে জিন্না ১৮ই এপ্রিল একটি বিবৃতি দিলেন এবং মুসলমানদের ঐ কমিটি বর্জন করার পরামর্শ দিলেন। ৩০শে জুলাই এক বিবৃতিতে বড়লাট ও ভারত সরকারকে অনিচ্ছুক দেশের উপর ফেডারাল পরিকল্পনা চাপিয়ে না দেবার জন্য আবেদন জানালেন। ৫ই আগস্ট বোম্বেতে এক জনসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বললেন যে পাশ্চাত্ত্য গণতন্ত্র "ভারতবর্ষের প্রতিভার সঙ্গে খাপ খায় না।"[৬] তাঁর কণ্ঠে এবার স্যার সৈয়দ আহমদের সুর।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের তেসরা সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ সরকার পোল্যাণ্ড আক্রমণকারী জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দ্বারা সরকারীভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত করলেন। কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্য অথবা প্রদেশসমূহে কার্যরত জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে কোন রকম আলোচনা বিনাই বড়লাট অনতিবিলম্বে ভারতবর্ষকে জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত বলে ঘোষণা করলেন। অতঃপর তিনি হলেন যুদ্ধকালীন বড়লাট এবং একাধিক অর্ডিন্যান্সের বলে ভারতীয় নাগরিক অথবা জনপ্রতিনিধিদের যেটুকু অধিকার ছিল তা হরণ করে নেওয়া হল। বড়লাট এরপরই গান্ধী জিন্না প্রমুখ নেতাদের তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন যাতে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় তাঁদের সাহায্য পাওয়া যায়। চৌঠা সেপ্টেম্বর গান্ধী বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানালেন যে মানবতার কারণে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর নৈতিক সহানুভূতি ইংলণ্ড ও মিত্রপক্ষের দিকে। তবে তিনি এও জানালেন যে কংগ্রেসের তরফ থেকে এ-ব্যাপারে কোন কথা বলার অধিকার তাঁর নেই, এবং কংগ্রেস তার সিদ্ধান্ত স্বয়ং নেবে। জিন্না বড়লাটকে জানালেন যে লীগের সমর্থন পেতে হলে তাঁকে সক্রিয়ভাবে কিছু করতে হবে এবং অন্ততঃ কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলকে পদচ্যুত করা অপরিহার্য।[৭]

পরিস্থিতি বিচার করে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেবার জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ৭ই থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত একাদিক্রমে মিলিত হল। জাতীয় সমস্যা সম্বন্ধে জাতীয় পর্যায়ে আলোচনার জন্য অন্যান্য দলের নেতাদের সঙ্গে জিন্না সেই সভায় যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রিত হলেও তিনি সে আমন্ত্রণ স্বীকার করেন নি। কংগ্রেস নেতাদের তিনি দিল্লীতে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার প্রস্তাব দিলেন। "গান্ধীর অভিমত এই ছিল যে আমাদের নৈতিক সমর্থন দেওয়া অবশ্য কর্তব্য, মন্ত্রীমণ্ডলকে কাজ করতে দেওয়া উচিত এবং তাঁর এই বিশ্বাস ছিল যে মন্ত্রীমণ্ডলের মাধ্যমে পূর্ণ স্বরাজ বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের ঘোষণা তিনি আদায় করে নিতে পারবেন।"[৮] কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিল। আক্রান্ত পোল্যাণ্ড ও গণতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতি ব্যক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্কিং কমিটি বলল যে ভারতবর্ষে বিগত দেড়শ' বছর ধরে গণতন্ত্র নেই—এমন কি যুদ্ধ ঘোষণার মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেও দেশবাসীর সঙ্গে পরামর্শ করা হয় নি, যদিচ অন্যান্য উপনিবেশের ক্ষেত্রে তা করা হয়েছে। সুতরাং ভারতবাসীদের গণতন্ত্র রক্ষা করার জন্য যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সহযোগিতা করতে হলে আগে এদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং যুদ্ধের ব্যাপারে নিজের স্পষ্ট লক্ষ্যও ইংলণ্ড কর্তৃক ঘোষিত হওয়া প্রয়োজন। এছাড়া বড়লাটের যুদ্ধকালীন বিশেষ অধিকারাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের সম্পর্কও নির্ধারিত হওয়া দরকার।[৯]

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারতশাসন আইনে ফেডারাল ব্যবস্থা প্রবর্তনের যে প্রস্তাব করা হয়েছিল এবং যা এত দিন কার্যকরী করা হয় নি, বড়লাট তাঁর ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘোষণায় তাকে লক্ষ্য হিসাবে বজায় রাখলেও তার বাস্তব প্রয়োগ অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখলেন। এতে এক দিকে যেমন কেন্দ্রে জনপ্রতিনিধিদের সীমিত ক্ষমতা হস্তান্তর করার আশা আপাততঃ তিরোহিত হল, অন্য দিকে লীগ এবং রাজন্য-বর্গকেও সন্তুষ্ট করা হল। জিন্না ও লীগের সাম্প্রতিক ফেডারেশন বিরোধিতার কারণ পূর্বে বলা হয়েছে। ফেডারেশনে দেশীয় রাজন্যগুলির প্রজাদের প্রতিনিধি থাকবে না বলে কংগ্রেস এর বিরোধী ছিল। কিন্তু রাজন্যবর্গকে তাঁদের অপ্রতিহত ক্ষমতার কিছুটা ছাড়তে হবে বলে তাঁরাও এর বিরোধী ছিলেন। যুদ্ধে তাঁদের কাছ থেকে ধন ও জনের সাহায্য পাবার জন্য তাঁদের ক্ষোভের কারণ বজায় রাখা সরকার উচিত মনে করলেন না। কিন্তু ফেডারেশন প্রস্তাব স্থগিত রাখার দ্বারা ভারত অখণ্ড থাকার অন্যতম সম্ভাবনা তিরোহিত হল।

যুদ্ধ ও বড়লাটের তৎসম্পর্কিত ঘোষণা সম্বন্ধে লীগ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত তার ১৭-১৮

সেপ্টেম্বরের জরুরী সভায় বিচার-বিবেচনা করল। কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশসমূহে মুসলমানদের ধর্মীয় রাজনৈতিক ও আর্থিক অধিকারের ক্ষেত্রে যে "শত্রুভাবাপন্ন" দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের রক্ষা করার জন্য গভর্নরগণ ও বড়লাট তাঁদের বিশেষ অধিকার প্রয়োগ না করায় লীগ গভীর অসন্তোষ প্রকট করল। ফেডারেশন পরিকল্পনাকে কেবল স্থগিত রাখা নয়, চিরতরে বাতিল করার দাবি জানাল। প্রস্তাবে এও বলা হল যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দুই বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে সরকার যেন ভারতবর্ষের সংবিধানের সমগ্র প্রশ্নটিকে নূতন করে বিবেচনা করেন। সর্বশেষে এই দাবি জানানো হল যে ব্রিটিশ সরকার যেন "মুসলমানদের এই আশ্বাস দেন যে মুসলিম লীগের সম্মতি ও স্বীকৃতি ব্যতিরেকে ভারতবর্ষের সাংবিধানিক অগ্রগতির প্রশ্ন সম্বন্ধে কোন রকম ঘোষণা করা হবে না।"[১০] অর্থাৎ লীগের জন্য পরিপূর্ণ ভিটোর অধিকার দাবি করা হল।

লিনলিথগো আদৌ কংগ্রেস অথবা জওহরলালের (তাঁর মতে "কেতাবী বুদ্ধি··· এবং বৈদেশিক রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে অ্যামেচার জ্ঞানসম্পন্ন"[১১]) গুণগ্রাহী ছিলেন না। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য যে কোন উপায়ে সৈন্য ও অর্থ সংগ্রহ করে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সাহায্য করা। সুতরাং মুসলিম লীগের এই একরোখা ভূমিকা বড়লাটকে সুবর্ণ সুযোগ দিল। ভারতবাসীদের সহযোগিতা পাবার জন্য তিনি তাঁর শাসন পরিষদের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে কিছু রাজনৈতিক নেতাকে তাতে স্থান দেবার কথা বললেও এদেশবাসীকে যথার্থ ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি এমন কি নিছক যুদ্ধের লক্ষ্য ঘোষণা করা সম্বন্ধেও কোন কথা দিলেন না। গান্ধী-জিন্না-নেহরু এবং আরও অনেক ভারতীয় নেতার সঙ্গে ২৬শে সেপ্টেম্বর তাঁর দ্বিতীয় দফা সাক্ষাৎকার অথবা নেহরু-রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর তেসরা অক্টোবরের আলোচনারও কোন পরিণাম হল না। বড়লাট কংগ্রেস-নেতাদের লীগের সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব দেবার পরামর্শ দিলেন এবং বাস্তব অবস্থার জন্য তার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। অতএব আবার অচলাবস্থা এবং যথার্থ ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাবনা থেকে ভারত সরকারের নীতিনির্ধারকদের নিষ্কৃতি লাভ। ভারতসচিব জেটল্যাণ্ডও ভারত সরকারের এই ভূমিকায় সন্তুষ্ট।

কোন দাবিই পূর্ণ না হওয়ায় সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে তদানীন্তন পরিস্থিতিতে ইচ্ছা থাকলেও কংগ্রেসের পক্ষে ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধপ্রচেষ্টার সঙ্গে সহযোগিতা করা অসম্ভব এবং প্রদেশগুলির কংগ্রেস সরকার যেন ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে পদত্যাগ করে। স্থির হল যে এই

মর্মে বিধানসভাসমূহে প্রস্তাব গ্রহণ করার পর কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলগুলি পদত্যাগ করবে। তদনুসারে বিধানসভাসমূহে প্রস্তাব উত্থাপিত হলে লীগের তরফ থেকে সর্বত্র একই ধরনের সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করা হয়, যদিও তা যে অগ্রাহ্য হবে তা পূর্ব থেকেই জানা ছিল। এতে লীগ ওয়ার্কিং কমিটির ১৭-১৮ সেপ্টেম্বরের বক্তব্যের সারমর্ম ছাড়াও বলা হয় যে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্বন্ধে যুদ্ধ চলার সময়ে অথবা তার পরও কোন আলোচনার প্রাক্কালে ব্রিটিশ সরকারকে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, "বর্তমান সংবিধানের অনুসারী গণতান্ত্রিক পার্লামেণ্টারী প্রথার শাসনব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে কারণ তা এদেশের পরিস্থিতি এবং দেশবাসীর প্রতিভার একান্ত প্রতিকূল" এবং তাই সমস্ত ব্যাপারটা সম্বন্ধেই নূতন করে ভাবতে হবে। এই কারণে ভবিষ্যৎ সংবিধানের মূলনীতি বা অন্য কিছু সম্বন্ধে "অখিল ভারত মুসলিম লীগের—একমাত্র যে প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষের মুসলমানদের প্রতিনিধিস্থানীয় ও তাঁদের পক্ষে কথা বলার অধিকারী—অনুমোদন ও স্বীকৃতি যাবতীয় প্রধান সংখ্যালঘু ও অন্যান্য স্বার্থের সম্মতি ব্যতিরেকে" ব্রিটিশ সরকার কোন রকম প্রতিশ্রুতি দেবেন না। এখানে অন্যান্য সংখ্যালঘুদের উল্লেখ করার কারণ হল এই যে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হবার সময় থেকে "শত্রুর শত্রু আমাদের মিত্র"—কূটনীতির এই প্রাচীন নির্দেশ অবলম্বনে জিন্না আম্বেদকর ও দক্ষিণের দ্রাবিড় কাজঘমের নেতাদের সঙ্গে সখ্যভাব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। পরে আমরা দেখব যে হিন্দু-সমাজের একাংশ—তপশিলী সম্প্রদায়ের কিছু প্রতিনিধিদের এই ভাবে লীগের শিবিরভুক্ত করা এমন কি ভারতবিভাজনের সময়ও জিন্নার পক্ষে কেমন সহায়ক হয়েছিল।

পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে অক্টোবরের শেষে এবং নভেম্বরের প্রথমে আটটি প্রদেশের কংগ্রেসী সরকার পদত্যাগ করল। এর ফলে শুধু বড়লাট ও ভারত সরকারই নয়, লীগের সামনেও স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত হল। কারণ সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কংগ্রেস এবং ক্ষমতার বাইরে কংগ্রেসের শক্তি ও প্রভাবে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। সরকারের পক্ষে ভারতবর্ষের জনশক্তি ও ধনবলকে কাজে লাগিয়ে তাদের যুদ্ধপ্রচেষ্টা অপ্রতিহত গতিতে চালাবার অবকাশ জুটে গেল। আর কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলের পদত্যাগের ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হল তা পূর্ণ করার জন্য যবনিকার অন্তরালে লীগ প্রস্তুতই ছিল। দুই প্রধানমন্ত্রী স্যার সিকন্দর ও ফজলুল হকের মাধ্যমে যুদ্ধপ্রচেষ্টার সাহায্য মেলার সঙ্গে সঙ্গে লীগও দুই প্রদেশে শক্তিশালী হচ্ছিল, যদিও নেতৃত্বের ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে উভয়ের সঙ্গেই জিন্নার সম্পর্ক ভাল ছিল না। ২২শে

অক্টোবর এক প্রস্তাব গ্রহণ করে লীগ জানাল ব্রিটীশ সরকার ভবিষ্যৎ সংবিধানে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলে লীগ যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সাহায্য করবে। স্বদেশবাসীর বদলে জিন্না ও লীগের ইংরেজ শাসকদের উপর এত ভরসা করার প্রবণতার সমালোচনা করে গান্ধী "হরিজনে" এক প্রবন্ধ লিখলেন। যাই হোক, এই পদত্যাগের ফলে অতঃপর অন্যান্য প্রদেশেও লীগ শক্তিশালী হবার সুযোগ পেল। পরবর্তী কালে আমরা দেখব যে মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশসমূহে লীগের সংগঠন ও প্রচার পাকিস্তান দাবির পরিপূর্তির পক্ষে কম সহায়ক হয় নি।

১লা নভেম্বর গান্ধী এবং কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও লীগ সভাপতি জিন্না বড়লাটের আমন্ত্রণক্রমে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। নেতাদের আগ্রহে বডলাট লিখিত ভাবে নিম্নোক্ত ভাষায় তাঁর প্রস্তাব জানালেন: "কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতারূপে আমি আপনাদের এবং উপস্থিত অন্যান্য ভদ্র মহোদয়বর্গকে যে প্রস্তাব বিবেচনার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম তা হল এই যে কেন্দ্রে মিলে-মিশে কাজ করার আত্যন্তিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে আপনারা নিজেদের মধ্যে আলোচনায় প্রবৃত্ত হবেন। সেই আলোচনার উদ্দেশ্য হবে—আপনারা প্রাদেশিক ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়ায় উপনীত হতে পারেন কি না তা আবিষ্কার করা। বোঝাপড়ার এজাতীয় ভিত্তি আবিষ্কৃত হলে আপনারা আমার সমক্ষে উপযুক্ত প্রস্তাব পেশ করবেন এবং তাহলে আপনাদের উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের অবিলম্বে শাসন পরিষদের সদস্য হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানানো সম্ভব হবে।"[১২] বলা বাহুল্য বড়লাটের এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য ইংলণ্ডের বিরোধী শ্রমিক দল এবং ভারতের স্বাধীনতার প্রতি সহানুভূতিশীল আর সবাইকে দেখানো যে ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর সহযোগিতা পেতে ইচ্ছুক। এতদনুসারে দফায় দফায় গান্ধী-জিন্না-রাজেন্দ্রপ্রসাদ আলোচনা ছাড়াও জিন্না-জওহরলাল আলোচনা ও পত্র-বিনিময় হল। কিন্তু এই সব আলাপ-আলোচনা নিষ্ফল হওয়া অবধারিত ছিল। একদিকে বড়লাট এক নূতন পূর্ব-শর্ত—প্রাদেশিক স্তরেও মতৈক্য[১৩]—জুড়ে দিয়েও সমস্যাটিকে আরও জটিল করে তুলেছিলেন। অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক বিভেদের প্রশ্নকে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর বা স্বাধীনতার প্রশ্নকে মুলতুবী রাখা হচ্ছিল। কংগ্রেসের বক্তব্য ছিল—সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান ভবিষ্যৎ গণপরিষদ করবে। স্বভাবতঃ কংগ্রেসের এ ভূমিকা জিন্নার মনোমত হল না এবং সে কথা তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণাও করলেন। কারণ ভারত বিভাজনের জন্য তাঁর মন তখন তৈরী হয়ে গিয়েছে এবং সেকথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করার অনুকূল

অবসর তিনি খুঁজছিলেন। দুই চারিটি অতিরিক্ত মন্ত্রীপদ বা অনুরূপ কিছুর বিনিময়ে মূল লক্ষ্য থেকে চ্যুত হবার মত রাজনীতিবিদ্ তিনি ছিলেন না। মূল দাবি ঘোষণা না করা পর্যন্ত নিছক রণকৌশল হিসাবে তিনি আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ৫ই নভেম্বর বড়লাট কংগ্রেস ও লীগের মতভেদের জন্য তাঁর প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে বলে ঘোষণা করলেন।

এর পরও গান্ধী অবশ্য আশা করেছিলেন যে জিন্না ও জওহরলালের মধ্যে আলোচনা সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হবে। জিন্না ও নেহরুর মধ্যে পত্র বিনিময় ও আলোচনার সূত্রপাত হয় স্যার সিকন্দরের ১১ই অক্টোবরের বিবৃতিকে কেন্দ্র করে যাতে তিনি বলেছিলেন যে, "...মিস্টার জিন্নাকে যদি আনুষ্ঠানিকতা-বর্জিত ভাবেও আমন্ত্রণ জানানো হয় তাহলে তিনি সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক হবেন।" জওহরলাল এই বিবৃতি দেখে মৌলানা ও কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদকে লিখলেন যে এ ব্যাপারে চেষ্টা করা উচিত এবং প্রয়োজনে তিনি জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুত। ১৮ই অক্টোবর জওহরলাল জিন্নাকে আন্তরিকতা সহকারে এ সম্বন্ধে লিখলেন। ৬ই নভেম্বর সংবাদপত্রে এক বিবৃতির মাধ্যমে বড়লাটের সমালোচনা প্রসঙ্গে জওহরলাল জিন্নার সঙ্গে বহু বিষয়ে মতৈক্যের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে একথাও বললেন যে তাঁদের পারস্পরিক আলোচনা অনেক ভুল-বোঝাবুঝি দূর করতে সমর্থ হয়েছে। রাজেন্দ্রপ্রসাদের কাছে ১৪ই নভেম্বর এবং জাকির হোসেনের কাছে ২৪শে নভেম্বর লিখিত পত্রে জওহরলাল অনুরূপ মানসিকতার পরিচয় দেন। ১লা ডিসেম্বর জিন্নাকে লিখিত পত্রে জওহরলাল জানান যে পূর্বতন সাক্ষাৎকারের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁর সঙ্গে পুনরায় মিলিত হবার জন্য জিন্নার চিঠির অপেক্ষায় আছেন। কিন্তু ৯ই ডিসেম্বরের চিঠিতে জওহরলাল জিন্নাকে জানান, যেহেতু প্রদেশসমূহ থেকে কংগ্রেসের শাসনের অবসানের জন্য বিগত দোসরা লীগকে তিনি আগামী ২২শে মুক্তি ও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের দিবস পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন, তাই তিনি আর জিন্নার সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যেতে অনিচ্ছুক। কারণ তাঁদের মধ্যে আর আলোচনার অনুকূল সাধারণ ভিত্তিভূমি নেই এবং এই সিদ্ধান্তের দ্বারা জিন্না এই কথা সপ্রমাণ করেছেন যে নেহেরুর সঙ্গে তাঁর "মূল্যবোধ জীবন ও রাজনীতির লক্ষ্য" একেবারে ভিন্ন।[১৪] কৌশলগত কারণে জিন্না অবশ্য তখনই নেহেরুর সঙ্গে পত্র-বিনিময় বন্ধ করলেন না—পরবর্তী ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ব্যর্থ পত্রালাপ চলল।

দোসরা ডিসেম্বরের ঐ বিবৃতিতে জিন্না অত্যন্ত কঠোর ভাষায় কংগ্রেসী মন্ত্রী-

মণ্ডলীগুলির বিরুদ্ধে মুসলমানদের তথাকথিত অত্যাচারের পুরাতন অভিযোগসমূহের পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। কেবল জওহরলাল, গান্ধী অথবা কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারাই নয়, বাংলার লীগের নেতা ইস্পাহানীও তাঁর এক পত্রে জিন্নার এই সিদ্ধান্তের জন্য মনোবেদনা ব্যক্ত করে মন্তব্য করেন যে তিনি ক্রমাগত প্রতিক্রিয়াশীল ও জী হুঁজুরদের কবলিত হচ্ছেন। লীগের অপর এক নেতা আবদুর রহমান সিদ্দিকীর নেতৃত্বে বঙ্গীয় আইনসভার ১৬জন সদস্য জিন্নার এই কার্যকে "জাতীয় মর্যাদার প্রতি অপমান" এবং 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি চাটুকারিতা" আখ্যা দিয়ে দলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন।[১৫] জিন্না কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে নিজ সিদ্ধান্তের সমর্থনে কংগ্রেস ও তাঁর বিরোধীদের প্রতি তীব্রতর ভাষা প্রয়োগ করে আর একটি বিবৃতি দিলেন এবং কংগ্রেসের শাসনাধীন প্রদেশসমূহে মুসলমানদের উপর "অত্যাচারে"র তদন্তের জন্য একটি রয়াল কমিশন নিয়োগের দাবি জানালেন।

১৩ই ডিসেম্বর জওহরলালকে তিনি লিখলেন যে, লীগকে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকার না করলে কংগ্রেসের সঙ্গে কোন রকম আলাপ-আলোচনা করবেন না। ২২শে ডিসেম্বর মুসলমানদের কর্মবিরতি পালন করতে ও সভাসমিতির মাধ্যমে কংগ্রেসী "অপশাসন" থেকে মুক্তি পাবার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে বলা হয়েছিল। জিন্না ভেবে-চিন্তেই দিনটি নির্ধারিত করেছিলেন। দিনটি ছিল শুক্রবার এবং মসজিদে মুসলমানদের স্বাভাবিক ভাবে একত্র হবার দিন। আর এক দফা ধর্মস্থানগুলিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো হল এবং মসজিদে মসজিদে "হিন্দু" কংগ্রেস-বিরোধী বক্তৃতার অগ্ন্যুদ্গার হল। মুসলমানরা ছাড়াও দক্ষিণের দ্রাবিড় কাজঘম্ দলের তরফ থেকে রামস্বামী নাইকার, ডঃ আম্বেদকারের নেতৃত্বাধীন তফশিলী সম্প্রদায় ফেডারেশন এবং ভারতীয় খ্রীষ্টানদের একাংশ এই কংগ্রেস-বিরোধী জেহাদে লীগের সঙ্গে যুক্ত হলেন। উপযুক্ত রণকৌশল পরিকল্পনাকারী জিন্না নিজ শিবিরকে শক্তিশালী করার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী পক্ষে বিভাজন সৃষ্টির সনাতন যুদ্ধনীতিতে সাফল্যের পরিচয় দিলেন।

২৩শে ডিসেম্বর বড়লাট জিন্নাকে তাঁর ৫ই নভেম্বরের চিঠির জবাবে জানালেন যে মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন পদক্ষেপ করা সরকারী নীতি নয়।[১৬] ১লা জানুয়ারী গান্ধীকে লিখিত এক পত্রে জিন্না ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে তাঁর ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানালেন।[১৭] ১৯শে জানুয়ারী লণ্ডনের "টাইম অ্যাণ্ড টাইড" পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর এক রচনায়[১৮] এই অভিমত ব্যক্ত হল যে পাশ্চাত্ত্য ধরনের সংসদীয় গণতন্ত্র মুসলিম স্বার্থের বিরোধী। কংগ্রেসের বিরোধিতা করার জন্য

জিন্না মুসলমান ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে মিলিত ভাবে কর্মসূচী গ্রহণ করছেন এবং এটা তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতার দ্যোতক এবং প্রশংসনীয়—পরোক্ষভাবে এই অভিমতযুক্ত গান্ধীর পত্রের জবাবে ২১শে জানুয়ারী গান্ধীকে জিন্না লিখলেন যে তাঁর পদক্ষেপের গান্ধীকৃত ব্যাখ্যা ভিত্তিহীন। তিনি আবার জানালেন যে মুসলমানরা এক পৃথক জাতি (nation) এবং বস্তুনিষ্ঠ হবার জন্য গান্ধী যেন তাঁর অহিংসা খদ্দর প্রভৃতি "বাতিক" বর্জন করেন।[১৯] ২৩শে ফেব্রুয়ারী লিনলিথগোকে একটি চিঠি লিখে দাবি জানালেন যে যুদ্ধরত ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে কোন মুসলিম দেশ বা শক্তির বিরুদ্ধে যেন নিয়োগ করা না হয়।[২০]

ইতিমধ্যে অখিল ভারত লীগ ওয়ার্কিং কমিটির ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর সভায় ফেডারেল শাসন ব্যবস্থার বদলে পশ্চিম ও পূর্বের দুটি মুসলমান অঞ্চলে (Zone) পৃথক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন বা ভারত বিভাজনের দাবি সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বীকৃত হয় এবং এর দুই দিন পর বড়লাটের সঙ্গে দেখা করে জিন্না জানিয়ে দেন যে লীগের আগামী মাসের লাহোর অধিবেশনে তাঁরা ভারত বিভাজনের দাবি তুলবেন। বড়লাট জানান যে এ সম্বন্ধে ভারতসচিব জেটল্যাণ্ডের কাছ থেকে তিনি ইতিমধ্যে খবর পেয়ে গেছেন।[২১] ১৩ই মার্চ তিনি আবার বড়লাটের সঙ্গে দেখা করেন এবং "সেই সময়ে তিনি বড়লাটকে এই আশ্বাস দেন যে মুসলমানদের পূর্বস্বীকৃতি ছাড়া কংগ্রেসের সঙ্গে কোন রকম রাজনৈতিক বোঝাপড়া করা হবে না—এই মর্মে ভরসা দিলে মুসলমানরা যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বাধাসৃষ্টি করবে না। বড়লাট…অনুকূল প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এবং বলেন যে তিনি জিন্নার অভিমত লণ্ডনে জানিয়ে দেবেন।"[২২]

লীগের বাৎসরিক অধিবেশনে যোগ দিতে জিন্না ২২শে মার্চ একরকম অনাড়ম্বর ভাবে লাহোরে উপনীত হলেন। আড়ম্বর না করার কারণ ১৯শে গোঁড়া মুসলমান আধা সামরিক প্রতিষ্ঠান খাকসারদের নেতা ও স্বেচ্ছাসেবকদের উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে অস্ত্রসহ শোভাযাত্রা করার জন্য লাহোরের পুলিস গুলি চালায়। হতাহতের সংখ্যা অনেক হওয়ায় শহরে তীব্র উত্তেজনা ছিল এবং প্রধানমন্ত্রী স্যার সিকন্দর এমন কি জিন্নাকে লীগের অধিবেশন মুলতুবী করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। জিন্না সে পরামর্শ অগ্রাহ্য করে জানান যে তাঁকে নিয়ে শোভাযাত্রা ইত্যাদি যেন করা না হয়। লাহোরে উপনীত হয়ে তিনি প্রথমে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত খাকসারদের কুশলবার্তা গ্রহণ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এক ঢিলে দুই পাখী মারা। এই পদক্ষেপের দ্বারা সাধারণ নাগরিক ও খাকসারদের প্রশংসা অর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে প্রচ্ছন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী স্যার সিকন্দরকে

সমুচিত শিক্ষা দেওয়া। একই উদ্দেশ্যে লীগের ঐ অধিবেশনে তিনি স্বয়ং সিকন্দর-বিরোধী খাকসারদের উপর থেকে "বেআইনী" সরকারী নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া এবং তাদের ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করার এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

ঐ দিন বিকেলে লীগের প্যাণ্ডেলে ভারতবর্ষের নানা অঞ্চল থেকে সমবেত প্রায় ৬০ হাজার প্রতিনিধি ও দর্শকদের সম্মুখে জিন্না তাঁর ঐতিহাসিক দ্বিজাতি তত্ত্ব ও বিভাজনের প্রস্তাবযুক্ত বক্তব্য উপস্থাপিত করেন, যার ভিত্তিতে পরদিবস লীগ তার বিখ্যাত লাহোর বা পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করে। মাত্র এর কয়েক দিন পূর্বেই (১৯শে মার্চ) বিহারের রামগড়ে নূতন কংগ্রেস-সভাপতি মৌলানা আজাদ তাঁর সভাপতির অভিভাষণে ভারতবর্ষের এক বৈশিষ্ট্য—বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিকে ধর্মনিরপেক্ষ রাখার উপর জোর দিয়েছেন। মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের দ্যোতক জিন্নার লাহোর বক্তৃতা যেন মৌলানা আজাদের বক্তব্যেরই প্রত্যুত্তর।

জিন্না জানতেন যে ভারত বিভাজনের যে তত্ত্ব বিগত প্রায় আড়াই বছর ধরে তিনি যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করেছেন, তার প্রকাশ্য অভিব্যক্তির জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। তাই জনসাধারণের সামনে বক্তৃতা দেবার ব্যাপারে তাঁর যাবতীয় কুশলতা প্রয়োগ করে ঐ ভাষণ দিয়েছিলেন যার জন্য তাঁর বক্তব্যের প্রারম্ভিক অংশ ছাড়া অধিকাংশ ইংরাজীতে হলেও এবং তাঁর শ্রোতৃমণ্ডলীর অধিকাংশ তা না বুঝলেও তাঁরা মন্ত্রমুগ্ধের মত জিন্নার দু'ঘণ্টার অভিভাষণ শুনে-ছিলেন। জিন্নার এই বাক্‌নৈপুণ্যকে নিখুঁত করতে সাহায্য করেছিল তাঁর অভিনয়-কুশলতা, পিতৃপ্রভাবে স্থায়ীভাবে রঙ্গমঞ্চে যোগ না দিলেও দীর্ঘদিনের অনুশীলনে যা তাঁর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছিল। বক্তৃতাকালে জিন্নার কণ্ঠস্বর কখনও আবেগ, কখনও উষ্মা বা অনুকম্পা, কখনও ব্যঙ্গ কখনও বা রঙ্গ-বিদ্রূপে মুখর হয়ে উঠছিল। ভ্রূকুটি, তর্জনী সঙ্কেত, মুষ্টি আস্ফালন, যুক্তকরে আবেদন ইত্যাদি সহায়ক অঙ্গভঙ্গি তাঁর বক্তব্যকে শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে গেঁথে দিতে সাহায্য করল।[২৩] মূল বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে সুযোগ পেলেই "ইসলামের সেবক", "পবিত্র কর্তব্য" এবং "আমার স্বধর্মীয়দের প্রতিভা" ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক ও গোষ্ঠীগত আবেদনযুক্ত বাক্যাংশ ঢুকিয়ে দিয়ে তিনি তাঁর মুসলিম শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে নিজের বক্তব্যকে অপ্রতিরোধ্য করে তুললেন।

প্রথমে কংগ্রেস ও গান্ধীর ভূমিকার তীব্র তীক্ষ্ণ সমালোচনা করার পর জিন্না বললেন যে কংগ্রেসের নূতন "টোপ"—গণপরিষদের দ্বারা ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনা—

লীগ গলাধঃকরণ করবে না। কারণ যে গান্ধী তাঁকে ভাই[২৪] বলেন, তাঁর (অর্থাৎ হিন্দুদের) তিন ভোটের বদলে তাঁর নিজের মাত্র একটি ভোট। তাই তাঁর বক্তব্য হল : হিন্দু-মুসলমান সমস্যা আর ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ প্রশ্ন বা সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘুর ব্যাপার নয়। এই বিবাদকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করে তিনি ঘোষণা করলেন : "ভারতবর্ষের সমস্যা আন্তঃসাম্প্রদায়িক চারিত্র্যযুক্ত নয়। প্রকাশ্যতঃ এটা আন্তর্জাতিক ধরনের এবং তাই অবশ্যম্ভাবীরূপে একে তদনুরূপ বিবেচনা করতে হবে। এই মূলীভূত ও মৌলিক সত্য উপলব্ধি না করা পর্যন্ত যে সংবিধানই রচনা করা হোক না কেন, তা এক দুর্বিপাকেরই সৃষ্টি করবে। তা কেবল মুসলমানদের পক্ষেই ধ্বংসাত্মক এবং ক্ষতিকারক বলে সিদ্ধ হবে না, ব্রিটিশ ও হিন্দুদের উপরও তার একই পরিণাম হবে। ব্রিটিশ সরকার যদি এই উপমহাদেশের অধিবাসীদের শান্তি ও সুখের জন্য যথার্থই আন্তরিকতাসম্পন্ন হন তাহলে আমাদের সকলের সামনে যে একমাত্র পথ খোলা আছে তা হল ভারতবর্ষকে 'স্বয়ংশাসিত জাতীয় রাষ্ট্রে' বিভক্ত করে প্রমুখ জাতিগুলিকে (nations) পৃথক পৃথক বাসভূমি পেতে দেওয়া।"

অতঃপর দ্বিজাতিতত্ত্বের সপক্ষে যুক্তিজাল বিস্তার প্রসঙ্গে বললেন, "একথা উপলব্ধি করা অত্যন্ত কঠিন যে কেন আমাদের হিন্দু বন্ধুরা ইসলাম এবং হিন্দুধর্মের সঠিক তাৎপর্য অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন। প্রচলিত অর্থে এদের ধর্ম বলা চলে না। এগুলি আসলে পৃথক এবং স্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট সমাজ-ব্যবস্থা। হিন্দু ও মুসলমানেরা আদৌ কোনদিন এক জাতিতে পরিণত হবে—এ এক স্বপ্ন। এক ভারতীয়তার এই ভ্রান্ত ধারণা সীমাবহির্ভূত ভাবে এতদূর শিকড় বিস্তার করেছে যে এ বর্তমানের অধিকাংশ সমস্যার মূলে এবং সময়ে যদি আমরা আমাদের ধারণার সংশোধন না করি তাহলে এর পরিণতিতে ভারতবর্ষ ধ্বংস হয়ে যাবে। হিন্দু ও মুসলমানেরা দুই ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় দর্শন, সামাজিক প্রথা ও সাহিত্যের এলাকাভুক্ত। তাদের মধ্যে না বৈবাহিক বন্ধন স্থাপিত হয়, না তারা একত্রে পান-ভোজন করেন। সত্যি কথা বলতে কি তারা দুই পৃথক পৃথক সভ্যতার অঙ্গ, যার ভিত্তি প্রধানতঃ পরস্পর সংঘর্ষরত ভাবধারা ও ধারণা। জীবনের প্রতি ও তার সম্বন্ধে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন। একথাও স্পষ্ট যে হিন্দু ও মুসলমান ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন উৎস থেকে নিজ নিজ প্রেরণা সংগ্রহ করেন। তাঁদের মহাকাব্য, তার নায়ক এবং ঘটনাবলীও পৃথক।* প্রায়শঃ একের নায়ক অপরের শত্রু এবং অনুরূপভাবে তাদের জয়পরাজয়ও অঙ্গাঙ্গী ভাবে সম্পর্কিত। এই রকম দুটি জাতিকে এক রাষ্ট্রের জোয়ালে জুড়লে এর একটি

হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও অপরটি সংখ্যালঘু। ঐজাতীয় রাষ্ট্রের সরকারের জন্য যে ঐক্যসূত্র রচিত হবে তার বিরুদ্ধে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে পেতে শেষ অবধি তা ধ্বংস হয়ে যাবে।"

ভারত বিভাজনের পক্ষে তাঁর যুক্তি হল: "বলকান এলাকায় সাত-আটটি সার্বভৌম রাষ্ট্র আছে। অনুরূপভাবে ইবিরিয়ান অঞ্চলে পর্তুগীজ ও স্পেনীয়রা বিভক্ত। তত্রাচ এক অস্তিত্বহীন ভারতের ঐক্য ও অখণ্ড জাতীয়তার দোহাই দিয়ে এদেশে এক কেন্দ্রীয় সরকারের কথা বলা হচ্ছে যদিও আমরা জানি যে গত বারো শত বৎসরের ইতিহাসে এমন কোন ঐক্য সাধিত হয় নি এবং এই দেশ বরাবরই হিন্দু ভারতবর্ষ ও মুসলিম ভারতবর্ষ রূপে বিভক্ত থেকেছে। আজকে যে কৃত্রিম ঐক্য দেখা যায় তার সূচনা ব্রিটিশ বিজয়ের লগ্নে এবং এ বজায়ও রয়েছে তাদের অস্ত্রের বলে।" কোন রকম অস্পষ্টতা বা দ্বিধা-সঙ্কোচ না রেখে তিনি ঘোষণা করলেন: "মুসলিম-ভারত এমন কোন সংবিধান স্বীকার করতে পারে না যার পরিণতি স্বতঃই হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার। গণতান্ত্রিক প্রথার নাম দিয়ে হিন্দু ও মুসলমান-দের একত্র করে সেই প্রথা সংখ্যালঘুদের উপর চাপিয়ে দিলে তার একটিই মাত্র অর্থ হবে এবং তা হল হিন্দু-রাজত্ব। কংগ্রেস হাইকমাণ্ড যে ধরনের গণতন্ত্রের জয়গান করেন তার অর্থ হল ইসলামের দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সবকিছুর সম্পূর্ণ বিনাশ।" হিন্দু-মুসলমানের মিলন যে অসম্ভব—এই বক্তব্যের সমর্থনে তিনি লাজপৎ রায়ের উক্তি উদ্ধৃত করলেন। তাই তাঁর দাবি হল, "জাতি (nation) শব্দের যে কোন পরিভাষা অনুসারে মুসলমানেরা একটি জাতি এবং তাদের নিজস্ব বাসভূমি, এলাকা এবং রাষ্ট্র চাই।"[২৫]

পূর্বে যেমন বলা হয়েছে—এর অনুসরণে ২৩শে মার্চ অখিল ভারত মুসলিম লীগ ভারত বিভাজনের নিম্নোদ্ধৃত প্রস্তাব গ্রহণ করল:

"...অখিল ভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশনের সুবিবেচিত অভিমত এই যে নিম্নোক্ত মূল নীতি অনুযায়ী না হলে কোন সাংবিধানিক পরিকল্পনা এদেশে কার্যকরী হবে না বা মুসলমানদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে না। এই মূল নীতি হল —ভৌগোলিক দিক থেকে পরস্পর সম্বন্ধিত একক্ সমূহকে প্রয়োজনীয় আঞ্চলিক ব্যবস্থাপিতকরণের (readjustment) সহায়তায় এমন ভাবে পৃথক পৃথক এলাকায় পরিণত করতে হবে যে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মত যে-সব এলাকায় মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেগুলিকে একত্র করে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের'[২৬] (states) গঠন করা যায় যার অঙ্গীভূত একক্ সমূহ স্বয়ংশাসিত ও সার্বভৌম হবে।"[২৭]

এইভাবে মুসলমান "জাতি"র জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বতন্ত্র বাসভূমির দাবি উপস্থাপিত করে একদিকে জিন্না যেমন তাঁর অনুগামীদের চোখে পাকিস্তানের জনক ঐতিহাসিক পুরুষে পরিণত হলেন, অন্যদিকে তাঁর সমালোচকদের দৃষ্টিতে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রবলতম প্রবক্তারূপে পরিগণিত হলেন।

॥ ২০ ॥

জিন্না কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্ব বা মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রথম প্রবক্তা নন। তবে সে প্রসঙ্গের আলোচনার পূর্বে ভারতবর্ষে ইসলামের আবির্ভাব ও তার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সংক্ষেপে পর্যালোচনা করে নেওয়া উচিত।

নব ধর্মপ্রচারক ও উপনিবেশ স্থাপনাকারীদের মাধ্যমে ইসলামের সঙ্গে ভারতবাসীর বিচ্ছিন্ন ভাবে পরিচয় ঘটলেও সংগঠিত শাসকশক্তির মাধ্যমে ইসলামের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রথম অভিঘাত হয় ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে আরব সেনাপতি মহম্মদ-বিন-কাশিমের সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে। অতঃপর ইসলাম ধীরে ধীরে সিন্ধু প্রদেশে ব্যাপ্ত হল। একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গজনীর মামুদের বিজয়াভিযানের মাধ্যমে পাঞ্জাব থেকে মথুরা ও সোমনাথ পর্যন্ত ভূখণ্ডের অধিবাসীরা ইসলামের সঙ্গে পরিচিত হন। তবে উত্তর ভারতে ইসলামের স্থায়ী দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হয় তুর্কী মহম্মদ ঘোরীর হাতে থানেশ্বরের পৃথ্বিরাজের পরাজয় (১১৯২ খ্রীঃ) এবং দিল্লী বিজয়ের পর। এর বিশ বৎসরের মধ্যে তুর্কীশক্তি বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। আর এক শতাব্দীর মধ্যে দাক্ষিণাত্যের মাদুরাই পর্যন্ত অর্ধচন্দ্র তারকালাঞ্ছিত পতাকা শোভা পেতে থাকে। ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীরে ইসলামের প্রাদুর্ভাব হয়। অতঃপর পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত পতন-অভ্যুদয়ের মধ্যে দিয়ে ইসলামই ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান রাজশক্তির ভূমিকা পালন করে।

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের প্রায় সিকিভাগ অধিবাসী ইসলাম ধর্মাবলম্বী হয়ে গেছেন। একাধিক কারণে এটা ঘটেছিল। বিদেশাগত বিজেতা, তাঁদের সৈন্য-সামন্ত, অন্য রাজপুরুষ ও তাঁদের পৃষ্ঠপোষিত ইসলাম ধর্মাবলম্বী যতই আসুন, তাঁরা এদেশের মুসলমানদের এক অকিঞ্চিৎকর অংশ মাত্র ছিলেন। মুসলিম সংখ্যাস্ফীতির প্রধান ছিল হিন্দু ভারতবাসীদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ। একথা সত্য যে এ সময়ে শাসকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রশ্রয়ে জোর করে ধর্মান্তরিত করার বহু ঘটনা ঘটেছে। বেশ কিছু হিন্দু অর্থ, পদমর্যাদা এবং রাজানুগ্রহের লোভেও মুসলমান

হয়েছেন। কিন্তু ইসলাম ধর্মাবলম্বনকারীদের বৃহত্তম অংশ স্বেচ্ছায় নিজেদের ধর্মমত পরিত্যাগ করেছিলেন। জাতি (caste) ও বর্ণভেদ, ছুৎমার্গের বিচার এবং উচ্চ-নীচের বিচারে পীড়িত "নিম্নবর্ণে"র দরিদ্ররা (এঁদের মধ্যে বৌদ্ধ ও অন্যান্য মতাবলম্বীরাও পড়েন, ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির পুনরভ্যুদয়ের জন্য যাঁদের স্থান "নিম্নবর্ণে"র অন্তভুক্ত হয়) ইসলামের উদার সাম্যযুক্ত সামাজিক কাঠামোর মধ্যে নিরাপদ স্থান পাবার সঙ্গে সঙ্গে রাজার ধর্মের সাযুজ্য লাভ করার গৌরব অর্জন করা বাঞ্ছনীয় মনে করেছেন। ব্রাহ্মণ্য-কাঠামোয় উপেক্ষিত প্রকৃতিপূজকরাও (animiss) অনুরূপ ভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। বঙ্গদেশে ভূতপূর্ব বৌদ্ধরা হিন্দু সমাজের প্রত্যন্ত প্রদেশে স্থান পাবার পরও উৎপীড়িত ও নিগৃহীত হচ্ছিলেন। তাঁরা যেন ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবযুক্ত হিন্দুসমাজের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যই ব্যাপকভাবে ইসলাম ধর্মকে আলিঙ্গন করলেন।

হিন্দুদের বিপুল সংখ্যায় ইসলামের অঙ্গনে নিয়ে যাবার কৃতিত্ব মুসলিম সাধু সন্ত এবং বিশেষ করে মরমীয়া সুফী সাধক ও তাঁদের শিষ্যদের প্রাপ্য। এঁদের মধ্যে প্রমুখ ছিলেন আজমীরের খাজা মৈনুদ্দীন চিস্তি, দিল্লীর খাজা কুতুব অল-দীন কাকী, শেখ ফরীদ অল-দীন গঞ্জ-ই-শকর ও হজরৎ নিজামুদ্দীন আউলিয়া এবং তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যবর্গ। সুফীদের মধ্যে অনেকে দর্শনের ক্ষেত্রে ইসলামের সঙ্গে হিন্দুধর্মের সমন্বয়ের প্রয়াস করেন। উদাহরণ স্বরূপ মৈনুদ্দীন চিস্তির কাছে দীক্ষিত হুসেনী ব্রাহ্মণদের কথা বলা যায়। রামানন্দ, কবীর এবং দাদূ রজ্জবের উদার সমন্বয়মূলক শিক্ষাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়। সমন্বয়-সাধনার এই প্রবাহ আকবরের মত নৃপতি এবং দারাশুকোর মত রাজপুত্রকেও এর প্রবক্তায় পরিণত করে। ইসমাইলীয় বা খোজাদের দশাবতারের প্রতি বিশ্বাস এবং আহমদীয়া বা কাদিয়ানীদের বিশ্বাস ও আচার-বৈচিত্র্যের কথাও স্মরণীয়। যাই হোক, রাজনীতি এবং আধ্যাত্মিকতা—উভয় ক্ষেত্রেই ইসলামের কাছে পরাজিত হয়ে হিন্দুরা অংশতঃ কূর্মবৃত্তি গ্রহণ করে নিজেদের চতুর্দিকে বিধিনিষেধের নানারকম প্রাচীর খাড়া করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন। এই কড়াকড়িও আবার হিন্দু সমাজ ত্যাগ করে মুসলমান সমাজকে পুষ্ট করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ইসলামের অভিঘাতে ভারতীয় সমাজের উপর দ্বিতীয় যে ধরনের প্রতিক্রিয়া হয় তা হল শঙ্করদেব, নানক এবং চৈতন্য প্রমুখ সমন্বয়বাদী ভক্তিমার্গ অনুসারী সাধকদের আবির্ভাব। তাঁদের উদার সহজিয়া দর্শন ও উপাসনাপদ্ধতি বিশেষ করে লোকায়ত স্তরে ধর্মসমন্বয়ভিত্তিক এক পূর্ণাঙ্গ (composite) সংস্কৃতির প্রবর্তন করে। এই ধারা

যে কেবল হিন্দু সমাজ থেকে ইসলামের শিবিরে যাওয়াই বন্ধ করে অথবা ইসলামের অন্তরঙ্গ হয়ে স্বল্প সংখ্যায় হলেও মুসলমান সমাজ থেকে দীক্ষিত হিন্দু সংগ্রহ করে তা-ই নয়—এই ধর্মসমন্বয় এবং সংস্কৃতিসমন্বয় পরবর্তীকালে ভারতীয়ত্বের ভিত্তিভূমি রূপে পরিগণিত হয়।[১]

ভারতীয় সমাজে ইসলামের পূর্বোক্ত প্রকারে ব্যাপক বিস্তার ঘটলেও এদেশের মুসলমানরা কোনক্রমেই সমশ্রেণীভুক্ত (homogenous) ছিলেন না।[২] এর সর্ব পুরাতন অংশ ছিল বহিরাগত আরব, তুর্কী, পাঠান, মোগল, আফগান ও পারসীক প্রমুখ অভিযানকারী ও তাঁদের সহযোগী ও পরিবার-পরিজনবর্গ। সংখ্যালঘু হলেও এঁরাই ছিলেন মুসলমান সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়। এঁরা প্রধানতঃ ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। মুসলমানদের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অংশের উদ্ভব বিদেশাগত অভিযানকারী, ভাগ্যানুসন্ধানপ্রয়াসী এবং তাঁদের সহায়কদের সঙ্গে স্থানীয় মহিলাদের মিলনের ফলে। ঐ সুদূর অতীতে অত দুর্গম পথ অতিক্রম করে পর্দানসীন মুসলমান মহিলারা কমই এসেছিলেন এদেশে। সুতরাং বিদেশাগত অভিজাতদের প্রকৃতির নিয়মে এদেশ থেকেই জীবনসঙ্গিনী গ্রহণ করতে হয় এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা ভারতীয় মুসলমান-সমাজের একটি বিশিষ্ট উপাদানে পরিণত হন। এঁদের অবস্থিতি স্বাভাবিক কারণে এদেশের সর্বত্র। পরবর্তীকালে ভারতীয় মুসলমানদের নেতৃত্বের বৃহৎ অংশ এসেছিল সম্ভবতঃ এই অংশ থেকে। তবে পূর্বেই যেমন বলা হয়েছে, এদেশের অধিকাংশ মুসলমান ধর্মান্তরিত হিন্দু, বৌদ্ধ বা প্রকৃতি-পূজক এবং পূর্ব থেকেই এঁরা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে দেখা যায় যে ভারতবর্ষের সর্বত্র বিরাজিত এই বিপুলসংখ্যক মুসলমানদের মধ্যে সর্ববৃহৎ অংশ হল কৃষক, কৃষি-শ্রমিক এবং শিল্পী-কারিগর সম্প্রদায়। এঁরা হলেন মুসলমান-সমাজের ভিত্তিভূমি। মুসলিম সমাজের শিখরদেশে ছিলেন অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক জমির মালিক ও রাজকর্মচারীদের অভিজাত সম্প্রদায়। মাঝখানে অবস্থিতি একান্ত স্বল্পসংখ্যক মধ্যবিত্ত বৃত্তি অবলম্বন-কারী ব্যক্তিরা। মুসলিম মধ্যবিত্তদের সংখ্যাল্পতার কারণ ছিল দ্বিবিধ। প্রথমতঃ একটু যোগ্য ব্যক্তি হলেই মুসলমান শাসক এবং অভিজাতদের বদান্যতায় তিনি অতি দ্রুত উপরে উঠার সুযোগ পেয়ে যেতেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁদের হিন্দু মধ্যবিত্তদের সঙ্গে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে হত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে মুসলমানধর্মীয়দের শাসনের অবসানের সূচনা হয় এবং স্বভাবতই তাই সমগ্র মুসলিম সমাজকে অতঃপর গভীর সঙ্কট ও চাপের সম্মুখীন হতে হয়।

শাসনক্ষমতা হস্তচ্যুত হবার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতম সরকারী পদসমূহ কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীদের করায়ত্ত হয় এবং নিম্নতর পদের অধিকাংশ ইংরেজ বণিকদের সহায়করূপে হিন্দুরা দখল করেন। ভূতপূর্ব শাসক এবং তাঁদের অনুগ্রহপুষ্ট মুসলমান অভিজাতদের পক্ষে তাই হয় অতীতের শাসিত সম্প্রদায়ের সদস্য হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামা অথবা আহত অহমিকার জন্য নূতন শাসকদের থেকে দূরে সরে থাকা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। কিন্তু অন্ন-সমস্যার এতে সমাধান হয় না এবং হৃত মান-মর্যাদারও পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা দেখা দেয় না। উপরন্তু কোম্পানী ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং শেষ অবধি ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয় তার ফলেও বহুসংখ্যক জমির মধ্যস্বত্বভোগী অভিজাত মুসলমান উপার্জনের একমাত্র উপায় থেকে বঞ্চিত হয়ে আর্থিক সঙ্কটে পতিত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতি বিদ্বিষ্ট হন। কিছুদিন পরই অতীতের সরকারী ভাষা ফার্সীর বদলে সরকারী কাজকর্মের ভাষা হিসাবে ইংরাজীর প্রবর্তন হয়। হিন্দুরা অতি শীঘ্র এ ভাষা শিখে সরকারী চাকরি ইত্যাদির ক্ষেত্রে আরও সুবিধা করে নিলেও মুসলমান অভিজাত ও মধ্যবিত্তরা অতীত গৌরবের সঙ্গে যুক্ত নিজেদের ভাষা ছেড়ে বিজাতীয় ও বিধর্মী বিজেতাদের ভাষা শেখার ব্যাপারে আগ্রহ দেখালেন না। সুতরাং জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে তাঁরা আরও পিছিয়ে পড়েন। ইসলামের উদ্গম ও বিকাশের কেন্দ্র আরব ও পারস্য দেশেও কালপ্রভাবে ধর্মের প্রথম দিকের তেজ ও উদ্দীপনা আর নেই। সুতরাং তার গরবে ভারতীয় মুসলমানদের আত্মগর্ব তৃপ্ত করার পথও অবরুদ্ধ।

"ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বঙ্গের সংবাদপত্রসমূহে এবং বিশিষ্ট হিন্দু নেতাদের বক্তৃতা-বিবৃতিতে মুসলমান শাসনের প্রতি তীব্র নিন্দা বর্ষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থার প্রতি উৎসাহব্যঞ্জক একরকম সানন্দ অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। দেশ যে সমস্ত সমস্যার দ্বারা পীড়িত ছিল তার প্রায় সবগুলির জন্য মুসলিম শাসনকে দায়ী করা হয়। হিন্দুরা নূতন ব্যবস্থার দ্বারা সর্বাধিক লাভান্বিত হন···। উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের মনে হিন্দুদের সম্বন্ধে একটা অনীহার ভাব সৃষ্টি হয় এবং তার প্রতিক্রিয়ায় হিন্দুরাও মুসলমানদের সম্বন্ধে বীতস্পৃহ বোধ করেন···। বৃত্তি ও ক্ষমতাচ্যুত মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায় এবং শিক্ষিত মুসলমানরা একরকম মরীয়া হয়ে নিজেদের ভিতর একটা বিদ্রোহের ভাব লালন করা আরম্ভ করেন এবং মুসলমান কৃষক-সম্প্রদায়কে মুসলিম গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁদের সঙ্গে যোগদান করার আহ্বান জানান। তাঁদের বক্তব্য ছিল—এই পন্থাতেই স্বদেশীয়দের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা

সম্ভব যা তাঁদের নূতন জমিদারদের শোষণ থেকে পরিত্রাণ করবে।"[৩]

কয়েক শতাব্দী ভারতবর্ষে হিন্দুদের পাশাপাশি থাকার ফলে এদেশে ইসলামের উপরও দ্বিবিধ প্রতিক্রিয়া হয়। ইসলাম এদেশে এসে স্বাভাবিক নিয়মে হিন্দুধর্ম ও সমাজকে প্রভাবিত করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। এর সঙ্গে সুফী প্রভাব যুক্ত হয়ে এক হিন্দু-মুসলমান মিলিত সংস্কৃতির প্রবর্তন করে যার প্রতি ইতিপূর্বেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এছাড়া এক ধরনের জাতিভেদ প্রথা বা উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ, মাজার, কদম রসুল, হজরৎ বাল বা ঐজাতীয় প্রতীকের উপাসনা, যা মূল ইসলামে ছিল না—তাও এদেশের মুসলমানদের মধ্যে স্বীকৃতিলাভ করে। অপর দিকে পূর্বোক্ত সমন্বয় সাধনার প্রতিক্রিয়ায় তারই পাশাপাশি ইসলামকে শুদ্ধ-নিষ্কলঙ্ক রাখার ও বার বার কোরাণ ও হদিসের মূল শিক্ষার প্রতি মুসলমান সমাজকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার প্রবণতাও দৃষ্টিগোচর হয়।[৪] ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বার বার ভারতীয় ইতিহাসের গতিপথে কখনও এর প্রথমোক্ত কখনও বা দ্বিতীয়োক্ত প্রবণতার প্রাবল্য দেখা গেছে।

বিচ্ছিন্নতাবাদ ও দ্বিজাতিতত্ত্বের আধুনিক ইতিহাস জানতে আমরা অতঃপর উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রত্যাবর্তন করব। নূতন প্রাণশক্তিতে উদ্বেল যে ইসলামের অভিঘাতে একদা ভারতীয় সমাজে একটা প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয় কালক্রমে তা ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক দিক থেকে মোগল শক্তির শেষ যুগ। মারাঠা ও শিখ শক্তির উদয় হয়েছে এবং অন্তরাল থেকে ব্রিটিশ শক্তি আবির্ভূত হয়ে বণিকের মানদণ্ডের অন্তরালে পূর্ণ রাজদণ্ড রূপে আত্মপ্রকাশের প্রহর গুনছে। অনতিবিলম্বে তাদের মাধ্যমে পাশ্চত্ত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি এদেশকে প্লাবিত করবে।

সিপাহী বিদ্রোহ পূর্ব ভারতে মুসলিম হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের প্রথম উল্লেখযোগ্য আন্দোলন হয় আমাদেরই বঙ্গদেশে। ফরিদপুর জেলার মৌলভী শরিয়ৎউল্লা দীর্ঘ বিশ বৎসর কাল আরব দেশে অতিবাহিত করে প্রত্যাবর্তন করার পর উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে তাঁর ফরাজী আন্দোলন মারফৎ মুসলমানদের কট্টর ইসলাম-নিষ্ঠ হয়ে নিজেদের অবস্থার সংস্কার-সাধনের পরামর্শ দিলেন। তাঁর পুত্র দুদু মিঞাও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজ অনুগামীদের জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগঠিত করেন। তবে তাঁর আন্দোলনের এই অর্থ নৈতিক দিক সম্ভবতঃ জমিদারদের বৃহদংশ হিন্দু হবার জন্য। জৌনপুরের শেখ করামৎ আলীও এমনি এক কট্টর ইসলামী আন্দোলন প্রবর্তন করেন। চল্লিশ বছর একটানা

পূর্ববঙ্গে নৌকাযোগে সদলবলে সফর করে তিনি আসাম ও বঙ্গে গোঁড়া ইসলামের প্রচার করেন।

ওহাবী আন্দোলনের প্রবর্তক রায়বেরিলীর সৈয়দ আহমদের (১৭৮৬-১৮৩১ খ্রীঃ) প্রভাব অবশ্য আরও ব্যাপক ছিল। তিনি অনুপ্রাণিত হন ইসলামী ধর্ম-দর্শনের অদ্বিতীয় পণ্ডিত দিল্লীর শাহ-ওয়ালি-উল্লা (১৭০৩-১৭৬২ খ্রীঃ) দ্বারা। বঙ্গ-বিহার থেকে শুরু করে ইংরেজ শাসনের বহির্ভূত শিখ শাসিত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলকে দার-উল-হারব বা কাফের শাসিত দেশ বিবেচনা করে তাঁর জেহাদ এবং তা সম্ভব না হলে মুজাহিদদের হিজরতের বাণী তাঁকে মুসলমান সমাজে জনপ্রিয় করে তোলে। আধুনিক ধ্যান-ধারণা গ্রহণ করার পরিবর্তে এই সন্নীতিপরায়ণ সংস্কারক অতীতে ফিরে যাওয়াকেই বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলঃ "…মুসলমান সমাজকে আভ্যন্তরীণ অবক্ষয়ের প্রভাবমুক্ত করা এবং দেশে মুসলিম সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা।…তিনি এক পৃথক স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের প্রস্তাব করেন কারণ তাঁর মতে ইসলাম ও তার প্রথা-পদ্ধতির পুনরভ্যুদয়ের জন্য এ একান্ত অপরিহার্য।"[৫]

নেশন স্টেটের মানসিকতা সে যুগের ভারতে গড়ে না উঠলেও স্বভাবতই এই পৃথক হবার বা থাকার মানসিকতা ভারতীয় সমাজের বৃহত্তম অংশ হিন্দুদের কাছে প্রীতিপ্রদ মনে হয় নি। শিখ রাজত্বকে দারুউল-হারব ঘোষণা করে তার বিরুদ্ধে জেহাদ পরিচালনার জন্য স্বভাবতই শিখরাও মুসলমানদের প্রতি অপ্রসন্ন হন। তাছাড়া ওহাবী জেহাদের শিকার হিন্দুদেরও হতে হয় এবং শিখ সাম্রাজ্য ইংরেজদের করায়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত ব্রিটিশদের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে পুষ্ট[৬] ওহাবী জেহাদীদের হাত থেকে হিন্দুরা রক্ষা পায় নি। এর পরিণামে মুসলমানরা দেশের মূল ধারা থেকে আরও দূরে সরে গেলেন।

সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরেজদের নীতিতে আরও একটা পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হল। বিদ্রোহে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমান অংশ গ্রহণ করলেও ইংরেজদের আক্রোশটা প্রধানতঃ পড়েছিল মুসলমানদের উপর। আইনতঃ ভারতসম্রাট বাহাদুর শাহকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহীরা নিজেদের কাজকে নীতিসঙ্গত রূপ দেবার চেষ্টা করেছিল। বিদ্রোহের দ্বারা প্রভাবিত বৃহত্তম অঞ্চল অযোধ্যার শাসক নবাবও ছিলেন মুসলমান। এছাড়া ছোট বড় আরও অনেক বিদ্রোহের নেতাও ছিলেন ইসলাম ধর্মাবলম্বী। এইসব কারণে নূতন শাসক ইংরেজদের দমননীতি মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের উপর পড়ে। অতঃপর তাঁদের তফাৎ রাখাই হয় ব্রিটিশ নীতি।

মুসলমান অভিজাত আশ্রফ সম্প্রদায়ের নূতন শাসকবর্গ কর্তৃক তাঁদের পরিহার করে চলার এই নীতি বুঝতে বিলম্ব হয় নি। তাঁরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে তাঁরাই স্বাধীন ভারতের শেষ শাসক সম্প্রদায় এবং তাই সঙ্গত কারণেই উড়ে এসে জুড়ে বসা এই বিদেশীদের অপসারণের পর তাঁদের হাতেই দেশের ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়া উচিত। ইংরেজদের সহচর হিসাবে হিন্দুরা তাঁদের উপর কর্তৃত্ব করছেন যদিও এর পূর্বে এই অধিকার ছিল কেবল তাঁদেরই। ভবিষ্যতে হিন্দুদের দ্বারা শাসিত হতে হবে—এই আতঙ্কও মুসলমান অভিজাতদের মনে বাসা বাঁধল। কিন্তু উপায়ান্তর না দেখে আত্মমর্যাদাজ্ঞান এবং অভিমান-চালিত হয়ে তাঁরাও ইংরেজদের সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে থাকার মানসিকতা ও অতীত কণ্ডূয়নবৃত্তি গড়ে তুললেন। ইংরাজী শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতি গ্রহণের ধার দিয়ে না গিয়ে তাঁরা মাদ্রাসা-মক্তবের উর্দু-আরবী-ফার্সী ভিত্তিক শিক্ষা-সহবতকেই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করলেন। আর চোখের সামনে দেখতে লাগলেন যে ইংরেজ শাসকদের প্রসাদপুষ্ট এবং তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি গ্রহণকারী হিন্দুরা কেমন সম্পন্ন ও ক্ষমতাশালী হয়ে উঠছেন। এর উপর ফার্সীর পরিবর্তে ইংরাজীকে রাজকার্যের ভাষা করায় এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন ও লাখেরাজ সম্পত্তির অধিকার বাতিলের ফলে মুসলমান অভিজাতরা শিক্ষা-সংস্কৃতি ও আর্থিক—উভয় ক্ষেত্রেই মার খেলেন। উপেক্ষার জন্য একদিকে অবরুদ্ধ ক্ষোভ ও দেশের মূল প্রবাহ থেকে সরে থাকা এবং অন্যদিকে হিন্দুদের প্রতি ঈর্ষা ও ভয় সিপাহী বিদ্রোহ-উত্তর মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের মানসিকতার ভিত্তিভূমি হয়ে উঠল। সত্য কাল্পনিক যা-ই হোক, পূর্বোক্ত মুসলিম মানসিকতা পরবর্তী এক শতাব্দীকালের হিন্দু-মুসলমান রাজনৈতিক সম্পর্ককে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

অভিজাতরা কূর্মবৃত্তি গ্রহণ করায় সাধারণ মুসলমানদের নেতা হয়ে দাঁড়ালেন যুগ এবং কালপ্রবাহ সম্বন্ধে অজ্ঞ দূরদৃষ্টিবিহীন সঙ্কীর্ণচেতা গোঁড়া ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ। সেই সব নেতাদের আদর্শ ছিল ফরাজী ও ওহাবী আন্দোলনের তত্ত্ব-দর্শন। তাঁদের ধারণা ছিল—গোঁড়া ইসলামী আচার-আচরণ থেকে বিচ্যুতিই মুসলমানদের পতনের কারণ এবং কোরাণ-হদীস-সম্মত অতীতে ফিরে গেলেই তাঁদের গৌরব-রবির পুনরুদয় ঘটবে। তদানীন্তন মুসলমান সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে এক মুসলমান পণ্ডিতের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

"যে সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থের নির্দেশ হল মানুষের মধ্যে সাম্য এবং মানুষ এই ধরাতলে ঈশ্বরের প্রতিনিধি—একথা বিশ্বাস করা, সেই সম্প্রদায় আপন সিদ্ধান্ত

ও ঐতিহ্যে নিজেদের এই পরিমাণ বেঁধে ফেলে যে ব্যক্তির যাবতীয় উদ্যম-অভিক্রম তিরোহিত হয়ে তাকে সম্পূর্ণরূপে গোষ্ঠীপতির উপর নির্ভরশীল করে তুলল।"[৭]

কূপমণ্ডুকতা পরিহার করে মুসলমান সমাজকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে ব্রিটিশ শাসনের সুফলের অংশীদার হবার জন্য যে দুই মুসলমান নেতা সর্বপ্রথমে আহ্বান জানালেন তাঁরা হলেন স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ এবং সৈয়দ আমীর আলী। উভয়েহ জাতীয়তাবাদী বা সকল সম্প্রদায়ের ভারতীয়দের নেতারূপে তাঁদের জনসেবা-মূলক জীবনের সূত্রপাত করলেও অনতিবিলম্বে নিজেদের প্রয়াস কেবল স্বধর্মীয়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করেন। আমীর আলী ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে উচ্চ আদালতের বিচারপতি হবার তেরো বৎসর পূর্বে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সেণ্ট্রাল ন্যাশন্যাল মহমেডান অ্যাসোসিয়েসানের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নিঃসন্দেহে এইটিই মুসলমানদের প্রথম উল্লেখযোগ্য সংগঠন যা তাঁদের সমস্যাবলী সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা ও পথপ্রদর্শনের প্রয়াস করে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শাখাযুক্ত এই প্রতিষ্ঠানে প্রথম দিকে কয়েকজন হিন্দু ও ইউরোপীয় সদস্য থাকলেও, "নিজের লক্ষ্য ও কার্যকলাপের দিক থেকে এটি প্রধানতঃ ছিল একটি মুসলিম প্রতিষ্ঠান। তাই এর বিস্তৃত ভিত্তি সত্ত্বেও এই প্রতিষ্ঠান মুসলমানদের হিন্দুদের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সমর্থ হয় এবং পরোক্ষ ও অচেতন ভাবে তাঁদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা গড়ে তোলার সহায়ক হয়।"[৮]

স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ (১৮১৭-১৮৯৮ খ্রীঃ) স্বয়ং ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও তাঁর দূরদৃষ্টিবলে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মূল্য উপলব্ধি করেছিলেন বলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে নিজ সম্প্রদায়ের ভিতর এর প্রবর্তনের জন্য অদ্বিতীয় প্রয়াস করেন। দিল্লীর এই অভিজাত মুসলমান কুড়ি বছর বয়সে ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকরি নিয়েছিলেন এবং অধস্তন বিচারকের পদে উন্নীত হন। তিনি পাশ্চাত্ত্যের উন্নতির অন্যতম কারণ বিজ্ঞানের প্রবক্তা ছিলেন। পয়গম্বরের উপদেশ এবং কোরাণের প্রামাণ্যতা মেনে নেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যুক্তিবাদকেও মনুষ্যজীবন ও কর্মে উপযুক্ত স্থান দেন। তার ভূমিকা ছিল একদিকে মুসলিম গোঁড়ামির পৃথক থাকার মানসিকতার বিরুদ্ধে লড়াই এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যপ্রবাহে মুসলিম সমাজকে প্রবাহিত হয়ে যেতে না দেওয়া। সঙ্গত কারণেই তাঁকে ভারতীয় মুসলমানদের নবজাগরণের জনক বলা হয়ে থাকে। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজদের পক্ষাবলম্বন করার জন্য তাঁকে যথেষ্ট নিগ্রহ সহ্য করতে হয়। ইংরেজ রাজত্বকে তিনি দার-উল-ইসলাম বা শান্তির শাসন ব্যবস্থা বিবেচনা করতেন। এই সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির সুযোগ নিয়েই

কেবল মুসলমানরা নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে পারে—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। স্বসম্প্রদায়ের বিকাশের জন্য তাই ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আলীগড়ে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বীজ মহমেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। যা ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। তিনি ইংরেজদের মন থেকে এই ধারণা দূর করার চেষ্টা করেন যে মুসলমানরাই সিপাহী বিদ্রোহের প্রধান নায়ক। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের ব্রিটিশ প্রশাসনের কাছাকাছি এনে তাঁদেরও হিন্দুদের মত শাসকদলের প্রসাদপুষ্ট হবার সুযোগ দেওয়া। প্রথম দিকে (১৮৬৭-১৮৮৩ খ্রীঃ) তিনি দেশের হিতসাধনে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রবল প্রবক্তা ছিলেন এবং উভয় সম্প্রদায়কে নিজের দুই চক্ষুর সঙ্গে তুলনা করতেন। তাঁর আলীগড় কলেজে হিন্দুরাও অর্থসাহায্য করেন এবং কোন রকম ভেদভাব না করে যথেষ্ট সংখ্যক হিন্দু ছাত্র ও অধ্যাপক গোড়ায় ঐ কলেজে ছিলেন।

কিন্তু ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের পর তাঁর ভূমিকা পরিবর্তিত হল। এর সূত্রপাতের আভাস পাওয়া যায় বড়লাটের কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠানসমূহে ষোল আনা নির্বাচন ব্যবস্থার বদলে সরকার কর্তৃক এক-তৃতীয়াংশ মনোনয়নের অধিকারবিশিষ্ট বিলের সমর্থন প্রসঙ্গে। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী তিনি এ সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "...ভারতবর্ষের বর্তমান সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা কয়েক শতাব্দীর স্বৈরতন্ত্র ও কুশাসনের ইতিহাসের পরিণাম। এ হল জাতির (race) উপর জাতির, ধর্মের উপর ধর্মের প্রভুত্বের পরিণতি। জনসাধারণের ঐতিহ্য ও অনুভূতি এবং তাদের বর্তমান আর্থিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বহুল পরিমাণে অতীত ইতিহাস দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত। ব্রিটিশ শাসনের মানবীয় পরিণাম ব্রিটিশ আধিপত্যের পূর্ববর্তীকালের বিবাদ ও দ্বন্দ্বের স্মৃতি ভারতবর্ষ থেকে এখনও মুছে ফেলতে সক্ষম হয়নি। **ভারতবর্ষ এক মহাদেশ বিশেষ এবং এদেশে বিভিন্ন জাতি (race) ও বিশ্বাসের বিপুল সংখ্যক অধিবাসীর বসতি।** ধর্মীয় সংগঠন সমূহের কঠোরতা এমন কি প্রতিবেশীদেরও পরস্পর থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। জাতিভেদ প্রথা এখনও প্রবল ও শক্তিশালী। একই জেলার অধিবাসীদের মধ্যে নানা বিশ্বাস এবং বিভিন্ন জাতি (nationality) দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে কোন এক গোষ্ঠীর হাতে যদি ধন-সম্পত্তি ও ব্যবসা-বাণিজ্য থাকে তবে অপর গোষ্ঠীর মধ্যে আছে বিদ্যার প্রচলন ও তজ্জনিত প্রভাব।...এমতাবস্থায় একথা অস্বীকার করা কঠিন যে ভারতে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রভূত আয়াসসাধ্য এবং এই প্রক্রিয়ায় সামাজিক ও

রাজনৈতিক ঝুঁকিও আছে।”[৯]

অতঃপর তিনি কেবল মুসলমানদের নেতা হয়ে পড়লেন। মুসলমানরা এক স্বতন্ত্র নেশন বা জাতি এবং তাঁদের নবগঠিত (১৮৮৫ খ্রীঃ) ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে পৃথক থেকে ইংরেজদের প্রীতি অর্জনের মাধ্যমে স্ব-সম্প্রদায়ের কল্যাণ সাধন করা উচিত ইত্যাদি হল তাঁর বক্তব্য। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে নিজ অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে স্যার সৈয়দ সুস্পষ্টভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রোৎসাহন দিয়ে বলেন, “এই পরিস্থিতিতে মুসলমান ও হিন্দু এই দুই জাতি (nations) একই সিংহাসনে একভাবে ক্ষমতা ভোগ করবেন—এ কি সম্ভব? সুস্পষ্টভাবে এ অসম্ভব। এদের মধ্যে একটিকে অপরের উপর বিজয়ী হয়ে বিজিতকে ধরাশায়ী করতে হবে। উভয়েই সমভাবে থাকতে পারে এই আশা পোষণ করা অসম্ভব এবং অভাবনীয় ইচ্ছার দ্যোতক”[১০]। ইংরেজদের হাত থেকে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা আসার অর্থ মুসলমানদের উপর সংখ্যাগুরু হিন্দুদের শাসন—এই যুক্তি দেখিয়ে তিনি কোন রকম শাসন-সংস্কার এবং বিশেষ করে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন-ব্যবস্থার দাবিরও বিরোধিতা করতেন এবং ইংরেজ শাসন চিরস্থায়ী হোক চাইতেন।[১১] স্যার সৈয়দ প্রভাবিত আলীগড় গোষ্ঠীর বুদ্ধিজীবীবর্গ যাঁরা সে সময়ে এবং পরেও মুসলিম শাসনকে প্রভাবিত করেছিলেন তাঁরা হলেন শিক্ষাব্রতী মৌলভী নাজির আহমদ, মৌলভী জাকাউল্লা, ইউসুফ আলী, কবি আলতাফ হোসেন ও হালি এবং পাটনার পণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী খুদাবকস প্রমুখ। আলীগড়গোষ্ঠীর অপর এক নেতা ভকির-উল-মুল্ক এবং কলকাতার আমীর আলীর সহায়তায় স্যার সৈয়দ তাঁর নূতন ভূমিকা পালন করতে লাগলেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে একদিকে ওহাবী আন্দোলনের অবলুপ্তি এবং অন্যদিকে ইংরেজ রাজত্ব দার-উল-হারব নয়, দার-উল-ইসলাম ও সেই কারণে তার সঙ্গে সহযোগিতা করা কর্তব্য—এই মর্মে মৌলানা কেরামত আলী জৌনপুরীর ফতোয়া স্যার সৈয়দের ধারাকে পুষ্ট করল। তাঁদের মত মুসলমান সমাজের অগ্রণীদের এইভাবে স্বীয় সম্প্রদায়কে ভারতীয়দের তদানীন্তন আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার প্রয়াস যে ফলবতী হবে এতে আর আশ্চর্যের কি আছে? বিশেষ করে অভিজাত ও মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজে যখন হিন্দু-বিদ্বেষ ছিলই। এ সম্বন্ধে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে “ইসলাম প্রচারক” নামক একটি বাংলা পত্রিকায় মুসলমানদের তরফ থেকে প্রকাশিত একটি বিবৃতির তাৎপর্য অনুধাবনীয়। বিবৃতির অভিমত হল—ব্রিটিশ শাসনে মুসলমানেরা নিঃসংশয়ে অসীম শান্তি ও সুখে বসবাস করছেন।[১২]

স্যার সৈয়দ প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন-ব্যবস্থা ছাড়াও কংগ্রেসের ভারতীয়দের সিভিল সার্ভিসে নেবার দাবিরও বিরোধী ছিলেন এবং এমন কি দেওবন্দের মুসলমান নেতাদের সেই ফতোয়ার তীব্র বিরোধিতা করেন যাতে মুসলমানদের বলা হয় যে ইহজাগতিক ব্যাপারে হিন্দুদের সঙ্গে সহযোগিতা করা চলতে পারে।[১৩] (অবশ্য উক্ত ফতোয়ায় এও বলা হয়েছিল যে মুসলমানদের স্যার সৈয়দের কার্যকলাপের সঙ্গে সহযোগিতা করা বাধ্যতামূলক নয়।) লখনউ-এ প্রদত্ত ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরের দেড়ঘণ্টার ওজস্বিনী ভাষণে স্যার সৈয়দ মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদকে দৃঢ়মূল করেন। কখনও কখনও তিনি ইসলামের সনাতন তলোয়ারের ভাষার শরণ নেবার হুমকি দেন। তাঁর পূর্বোক্ত দুই সহকর্মী এবং অন্যান্য ভাবশিষ্যরা ও মুসলমান সমাজের অন্যান্য প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ তাঁর চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হয়ে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদকে আরও পুষ্ট করেন।

হিন্দু প্রভুত্বের ভয় যে একেবারে অমূলক ছিল তাও বলা চলে না। ঐ সময়ে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে মুসলমানেরা যেসব এলাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানেও বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। এই কারণে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের পুণা মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে মুসলমানরা আদৌ অংশগ্রহণ করেন নি। তাঁদের আশঙ্কা হয়েছিল যে তাঁরা একটি আসনও পাবেন না। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক (বিধান) সভার নির্বাচনে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুদের তুলনায় মাত্র অর্ধেক আসন পান। প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন-ব্যবস্থার যে দাবি উঠছিল তার মূলে রয়েছে মাথাপিছু একটি করে ভোট। এ পথে তো সংখ্যাগুরু হিন্দুদের শাসনই চিরস্থায়ী হবে এবং এক কালের শাসক মুসলমানদের তাঁদের অধীন হয়েই বরাবর থাকতে হবে। সুতরাং এ পথে মুসলিম আত্মাভিব্যক্তির প্রকাশ কি করে সম্ভব ?

ক্রমবর্ধমান এই বিচ্ছিন্নতাবাদের[১৪] চূড়ান্ত রাজনৈতিক রূপ হল ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত এবং লর্ড মিণ্টোর কাছে আগা খাঁর মুসলিম প্রতিনিধিমণ্ডল নিয়ে যাওয়া। এ সম্বন্ধে আগা খাঁর নিম্নোক্ত স্বীকারোক্তি স্মরণীয় : "লর্ড মিণ্টো কর্তৃক আমাদের দাবি মেনে নেওয়া হল পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্বন্ধে যেসব বিভিন্ন প্রস্তাব করেছেন তার ভিত্তি স্থাপিত হওয়া। এর চূড়ান্ত অপরিহার্য পরিণতি হল ভারত বিভাজন এবং পাকিস্তানের সৃষ্টি।"[১৫]

এ প্রসঙ্গের উপর যবনিকা টানার পূর্বে একটি সঙ্গত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবার

প্রয়াস করা হবে। প্রশ্নটি হল—১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ যখন ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্যোতক ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার তোড়জোড় চলছে তখন থেকে স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ভূমিকায় এই আমূল পরিবর্তন ঘটার অন্তর্নিহিত কারণ কি? তাঁর রাজনৈতিক দর্শন এবং কর্মসূচীর বৈশিষ্ট্য এ প্রশ্নের পূর্ণাঙ্গ উত্তর দিতে অক্ষম। এর উত্তর মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে—আলীগড় কলেজের প্রথম ইংরেজ অধ্যক্ষ থিয়োডের বেক্ (১৮৪৪-১৮৯৯)-এর ভেদনীতি প্রচারের কুশলী প্রয়াস। তাঁর পরবর্তী দুই ইংরেজ অধ্যক্ষ থিয়োডর মরিসন (১৮৯৯-১৯০৫ খ্রীঃ) এবং ডবলু. এ. জে. আর্চিবোল্ডের (১৯০৫-?) ভূমিকাও প্রথম জনেরই অনুরূপ ছিল—একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই কারণে স্বভাবতই কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা অ্যালান অক্টোভ হিউমের সেই সৎ পরামর্শের (ভারতবর্ষের অবস্থা সঠিকভাবে বোঝার জন্য উপযুক্ত মানসিক প্রশিক্ষণ লাভ করুন এবং "মুসলমানদের অংশবিশেষের একটি গুপ্ত গোষ্ঠীকে"[১৬] সন্তুষ্ট করার প্রবণতা ত্যাগ করুন) প্রতি থিয়োডর বেক্ কর্ণপাত করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি।

একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে বলে রাখা ভাল যে পূর্বে যেমন আমরা দেখেছি যে দেওবন্দ গোষ্ঠীর নেতারা একদা বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরোধিতা করেছিলেন, ভারতীয় মুসলমানদের অপর একদল নেতাও সেই সময়ে সৈয়দ আহমদের বিচ্ছিন্নতাবাদের দ্বারা প্রভাবিত হন নি। এর মধ্যে প্রধান হলেন কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনের সভাপতি বদরুদ্দীন তৈয়বজী ও তাঁর সগোত্রীয়েরা। জনৈক শিক্ষাবিদের নামও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় এবং তিনি হলেন আলীগড়ের ফার্সীর অধ্যাপক মৌলানা শিবলি যিনি সাম্প্রদায়িকতার কট্টর বিরোধী ছিলেন। মুসলমানরা জাতি অথবা এমন কি নিজেদের কল্যাণের জন্যও অগ্রণী হয় না অথচ "তাঁদের কাছে ধর্মের নামে আবেদন করে দেখুন কী বিপুল সাড়া পাওয়া যাবে!"[১৭]—এ নিয়ে তাঁর ক্ষোভের সীমা ছিল না। আরও অনেক মুসলমানও এই ভাবে ভাবিত ছিলেন। কিন্তু সে বিষয় আপাততঃ আমাদের আলোচ্য নয়।

জিন্না-পূর্ব মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে বিংশ শতাব্দীর এই প্রবণতার প্রধান বাহন মুসলিম লীগের ভূমিকাও সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। স্যার সৈয়দ ও সমভাবে ভাবিত গোষ্ঠীর প্রভাবে মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায় দেশের প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ ব্যাপক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ ছিলেন। একই কারণে মুসলিম জনমতের বৃহৎ অংশ বঙ্গভঙ্গের বিরোধ সহ

তাবৎ সরকার-বিরোধী আন্দোলন সম্বন্ধেই নিস্পৃহ ছিল। এইভাবে কংগ্রেসকে তার ধর্মনিরপেক্ষ চারিত্রধর্ম সত্ত্বেও নিজেদের অসহযোগিতার জন্য প্রধানতঃ হিন্দু সংগঠন রূপে গড়ে উঠতে দিয়ে প্রতিষ্ঠানটির প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু চারিত্রধর্মের জন্য তার বিরূপ সমালোচনাও করতে লাগলেন। মুসলমানদের জন্য পৃথক এক রাজনৈতিক দলের পটভূমিকাও এইভাবে প্রস্তুত হল।

লীগের জন্মকাহিনী পূর্বেই বলা হয়েছে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে লীগের নিম্নোক্ত লক্ষ্য নির্ধারিত হয়: "…মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং তার বিস্তার, সরকারকে মুসলমানদের প্রয়োজনীয়তা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে অবহিত রাখা, ভারতবর্ষের মুসলমানদের ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অনুগত করা[১৮] এবং মুসলমানদের অপরাপর সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হওয়া থেকে বিরত রাখা।"[১৯] ঢাকার ঐ সম্মেলনে মুসলমানদের পক্ষে হিতকর বলে বঙ্গভঙ্গের সমর্থন করা হয়েছিল। পরবর্তী বৎসরে করাচীতে অনুষ্ঠিত লীগের অধিবেশনের সভাপতি স্যার আদমজী পীরভাই ইম্পিরিয়াল ও প্রাদেশিক কাউন্সিলসমূহে মুসলমান-দের জন্য কিছু কিছু আসন সংরক্ষণের জন্য ব্রিটিশ সরকারকে প্রভূত ধন্যবাদ দিয়ে মুসলমানদের সরকারের প্রতি অনুগত থাকার পরামর্শ দিলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮-১৯ মার্চ আলীগড়ের বিশেষ অধিবেশনে সরকারের জন্য একটি স্মারকলিপি প্রস্তুত হয় এবং তাতেও মুসলমানদের জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহে স্থান-সংরক্ষণকে ভারতের সমগ্র মুসলমান সাম্রাজ্যের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্তি আখ্যা দিয়ে এর জন্য সরকারকে অজস্র ধন্যবাদ জানানো হয়।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে অমৃতসরে অনুষ্ঠিত লীগ অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণে সৈয়দ আলী ইমাম দ্বিজাতি তত্ত্বকে প্রোৎসাহিত করে বলেন: "যথার্থ সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় সম্প্রদায় হাজার হাজার বৎসর পূর্বের মত পরস্পর থেকে বহুদূরে বিরাজমান।…উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রস্থ চিন্তাভাবনা একে-বারেই ভিন্ন।…সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে উভয় সম্প্রদায়ের ধ্যান-ধারণাও পৃথক। এ কথা তাই স্পষ্ট যে চরিত্রের জাতিগত (ethenic) বিভিন্নতা ছাড়াও উভয় সম্প্রদায়ের চিরাচরিত ধর্ম, সামাজিক ও রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণায় কোন সাধারণ মিলন-ক্ষেত্রই নেই।"[২০] এ ছাড়া সভাপতি ঘোষণা করেন যে ধর্মকে রাজনীতি থেকে পৃথক করা যায় না। ঐ অধিবেশনেই মহম্মদ আলী প্যান ইসলামের আদর্শ প্রচার করে বলেন, "…যে দেশের জনসাধারণ সমশ্রেণীভুক্ত নয়, সেদেশে ভৌগোলিক নির্বাচন-ক্ষেত্রের কথা বলা একান্তভাবেই অনুচিত।"[২১]

মুসলিম লীগের দাবিপূর্তির জন্য ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থার প্রবর্তন হল। এর সঙ্গে সঙ্গে ভোটাধিকারের ক্ষেত্রেও মুসলমানদের প্রতি সবিশেষ পক্ষপাত করা হয়। ভারতের রাজনীতিতে এর পরিণাম হয় সুদূরপ্রসারী। এর প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাও প্রবল হতে লাগল, যা পরবর্তীকালে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের শুদ্ধি ও মদনমোহন মালব্যের সংগঠন আন্দোলনে অভিব্যক্ত হল।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত লীগের অধিবেশনে তদানীন্তন হিন্দি-উর্দু বিরোধের জের ধরে উর্দুকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে এবং উর্দু-বিরোধকে মুসলিম-বিদ্বেষ রূপে বর্ণনা করে অনেক বক্তৃতা দেওয়া হয়। ঐ সম্মেলনে হাকিম আজমল খাঁ মুসলমানদের পৃথক রাজনৈতিক সংগঠনের সপক্ষে জোরালো দাবি রাখেন এবং "মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন প্রথার সমর্থনের জন্য ফিরোজশা মেহতা, সিনহা ও অন্যান্য মডারেট কংগ্রেস নেতাদের প্রশংসা করেন।[২২] পরবর্তী বৎসরে নাগপুর অধিবেশনে সৈয়দ নবীউল্লা ব্রিটিশ সরকারকে এই মর্মে প্রশংসাপত্র দেন যে তাঁরা আদৌ ভেদনীতি অনুসরণ করছেন না।

পরবর্তী বৎসরগুলিতে অবশ্য একদিকে নূতন হাওয়া এবং অন্যদিকে জিন্নার প্রভাবে লীগ মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রভাবমুক্ত হওয়া শুরু করে এ তথ্য পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। খিলাফতের জন্য হিন্দুদের সাহায্য নিলেও ঐ দাবি ছিল মূলতঃ প্যান্ ইসলামিক। এজাতীয় এক আন্দোলন যে মুসলিম বিচ্ছিন্নতা-বাদের মানসিকতাকে পুষ্ট করবে—এ অত্যন্ত স্বাভাবিক। বিশেষ করে তার ভিত্তি যদি ধর্মীয় অহমিকতাবোধ হয় এবং তাকে গতিশীল করার জন্য যদি ইকবালের মত কবি দার্শনিকের সহায়তা পাওয়া যায়। ইকবাল তাঁর রচনাবলীর মাধ্যমে নিজ বিশ্বাস—ইসলামের সর্বব্যাপী (all embracing) সম্পূর্ণতা এবং আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য সংগ্রামী ভূমিকার কথা প্রচার করেন। খিলাফতের যুগে মুসলমানদের জঙ্গী মনোভাবের সঙ্গে এ খুবই খাপ খেয়ে যায়। ইকবাল প্রচার করলেন যে বিশ্ব-মানবের আশাস্থল অর্থ ও সম্পদের লোভে পীড়িত ইউরোপের সভ্যতা-সংস্কৃতি নয়, একমাত্র ইসলামই তার যথার্থ মূল্যবোধের আধারে জগৎকে আলোকবর্তিকা দেখাতে পারে। সৈয়দ আহমদ যদি ভারতীয় ইসলামে এক পৃথক অস্তিত্বের ভাবনা সঞ্চার করে থাকেন, ইকবাল তবে তাকে এক স্বতন্ত্র ভবিতব্য সম্বন্ধে সচেতন করে তুললেন। তরুণ মুসলিম সমাজ ইকবালের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলন ও নেহরু-রিপোর্টের সুপারিশের সংশোধন এবং সর্বশেষে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জিন্না মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের

শক্তিকে ক্ষীণ করে সমন্বিত সংস্কৃতির অনুকূল সমন্বিত রাজনীতি প্রবর্তনে সহায়ক হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে তা সম্ভব হল না। মুসলমানদের নেতৃস্থানীয় অভিজাত ও মধ্যবিত্ত সমাজের আপন স্বার্থ এবং হিন্দুদের প্রতি তাঁদের অবিশ্বাস এবং ঈর্ষা ও ভয়ের ভিত্তিভূমি তো ছিলই। বিচ্ছিন্নতাবাদের রাজনৈতিক সংগঠন ও জিন্নার সংগঠনী কুশলতায় তা শক্তিশালী হয়ে উঠল। এর প্রেরক-শক্তিও ইসলাম এবং ঐস্লামিক সংস্কৃতি বিপন্ন হয়ে ওঠার ভয়। ইকবালের ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরের এলাহাবাদের ভাষণে যে পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র সৃষ্টির কল্পনা ছিল, তাকে নিয়ে কেম্ব্রিজের আদর্শবাদী ও স্বপ্নদ্রষ্টা চৌধুরী রহমৎ আলী ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে নিরন্তর প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন, "ইকবালের আদর্শবাদ, রহমৎ আলীর দূরদৃষ্টি এবং মুসলমানদের ভয়[২৩] জিন্নার বাস্তব প্রতিভার সঙ্গে যুক্ত হয়ে মুসলমানদের মধ্যে এমন সংহতি সৃষ্টি করল যার তুলনা ব্রিটিশ শাসনকালে মেলে না এবং এর পরিণতি হল এক রাজনৈতিক নবসৃষ্টি।"[২৬] লীগের ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের অধিবেশনে ভূতপূর্ব জাতীয়তাবাদী জিন্নার দুই জাতিতত্ত্বের সপক্ষে ওকালতী বৃত্তের পরিক্রমা পূর্ণ হবারই সমতুল্য।

॥ ২১ ॥

পাকিস্তান সৃষ্টির ইতিহাস নিয়ে আরও অগ্রসর হবার পূর্বে লাহোর প্রস্তাবের পূর্ববর্তী সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারতবিভাজনের অন্যান্য পরিকল্পনা ও প্রয়াসের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের আদেশের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কার্জন যদিও বাংলার চট্টগ্রাম ঢাকা ও রাজসাহী বিভাগের সঙ্গে আসামকে যোগ করে এক মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ সৃষ্টি করেছিলেন, সে পরিকল্পনায় ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সম্ভাবনা ছিল না বলে বঙ্গভঙ্গকে ঠিক ভারত-বিভাজনের প্রয়াস বলা যায় না।

অবশ্য ইতিপূর্বে আলীগড় কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ স্যার থিয়োডর মরিসনের এতদসম্বন্ধীয় একটি পুস্তিকা ইংলণ্ডে প্রকাশিত হয়। তিনি মন্তব্য করেন যে ৫০ লক্ষ মুসলমানকে যদি উত্তর ভারতে বসতি স্থাপন করানো যায় তাহলে একটা জাতীয় ভাবধারার সৃষ্টি হবে এবং হয়ত এর ফলে মুসলমানদেরও সমস্যার সমাধান হবে। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে আবদুল হালিম শররায় সর্বপ্রথম মুসলমানদের জন্য এক

পৃথক বাসভূমির প্রস্তাব করেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে স্টকহলমের আন্তর্জাতিক সমাজবাদী সম্মেলনে দুই ভারতীয় প্রতিনিধি—আবদুল জব্বার ও আবদুল সাত্তার এ জাতীয় বক্তব্য উপস্থাপন করেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে খিলাফতের বিরোধী এবং ইংরেজ-শাসনের প্রবল সমর্থক নাদির আলী নামক আগ্রার জনৈক ব্যবহারজীবী একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানের অন্যতম উপায় হল ভারতবিভাজন। এর তিন বছর পর মৌলানা মহম্মদ আলী আলীগড়ে প্রদত্ত এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে, "হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধান না হলে ভারতবর্ষ হিন্দু-ভারত ও মুসলমান-ভারতে বিভক্ত হবে।" ঐ বছরেই লাহোরে অনুষ্ঠিত লীগের এক সভায় এক প্রস্তাবের মাধ্যমে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে এদেশে এককেন্দ্রিক (unitary) শাসন-ব্যবস্থার বদলে ফেডারেল ধরনের শাসন-ব্যবস্থা চাই। বলা বাহুল্য এ প্রস্তাবকে যথার্থ বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দেওয়া যেতে পারে না। লালা লাজপত রায়ও ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন, যাতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও পূর্ববঙ্গে চারটি মুসলিম রাজ্য (states) গঠনের প্রস্তাব ছিল।

ইকবাল ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে এলাহাবাদে মুসলিম লীগের অধিবেশনে সর্বপ্রথম উত্তর-পশ্চিমের মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিকে নিয়ে ফেডারেল ভারতবর্ষের মধ্যেই একটি রাজ্য (state) গঠনের প্রস্তাব করেন। তবে কি ভারতবর্ষ এবং কি লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে সমবেত লীগ বা অন্য মুসলিম নেতারা এর প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করেননি। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাব লীগের স্যার মহম্মদ শাহনওয়াজ "জনৈক পাঞ্জাবী" ছদ্মনামে "কনফেডারেসি অফ ইণ্ডিয়া" নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। এতে পাঁচ ভাগে ভারতবিভাজনের একটি পরিকল্পনা পেশ করা হয়। বিভাগগুলি হল—সিন্ধু অঞ্চল, হিন্দু ভারত, রাজস্থান, দাক্ষিণাত্য ও বঙ্গ। তবে তাঁর পরিকল্পনায় পৃথক দেশগুলির পুনঃসংযোগকারী ভারত নামে এক শিথিল কনফেডারেশনের স্থান ছিল। পাঞ্জাবের এককালীন প্রধানমন্ত্রী স্যার সিকন্দর হায়াৎ খাঁ "আউটলাইনস অফ এ স্কিম অফ ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন" নামক এক পুস্তিকার মাধ্যমে সাতটি মোটামুটি স্বতন্ত্র অঞ্চলের সমবায়ে ভারতরূপী এক শিথিল কনফেডারেশন রচনার প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। খলিকুজ্জমাঁও তদানীন্তন ভারতসচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড এবং তাঁর সহকারী কর্নেল মুইরহেডের কাছে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ভারতবিভাজনের এক পরিকল্পনা দাখিল করেন এবং তাঁর বক্তব্য হল এই যে সেই পরিকল্পনাই লীগ ওয়ার্কিং কমিটির ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর

সভায় গৃহীত হয়ে পাকিস্তান নামে ভারতবিভাগের ভিত্তি রচনা করে।

আলীগড়ের দুই অধ্যাপক সৈয়দ জাফর-উল ও মহম্মদ আফজল হাসান কাদেরী পাকিস্তান, বঙ্গ, হিন্দুস্থান, হায়দ্রাবাদ, দিল্লী ও মালাবার—এই ছয়টি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে ভারত বিভাগের এক পরিকল্পনা প্রচার করেন। ডঃ এস. এ. লতিফ তাঁর "দি মুসলিম প্রবলেম ইন ইণ্ডিয়া" গ্রন্থে মুসলমানদের চারটি ও হিন্দুদের জন্য আরও ছটি সাংস্কৃতিক অঞ্চলের ভিত্তিতে ভারত বিভাগের এক পরিকল্পনা রচনা করেন। সিন্ধুর স্যার আবদুল্লা হারুনের কমিটিও লীগের আহ্বানে অপর একটি ভারত-বিভাজনের পরিকল্পনা রচনা করে।

সর্বশেষে উল্লেখ করলেও এ প্রসঙ্গে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র চৌধুরী রহমৎ আলীর পাকিস্তান পরিকল্পনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। লণ্ডনের কিছু মুসলমান ছাত্রসহ রহমৎ আলী ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর-ডিসেম্বরে প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের সময়ে সমবেত মুসলমান নেতাদের সঙ্গে দেখা করে ভারতবর্ষ ভাগ করে পাকিস্তান গঠন করার প্রস্তাব প্রথম উত্থাপন করেন এবং নেতারা সে প্রস্তাব বিবেচনার অযোগ্য মনে করেন—এ তথ্য ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে। দুই বৎসর পর চৌধুরী রহমৎ আলীসহ আরও তিনজন ছাত্র কেম্ব্রিজ থেকে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে ভারত বিভাগ করে একটি স্বতন্ত্র মুসলমান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা একটি চার পৃষ্ঠার পুস্তিকার মাধ্যমে প্রকাশ করেন। পাকিস্তানের ইংরাজী বানান অনুসারে P পাঞ্জাব, A আফগানিয়া বা পুস্তুভাষী অঞ্চল, K কাশ্মীর, S সিন্ধু ও Istan বেলুচিস্তানের সমন্বয়ে সেই স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হবে বলা হয়। তৃতীয় গোল-টেবিল বৈঠকে সমাগত প্রতিনিধিদের মধ্যে ঐ পুস্তিকা বিতরণ করলেও মুসলমান নেতারা কেউই অথবা জিন্না তখন পাকিস্তান প্রস্তাবকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার যোগ্য মনে করেননি। *Now or Never* নামক সেই পুস্তিকাটিতে বলা হয় যে সে বক্তব্য পাকিস্তান বা উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের সাড়ে তিন কোটি মুসলমানের দাবি। তাঁরা গোলটেবিল বৈঠকে নির্ধারিত ফেডারেল শাসনব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল: "পাকিস্তানের মুসলমানরা এক পৃথক বৈশিষ্ট্যযুক্ত জাতি (nation)…এবং তারা এক পৃথক জাতীয় (national) মর্যাদার স্বীকৃতি দাবি করে।" শেষ গোলটেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে গঠিত জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটির মুসলমান সদস্যদের ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-বিভাজনের এই সুস্পষ্ট প্রস্তাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে ইউসুফ আলী মন্তব্য করেন যে, ওটা "নিছক ছাত্রদের পরিকল্পনা, কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি ঐ পরিকল্পনা পেশ করেননি।" স্যার জাফরুল্লা খাঁ বলেন যে ও

প্রস্তাব "বিকৃতমস্তিষ্কের কল্পনা ও অবাস্তব।" ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে চৌধুরী রহমৎ আলী পাকিস্তান জাতীয় আন্দোলনের সভাপতিরূপে কেম্ব্রিজ থেকে চার পৃষ্ঠার আর একটি পুস্তিকা প্রচার করেন।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে অবস্থা যখন পাকিস্তান আদর্শের কিছুটা অনুকূল, চৌধুরী রহমৎ আলী তখন করাচী থেকে আর একটি বিবৃতি দেন যা পরে *The Millat of Islam and the Menance of Indianism* নামে কেম্ব্রিজ থেকে প্রকাশিত হয়। এতেও মুসলমানদের ভারতীয় ঐতিহ্য সর্বতোভাবে অস্বীকার করে স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের পক্ষে ওকালতী করা হয়। রহমৎ আলী প্রচারিত পাকিস্তানের মানচিত্রে একে তিন নামে তিনটি অংশে বিভক্ত রাষ্ট্ররূপে দেখানো হয়। উত্তর-পশ্চিম অংশের নাম যথারীতি পাকিস্তান। বঙ্গ ও আসাম মিলিয়ে বঙ্গ-ই-ইসলাম। নিজামের উসমানী বংশের নামে হায়দ্রাবাদ উসমানীস্তান নামে পরিচিত হবে প্রস্তাব করা হয়। বাস্তবে সৃষ্ট না হওয়া পর্যন্ত বিলাতে অবস্থানকারী এই স্বপ্নদ্রষ্টা মুসলমান যুবক আলাপ-আলোচনা, সংবাদপত্রে লিখিত পত্র ও প্রবন্ধ এবং প্রচার পুস্তিকার মাধ্যমে পাকিস্তানের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে নিরলস প্রচার চালিয়ে যান। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর বিধিলিপিও অধিকাংশ আদর্শবাদী স্বপ্নদ্রষ্টার মত শোচনীয় আশাভঙ্গের কাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছিল। পাকিস্তানের ভাবরূপের জনক তাঁর সাধের 'সব পেয়েছির দেশ"-এ বসবাস করার আগ্রহ বোধ করেননি। খলিকুজ্জমাঁ লিখেছেন :" "দেশবিভাগের পর ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ-কার হয়েছিল। তিনি আমাকে মধ্যাহ্নভোজনে আমন্ত্রণ করেছিলেন এবং সেই সময়ে পাঞ্জাব ও বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর তীব্র বিরূপতা ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে ঐ কার্য বিশ্বাসঘাতকতার সমতুল্য ছিল। আমি তাঁকে খুবই অসন্তুষ্ট দেখলাম। কারণ তাঁর মনে সন্দেহ জেগেছিল যে তাঁর নিজের শহরে তাঁর উপর দৃষ্টি রাখার জন্য সরকারী গুপ্তচর নিয়োগ করা হয়েছে। অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন করেন এবং *The Great Betrayal* নামক একটি পুস্তিকা রচনা করার কিছুদিন পর মৃত্যুমুখে পতিত হন। বড়ই লজ্জার কথা যে পাকিস্তানের জনসাধারণ যে রাষ্ট্রের নামে তাঁরা শপথ গ্রহণ করেন তার নামকরণকারীর উদ্দেশে এমন কি একটা ফতেহাও দেন না।"[১]

মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রোৎসাহিত করার ব্যাপারে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্নেহপুষ্ট আগা খাঁর সেই ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই একটা প্রমুখ ভূমিকা ছিল। "সেই ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দেই আগা খাঁ দেখতে পেয়েছিলেন যে ভারতবর্ষের মুসলমানদের নিজ

দাবি পেশ করার জন্য এক সম্পূর্ণ নূতন ভিত্তিভূমি প্রয়োজন। তিনি মনে করলেন যে এর শ্রেষ্ঠ উপায় হল উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলসমূহের এবং বঙ্গদেশের মুসলমানদের এই 'অপ্রতিরোধ্য ভূমিকার' সুযোগ গ্রহণ করা। কেন্দ্রে মুসলমানদের 'আত্যন্ত ফেডারেশনপন্থী' হতে হবে এবং 'ভারতবর্ষ যা অর্থাৎ দক্ষিণ এসিয়ার এক সংযুক্ত রাষ্ট্র—তাকে তা-ই করতে হবে।' এই সংযুক্ত রাষ্ট্রে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ-সমূহকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করবেন। কিন্তু আমাদের ভারতের প্রতি আনুগত্যে কদাচ কোন শঙ্কা সৃষ্টি হতে দেওয়া চলবে না এবং 'আমাদের হিন্দু স্বদেশবাসীরা যেন একথা উপলব্ধি করেন যে তাঁদের মতই সমগ্র ভারতবর্ষের কল্যাণ …আমাদের কাছেও সমান প্রিয়…'।"[২]

যাই হোক, ভারত-বিভাজনের পূর্বতন প্রস্তাবাবলীর অনুশীলন পরিহার করে আমরা ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ লীগের লাহোর প্রস্তাব গ্রহণের পরবর্তী পরিস্থিতির সমীক্ষা করব। খলিকুজ্জমাঁর সাক্ষ্যে জানা যায়: "পরের দিন সকালে হিন্দু সংবাদপত্রসমূহে বড় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হল 'পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত', যদিও ঐ নাম দুটি বক্তৃতার কোনটিতেই উচ্চারিত হয়নি বা প্রস্তাবেও উল্লিখিত হয়নি। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহ মুসলিম জনসাধারণের সামনে এক সুসংবদ্ধ ধুয়ো উপস্থাপিত করল এবং অবিলম্বে তা তাঁদের সামনে একটি রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি খাড়া করল। লাহোর প্রস্তাব মুসলমানদের কাছে পৌছে দিতে এবং তার যথার্থ অর্থ ও তাৎপর্য তাঁদের কাছে ব্যাখ্যা করতে মুসলমান নেতাদের অনেক সময় লাগত। হিন্দু সংবাদপত্রসমূহ লাহোর-প্রস্তাবের নাম 'পাকিস্তান-প্রস্তাব' দিয়ে মুসলিম জন-সাধারণের কাছে এর তাৎপর্য বোঝানোর জন্য নেতাদের যে বহু বছরের পরিশ্রমের প্রয়োজন পড়ত তার হাত থেকে তাঁদের রেহাই দিল।"[৩] জিন্নার এককালের একান্ত সচিব পীরজাদা এই ঘটনার বর্ণনাপ্রসঙ্গে জিন্নার নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন: "পাকিস্তান শব্দ আমরা চালু করিনি, হিন্দুরাই এই শব্দটি আমাদের উপহার দিয়েছেন। লাহোর-প্রস্তাব তীব্রভাবে সমালোচনা করতে গিয়ে হিন্দুরা পাকিস্তান-প্রস্তাব রূপে এর উল্লেখ করেন। তার ফলেই এই শব্দের প্রচলন হয়। অবশ্য জিন্না হিন্দুদের এর জন্য ধন্যবাদ জানান।"[৪]

লাহোরের ঐ সিদ্ধান্ত সরকারী ভাবে "পাকিস্তান-প্রস্তাব"-এর অভিধা পায় পরবর্তী বৎসরের ১৫ই এপ্রিল মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত লীগের বাৎসরিক অধিবেশনে। সেই অধিবেশনেই স্থির হয় যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাই হবে লীগের মূল নীতি এবং প্রতিষ্ঠানের সংবিধানেও তা স্বীকৃতি পায়। পাকিস্তান অর্থাৎ পবিত্র দেশ অথবা

পবিত্রদের দেশ নাম এই দাবির সপক্ষে মুসলিম ধর্মোন্মাদনাকে যুক্ত করার ব্যাপারে প্রবল সহায়ক সিদ্ধহয়।

এই প্রসঙ্গে পাকিস্তান দাবিকে কেন্দ্র করে ক্রমশঃ ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে যে প্রবল জনমত সংগঠিত হতে থাকে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা যেতে পারে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে জিন্না বিশ্বাস অথবা আচারে-বিচারে আদৌ গোঁড়া মুসলমান ছিলেন না। বরং তিনি মৌলভী-মৌলানাদের বিরোধী ছিলেন। এমন কি ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দেও (১লা ফেব্রুয়ারী) বোম্বের ইসমাইলি কলেজের এক বক্তৃতায় তিনি বলেন যে ধর্ম হল "নিছক ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যেকার একটা ব্যাপার"। দেশ বিভাগের ঠিক পূর্বে রয়টারের প্রতিনিধি ডুন ক্যাম্পবেলকে জিন্না বলেন যে নূতন রাষ্ট্রটি হবে "এক আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যার সার্বভৌমত্ব থাকবে জনসাধারণের হাতে এবং ধর্ম জাতি (caste) ও বিশ্বাস নির্বিশেষে নূতন রাষ্ট্রের অধিবাসীরা নাগরিকতার সমান সুযোগ ভোগ করবেন।"[৫] প্রত্যুতঃ ধর্মশাস্ত্রনিষ্ঠ উলেমা সম্প্রদায় ও তাঁদের সংগঠন জমায়েত-ই-উলেমা-ই-হিন্দ্ পাকিস্তান দাবির বিপক্ষে ছিলেন এই কারণে যে তাঁদের মতে ইসলাম ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী নয়—ইসলামের উম্মা বা সমাজ আন্তর্জাতিক। এই কারণে প্যান ইসলাম মুসলমানদের স্বাভাবিক প্রবণতা। স্যার সৈয়দ আহমদের মত জিন্নাকেও যে উলেমাদের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তার অন্যতম কারণ এই। এ প্রসঙ্গে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে জমায়েতের সভাপতি মৌলানা হোসেন আহমদ মাদনির জিন্না ও লীগের বিরুদ্ধে ফতোয়া এবং অর্হর উলেমাদের ব্যঙ্গ করে তাঁকে কাফের-এ-আজম বলার কথা স্মরণীয়। একথা সত্য যে ভারত-বিভাজনের প্রাক্কালে সিলেট ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গণভোটের সময় স্বয়ং জিন্নার উদ্যোগে লীগ উলেমাদের একাংশের সাহায্য নেয় এবং তাঁদের ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িকতাযুক্ত[৬] প্রচার গণভোটের পরিণতি লীগের অনুকূল করতে সাহায্য করে। এই সময়ে জমায়েতের পাকিস্তান দাবির অনুকূল অংশ মূল প্রতিষ্ঠান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জমায়েত-ই-উলেমা-ই-ইসলাম গঠন করে।

কিন্তু সেসব ছিল জিন্নার রাজনৈতিক কৌশলের অন্তর্গত। এইজন্য তিনি পাকিস্তানের প্রবল প্রতাপান্বিত কর্ণধার হওয়া সত্ত্বেও তাঁর এককালের সহায়ক জমায়েত-উল্-উলেমা-ই-ইসলামের ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী পেশ করা ধর্মীয় পুরুষদের সরকারী ক্ষমতার ভাগ দেবার দাবি সম্বন্ধে কোন রকম উৎসাহ দেখাননি। পরের মাসে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধানের রূপরেখার ইঙ্গিত দিতে গিয়ে তিনি বলেন,

"আমি নিঃসন্দেহ যে এ হবে গণতান্ত্রিক ধরনের যাতে ইসলামের মূল নীতির সমাবেশ থাকবে।" এবং "পাকিস্তান কোনমতেই ধর্মীয় রাষ্ট্র হবে না যার শাসনের দায়িত্ব থাকে দৈবী উদ্দেশ্যচালিত ধর্মযাজকদের হাতে।"[৭]

মূল কথা হল—পাকিস্তানের আন্দোলন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত লিবারেল নেতারা পরিচালনা করেন এবং জিন্না স্বয়ং সেই শ্রেণীর প্রতিভূ। ব্রিটিশ শাসনে রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং চাকুরি ও ব্যবসা ইত্যাদির ক্ষেত্রে হিন্দুদের তুলনায় অসুবিধাজনক অবস্থায় থাকার জন্য এই শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংগঠিত হওয়া শুরু করে। সমাজ ও অর্থনীতির সর্বস্তরে হিন্দুদের প্রাধান্য মুসলিম অভিজাতদের মধ্যে ঈর্ষা এবং ভয়—দুই-এরই জন্ম দেয়। ইসলামের প্রথম যুগ এবং ভারতের মুসলিম শাসনের অতীত গৌরবের কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়ে সেই নেতৃত্ব সাধারণ মুসলমানদের (এর মধ্যে প্রাচীনপন্থী গোঁড়া ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস দ্বারা চালিত অশিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত মোল্লা, পীর জাতীয় ধর্মযাজকরাও পড়েন) মধ্যে ইসলামের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার এবং ইসলামের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন দৃঢ়মূল করে তোলে। যে কোন রাজনৈতিক নেতার কৃতিত্বের মূলে আছে নিজের ব্যক্তিগত স্বপ্নকে অনুগামীদের মধ্যে সঞ্চারিত করে তা সত্য বা সম্ভাব্য বলে বিশ্বাস করতে অনুপ্রাণিত করা এবং এইভাবে তাকে অপ্রতিরোধ্য করে তোলা। নেতা হিসাবে জিন্নার সার্থকতা এইখানে। "জনসাধারণের মধ্যে জিন্না যে প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তার ব্যাখ্যা এই ঘটনার দ্বারা করা যায় যে তিনি এক নূতন মুসলিম রাষ্ট্রের আওতায় তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের প্রতিশ্রুতি দেন। পাকিস্তানের দাবির দ্বারা মুসলিম লীগ ভারতবর্ষে হিন্দুদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিনাই ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষার সন্তুষ্টিবিধান করছিল এবং জনসাধারণের রাজনৈতিক অভীপ্সার পরিপূর্তি ঘটাচ্ছিল।"[৮]

মুসলিম জনমতের পূর্বোক্ত দুই আপাত পরস্পরবিরোধী ধারার সফল সমন্বয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত জিন্নার নেতৃত্বের জন্য অতঃপর পাকিস্তানবিরোধী তাবৎ প্রয়াস প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মুখে বালির বাঁধের মত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। হিন্দু মহাসভার নেতা সাভারকরের ২৫শে মার্চের উক্তি—সর্বশক্তি প্রয়োগে আমরা ভারত-বিভাজনে বাধা দেব, অথবা মাস্টার তারা সিং-এর ১৫ই এপ্রিলের শাসানি মুসলিম জনমানসকে যথারীতি পাকিস্তানের আরও অনুকূল করল। হরিজন পত্রিকায় এপ্রিল মাসে একাধিক প্রবন্ধের মাধ্যমে উপস্থাপিত গান্ধীর যুক্তি অথবা জওহরলাল বা কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের ভারত-বিভাজনের বিরোধী বক্তব্য "হিন্দু স্বার্থ প্রভাবিত"

বিধায়ে তাঁরা বিবেচনার অযোগ্য মনে করলেন। লাহোরে মার্চে বাদশা খাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সম্মেলন পাকিস্তানের দাবি এবং সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন ও চাকুরিতে সংরক্ষণ আদির তীব্র নিন্দা করল। ২৭শে এপ্রিলে সিন্ধুর প্রধানমন্ত্রী আল্লাবক্সের সভাপতিত্বে এবং কংগ্রেস ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী মুসলিম সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত দিল্লীর অখিল ভারতীয় আজাদ মুসলিম সম্মেলনে উপস্থিত ১৪০০ প্রতিনিধি লীগের ভারত-বিভাজনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করার সঙ্গে সঙ্গে লীগই মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান—এই দাবি অস্বীকার করে। কুম্ভকোণম্-এ মহম্মদ ইউসুফ শরীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ ভারতের মুসলমানদের বিভেদবিরোধী সম্মেলন দুই জাতিতত্ত্বের এবং লীগই মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান—এই দাবির বিরোধিতা করে। ডিসেম্বরে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে স্যার সুলতান আহমদ এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেন যে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতি পরস্পরবিরোধী এবং এদের মধ্যে সাধারণ মিলনভূমি নেই। কিন্তু এইসব সম্মানভাজন নেতৃবৃন্দ এবং সবগুলি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের বিধানসভার বহুসংখ্যক মুসলমান সদস্য (এর মধ্যে সিকন্দর হায়াৎ খাঁও ছিলেন যিনি সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নয়, আঞ্চলিকতার স্বার্থে পাঞ্জাবের স্বায়ত্তশাসনের সমর্থক হলেও এবং এই কারণে লাহোর প্রস্তাব সমর্থন করলেও এক বৎসরের মধ্যে[৯] পাঞ্জাব বিধানসভায় প্রকাশ্যে লাহোর প্রস্তাবের নিন্দা করে বলেন যে এ ব্যাপারে তাঁর কোন দায়িত্ব নেই ও ঐ প্রস্তাবের তাৎপর্য যতই উপলব্ধি করছেন, ততই তার বিরোধী হচ্ছেন) মুসলমান জনসাধারণের মনে এই সব প্রচেষ্টা কোন দাগ কাটতে অক্ষম হয়।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুলাই বড়লাট জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ গঠন করে জিন্নার অনুমতি ব্যতিরেকে তাতে লীগ প্রভাবিত তিনটি প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী স্যার সিকন্দর (তাঁর ইউনিয়নিস্ট কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার সঙ্গে অবশ্য লীগের সম্বন্ধ ছিল আনুষ্ঠানিক), স্যার সাদুল্লা এবং ফজলুল হক সহ আরও তিনজন প্রভাবশালী মুসলমান নরনারীকে সদস্যরূপে নেন। জিন্না কৈফিয়ৎ তলব করলে প্রধানমন্ত্রীরা জানান যে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সাহায্য করার অনুকূলে লীগের ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে আগস্টের প্রস্তাব রয়েছে। এ ছাড়া লীগের প্রতিনিধি হিসাবে নয়, নিজ নিজ প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁরা মনোনীত হয়েছেন। কিন্তু বড়লাট লীগ সদস্যদের "লীগের সভাপতি এবং কার্যসমিতিকে এড়িয়ে"[১০] তাঁর শাসন পরিষদ ও জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদে ঐসব মুসলমান সদস্য নেবার সিদ্ধান্ত করায় এবং ভারতসচিব

আমেরী বিলাতের পার্লামেন্টে এই ঘোষণা করায় যে তাঁরা "মহান মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি" হিসাবে ঐ পদে নিযুক্ত হচ্ছেন, মুসলিম প্রতিনিধিত্বের একমেব দাবিদার লীগ—এই ভূমিকার প্রবক্তা জিন্না লীগ সদস্যদের বড়লাটের মনোনয়নে ঐসব পদে যোগদানের তীব্র বিরোধিতা করলেন। সঙ্গদের মতে, "ব্যাপারটা অতঃপর মুসলিম প্রতিষ্ঠানের মর্যাদার এবং জিন্নার শক্তির পরীক্ষার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল।"[১১]

নামমাত্র ভাবে স্যার সিকন্দর লীগের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেও ব্যক্তিগত ভাবে পাঞ্জাবের নেতৃত্বের প্রশ্নে জিন্নার বিরোধী ছিলেন। এ ছাড়া তাঁর মুসলমান-হিন্দু-শিখের মিলিত ইউনিয়নিস্ট রাজনীতির স্বার্থেও তিনি পাঞ্জাবের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে জিন্না ও মুসলিম লীগের প্রাধান্য অবাঞ্ছনীয় মনে করতেন যদিও অখিল ভারতীয় স্তরে জিন্নাকে মুসলমানদের প্রবক্তা হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন। তাঁর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হওয়ায় তাই স্যার সিকন্দর প্রথমে জিন্না ও লীগের এই নির্দেশের তীব্র বিরোধিতা করলেন। কিন্তু জিন্নাও উপলব্ধি করেছিলেন যে এই প্রশ্নে পিছু হটে এলে পাঞ্জাবে লীগের ভবিষ্যৎ দীর্ঘকালের জন্য মাটি হয়ে যাবে এবং তাহলে পাকিস্তানের প্রথম অক্ষরই (P) আপাততঃ তাঁর হাতছাড়া হবে। স্নায়ুযুদ্ধের পরিণামে অনতিবিলম্বে স্যার সিকন্দর আত্মসমর্পণ করলেন হয়ত এই ভেবে যে এর দ্বারা পাঞ্জাবে তাঁর কর্তৃত্ব বিঘ্নিত হবে না। স্যার সাদুল্লাও তাঁর অনুগামী হলেন (২৫শে আগস্ট ১৯৪১)। শেরে বাঙ্গাল ফজলুল হক এই প্রশ্নে জিন্নার বিরুদ্ধে প্রথমে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করলেও বিধানসভায় প্রধানতঃ লীগ সদস্যদের উপর নির্ভর করতে হচ্ছিল বলে (তাঁর কৃষক প্রজা দল ইতিমধ্যে মন্ত্রীমণ্ডলের নীতির প্রশ্নে বহুধা বিভক্ত হয়ে গেছে) শেষ পর্যন্ত জিন্নার নির্দেশের বিরুদ্ধে যাবার সাহস করলেন না। হক সাহেব পরবর্তীকালে (১৪ই নভেম্বর ১৯৪১) লিখিতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে গদি বজায় রাখলেন।[১২] প্রধানমন্ত্রীদের ছাড়া বাকী তিনজন মুসলমান সদস্যদের এক-জন (ছতারির নবাব) হায়দ্রাবাদের প্রধানমন্ত্রীর পদ পেয়ে প্রতিরক্ষা পরিষদ থেকে পদত্যাগ করায় জিন্নার রোষ থেকে পরিত্রাণ লাভ করেন। বেগম শাহনওয়াজ ও স্যার সুলতান আহমদ তখনকার মত লীগ থেকে বহিষ্কৃত হবার ঝুঁকি নিলেও মুসলিম রাজনীতিতে স্থান পাবার জন্য পরে আবার জিন্না ও লীগের দ্বারস্থ হন।

বিপুল জনসমর্থন যে কোন রাজনৈতিক নেতার ভিতর দৈবনির্দেশিত পুরুষ বা চিরঅভ্রান্ততার মানসিকতা সৃষ্টি করতে পারে, যদি না গান্ধীর মত তিনি যথার্থ অধ্যাত্মবাদী হন। বিদেশের হিটলার, মুসোলিনী বা স্ট্যালিন বা আমাদের দেশের

নেহরু বা জিন্নাও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। আর এই দৈবনির্দেশিত পুরুষ বা চিরঅভ্রান্ততার মানসিকতা এবং স্বৈরতন্ত্র ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। কেবল নিজ দলের স্বতন্ত্র অভিমত ও ব্যক্তিত্বসম্পন্নদের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রেই জিন্নার ভিতর এই সময়ে এই মানসিকতা ফুটে ওঠেনি, যাঁকে তাঁর আক্রমণের লক্ষ্যস্থল ও হিন্দুসমাজের প্রতিভূরূপে বিবেচনা করতেন সেই গান্ধীর প্রতি তো বটেই, এমন কি মুসলমান সমাজে অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং অনন্য দেশভক্ত কংগ্রেসের তদানীন্তন সভাপতি মৌলানা আজাদের প্রতিও এই সময়ে তিনি এইরকম এক রূঢ় আচরণ করেন। অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুনের ও ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের (যুদ্ধশেষে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে—এই আশ্বাস পেলে কংগ্রেস জাতীয় সরকারে যোগ দিয়ে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সহযোগিতা করবে) পরিপ্রেক্ষিতে লীগের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য ৮ই জুলাই আজাদ স্যার সিকন্দরের সঙ্গে দেখা করেন। পাঞ্জাবে লীগের সিকন্দরবিরোধী (আদি) গোষ্ঠী জিন্নার কাছে এই নিয়ে নালিশ করেন। সিকন্দরের মতাদর্শ এবং ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর প্রতি জিন্নার ষোল আনা বিশ্বাস ছিল না। তাই এক তারবার্তায় স্যার সিকন্দরকে সতর্ক করে দেবার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রে এক বিবৃতির মাধ্যমে জিন্না জানান যে লীগ কর্তৃপক্ষকে ডিঙিয়ে প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রীর কংগ্রেসের সঙ্গে কোন বোঝাপড়ায় আসার অধিকার নেই।[১৩] আজাদ তাই জিন্নাকে এক গোপন তারবার্তা পাঠিয়ে জানান যে কংগ্রেস যে জাতীয় সরকারে যোগ দিতে রাজী হয়েছে তাতে অন্যান্য দলের প্রতিনিধিরাও থাকবেন। কংগ্রেসের সভাপতি তাই লীগের সভাপতির কাছে জানতে চাইলেন যে দ্বিজাতিতত্ত্বের পরিকল্পনাসম্মত নয় বলে লীগ কি এজাতীয় কোন সাময়িক ব্যবস্থাতেও সম্মত হবে না ?

জিন্না এ তারের যে জবাব দেন তাতে তাঁর ক্ষমতামদমত্ত স্বৈরতন্ত্রী মানসিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। তিনি জানালেন: "আপনার তারবার্তা বিশ্বাসের ভাব সৃষ্টিতে অপারগ। চিঠিপত্র অথবা অপর কোন ভাবে আমি আপনার সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে অস্বীকার করছি এইজন্য যে আপনি মুসলিম-ভারতের বিশ্বাস খুইয়েছেন। আপনি কি একথা বুঝতে পারেন না যে কংগ্রেস নিজেকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের রঙে রঞ্জিত করতে বিদেশীদের প্রতারিত করার জন্য আপনাকে মুসলমান খেলার পুতুল সভাপতি বানিয়েছে ? আপনি মুসলমান অথবা হিন্দু—কারও প্রতিনিধিই নন। কংগ্রেস এক হিন্দু প্রতিষ্ঠান। আপনার যদি আত্মমর্যাদা থাকে তাহলে অবিলম্বে পদত্যাগ করুন। এযাবৎ আপনি যতটা পেরেছেন লীগের ক্ষতির চেষ্টা করেছেন। আপনি জানেন যে এতে আপনি চূড়ান্ত ভাবে ব্যর্থ

হয়েছেন। ঐ প্রয়াসে ক্ষান্তি দিন।"[১৪]

জিন্নার অহমিকা এতে তৃপ্ত হলেও এবং এজাতীয় ব্যাপারে তিনি একটা মর্ষকামী আনন্দ পেলেও তারবার্তায় যে মানসিকতা ফুটে উঠেছে তা যে আদৌ সুরুচিসম্পন্ন ছিল না এবং বিশেষ করে তাঁর ভাষায় সৌজন্যের অভাব ছিল—এ কথা লীগের প্রথম সারির নেতা খলিকুজ্জমাঁ ঘটনার বিশ বছর পর লিপিবদ্ধ করে গেছেন।[১৫]

॥ ২২ ॥

যাই হোক, এইভাবে ক্ষমতা-প্রাপ্তির অন্যতম সোপান মুসলমানদের একমেব নেতা রূপে ব্রিটিশ সরকার এবং কংগ্রেস সহ তাবৎ রাজনৈতিক দলের কাছে প্রতিভাত হবার চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইংরেজ ও কংগ্রেসের সঙ্গে শক্ত ঘাঁটি থেকে আলাপ-আলোচনাও বজায় রাখলেন।

যুদ্ধে মিত্রশক্তির অবস্থার ক্রমাবনতি হতে থাকায় ইতিমধ্যে ব্রিটিশ মন্ত্রীমণ্ডলে পরিবর্তন হয়েছে। চার্চিল প্রধানমন্ত্রী এবং আমেরী ভারতসচিব। ফলে সরকারী মহলে জিন্নার কদর বেড়ে গেল। তাঁর সাংবাদিক বন্ধু শিব রাও এ সময়ে সিমলার (ভারত সরকারের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী) সরকারী মহলের মনোভাব সম্বন্ধে মাদ্রাজের "হিন্দু" পত্রিকায় লেখেন যে তাঁদের মধ্যে জিন্নাপ্রীতির প্রাদুর্ভাব ঘটেছে এবং জিন্না অসন্তুষ্ট হতে পারেন এমন কোন পদক্ষেপ যুক্তিযুক্ত হলেও কর্তৃপক্ষ নিতে অনিচ্ছুক। নূতন সরকার ভারতবাসীর সঙ্গে বোঝাপড়া করার আর একটি চেষ্টা করল। এর অঙ্গ হিসাবে বড়লাটের আমন্ত্রণে জিন্না ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জুন তাঁর সঙ্গে দেখা করে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সহযোগিতা করার অঙ্গীকার করার সঙ্গে সঙ্গে যেসব দাবি জানালেন তা তাঁর ১লা জুলাই-এর চিঠিতে লিপিবদ্ধ করলেন। দাবিগুলি হল: (ক) লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তি এবং ভারত বিভাগের পরিকল্পনাকে ব্যাহত করতে পারে এমন কোন ঘোষণা করা হবে না; (খ) মুসলিম-ভারতের পূর্ব-স্বীকৃতি ছাড়া ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্পর্কে কোন অস্থায়ী বা স্থায়ী ব্যবস্থা করা হবে না; (গ) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহে মুসলিম নেতৃত্বকে সমান অংশ ও অধিকার দিলেই কেবল যুদ্ধপ্রচেষ্টায় ভারতবাসীদের পক্ষে উপযুক্ত ভাবে যোগদান করা সম্ভব হবে এবং (ঘ) যুদ্ধ চলাকালীন বড়লাটের শাসন পরিষদের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে কংগ্রেসকে যদি যোগ দিতে দেওয়া হয় তাহলে অতিরিক্ত আসনে মুসলমানদের সংখ্যা হিন্দুদের সমান হবে। নচেৎ মুসলমানদের মোট আসনের অধিকাংশ দিতে

হবে। কারণ তাঁদেরই যুদ্ধপ্রচেষ্টার অধিকাংশ দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে। প্রস্তাবিত যুদ্ধ পরিষদের সদস্য-সংখ্যাও পূর্বোক্ত ধরনে নির্ধারিত হবে এবং সেই পরিষদ ও বড়লাটের শাসন পরিষদের মুসলমান সদস্যদের মনোনীত করবে লীগ।

জিন্নার দাবি সরকারী ক্ষমতা লীগের হাতে তুলে দেবার সমতুল্য ছিল। তাঁকে এতটা সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয় বলে বড়লাট তাঁর ৬ই জুলাই-এর উত্তরে জানালেন যে এ ব্যাপারে মুসলমানদের স্বার্থের দিকে পূর্ণমাত্রায় নজর রাখলেও এবং লীগের পরামর্শের প্রতি যথোচিত গুরুত্ব দিলেও সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে বড়লাট ও ভারতসচিবের হাতে। ইতিপূর্বে স্যার সিকন্দর ও ফজলুল হকের সঙ্গে জিন্নার ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষের প্রসঙ্গে আলোচিত তাঁদের জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদের সদস্য হবার পটভূমিকা এই।

৭ই আগস্ট বড়লাট সরকারের নীতি ঘোষণা প্রসঙ্গে বললেন যে দেশবাসীর কোন অনিচ্ছুক অংশের প্রতি কোন ব্যবস্থা চাপিয়ে দেবার ইচ্ছা সরকারের নেই এবং যুদ্ধের অবসানে ভারতের বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিদের নিয়ে নূতন সংবিধানের কাঠামো রচনার ব্যবস্থা করা হবে। বড়লাটের শাসন পরিষদের সম্প্রসারণ ও যুদ্ধের পরামর্শ-দাতা পরিষদ গঠনের কথাও তিনি জানালেন। নূতন মন্ত্রীসভার ভারতসচিব আমেরীর কণ্ঠে ভেদনীতির সনাতন সুর বেজে উঠল। তিনি বললেন—ভারতের সমস্যা সরকার বনাম দেশবাসীর মতবিরোধ নয়, ভারতবাসীদের পরস্পরবিরোধ। সুতরাং হিন্দুরা ছাড়াও মুসলমান, তপশিলী সম্প্রদায় ও দেশীয় রাজন্যবর্গের ভিতর একটা রফা হওয়া দরকার। তবে ভারত বিভাগের দাবিকে নিরুৎসাহ করার উদ্দেশ্যে তিনি এও বললেন যে ভারত এক স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং বৈশিষ্ট্যযুক্ত অঞ্চল এবং সকলের পক্ষে সমান এক প্রাচীন সভ্যতা ও পুরাতন ইতিহাসের জন্য ভারতবর্ষ ও এই দেশবাসী গর্ব করতে পারে।

আবার একদফা আলাপ-আলোচনা এবং তার শেষে ২৯শে সেপ্টেম্বর জিন্না লীগ কাউনসিলের সভায় ঘোষণা করলেন যে ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার প্রস্তাবে তাঁর আপত্তি না থাকলেও বর্তমানে সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তর করার ইচ্ছা নেই। তাঁরা মুসলিম জাতির (nation) ৯ কোটি সদস্যকে উপেক্ষা করছেন বলে সহযোগিতার এ প্রয়াস আপাততঃ ব্যর্থ হল।

কংগ্রেস শিবিরেও অনুরূপ হতাশার সৃষ্টি হল। কংগ্রেস একদিকে যুদ্ধের সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে মিত্রশক্তিকে বিব্রত করতে চায় না, অন্যদিকে ভারতবাসীর স্বাধিকার সঙ্কোচনের প্রতিও চোখ বুজে থাকতে পারে না। তাই কংগ্রেস অক্টোবর থেকে প্রতীকাত্মক ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত নিল যাতে মাত্র এক-

জন করে সত্যাগ্রহী বাক্স্বাধীনতার জন্য সরকারী নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে আহূত জনসভায় কেবল বলবেন যে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় ধন বা জন দিয়ে সাহায্য করা পাপ বা অধর্ম। গান্ধীর ব্যক্তিগত নির্দেশে ও নেতৃত্বে পরিচালিত এই সত্যাগ্রহে সমগ্র দেশে প্রায় ৫ হাজার বাছাই করা কংগ্রেস কর্মী কারাবরণ করেন। এই সত্যাগ্রহে লীগের বিরুদ্ধে কোন কিছু থাকার কোন সুদূর সম্ভাবনা না থাকলেও লীগ কাউন্সিল এক প্রস্তাবের মাধ্যমে সত্যাগ্রহের পিছনে গান্ধীর "সত্যকার অভিসন্ধি ও উদ্দেশ্য" ধরে নিয়ে জানাল যে, "মুসলিম দাবির পরিপন্থী অথবা তার প্রতিকূল কোন সুবিধা কংগ্রেসকে দিলে" লীগ তার বিরুদ্ধে লড়াই করবে। অস্ত্র ধরতে হোক বা না-ই হোক, উভয়ের সাধারণ শত্রু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই জেহাদ ব্রিটিশ সরকারের মনঃপূত হয়েছিল—একথা বলাই বাহুল্য। ১৯শে নভেম্বর জিন্না কেন্দ্রীয় পরিষদে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে এক চমক সৃষ্টি করলেন। মহম্মদ আলীর করাচী থেকে কলকাতা পর্যন্ত এক করিডরের দাবির উল্লেখ করলেন প্রস্তাবিত পাকিস্তানের দুই অংশের সংযোগভূমি হিসাবে।[২] পাছে প্রতিপক্ষ মূল দাবি না মানে তাই দাবির পরিধি বাড়িয়ে তাদের মনোবল ভেঙে দেবার জিন্নার কৌশলের অঙ্গ এ।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূরীকরণের জন্য আহূত বোম্বের আসন্ন নির্দলীয় সম্মেলন উপলক্ষ্য করে এর উদ্যোক্তা লিবারেল নেতা সপ্রু গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকারের উদ্যোগ করেন। জিন্না "হিন্দু নেতা হিসাবে" তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক হলেও গান্ধীর পক্ষে সে প্রস্তাব মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। জিন্নাও মার্চে অনুষ্ঠিত সেই সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে যোগ না দিয়ে ব্যঙ্গ করে সম্মেলনকে ওলন্দাজ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তুলনা করেন যাতে "সবাই সেনাপতি, সৈন্য কেউ নয়।"

এ বছরে ভারত-বিভাজনের দাবির বিরোধীদের এবং তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক প্রভাবশালী নেতা গান্ধীর বক্তব্যের খণ্ডনপ্রয়াস জিন্নার অন্যতম কৃতি। দোসরা মার্চ পাঞ্জাব মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন কর্তৃক আহূত পাকিস্তান সম্মেলনে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোন ইংরেজ ভিন্ন ধর্মগ্রহণ করলেও ইংরেজই থেকে যায়—গান্ধীর এই যুক্তির বিরুদ্ধে জিন্না বললেন যে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সে যুক্তি খাটে না। কারণ এখানে ভিন্ন ধর্মগ্রহণকারী মাত্রেই হিন্দুদের চোখে ম্লেচ্ছ এবং "হিন্দুরা সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অথবা কোন ভাবেই তার সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখে না।" এদেশের ধর্মান্তরিত "এক ভিন্ন ব্যবস্থার" সদস্য হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষে মুসলমানরা এই সেদিন ধর্মান্তরিত—গান্ধীর এই যুক্তির জবাবে জিন্না

বলেন, "প্রায় এক হাজার বছর হয়ে গেল অধিকাংশ মুসলমান এক ভিন্ন জগৎ, এক ভিন্ন সমাজ, এক ভিন্ন দর্শন এবং এক ভিন্ন বিশ্বাসের আওতায় রয়েছে। এই অবস্থাকে কি আপনারা নিছক ধর্ম পরিবর্তন, পাকিস্তান দাবির যুক্তি হতে পারে না —এই বৃথা বাগাড়ম্বরের সঙ্গে তুলনা করতে পারেন ?"

ইসলাম দেশবিভাগের বিরোধী—গান্ধীর এই বক্তব্যের খণ্ডন প্রসঙ্গে নাটকীয় ভাবে জিন্না বলেন, "ভদ্রমহোদয়া ও ভদ্রমহোদয়গণ! আমি শাস্ত্রজ্ঞ মৌলানা বা মৌলভী নই, আর ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার জ্ঞান আছে, এমন দাবিও আমি করি না। তবে আমার ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে অল্পস্বল্প আমিও জানি এবং আমার ঐ ধর্ম-বিশ্বাসের আমি এক দীন কিন্তু গর্বিত অনুগামী (শ্রোতৃমণ্ডলীর উল্লাস)। ঈশ্বরের দোহাই, আমি কি একথা জানতে পারি যে, এই লাহোর প্রস্তাব কি করে ইসলাম-বিরোধী হল ? কেন এ ইসলামবিরোধী ?" ভারত-বিভাজন মুসলিম স্বার্থের পরিপন্থী—এর জবাবও দিলেন তিনি অনুরূপ নাটকীয় ভঙ্গীতে। বললেন, "আমার হিন্দু বন্ধুদের আমি বলি—দয়া করে আমাদের বিরক্ত করবেন না (উল্লাস)। আমাদের ভুল দেখিয়ে দেবার জন্য আপনাদের আমরা উচ্ছ্বসিত ধন্যবাদ জানাই। …এর পরিণতির সম্মুখীন হতে আমরা প্রস্তুত।…দয়া করে নিজেদের সামলান।" দেশবিভাগে সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান হবে না, প্রস্তাবিত উভয় রাষ্ট্রেই যথেষ্ট সংখ্যক সংখ্যালঘু থেকে যাবেন—এই যুক্তির বিরুদ্ধে তিনি বললেন, "যুক্তি হিসাবে কি আপনারা একথা উল্লেখ করতে চান যে হিন্দু সংখ্যালঘুরা অথবা মুসলমান অঞ্চলসমূহের সংখ্যালঘুরা সংখ্যালঘু হয়েই থেকে যাবেন বলে ৯ কোটি মুসলমান এক কৃত্রিম 'অবিভাজিত ভারতে', যেখানে এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা চলবে সেখানে সংখ্যালঘু হিসাবে বসবাস করবেন যাতে আপনারা তাদের সকলের উপর প্রভুত্ব করতে পারেন… ?" যুক্তির দিক থেকে জিন্নার বক্তব্যের দুর্বলতা কিন্তু মুসলমান সমাজের কাছে ধরা পড়ল না। তাঁদের বড় একটা অংশ জিন্নার বক্তব্যের এই সাম্প্রদায়িক আবেদনমূলক আবেগের দ্বারা এই বিশ্বাসে আবিষ্ট হয়ে গেলেন যে, পাকিস্তান হল "মুসলমানদের কাছে জীবন-মরণের প্রশ্ন এবং…দর-কষাকষির কোন আখড়া নয়।"৩

১২ই এপ্রিল মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত লীগের বাৎসরিক অধিবেশনের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ সম্মেলনে পাকিস্তান প্রাপ্তিকে লক্ষ্য হিসাবে লীগের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করানোর ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে জিন্না যথারীতি গান্ধী ও কংগ্রেসের তীব্র ভাষায় নিন্দা করেন। অধিবেশনে বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিত তামিলনাড়ুর রামস্বামী নাইকার, সম্মুখম চেট্টি প্রমুখ অব্রাহ্মণ সংগঠনের নেতাদের সমর্থনে তিনি

পৃথক দ্রাবিড়স্থানের দাবিরও পোষকতা করেন। এছাড়া লক্ষ্যপ্রাপ্তির জন্য একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সাহসী তরুণ সহকর্মীদের জন্য আবেদন জানান। সত্যাগ্রহ দ্বারা কংগ্রেস যে চাপ দেবার চেষ্টা করছে ব্রিটিশ সরকার যেন তার কাছে নতিস্বীকার না করে—এই পরামর্শ দেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন: "যাঁরা আপনাদের পাশে দাঁড়াতে ইচ্ছুক এবং যাঁরা আন্তরিক ভাবে আপনাদের সমর্থন করতে অভিলাষী তাঁদের প্রতি আপনারা অনুগত নন···। আপনারা যদি সততা সহকারে মুসলিম-ভারতের সাহায্য ও সহযোগিতা চান তাহলে হাতের তাস টেবিলের উপর ফেলুন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করুন।"[৪] ডিসেম্বরে তিনি নাগপুরে মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের অধিবেশনে ভাষণ দিলেন এবং ফজলুল হক্ লীগ ছেড়ে কোয়ালিশন মন্ত্রীমণ্ডল গড়ায় তাঁর এবং তাঁর সহযোগী ঢাকার নবাবের তীব্র নিন্দা করলেন। হক্ সাহেবের মন্ত্রীমণ্ডল থাকা সত্ত্বেও পরের বছর ১২ই ফেব্রুয়ারী হাওড়া স্টেশনে পৌছালে সুরাবর্দী-সিদ্দিকী-ইস্পাহানীর ব্যবস্থাপনায় ৪০ হাজার জনতা তাঁর জয়ধ্বনি দিতে দিতে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। কলকাতা থেকে সিরাজগঞ্জ গিয়ে জিন্না প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করলেন। বাংলার গ্রামাঞ্চলেও তখন লীগের জনপ্রিয়তা দ্রুতগতিতে বাড়ছে।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে জাপান যুদ্ধে যোগদান করে পরবর্তী ফেব্রুয়ারীর ভিতর মালয় সিঙ্গাপুর ইত্যাদি দখল করার পর ভারতবর্ষের পূর্বদিকে যথার্থ সঙ্কটের কালো মেঘ দেখা দেয়। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধরত চীনের নেতা চ্যাং কাইশেক ভারত সফরে এসে এবং জাতীয় নেতাদের সঙ্গে দেখা করে তাঁর সহানুভূতি কোন্ দিকে তা পরোক্ষ ভাবে জানিয়ে গেছেন। আমেরিকাও এতদিনে প্রকাশ্যে মিত্র-শক্তির সঙ্গে যোগ দিয়েছে এবং ঐ দেশের জনমত মনে করে যে ভারতকে পরাধীন রেখে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় যথোচিত সাহায্য পাওয়া সম্ভব নয়। ব্রিটেনের যুদ্ধকালীন জাতীয় মন্ত্রীমণ্ডল তাই কংগ্রেস নেতাদের কারামুক্ত করে মন্ত্রীপরিষদের সদস্য ক্রিপসের মাধ্যমে আর এক দফা ভারতবাসীর সঙ্গে রফার চেষ্টা করলেন। প্রধানমন্ত্রী চার্চিল অবশ্য এই ব্যবস্থার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন এবং ভারতসচিব ও বড়লাট দুইজনেই এ ব্যাপারে চার্চিলের অনুগামী ছিলেন। তবুও ব্যর্থতার জন্য প্রস্তুত হয়েই নিছক মন্ত্রীসভার শ্রমিক দল ও যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সহযোগী আমেরিকার জনমতের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য চার্চিল মন্ত্রিসভা ক্রিপসকে তাঁদের প্রস্তাবসহ ভারতে পাঠালেন। গান্ধী ক্রিপস প্রস্তাবের সারমর্ম জেনে প্রথম আলোচনার পরই নিরুৎসাহ হলেও ক্রিপস জওহর-লাল প্রমুখ কংগ্রেস নেতাদের পূর্বপরিচিত বলে কংগ্রেসী মহলে নূতন আশার সঞ্চার

হল। সঙ্গত কারণেই জিন্না সন্দিগ্ধ হলেন এবং ক্রিপসের সঙ্গে আলোচনায় সতর্ক ভাবে এগোলেন। ইতিপূর্বেই তিনি অবশ্য চার্চিলকে তারযোগে জানিয়েছিলেন যে "কংগ্রেসের এজেন্ট" সপ্রুর ভারতকে অখণ্ড রেখে শাসন সংস্কারের জন্য প্রস্তাব বিবেচিত হলে মুসলমানরা বিদ্রোহী হবেন এবং যুদ্ধপ্রচেষ্টাও ব্যাহত হবে।

ক্রিপস ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ দিল্লীতে এসে দফায় দফায় ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। সরকারের যুদ্ধশেষে ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দেবার অভিপ্রায় থাকলেও চার্চিলের কাছে জিন্নার তারবার্তা তাঁকে অবিলম্বে ঐজাতীয় প্রস্তাব দেওয়া থেকে বিরত রাখল। ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়া অফিসের সিভিলিয়ানরা কংগ্রেসের দাবির কাছে "আত্মসমর্পণ" করে ভারতে সাংবিধানিক পরিবর্তন করলে ১০ লক্ষ সদস্যযুক্ত সৈন্যবাহিনীর উপর তার কী কুপ্রভাব পড়বে সে কথা আমেরিকে জানালেন এবং তিনি তা প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের গোচরীভূত করায় যথার্থ ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ব্যাপারে তাঁর হাত আরও পুষ্ট হল। চার্চিল লিনলিথগোকে জানিয়েও দিলেন যে ভারতীয় দলগুলি সরকারের এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেও ব্রিটেনের আন্তরিকতার কথা জগতে প্রচারিত হয়েই যাবে।[৫]

ক্রিপস প্রস্তাবের সারমর্ম হল: যুদ্ধশেষে দেশীয় রাজ্যসমূহসহ ভারতবর্ষ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা পাবে এবং নিজের জন্য নূতন সংবিধান রচনা করবে। তবে ব্রিটিশ ভারতের কোন প্রদেশ যদি ভারতীয় যুক্তরাজ্যে যোগ দিতে না চায় তাহলে তার স্বতন্ত্র থাকার অধিকার থাকবে। অবশ্য ইচ্ছা হলে সে প্রদেশ পরে কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে। এইভাবে পৃথক থাকতে ইচ্ছুক প্রদেশ বা প্রদেশসমূহ নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র সংবিধানও রচনা করতে পারবে। ভবিষ্যৎ গণপরিষদ গঠনের পদ্ধতি বর্ণনা করে অতঃপর ঐ প্রস্তাবে ভারতীয় নেতৃবর্গকে অবিলম্বে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব নেবার জন্যও আহ্বান জানানো হয়েছিল এই শর্তে যে যুদ্ধচলাকালীন ভারতরক্ষার পূর্ণ দায়-দায়িত্ব থাকবে ভারত সরকারের হাতে।

একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে এই প্রস্তাবে যুদ্ধশেষে ভারতীয় যুক্তরাজ্য গঠনের মাধ্যমে স্বশাসন প্রবর্তনের কথা থাকলেও প্রয়োজনে ভারত-বিভাজনেরও স্বীকৃতি ছিল। তবে এ বিভাজন সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নয়, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বা অটোনমির নামে। আর ভারতীয় নেতাদের শাসনব্যবস্থার অঙ্গীভূত করার প্রস্তাব থাকলেও প্রতিরক্ষা ও যুদ্ধপ্রচেষ্টার সমস্ত ব্যবস্থা ও উদ্যোগ-আয়োজন ইংরেজদের হাতে রাখা হয়েছিল। এতে যুদ্ধকালে প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ভারতীয় নেতাদের

মান-মর্যাদা দিলেও যথার্থ ক্ষমতার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ দেবারও পরিকল্পনা ছিল না।

ক্রিপসের সঙ্গে বিভিন্ন দলের নেতাদের অনেক আলাপ-আলোচনা হল যাতে বিভিন্ন পক্ষের বক্তব্য শুনে প্রস্তাবের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও ভাষ্য দেওয়া হল। শেষ অবধি কংগ্রেস আত্মনিয়ন্ত্রণের যুক্তির দোহাই দিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদের সম্ভাবনাযুক্ত প্রস্তাবের দীর্ঘমেয়াদী অংশে অর্থাৎ যুদ্ধশেষে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ও গণপরিষদের অংশে আপত্তি না করলেও ভারতের দ্বারদেশের বিদেশী আক্রমণকারী (জাপান) উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ভারতবাসীদের সর্বতোভাবে সংগঠিত করার জন্য অবিলম্বে যথার্থ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় সরকার গঠন করা হচ্ছে না বলে ১০ই এপ্রিল ক্রিপস প্রস্তাব অগ্রাহ্য করল। কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত প্রচারিত হবার পরদিন লীগ প্রস্তাবে পাকিস্তানের সম্ভাবনা নিহিত আছে বলে প্রস্তাবের ঐ অংশের সমর্থন করলেও বর্তমান রূপে ঐ প্রস্তাবকে গ্রহণের অযোগ্য বিবেচনা করল। লীগের আপত্তির বিশেষ কারণগুলি হল: পাকিস্তান প্রাপ্তির সম্ভাবনা ভবিষ্যতের ব্যাপার, বর্তমানে মুসলিম জাতিকে অন্ততঃ প্রথম দিকে হিন্দুদের সঙ্গে একই গণপরিষদে বসতে বাধ্য হবার অঙ্গীকার করতে হবে, গণপরিষদের প্রস্তাবিত গঠনপদ্ধতি মুসলমানদের মৌলিক অধিকার—পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রতিকূল, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে পৃথক হয়ে যাবার জন্য গণভোট নিতে হলে সে অধিকার সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক অধিবাসীদের বদলে কেবল মুসলমানদের দিতে হবে—নচেৎ আত্ম-নিয়ন্ত্রণের কোন অর্থ নেই ইত্যাদি। কংগ্রেস জাতির প্রতিনিধিরূপে কথা বলতে পারে না এবং ঐ প্রতিষ্ঠান কেবল উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সংগঠন ইত্যাদি বলে ১৩ই এপ্রিল জিন্না ঘোষণা করলেন, "সব দল যদি মুসলমানদের পাকিস্তান দাবি বা দেশ বিভাগ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মেনে নেয় এবং তার খুঁটিনাটি যদি যুদ্ধশেষে স্থির হবে বলে নির্ধারিত হয় তাহলে বর্তমান সম্বন্ধে আমরা কোন যুক্তিযুক্ত বোঝা-পড়ায় আসতে প্রস্তুত।"

ক্রিপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পূর্বোক্ত প্রকাশ্য কারণসমূহ ছাড়াও কিছু কিছু গোপন কারণ ছিল। ডঃ আয়েষা জালালের মতে এর মূল ছিল লাহোর প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত স্ববিরোধে যার জন্য ক্রিপস প্রস্তাবে: "সম্প্রদায়গুলিকে নয়, প্রদেশ-সমূহকে কেন্দ্রের বাইরে থাকার অধিকার দেবার প্রস্তাব করায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহকে স্পষ্টতঃ এক সাম্প্রদায়িক পতাকার আওতায় কেন্দ্রে আনার জিন্নার প্রয়াসের পক্ষে গুরুতররূপে ক্ষতিকারক হবার সম্ভাবনা ছিল। অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে প্রাদেশিক

ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সঙ্গে অখিল ভারত পর্যায়ে কোন সাম্প্রদায়িক দলের নেতৃত্ব অনুসরণ করার সঙ্গতি নেই। এই প্রস্তাবের মাধ্যমে এই অস্বস্তিকর প্রশ্নোত্তরও উদ্ভব হয়েছিল যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহের মুসলমান নেতারা যদি জিন্নার ও লীগের অনুবর্তী হন তাহলে ঐসব প্রদেশের অমুসলমান সংখ্যালঘুদের অবস্থা কেমন হবে।"[৭] উপরন্তু জিন্নার প্রধান সমর্থক ছিলেন পাঞ্জাব, বাংলা বা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহের মুসলমানরা নন, মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশগুলির মুসলমানরা। আঞ্চলিক ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁদের কোন সুরাহা হবে না। লিনলিথগো তাই সঙ্গত কারণেই আমেরীকে জানিয়েছিলেন যে, "সংযুক্ত প্রদেশ ও বিহারের মুসলমানদের এ প্রস্তাবে সান্ত্বনার কিছু নেই।"[৮]

এ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রসঙ্গে ক্রিপস প্রস্তাব গ্রহণের সমর্থক খলিকুজ্জমাঁ লিখেছেন: "আমার অভিমত কার্যকরী হয়নি। কারণ ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সদস্য এই ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন যে, কেবল মুসলমান ভোটারদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবির ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে ন্যূনতম বক্তব্য এই যে এর ফলে কোন অঞ্চলের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের একটা নূতন ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করা হল যেখানে কেবল একটি মাত্র সম্প্রদায় এজাতীয় দাবি জানাচ্ছে এবং ইতিহাসে এর দ্বিতীয় কোন নিদর্শন নেই।...ক্রিপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানকারী লীগের প্রস্তাব ১২ই এপ্রিল গৃহীত হয়। পাঞ্জাব ও বঙ্গের বিভাজনের বীজও তার সঙ্গে সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে উপ্ত হয়।"[৯]

কংগ্রেস ও লীগ ভিন্ন ভিন্ন কারণে ক্রিপস প্রস্তাব বর্জন করায় যুদ্ধ চলাকালীন ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়ার সম্ভাবনা তিরোহিত হল। কংগ্রেস তাই ৮ই আগস্ট বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে "ভারত ছাড" প্রস্তাব গ্রহণ করে দেশবাসীকে আবার স্বাধিকারের জন্য গণসংগ্রামে প্রবৃত্ত হবার আহ্বান জানাল। ইতিপূর্বে ওয়ার্কিং কমিটির এতদসংক্রান্ত প্রস্তাবের উপর মন্তব্য প্রসঙ্গে ৩১শে জুলাই জিন্না এক বক্তব্যের মাধ্যমে বিদেশী সাংবাদিকদের বলেন, "কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই-এর সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত, যাতে বলা হয়েছে যে ব্রিটিশ অবিলম্বে ভারত ছেড়ে চলে না গেলে এক গণআন্দোলন আরম্ভ করা হবে তা মিস্টার গান্ধী ও তাঁর হিন্দু কংগ্রেসের ব্রিটিশ সরকারকে ভয় দেখিয়ে কার্যসিদ্ধি করার এবং চাপ দিয়ে ব্রিটিশ বেয়নেটের ছত্রছায়ায় এমন এক শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য করার সর্বশেষ প্রয়াস যার দ্বারা অনতিবিলম্বে এক হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা হবে এবং ঐ কংগ্রেসরাজের করুণার উপর মুসলমান ও অপরাপর

সংখ্যালঘু স্বার্থদের নির্ভর করতে হবে।" জিন্নার এই সুস্পষ্ট অভিমতের পরও রাজাজী[১০] তাঁর সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার জন্য গান্ধীর উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন এবং প্রারম্ভিক কিছুটা দ্বিধার পর গান্ধী ৪ঠা আগস্ট বোম্বাই-এর সেই ঐতিহাসিক অধিবেশনের চার দিন পূর্বে জিন্নার উদ্দেশ্যে তাঁদের উভয়ের পরিচিত বোম্বের জনৈক মুসলমান ভদ্রলোককে (জনাব মেকলাই) উপলক্ষ্য করে একটি প্রস্তাব পাঠান। সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে জিন্নার যে আলোচনা হয়েছিল তার বিবরণ তাঁর কাছ থেকে অবগত হবার পর তিনি জানান, "মুসলিম লীগ যদি কংগ্রেসের অবিলম্বে স্বাধীনতা পাবার দাবির সঙ্গে কোনরকম কুণ্ঠা ছাড়াই পূর্ণমাত্রায় সহযোগিতা করে…তাহলে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক আজ নিজের বর্তমান যাবতীয় ক্ষমতা (সমগ্র ভারতবর্ষের তরফ থেকে) মুসলিম লীগকে হস্তান্তর করার ব্যাপারে কংগ্রেসের কোন আপত্তি হবে না।"[১১]

অবিলম্বে স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত গান্ধী ৮ই আগস্ট অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদীদের দীর্ঘদিনের কৌশল—সাম্প্রদায়িক বিভেদের অজুহাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিলম্বের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, "ভারতবর্ষের অচিরাৎ স্বাধীনতার জন্য জিন্নাসাহেব রাজী না হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে পারি না।" অবিলম্বে ভারতবাসীর স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেসের ঐ অধিবেশন "ভারত ছাড়" প্রস্তাব[১২] গ্রহণ করল এবং এর প্রতি সরকারের প্রথম প্রতিক্রিয়া হল পরদিবস প্রত্যুষে গান্ধী এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সমস্ত সদস্যদের গ্রেপ্তার ও অন্তরীণ করা। এর প্রতিবাদে দেশের নানা স্থানে প্রকাশ্য বিদ্রোহের পরিস্থিতি দেখা দেওয়ায় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে নিষিদ্ধ করা ও কংগ্রেসের সর্বস্তরের কর্মীদের কারারুদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে সরকার ঐ প্রতিষ্ঠান এবং তার কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক যুদ্ধ আরম্ভ করল। বাংলা সরকারের তদানীন্তন মুখ্য সচিবের মতে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত হল, "কংগ্রেসবিরোধী তাবৎ শক্তিকে সংহত করা। সংহতির এই প্রক্রিয়ায় সেই সব দল ও সংগঠন অন্তর্ভুক্ত হবে প্রচণ্ড গোলযোগসৃষ্টিকারী এক সম্ভাব্য আন্দোলনের বিরুদ্ধে যারা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক।"[১৩] যুদ্ধে অন্যায় বলে কিছুই নেই এবং ইংলণ্ড তো তখন জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত।

সরকারকে সাহায্য করার জন্য জিন্না হাতের কাছেই ছিলেন, যদিও ভিন্ন কারণে। বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় তিনি মুসলমানদের "আন্দোলনে কোন রকম অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার" পরামর্শ দিয়ে

বললেন যে, "তাঁরা যেন নিজেদের স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রার অনুশীলন করেন।" কারণ তাঁর মতে "আন্দোলন এইজন্য মুসলিম স্বার্থের পরিপন্থী যে তা সরকারকে কংগ্রেসের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য বাধ্য করার উদ্দেশ্যে আরম্ভ করা হয়েছে। কংগ্রেসের এই দাবি মেনে নেবার অর্থ মুসলিম স্বার্থের উপর মৃত্যুকল্প আঘাত হানা।" গান্ধী ও কংগ্রেসের উপর পূর্বেই অবিশ্বাস ছিল। "ভারত ছাড়" প্রস্তাবের উপর গান্ধীর পূর্বোদ্ধৃত বক্তৃতা সেই অবিশ্বাসকে আরও দৃঢ়মূল করায় স্পষ্টত: জিন্নার এই কঠোর ভূমিকা।

কাউনসিল অফ স্টেটস-এর লীগ পরিষদীয় দলের সম্পাদক সৈয়দ মহম্মদ হুসেন এবং সৈয়দ আবদুল লতীফের লীগের এই ভূমিকার প্রতিবাদের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর লীগের ওয়ার্কিং কমিটির ২০শে আগস্টের সরব ভৎর্সনা ডুবিয়ে দিল। ওয়ার্কিং কমিটির বক্তব্য হল: "যুদ্ধ শুরু হবার প্রারম্ভ এবং এমন কি তার পূর্ব থেকেই কংগ্রেস নীতির একমেব উদ্দেশ্য হচ্ছে কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা সমর্পণের জন্য ব্রিটিশ সরকারকে তোষামোদ করা অথবা চাপ দেওয়া।...এর সঙ্গে সঙ্গে তারা অবশ্য ভারতবর্ষের জন্য আত্মনিয়ণের দাবিও জানিয়েছে। কিন্তু এই 'ভারতবর্ষ' হিন্দু সংখ্যাগুরুদের অনুকূল কংগ্রেসী কবিকল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। মুসলমান জাতি (nation) নিজেদের ভবিতব্য নির্ধারণ করুন তাঁদের এই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের কিন্তু কংগ্রেস নিয়মিত বিরোধিতা করে আসছে।" প্রস্তাবে এও বলা হল যে, "ভারত ছাড়" দাবি, "যথার্থ অভিসন্ধি গোপন করার এক নিছক কৌশল এবং এর আসল লক্ষ্য হল কংগ্রেস কর্তৃক দেশের শাসন-ব্যবস্থার উপর চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ-প্রাপ্তি।"

শত্রুর শত্রু বরাবরই মিত্র হয়ে থাকে। সুতরাং ভারতের ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে যুদ্ধে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি এবং ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস নেতাদের কারামুক্ত না করা পর্যন্ত জিন্না ও লীগের চেয়ে বড় মিত্র আর কারও পক্ষে হওয়া সম্ভব ছিল না।

॥ ২৩ ॥

যুদ্ধপ্রচেষ্টায় গান্ধী বা কংগ্রেসের সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়া যাবে না একথা ইংরেজ সরকার ধরে নিয়েছিল। আপাততঃ ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ইচ্ছাও সরকারের ছিল না। এমতাবস্থায় ভারতবাসীর মধ্যে মতভেদের জন্যই যে এটা সম্ভবপর হচ্ছে না, এটা বিশ্বের কাছে তুলে ধরা ব্রিটিশ সরকারের 'তদানীন্তন ভূমিকার পক্ষে অনুকূল। জিন্না সেই সুযোগ তাঁদের করে দিলেন। সুতরাং

জিন্না ও লীগের প্রতি ব্রিটিশ সরকার অত্যন্ত বদান্য হয়ে উঠলেন। এর নিদর্শন স্বরূপ কিছু কিছু ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন।

কংগ্রেসের স্বায়ত্তশাসনের দাবি দানা বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব বিঘ্নিত হতে থাকে বলে সেই ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদকে প্রোৎসাহিত করার সরকারী নীতির পরিচয় আমরা পূর্বেই পেয়েছি। উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারীদের একাংশ অতঃপর নিয়মিতভাবে ভারতের জাতীয়তাবাদী দাবির বিরোধী সর্বপ্রকারের শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা করার নীতি অবলম্বন করল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত হতেই শাসকদের এই প্রয়াস আরও সুসংবদ্ধ রূপ ধারণ করল। জনসমক্ষে জিন্নার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য যুদ্ধ ঘোষণার পরদিবসেই (৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ খ্রীঃ) বড়লাট কর্তৃক তাঁকে গান্ধীর সঙ্গে একযোগে (এই প্রথম) সাক্ষাৎকারের জন্য আমন্ত্রণ করা যুদ্ধকালীন প্রয়াসের প্রথম চরণ। তারপর যুদ্ধে সহযোগিতার শর্ত হিসাবে কংগ্রেস যখন অবিলম্বে কেন্দ্রে দায়িত্বশীল সরকার ও গণপরিষদ গঠন করার দাবি জানাল এবং লীগের এর প্রতি প্রতিকূল ভূমিকার জন্য ইংরেজের হাত শক্ত হল, তখন "লিনলিথগো উত্তরোত্তর বেশী করে জিন্না ও লীগের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। তিনি স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন যে জিন্না 'কংগ্রেসের দাবির বিরোধিতা করে তাঁকে বহুমূল্য সহায়তা দেন এবং আমি সঙ্গত কারণে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।' জিন্না যদি কংগ্রেসকে সমর্থন করে 'আমার সামনে সম্মিলিত দাবি উপস্থাপিত করতেন তাহলে আমার এবং মহামান্য সম্রাটের সরকারের উপর নিঃসন্দেহে মারাত্মক চাপ পড়ত ···। সুতরাং একথা বলা যেতে পারে যে জিন্নার মর্যাদার সঙ্গে আমার একটা কায়েমী স্বার্থ যুক্ত ছিল।' "[১]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতা ও গণপরিষদ প্রতিষ্ঠার দাবির জবাব হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কর্তৃক জিন্না ও লীগের ভাবমূর্তি গড়ে তোলার প্রয়াসের সম্বন্ধে আরও অনেক সাক্ষ্য-প্রমাণ মেলে। দুর্গাদাসের মতে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই আগস্টে প্রদত্ত বড়লাটের বিবৃতি পরোক্ষভাবে জিন্নাকে সমর্থন জানায়। জিন্না "জনান্তিকে স্বীকার করেন যে লীগ এই সুবিধা লিওপোল্ড আমেরীর সৌজন্যে লাভ করে।"[২] অন্যত্র দুর্গাদাস জানিয়েছেন যে ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতার পর, "ইণ্ডিয়া অফিস এবং বড়লাট জিন্নাকে তাঁদের তুরুপের তাস হিসাবে গড়ে তোলার ব্যাপারে সহমত হন যাতে কংগ্রেসের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়া যায়। এটা আমি উপলব্ধি করেছিলাম স্যার সিকন্দরের সঙ্গে আলোচনার সময়। তিনি আমাকে জানান যে ভারতসচিবের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়ে বড়লাট তাঁকে ও

ফজলুল হককে বলেছেন যে তাঁরা যেন 'মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা হিসাবে' জিন্নার মর্যাদা ক্ষুন্ন করার চেষ্টা না করেন।"[৩]

লীগের লাহোর প্রস্তাব কিভাবে লিনলিথগো কর্তৃক জিন্নাকে তাঁর "গঠনমূলক নীতি" জনসমক্ষে প্রচার করার পৌনঃপুনিক পরামর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয় (পূর্বেই বলা হয়েছে যে লীগ ওয়ার্কিং কমিটি এর মূল নীতি স্বীকার করার পরেই লাহোরে রওনা হবার পূর্বে জিন্না বড়লাটকে এ প্রস্তাবের কথা আগাম জানিয়ে আসেন) এবং অতঃপর কিভাবে বড়লাট ও ভারতসচিব লীগ ও জিন্নাকে কংগ্রেসের দাবির বিরুদ্ধে দাবার চালের মত ব্যবহার করেন তার তথ্যসমৃদ্ধ বিবরণ ডঃ আয়েষা জালাল তাঁর গ্রন্থে দিয়েছেন।[৪] খলিকুজ্জমাঁও তাঁর গ্রন্থে[৫] স্বীকার করেছেন যে কিছু উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারী নানাভাবে পাকিস্তানের দাবিকে সমর্থন করতেন। এই সময়ে লীগ নিজ সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য যে অর্থভাণ্ডার গড়ে তোলে তার উৎস যে ব্রিটিশ সরকারের অনুগ্রহভাজন "হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে ভারতীয় রাজন্য-বর্গ, বড় বড় মুসলিম জমিদারগোষ্ঠী এবং বিশেষ করে কলকাতার ইংরেজ বণিকসমাজ", এ তথ্য ভারতে অবস্থিত আমেরিকার কনসাল জেনারেল তাঁর স্বদেশের সরকারকে জানালে তত্রস্থ ব্রিটিশ রাজদূত লর্ড হ্যালিফক্স (ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড আরউইন) ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে আগস্ট এক অত্যন্ত গোপনীয় তারবার্তায় এ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের বিদেশমন্ত্রী অ্যাণ্টনী ইডেনকে সতর্ক করে দেন। আমেরিকান অফিসারের বক্তব্য উদ্ধৃতি করে তিনি জানান, "...ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও ব্রিটিশ ব্যবসায়ী সমাজ কর্তৃক মুসলিম লীগকে সমর্থন করার উদ্দেশ্য সরকারেরই অনুরূপ। আর এই উদ্দেশ্য হল 'ভারতবর্ষের প্রতিনিধিদের' দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্তির পথে বাধাসৃষ্টি করা...ভারতের সমস্যাবলীর সুনির্দিষ্ট সমাধান পরিহার করা এবং বর্তমান অচলাবস্থা বজায় রাখা। মুসলমান জমিদারদের মুসলিম লীগকে সমর্থন করার প্রবণতার দ্বিতীয় কারণ হল এই যে তাঁরা কংগ্রেসের সকল প্রাকৃতিক সম্পদের রাষ্ট্রীয় মালিকানার বিশ্বাসের প্রতি আতঙ্কিত।"[৭] কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ, ভারতরক্ষা আইনের আয়ুধে সজ্জিত প্রশাসন যদৃচ্ছ পদক্ষেপ করতে পারে, স্বাধীন জনমতের অভিব্যক্তির পথ রুদ্ধ। সুতরাং জিন্নার পক্ষে তাঁর অভীষ্টের অভিমুখে অগ্রসর হবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হল।

১৩ই আগস্ট লণ্ডনের হেরল্ড পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন যে সরকারের কাছ থেকে যুদ্ধশেষে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি পেলে হিন্দুদের সঙ্গে সংখ্যাসাম্যের ভিত্তিতে লীগ অন্তর্বর্তী যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভায়

যোগ দিতে প্রস্তুত। আগস্টের ১৮ই লীগের ওয়ার্কিং কমিটি তাঁকে এই অধিকার দেয় যে কংগ্রেস সমরকালীন মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে লীগের সঙ্গে সহযোগিতা করবে কিনা সে সম্বন্ধে জানার জন্য তিনি গান্ধীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। নভেম্বরের শুরুতে দিল্লীর লীগ কাউন্সিলের সভায় আবার পাকিস্তান দাবির প্রতি জোর দেন। ঐ মাসের ২১শে লাহোরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে গান্ধী জেল থেকেই আগস্ট আন্দোলন প্রত্যাহার করার নির্দেশ দিতে পারেন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী রাজাজীর এক চিঠির উত্তরে জানান যে গান্ধীর উপবাসের পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লীতে যে পরামর্শসভা আহুত হয়েছে তাতে যোগ দিতে তিনি অক্ষম। এপ্রিলের ২৪ ও ২৬ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত লীগের অধিবেশনে পাকিস্তান দাবি মেনে নিতে বিলম্ব হবার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে শাসানি দেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি, "...কংগ্রেসকে প্রকাশ্য এবং একরকম চূড়ান্ত আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন যে ইচ্ছা করলে সমস্যার সমাধানের জন্য ঐ প্রতিষ্ঠান যেন তাঁর শরণাপন্ন হয়।"[৮] মুসলমানদের উদ্দেশ্যে আবেগমণ্ডিত ভাবে তিনি বলেন :

"নিজেদের ভস্মাবশেষ থেকে মুসলিম-ভারত যেভাবে ফিনিক্সের মত এখন পুনর্জন্ম লাভ করেছেন...তা প্রায় এক অভাবনীয় বিস্ময়। যে জাতি প্রায় হৃতসর্বস্ব হয়েছিল এবং দৈবক্রমে জাঁতার দুই চাকার মধ্যে পড়েছিল, অত্যল্প সময়ের মধ্যে তারা কেবল স্বরূপপ্রাপ্ত হয়নি—ব্রিটিশের পর সামাজিক দৃষ্টিতে তারা সর্বাপেক্ষা সংহত, সামরিক দৃষ্টিতে অত্যন্ত দুর্ধর্ষ এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিতে আধুনিক ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা নির্ণায়ক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। এবারে এই জাতিকে গড়ে তোলার জন্য গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করার সময় সমুপস্থিত যাতে আমাদের লক্ষ্য পাকিস্তানের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়।...লক্ষ্য আর দূরে নয়, সম্মিলিত হয়ে দাঁড়ান, শক্তি সংহত করুন ও এগিয়ে চলুন।"[৯]

মুসলমানদের মধ্যে শুধু আত্মবিশ্বাস সৃষ্টিই নয়, তাঁদের প্রচ্ছন্ন অহমিকাবোধকে উদ্দীপ্ত করার কৌশল অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীর মত প্রয়োগ করে জিন্না তাঁদের লীগ অর্থাৎ তাঁর নিজের নেতৃত্বের অধীনে আনার পথে এইভাবে অগ্রসর হলেন। এই সময়ে লীগের সংগঠন শক্তিশালী করার জন্য জিন্না ব্যাপকভাবে পশ্চিম ভারতে সফর করেন এবং সর্বত্র ঐজাতীয় বক্তৃতায় মুসলিম অহমিকাকে জাগ্রত করে মুসলমানদের আত্মচেতনার অভিব্যক্তির জন্য লীগের পতাকাতলে সমবেত করতে থাকেন। ঐসব প্রদেশে এবং বঙ্গ ও আসামেও লীগ মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হওয়ায় মুসলিম অহমিকাবোধ পুষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে জিন্নার নেতৃত্বের প্রভাববৃদ্ধি ঘটে।

লীগের সদস্যসংখ্যা প্রভূত মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। কংগ্রেসবিহীন ফাঁকা রাজনৈতিক ময়দানে লীগের মর্যাদাবৃদ্ধি ছাড়াও বিভিন্ন প্রদেশে যুদ্ধের নানাবিধ ঠিকাদারী ও অন্যান্য কাজে লীগের নেতা ও সমর্থকরা যথেষ্ট অর্থ এবং ক্ষমতা প্রতিপত্তি অর্জন করেন। আবার ঐ সমস্ত বিত্ত ও মর্যাদাও শেষ অবধি লীগ ও জিন্নার প্রভাব বৃদ্ধি করে। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক লীগের কার্যকলাপের উপর গোপনে তদারকী করার জন্য নিযুক্ত জনৈক গুপ্তচরের মতে এই সময়ে "তিনি (জিন্না) আরও আক্রমক, আরও যুযুধান এবং আরও কর্তৃত্বপরায়ণ হয়ে ওঠেন। সম্ভবতঃ এর কারণ হল সম্প্রতি অর্জিত ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতনতা এবং তার সহায়তায় কোন কোন পুরাতন আঘাতের প্রতিশোধ নেবার বাসনা।"[১০]

জিন্নার এই ক্ষমতাসচেতনতার নিদর্শন দুর্গাদাসের সঙ্গে ঐ সময়ে (এপ্রিল ১৯৪৩) তাঁর এক সাক্ষাৎকারের বিবরণে মেলে। জিন্না দুর্গাদাসকে বলেন, "আমার অনুগামীরা ক্ষমতায় রয়েছে। সুতরাং কংগ্রেসকে এখন বলতে হবে যে তারা কি দিতে প্রস্তুত। বল তাদের দিকে রয়েছে। তাঁরা ক্ষমতা চান এবং ব্রিটিশ তা দিতে রাজী নয়। সুতরাং আমি এখন সর্বাপেক্ষা অনুকূল শর্ত আদায় করার সুখকর অবস্থায় রয়েছি।"[১১] তিনি যে তাঁর ষোল আনার উপর আঠার আনা আদায় করে নেবার চেষ্টা করবেন তা রাজাজীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা এবং এর প্রায় দেড় বৎসর পর গান্ধীর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনার ব্যর্থতাতেই প্রকাশ। তবে সে প্রসঙ্গের অবতারণা করার পূর্বে তাঁর ক্ষমতাসচেতনতার অন্যতম উৎস— কয়েকটি প্রদেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হবার সংক্ষিপ্ত কাহিনী বর্ণনা করা প্রয়োজন।

ভারতের জনমতকে উপেক্ষা করে দেশকে যুদ্ধে জড়িত করার ব্রিটিশ সরকারের নীতির প্রতিবাদে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কংগ্রেস যখন বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রীমণ্ডল থেকে পদত্যাগ করে তখন বাংলার লীগ হক্ সাহেবের কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার অংশীদার ছিল। আমরা দেখেছি যে লীগ হক্ সাহেবকে পূর্ণমাত্রায় হাতের মুঠোয় পুরতে না পেরে তাঁকে চাপ দেবার জন্য তাঁর মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করায় তিনি লীগের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা এবং নির্দলীয় সদস্যদের নিয়ে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করেন। কিন্তু হক্ সাহেবের নিজের দল কৃষক প্রজা পার্টির ভিতরকার ক্ষমতাদ্বন্দ্বে সে মন্ত্রীসভা আদৌ শক্তিশালী ছিল না। তার উপর বঙ্গের মুসলিম জনমত ক্রমশঃ লীগের অনুগামী হয়ে ওঠায় এবং হক্ সাহেবের উপর মুসলিম জনমানসে উত্তরোত্তর জনপ্রিয়

জিন্না ও লীগের প্রচার-যুদ্ধের চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকায় তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলের অবস্থা ক্রমশই শোচনীয় হয়ে ওঠে। এছাড়া মাথার উপর খাঁড়ার মত বিধানসভায় ইংরেজ ও ইঙ্গভারতীয় ১৯টি আসনের শক্তি তো ছিলই এবং তাঁদের নেক্‌নজর কোন্ দিকে তা তাঁরা কখনও গোপন করেননি। লীগের প্ররোচনায় দলবলের দ্বারা পুষ্ট বিরোধীদলের অনাস্থা প্রস্তাব তবুও ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ ১০ ভোটে পরাজিত হয়। এর পরের দিন ছোটলাট স্যার জন হার্বার্ট জোর করে হক্ সাহেবের পদত্যাগ-পত্র আদায় করেন এবং এক মাস প্রশাসন নিজের হাতে রাখার পর ২৪শে এপ্রিল আরও কিছু দলত্যাগের দ্বারা পুষ্ট লীগ পরিষদীয় দলের নেতা স্যার নাজিমুদ্দীনের হাতে বঙ্গের শাসনভার অর্পণ করেন।

অপর এক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ পাঞ্জাবে মুসলমান-শিখ-হিন্দু ভূস্বামীদের ইউনিয়নিস্ট পার্টি প্রাদেশিক প্রশাসন করায়ত্ত করে এবং লীগ মাত্র ২টি আসন পায় এ আমরা পূর্বে দেখেছি। শহীদগঞ্জ মসজিদের প্রশ্নে নির্বাচনের পরই মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা ঐ প্রদেশে মাথাচাড়া দিয়ে উঠলেও প্রধানমন্ত্রী স্যার সিকন্দর বুদ্ধি করে তাঁদের দলের মুসলমান সদস্যদের নামে মাত্র লীগে যোগদান করতে দিয়ে তাঁর তিন সম্প্রদায়ের মিলনের ভিত্তিতে গঠিত ইউনিয়নিস্ট মন্ত্রিসভাকে লীগের সাম্প্রদায়িক আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হন। অবশ্য এর জন্য জিন্নার সঙ্গে এক চুক্তির ভিত্তিতে তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলকে ইউনিয়নিস্ট লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা আখ্যা দিতে হয়। স্যার সিকন্দরের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী মালিক খিজির হায়াৎ খাঁ তিওয়ানার কাছে জিন্না ক্রমাগত দাবি জানাতে থাকেন যে তিনি যেন ইউনিয়নিস্ট মন্ত্রিসভাকে অতঃপর মুসলিম লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা রূপে অভিহিত করেন এবং ইউনিয়নিস্ট দলের মুসলমান সদস্যরা যেন পরিপূর্ণভাবে লীগের অনু-শাসনের অধীন হন। নিজ দলের হিন্দু ও শিখ সদস্যদের সমর্থন বিনা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত বলে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে খিজির শেষ অবধি জিন্নার এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেন, যদিও তিনি সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের দাবির সমর্থনে ঘোষণা করেন এবং মুসলমানদের কল্যাণমূলক কার্যে কায়দ-এ-আজমের সঙ্গে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দেন। এইভাবে পাঞ্জাবে পূর্ণমাত্রায় না হলেও জিন্না অংশতঃ সফল হন।

প্রবলভাবে মুসলমান সংখ্যাগুরু প্রদেশ হবে—এইজন্য সিন্ধুকে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী থেকে পৃথক করলেও সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ সেখানে একটি আসনও পায়নি। স্যার গোলাম হোসেন হিদায়েৎউল্লা বিভিন্ন সম্প্রদায় ও দলের

সদস্যদের নিয়ে এক মন্ত্রিসভা গঠন করার পর স্বয়ং ও নিজের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ অনুবর্তীদের নিয়ে বিধানসভায় লীগ পরিষদীয় দল সৃষ্টি করেন। কিন্তু তাবৎ মুসলমান সদস্যদের নিজ নেতৃত্বে লীগের ছত্রছায়ায় আনার তাঁর পরিকল্পনা সফল হয়নি এবং তাঁর সমর্থক হিন্দু সদস্যরা আনুগত্য পরিবর্তন করায় এক বছরের কম সময়ের মধ্যেই তাঁর মন্ত্রিসভার পতন হয়। অতঃপর কংগ্রেসী সদস্যদের সমর্থনে অপর একজন মুসলমান নেতা খাঁ বাহাদুর আল্লাবক্স সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে প্রধানমন্ত্রী হন। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে আল্লাবক্সকে লীগের আওতায় আনার জিন্নার ব্যক্তিগত উদ্যম কেমন ভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। অতঃপর স্যার গোলাম হোসেন লীগ থেকে পদত্যাগ করে আল্লাবক্স মন্ত্রিসভায় যোগদান করায় সাময়িক ভাবে সিন্ধুতে লীগের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। সিন্ধুর লীগপন্থীরা পাঞ্জাবের শহীদগঞ্জের মতই শুক্কুরে এক মসজিদের প্রশ্ন নিয়ে ঐ প্রদেশে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে জাগিয়ে তোলেন। ঐ এলাকায় বার বার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হতে থাকে। হিন্দু মহাসভাও হিন্দু অধিকার রক্ষার আন্দোলনের নামে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে সংহত করার সুযোগ দেয়। হিন্দু মন্ত্রীদের পদত্যাগের ফলে আল্লাবক্স মন্ত্রিসভাকে সংখ্যালঘু হয়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য হতে হয়। অতঃপর মীর বন্দেআলী খাঁর লীগ ও নির্দলীয় হিন্দুদের কোয়ালিশন ন্যাশনালিস্ট পার্টির নামে ক্ষমতায় আসে। কিন্তু এক বছরের মধ্যে সেই মন্ত্রীমণ্ডলেও বিভেদ সৃষ্টি হওয়ায় বন্দেআলী খাঁকে পদত্যাগ করতে হয়। কংগ্রেস সদস্যদের সমর্থনে আল্লাবক্স আবার প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি প্রদেশে সাম্প্রদায়িক শান্তি ফিরিয়ে আনতে প্রভূত প্রয়াস করেন। কিন্তু শীঘ্রই গভর্নরের সঙ্গে নানা প্রশ্নে তাঁর মতভেদ তীব্র হয়ে ওঠে। তিনিও তাই ক্রমশঃ কংগ্রেসের প্রতি ঘনিষ্ঠ হন। আগস্ট আন্দোলন দমনের নামে দেশব্যাপী দমননীতি আরম্ভ করার প্রতিবাদে আল্লাবক্স ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর তাঁর সরকারী খেতাব বর্জন করে সরকারী নীতিবিরোধী এক প্রকাশ্য বিবৃতি দেন। অক্টোবরের ৮ই অনুরূপ আর এক বিবৃতি দেবার দু'দিন পর তিনি পদচ্যুত হন। ২২শে অক্টোবর স্যার গোলাম হোসেন এক মন্ত্রিসভা গঠন করার পরদিবস মন্ত্রিসভার অপর চারজন সদস্যসহ পুনরায় লীগে যোগদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় সিন্ধুতে লীগ শূন্য থেকে নূতন করে শাসনব্যবস্থার কর্ণধার হবার গৌরব অর্জন করে। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মার্চ সিন্ধু বিধানসভায় পাকিস্তানের সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় লীগের সিন্ধু বিজয় সম্পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে জিন্নার বহুদিনের সাধ পূর্ণ হয়।

সামগ্রিক ভাবে আসামে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলেও ঐ প্রদেশে যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমান থাকায় এবং তা প্রস্তাবিত পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে জিন্নার দৃষ্টি সততই ঐ প্রদেশের উপর ছিল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে ঐ প্রদেশের ৩৪টি মুসলমান আসনের মধ্যে লীগ ৯টি পেয়েছিল। একক বৃহত্তম দল হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেসের তদানীন্তন নীতি অনুসারে আসাম বিধানসভায় ঐ দল প্রথমে মন্ত্রিসভা গঠনের দায়িত্ব নেয়নি। সুতরাং ইতিমধ্যে লীগনেতা স্যার সৈয়দ মহম্মদ সাদুল্লা অন্য দল ও গোষ্ঠী থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান সদস্যদের সমর্থন সংগ্রহ করে সাধারণ নির্বাচনের পর কিছুদিনের জন্য আসামে লীগ মন্ত্রীসভা গঠন করেন। কিন্তু এক দিকে তাঁর কোয়ালিশন অন্তর্দ্বন্দ্বে ভেঙে যাওয়ায় এবং অন্য দিকে কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে ঐ প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হয়। কিন্তু যুদ্ধে যোগদানের ব্যাপারে সরকারী নীতির প্রতিবাদে অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে সঙ্গে আসামের গোপীনাথ বরদোলৈ মন্ত্রীসভাও পদত্যাগ করে। অতঃপর আবার আনুগত্য বদলের খেলায় বিজয়ী হয়ে স্যার সাদুল্লা আসামে লীগ মন্ত্রীসভা গঠন করেন। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মুসলমান অধিবাসীদের আসামে বসবাস করার অবাধ সুযোগ দিয়ে কংগ্রেস রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে পুনঃপ্রবেশ না করা পর্যন্ত তিনি আসামে মুসলিম লীগের শিকড় দৃঢ়মূল করেন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলমানদের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও নির্বাচনে কংগ্রেস সেখানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয় এবং খাঁ সাহেবের নেতৃত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করে। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশের মন্ত্রীমণ্ডলের সঙ্গে তাঁর মন্ত্রীসভাও যুদ্ধে যোগদানের প্রশ্নে পদত্যাগ করে। প্রদেশের বিধান সভায় ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লীগের নাম পর্যন্ত ছিল না। তারপর সর্দার ঔরঙ্গজেব খাঁর নেতৃত্বে লীগ পরিষদীয় দল গঠিত হয়। কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলের পদত্যাগের পর তিনি কিছুসংখ্যক নির্দলীয় হিন্দু ও শিখ সদস্যদের সহযোগিতায় চারজন মুসলমান এবং একজন শিখের এক লীগ মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করেন। সীমান্ত প্রদেশেও লীগের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে যার নিদর্শন হল অতঃপর অনুষ্ঠিত চারটি উপনির্বাচনে লীগ প্রার্থীর জয়লাভ।

এমতাবস্থায় জিন্না অবশ্যই ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সঙ্গে কথা বলার অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর এই আত্মশক্তিসচেতনতার নিদর্শন ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল লীগের বাৎসরিক অধিবেশনে প্রদত্ত তাঁর সভাপতির ভাষণের অপর এক স্থলেও দেখা গিয়েছিল। কংগ্রেস ও গান্ধীর তীব্র সমালোচনা করার পর ঐ বক্তৃতায়

তিনি বলেন যে গান্ধী যদি সত্য সত্যই পাকিস্তানের ভিত্তিতে তাঁর সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় উপনীত হতে চান তবে তাঁর থেকে কেউ বেশী খুশী হবেন না। "আর তা-ই যদি মিস্টার গান্ধীর অভিলাষ হয় তাহলে আমাকে এ সম্বন্ধে সরাসরি তিনি লিখছেন না কেন ?...এদেশে সরকার যতই শক্তিশালী হোক না কেন, আমি একথা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নই যে তার এতটা সাহস হবে যে আমাকে পাঠানো এরকম চিঠি সরকার আটকে রাখবে। এজাতীয় চিঠি আমার কাছে আসতে না দেবার পরিণাম গুরুতর হবে।...তাঁর হৃদয়ের যদি কোন পরিবর্তন ঘটে থাকে...তাহলে কেবল আমাকে কয়েকটি পঙ্‌তি লেখার অপেক্ষা। তারপর আর মুসলিম লীগ পিছিয়ে থাকবে না।"[১২]

জিন্নার ঐ ঘোষণার একটু পূর্ব ইতিহাস আছে। ঐ বছরের ২৯শে জানুয়ারী গান্ধী বড়লাট লিনলিথগোকে এক পত্র লিখে আগস্ট আন্দোলন দমন করার নামে জনসাধারণের উপর অত্যাচারের রথচক্র চালাবার তীব্র প্রতিবাদ করার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই আগস্টের পরবর্তী হিংসা ও প্রতিহিংসার জন্য সরকারী প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে তাঁকে দায়ী করার প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেন। তিনি আরও বলেন যে এর প্রতিবাদে বন্দী অবস্থাতেই ৯ই ফেব্রুয়ারী জলযোগ করার পর থেকে ২রা মার্চ সকাল পর্যন্ত তিন সপ্তাহের জন্য উপবাস করবেন। ঐ চিঠিতে দেশের তখনকার রাজনৈতিক অচলাবস্থার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে সম্পূর্ণ দায়ী করার পর তিনি একথাও জানান যে সরকারের এই প্রচার মিথ্যা যে আগস্ট প্রস্তাবের মাধ্যমে কংগ্রেস স্বয়ং ক্ষমতা গ্রাস করতে চেয়েছিল। বড়লাটকে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে ঐ সময়ে কংগ্রেস জিন্না ও লীগের হাতে সব ক্ষমতা সমর্পণ করার প্রস্তাব করেছিল এবং যুদ্ধকালে প্রশাসন চালাতে কংগ্রেস লীগের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত একথাও জানিয়েছিল। যাই হোক, পুণার আগা খাঁ প্রাসাদে বন্দী অবস্থায় অনশনরত মহাত্মার সঙ্গে দেখাশুনা করার ব্যাপারে বিধিনিষেধ শিথিল করে দেওয়া হয়েছিল। রাজাজী, যিনি ইতিপূর্বেই আত্মনিয়ন্ত্রণের যুক্তিতে লীগের সঙ্গে বোঝাপড়ার শর্ত হিসাবে ভারত-বিভাজন মেনে নিয়েছিলেন, তিনি ইতিমধ্যে এই শর্তের এক ফর্মুলা রচনা করেছিলেন। অনশনরত গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করে তিনি তাঁর ফর্মুলায় গান্ধীর স্বীকৃতিও লাভ করেছিলেন। রাজাজী ফর্মুলার সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ :

"১. নিম্নে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে লীগ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবি সমর্থন করে এবং যত দিন যুদ্ধ চলবে লীগ অস্থায়ী সরকার গঠন করার ব্যাপারে কংগ্রেসের সঙ্গে

সহযোগিতা করবে।

২. যুদ্ধের অবসানে একটি কমিশন উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব ভারতবর্ষের সেই সব জেলা চিহ্নিত করবে যেখানে মুসলমানদের পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিদ্যমান। এই ভাবে চিহ্নিত এলাকাসমূহে শেষ পর্যন্ত যাবতীয় অধিবাসীদের এক গণভোট হিন্দুস্থান থেকে পৃথক হবার প্রশ্নের মীমাংসা করবে। সংখ্যাধিক্যে যদি হিন্দুস্থান থেকে পৃথক এক সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত হয় তাহলে সেই সিদ্ধান্তকে কার্যকরা করা হবে।

৩. পৃথক হওয়া স্থির হলে প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, যোগাযোগ এবং অন্যান্য জরুরী বিষয়ের ব্যবস্থা করার জন্য পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদিত হবে।"[১৩]

এর এক মাস পর রাজাজী জিন্নার সঙ্গে দেড় ঘণ্টা আলোচনা করলেও এবং তারপরও জিন্নার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ থাকলেও গান্ধীর স্বাকৃতি পাবার চোদ্দ মাস অর্থাৎ ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলের পূর্বে কিন্তু তাঁর ফর্মুলা এবং তার প্রতি গান্ধীর সমর্থনের কথা তিনি জিন্না অথবা অপর কাউকে জানাননি।

ইতিমধ্যে লীগের "ডন" পত্রিকায় জিন্নার মহাত্মাকে সরাসরি পত্র লেখার আহ্বান পড়ে বন্দী মহাত্মা ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে তাঁকে নিম্নোদ্ধৃত পত্র লেখেন:

"...আমি আপনার আমন্ত্রণকে স্বাগত জানাই। তবে চিঠির মাধ্যমে আলোচনা করার চেয়ে মুখোমুখি কথা বলার প্রস্তাব আমি দিচ্ছি। অবশ্য এ ব্যাপারে আমি আপনার হাতে।

"আমি আশা করি যে এ চিঠি আপনাকে পাঠানো হবে এবং আপনি যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত হন তাহলে সরকার আপনাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে দেবে।

"তবে একটি কথা আমি উল্লেখ করব। আপনার আমন্ত্রণে একটি 'যদি' রয়েছে বলে মনে হয়। আপনি কি এই কথা বলতে চেয়েছেন যে আমার হৃদয়ের যদি পরিবর্তন ঘটে থাকে তবেই কেবল আমি আপনাকে লিখব? ঈশ্বরই কেবল মানুষের হৃদয়ের খবর রাখেন। আমি চাইব যে আমি যেমন সেই হিসাবেই আপনি আমাকে গ্রহণ করুন।..."[১৪]

ভারত সরকার কিন্তু জিন্নার এপ্রিলের বক্তৃতার মর্যাদা রক্ষা করতে গান্ধীর চিঠি তাঁর কাছে যেতে দেয়নি। তবে তার সারমর্ম তাঁর কাছে পৌছে দেওয়া হয়েছিল। জিন্নাও অবস্থাটা মেনে নিয়ে সংবাদপত্রের এক বিবৃতিতে বলেন যে, "...মিস্টার গান্ধীর এই চিঠির তাৎপর্য হল তাঁর নিজের কারামুক্তির সহায়তায় মুসলিম লীগ যাতে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হয় তার জন্য। এটা তাঁর এক চাল ছাড়া আর কিছু নয়।"

বেলুচিস্তান সফর শেষে বোম্বেতে ফেরার পর ২৬শে জুলাই এক খাকসার (পাঞ্জাবের উগ্রপন্থী মুসলমান সংগঠন) যুবক জিন্নার উপর আক্রমণ করে। সৌভাগ্যক্রমে সামান্য আঘাত পাওয়া ছাড়া জিন্নার কোন ক্ষতি হয়নি। যুবকটির অভিযোগ যে একদা তিনি লীগপন্থী হলেও এখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে "কথা বলা ছাড়া লীগ মুসলমান বা মানব সমাজের জন্য আর কিছু করছে না।" দৈবক্রমে রক্ষা পাওয়ায় মুসলমানরা ব্যাপকভাবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন দিবস পালন করেন। অক্টোবরে লিনলিথগোর বদলে ওয়াভেল নূতন বড়লাট হন। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি হবু বড়লাট হিসাবে জিন্না সম্বন্ধে তাঁর গোপন মূল্যায়ন হল: "একথা বলা মোটেই অত্যুক্তি নয় যে জিন্নাই হলেন মুসলিম লীগ। তিনি এক অহঙ্কারী, খেলো ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ যিনি হয়ত মনে করেন যে বর্তমান সময় হিন্দুদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসার উপযুক্ত নয়।" একই গোপন নোটে গান্ধী সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন, "গান্ধী ও জিন্না উভয়েই স্বৈরতন্ত্রী।...গান্ধীর এরকম হবার কারণ নিজেকে সাধু-সন্ত হিসাবে গড়ে তোলা। আর জিন্নার এই ভূমিকার মূলে রয়েছে তাঁর দলে যোগ্যতায় তাঁর ধারে-কাছে পৌঁছানোর উপযুক্ত ব্যক্তির অভাব।"[১৫]

নভেম্বরের ১৫ই জিন্না দিল্লীতে লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সভাপতির ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন যে তাবৎ মুসলমানের জন্য লীগের দ্বার উন্মুক্ত এবং এর নেতার বিরুদ্ধে কারও কোন অভিযোগ থাকলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাঁকে অপসারিত করা যেতে পারে। ১৮ই ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় পরিষদে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বাংলার দুর্ভিক্ষের জন্য ভারত সরকারের নিন্দা করার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণকে সহায়তা দেবার জন্য ঐ প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনের প্রশংসা করেন। ডিসেম্বরে করাচীতে লীগের একত্রিশতম সাধারণ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে আবার পাকিস্তানের দাবি জানাবার সঙ্গে সঙ্গে লীগের পুনর্জীবনের জন্য আনন্দ প্রকাশ করলেন। ঐ অধিবেশনেই তিনি তিন সদস্যবিশিষ্ট (লিয়াকৎ আলী খাঁ, খলিকুজ্জমাঁ ও হাসান ইমাম) লীগের নূতন পার্লামেন্টারী বোর্ড, পাকিস্তানের শিক্ষা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনার কাঠামো রচনার জন্য নবাব ইসমাইল খাঁর সভাপতিত্বে এক কমিটি অফ অ্যাকশান গঠনের কথা ঘোষণা করলেন। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী বোম্বেতে মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের সভায় তাঁদের পাকিস্তান অর্জনের জন্য কঠোর শ্রম করার পরামর্শ দেবার সঙ্গে সঙ্গে বললেন যে, "কোন কোন হিন্দু নেতা তাঁকে ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী করার যে

প্রস্তাব দিয়েছেন” তা নেহাৎই ছলনা এবং “এসব মুসলমানদের পথভ্রষ্ট এবং বিভ্রান্ত করার জন্য” করা হচ্ছে। ঐ মাসের শেষে কেন্দ্রীয় পরিষদে ওয়াভেল তাঁর বক্তৃতায় ভারতবর্ষের “ভৌগোলিক ঐক্যে”র উপর জোর দেওয়ায় পরিষদে এবং তার বাইরে জিন্না ওয়াভেলের তীব্র সমালোচনা করে বললেন যে ক্রিপস প্রস্তাবে পাকিস্তানের যে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ছিল ওয়াভেলের বক্তব্য তার পরিপন্থী। ওয়াভেলের জিজ্ঞাসার উত্তরে অন্ততঃ দুটি প্রদেশের (মধ্যপ্রদেশ ও বিহার) ছোটলাট তাঁকে পরোক্ষ ভাবে জানালেন যে জিন্নার দাবি মেনে নেওয়া উচিত।[১৬] মধ্যপ্রদেশের ছোটলাটের মতে জিন্নার সমর্থন যুদ্ধের সময়ে না পেলে সরকারের অবস্থা শোচনীয় হত।

গান্ধীর কাছ থেকে জিন্না চিঠি পাবার প্রায় দশ মাস পর (এপ্রিল ১৯৪৪) রাজাজী দিল্লীতে জিন্নার সঙ্গে দেখা করে গান্ধীর অনুমোদনের সংবাদসহ তাঁর ফর্মূলা পেশ করলেন। জিন্না কিন্তু পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ পাকিস্তান মন্তব্য করে প্রথম আলোচনাতেই রাজাজীর ফর্মূলার প্রতি বিরূপতা ব্যক্ত করেছিলেন। তবে তার নিজের বা লীগের তরফ থেকে ঐ প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিল করার কোন সূচনা তিনি দেননি।

জুলাই-এর ১০ই রাজাজী জিন্নাকে একটি তারবার্তার মাধ্যমে জানালেন যে তিনি তাঁর কাছে উপস্থাপিত ফর্মূলা অতঃপর জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করছেন এবং জানতে চাইলেন যে তিনি কি একথা সংবাদপত্রে জানাতে পারেন যে জিন্না তাঁর ফর্মূলা অগ্রাহ্য করেছেন? জবাবে জিন্না তার করলেন যে তিনি ঐ ফর্মূলা বাতিল করেছেন বলা ঠিক নয়। তবে গান্ধী যদি স্বয়ং তাঁকে এ সম্বন্ধে লেখেন তবে তিনি তাঁর প্রস্তাব উপযুক্ত সিদ্ধান্তের জন্য লীগের সামনে রাখতে পারেন।

কস্তুরবার মৃত্যুতে শোকার্ত এবং নিজের প্রবল অসুস্থতার জন্য অত্যন্ত দুর্বল গান্ধীকে সরকার ৬ই মে বিনাশর্তে মুক্তি দিলেন। ইতিমধ্যে যুদ্ধের পরিস্থিতি মিত্রশক্তির অনুকূল হয়েছে বলে সরকার বন্দী অবস্থায় গান্ধীর মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক ছিল না। পাঁচগিনিতে স্বাস্থ্যোদ্ধাররত গান্ধী ১৭ই জুলাই তাই জিন্নাকে উভয়ের মাতৃভাষা গুজরাতীতে (জিন্নার সুবিধার জন্য উর্দু অনুবাদসহ) এক আন্তরিকতাপূর্ণ চিঠি লেখেন। চিঠির বয়ান নিম্নরূপ:

“ভাই জিন্না—এমন এক সময় ছিল যখন আমি মাতৃভাষায় কথা বলার জন্য আপনাকে প্রবুদ্ধ করতে পারতাম।[১৭] আজও তাই সাহস করে আপনাকে মাতৃভাষায় লিখছি। জেল থেকে পাঠানো আমার আমন্ত্রণ-পত্রে ইতিপূর্বেই আমি

আপনার আর আমার মধ্যে এক সাক্ষাৎকারের প্রস্তাব করেছিলাম। কারামুক্তির পর এযাবৎ আমি আপনাকে লিখতে পারিনি। আজ তাই এই চিঠি লেখার প্রেরণা অনুভব করছি। আপনার অনুকূল সময়ে আমরা যেন মিলিত হই। আমাকে ইসলাম বা ভারতীয় মুসলমানদের শত্রু বিবেচনা করবেন না। সর্বদাই আমি আপনার এবং মানবজাতির সেবক ও মিত্র। আমাকে নিরাশ করবেন না।—আপনার ভাই, গান্ধী।"[১৮]

মার্চ ও এপ্রিলে খিজির হায়াৎ খাঁকে করায়ত্ত করার ব্যর্থ প্রয়াসের[১৯] পর প্রচণ্ড পরিশ্রমজনিত ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য জিন্না তখন শ্রীনগরে ছিলেন। সেখান থেকে ২৪শে জুলাই ইংরাজীতে—তাঁর ভাষায় "একমাত্র সেই ভাষায় যাতে আমার ভুল হবার সম্ভাবনা নেই"[২০] "ভাই" রূপে সম্বোধনকারী গান্ধীকে নিম্নোক্ত প্রকারে উত্তর দিলেন :

"প্রিয় মিস্টার গান্ধী—বোম্বে ফিরে যাবার পর আমার বাড়িতে আপনাকে অভ্যর্থনা জানাতে আমি আনন্দ বোধ করব। সম্ভবতঃ আগস্টের মাঝামাঝি আমি সেখানে ফিরব। আশা করি তার মধ্যে আপনি পূর্ণরূপে স্বাস্থ্যোদ্ধারে সক্ষম হবেন এবং বোম্বে ফিরে আসতে পারবেন। দেখা না হওয়া পর্যন্ত এর অতিরিক্ত আর কিছু আমি বলছি না।"

৩০শে জুলাই জিন্না লাহোরে লীগ ওয়ার্কিং কমিটিকে গান্ধীর সঙ্গে তাঁর পত্র ব্যবহারের কথা জানিয়ে বললেন যে ঐ ফর্মূলা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার দায়িত্ব তিনি ব্যক্তিগত ভাবে নিতে পারেন না। তাঁর ওয়ার্কিং কমিটি এ ব্যাপারে গান্ধীর সঙ্গে আলোচনার জন্য তাঁকে পূর্ণ ক্ষমতা দিল।

গান্ধীর সঙ্গে তাঁর আসন্ন আলোচনার সম্পর্কে জিন্নার ৫ই আগস্টের বিবৃতি —যাতে তিনি পুনর্বার এবং সম্ভবতঃ শেষবার গান্ধীকে "মহাত্মা" বলে উল্লেখ করেন, পূর্বোক্ত অবিশ্বাসের পরিবেশের মধ্যে আশার কিঞ্চিৎ আলোকের নিদর্শন প্রকট করল। বিবৃতি প্রসঙ্গে জিন্না আন্তরিকতার সঙ্গে বললেন, "আমরা যাতে একটা বোঝাপড়ায় উপনীত হতে পারি তার জন্য আমাকে ও মহাত্মা গান্ধীকে আপনারা আশীর্বাদ করুন। তৃতীয় পক্ষের অস্তিত্ব বিদ্যমান এবং সে পক্ষও তার চেষ্টা চালিয়ে যাবে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমরা একটা বোঝাপড়ায় উপনীত হতে পারি। কারণ গান্ধীজী দুর্নীতির উর্ধ্বে এবং আমার নিজের সম্বন্ধেও একই বিশ্বাস পোষণ করি।...আমরা যাতে মিলিত হই তার জন্য সার্বত্রিক আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছে। তাই আমরা যখন অতঃপর মিলিত হতে চলেছি তখন আমাদের সহায়তা

করুন। আমরা ঘটনাপ্রবাহের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে চলেছি। অতীতকে বিস্মৃত হওয়া যাক।" সেবাগ্রামে গান্ধী বললেন, "আপনারা প্রার্থনা করুন যে ভারতবর্ষের স্বার্থে উভয়পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য একটা বোঝাপড়ায় উপনীত হবার জন্য ঈশ্বর যেন কায়েদ এ-আজম এবং আমাকে সদ্বুদ্ধির আশীর্বাদ দেন।"[২১]

জিন্নার অসুস্থতার জন্য আলোচনা আগস্টের মধ্যভাগের বদলে ৯ই সেপ্টেম্বর মাউণ্ট প্লেজেণ্ট রোডে তাঁর বাসগৃহে দেশবাসীর এক বৃহদংশের শুভেচ্ছার মধ্যে শুরু হল। বিদেশেও এ সম্বন্ধে সাগ্রহ কৌতূহল জাগ্রত হয়েছিল। ২৭শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাঁরা ১৪বার মিলিত হয়েছিলেন এবং আলোচনার বিবরণ ও প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্ন লিপিবদ্ধ করার জন্য উভয়ের মধ্যে যে ২৪টি পত্র বিনিময় হয়েছিল তার শব্দসংখ্যা ছিল ১৫ হাজারেরও বেশী। কিন্তু সে আলোচনা ব্যর্থ হল। আলোচনা মূলতঃ রাজাজী ফর্মুলাকে কেন্দ্র করে আরম্ভ হলেও লাহোর প্রস্তাবের ভাষ্য ও ব্যাখ্যা থেকে আরম্ভ করে সম্ভাব্য দেশবিভাগের তাবৎ প্রশ্ন উভয়ের মধ্যে আলোচিত হয়েছিল।

আলোচনার ব্যর্থতার কারণ: (১) জিন্নার মতে এর ফলে পাঞ্জাব ও বঙ্গের বিভাজন হবে যাতে পাকিস্তানের আয়তন হ্রাস পাবে এবং তাহলে সে পাকিস্তান হবে বিকলাঙ্গ ও কীটদষ্ট, (২) গান্ধী পাকিস্তানের পূর্ণ সার্বভৌমত্ব মানতে প্রস্তুত ছিলেন না। দেশবিভাগের দাবি তিনি স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন একই পরিবারের সদস্যদের শরিকী বিবাদ মেটাবার আশায়। তাই ১৮ই সেপ্টেম্বর সাংবাদিকদের তিনি বলেন যে এটা হল, "…দুই ভাই-এর মধ্যে বাঁটোয়ারা।… দুই ভাই যখন পৃথক হয় তখন বিশ্বের চোখে তারা পরস্পরের শত্রু হয়ে যায় না। পৃথক হবার পরও পৃথিবী তাদের ভাই বলেই মানে।" উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে পৃথক হবার এক চুক্তির মাধ্যমে প্রতিরক্ষা বা ঐজাতীয় স্বার্থবিশিষ্ট প্রশ্নের সমাধান গান্ধী চেয়েছিলেন। কিন্তু জিন্নার মতে: "একথা যখন স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে যে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান দুটি পৃথক ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে, তখন দেশরক্ষা ও ঐজাতীয় 'সাধারণ স্বার্থবিশিষ্ট' ব্যাপারের কথাই উঠতে পারে না।" (তাঁর ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের চিঠি); (৩) রাজাজীর প্রস্তাবে প্রস্তাবিত পাকিস্তান এলাকার সকল নাগরিকের অধিকাংশ গণভোটের মাধ্যমে ইচ্ছা ব্যক্ত করলেই কেবল দেশ-বিভাগ হবার কথা। জিন্না গণভোটে রাজী ছিলেন না—অন্ততঃ অমুসলমানদের তো এ অধিকার দিতে তিনি আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। অমুসলমানরা মুসলমানদের ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করার সুযোগ পাবে—এ দাবি তিনি বিবেচনার অযোগ্য মনে

করতেন।[২২] (৪) রাজাজী-গান্ধী প্রস্তাবিত ভারত-বিভাজন স্বাধীনতার পর হবার কথা। কংগ্রেস তার এতদ্‌সম্বন্ধীয় প্রতিশ্রুতি ইংরেজ চলে গেলে মানবে—এ বিশ্বাস জিন্নার ছিল না। তাই তিনি আগে দেশবিভাগ ও পরে স্বাধীনতা চাইছিলেন।

শেষ পর্যন্ত সাময়িক শুভবুদ্ধিকে নিষ্প্রভ করে সেই পুরাতন অবিশ্বাসই জয়ী হল। লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সামনে ৩০শে জুলাই জিন্না যা বলেছিলেন তার উর্ধ্বে উঠতে পারলেন না। তাঁর বক্তব্য ছিল :

"সরল দ্ব্যর্থবিহীন ভাষায় মিস্টার গান্ধী পাকিস্তানের ভিত্তিতে মুসলিম লীগের সঙ্গে হাত মেলান এবং তাহলে আমরা ভারতবাসীর স্বাধীনতার সমীপবর্তী হব। মিস্টার গান্ধী ও মিস্টার রাজাগোপালাচারী যখন একথা বলেন যে গ্রেট ব্রিটেন ভারতবর্ষকে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর এসব শর্তের কোন মূল্য হবে বা এগুলিকে কার্য-করী করা যাবে তখন তাঁরা ঘোড়ার আগে গাড়ি জোতার ব্যবস্থা করেছেন বলতে হবে। হিন্দু এবং মুসলমানরা একটা বোঝাপড়ায় উপনীত হয়ে ঐক্যবদ্ধ না হলে স্বাধীনতার কোন সম্ভাবনা নেই। উভয় সম্প্রদায়ের এজাতীয় কোন যুক্তফ্রন্ট না হলে ব্রিটেনের শাসকদের অনিচ্ছুক হাত থেকে আমাদের স্বাধীনতা কেড়ে নেবার উপায়ান্তর নেই।

"যাই হোক শেষ অবধি মিস্টার গান্ধী অন্ততঃ ব্যক্তিগতভাবে বিভাজনের মূল নীতি বা ভারতবিভাগ মেনে নিয়েছেন। ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পক্ষে এটা শুভ ও অনুকূল। এখন যা বাকী রইল তা হচ্ছে এই প্রশ্নের সমাধান করা যে কবে ও কি ভাবে এই বিভাজনকে কার্যান্বিত করা হবে। আশা করি আমি একথা স্পষ্ট করতে পেরেছি যে এর জন্য যে উপায় ও পদ্ধতি নিয়োগ করা হয়েছে তা আদৌ বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনার অনুকূল নয় এবং এর রূপও জোর করে চাপানো। কারণ এর পরিবর্তন-পরিমার্জনের কোন অবকাশ নেই। প্রস্তাবের গুণাগুণ সম্বন্ধে বক্তব্য হল—মিস্টার গান্ধী যা দিতে চাইছেন তা হল মূল বস্তুর ছায়া ও খোসা মাত্র, বিকলাঙ্গ খঞ্জ ও কীটদষ্ট পাকিস্তান।"[২৩]

গান্ধী-জিন্না আলোচনা প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছিল। তাঁর ১৫ই সেপ্টেম্বরের চিঠিতে গান্ধী দ্বিজাতি-তত্ত্ব মানতে অস্বীকার করে জানালেন, "ধর্মান্তরিত এবং তাঁদের বংশধরদের কোন গোষ্ঠী পুরাতন জাতি থেকে ভিন্ন কোন জাতির সদস্য বলে নিজেদের দাবি করছেন—এর কোন উপমা আমি ইতিহাসে খুঁজে পাই না। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ভারতবর্ষ যদি এক জাতি ছিল তাহলে তার সন্তানদের এক বৃহদংশের ধর্মপরিবর্তন সত্ত্বেও তার অদ্বিতীয় জাতীয়তা অক্ষুণ্ণ আছে।" লাহোর

প্রস্তাব সম্বন্ধে গান্ধীর বক্তব্য ছিল : "এতে সমগ্র ভারতবর্ষের ধ্বংস ছাড়া আর কিছু আমি খুঁজে পাই না।" এর জবাবে তাঁর ১৭ই সেপ্টেম্বরের চিঠিতে জিন্নার বক্তব্য হল : "আমাদের বিশ্বাস ও বক্তব্য এই যে জাতির যে কোন পরিভাষা ও মানদণ্ডে মুসলমান ও হিন্দুরা দুটি প্রধান জাতি।" কারণ তাঁর মতে মুসলমানদের "সংস্কৃতি ও সভ্যতা অপরাপরদের থেকে স্পষ্টতঃ পৃথক। তাদের ভাষা ও সাহিত্য, শিল্প ও স্থাপত্য, নাম ও নামকরণের পদ্ধতি, মূল্যবোধ ও মাত্রাজ্ঞান, আইন ও নৈতিক বিধান, আচার-প্রথা ও পঞ্জিকা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য···সবই ভিন্ন।" আর সেই জন্য তাঁরা এক পৃথক সার্বভৌম বাসভূমি পাবার অধিকারী।

তবে জিন্না সম্বন্ধে গান্ধী একথা স্বীকার করেছিলেন যে, "মুসলমান জনসাধারণের উপর আপনার অদ্বিতীয় প্রভাব আছে।" সম্ভবতঃ পূর্বোক্ত স্বীকৃতির কারণেই গান্ধী জিন্নার শর্তে, জিন্নার বাসগৃহে গিয়ে দীর্ঘদিন ঐ আলোচনা চালিয়েছিলেন। এর ফলে জিন্নার ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠা এমন বেড়ে গিয়েছিল যে এমন কি মৌলানা আজাদও এতটা নত হবার জন্য গান্ধীর সমালোচনা করেছিলেন।[২৪] হিন্দু ও শিখ সাম্প্রদায়িক তত্ত্বসমূহ তো গোড়া থেকেই এই আলোচনার বিরোধী ছিল এবং পরবর্তীকালে গান্ধী-হত্যাকারী নাথুরাম গডসে প্রমুখ হিন্দুমহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কর্মীরা সেবাগ্রাম আশ্রমে গিয়েছিলেন জিন্নার সঙ্গে মিলিত হবার ব্যাপারে তাঁকে সক্রিয়ভাবে বাধা দিতে। বলা বাহুল্য হিন্দু ও শিখ সাম্প্রদায়িক তত্ত্বের এই সরব বিরোধিতার ফলেই আবার মুসলমানদের মধ্যে এই ধারণা বৃদ্ধি পায় যে জিন্নাই তাঁদের স্বার্থের যথার্থ প্রবক্তা এবং এই মানসিকতার দূরগামী প্রভাব পরবর্তীকালে দৃষ্টিগোচর হয়।

যাই হোক, আলোচনা ভেঙে গেলেও জিন্না প্রকাশ্যে বা জনান্তিকে কোন তিক্ততার পরিচয় দিলেন না। ২৭শে সেপ্টেম্বর আলোচনা ভেঙে যাবার খবর ও তাঁর কারণ সম্বন্ধে নিজের মন্তব্যসহ এক বিবৃতিদান প্রসঙ্গে তিনি বললেন, "···দুঃখের সঙ্গে বলছি যে আমি মিস্টার গান্ধীকে স্বমতে আনার আমার কর্তব্যে ব্যর্থ হয়েছি।···তবে আশা করি যে জনসাধারণ এর জন্য তিক্ততার পরিচয় দেবেন না এবং আমরা বিশ্বাস করি যে এ আমাদের প্রয়াসের অন্তিম পরিণতি নয়।" ঐ প্রকাশ্য বিবৃতি ছাড়াও তাঁদের ঘনিষ্ঠ পারিবারিক বন্ধু কানজি দ্বারকাদাসের সঙ্গে ১৭ই অক্টোবর এ প্রসঙ্গে আলোচনার সময় অসুস্থ ও দুর্বল জিন্না মন্তব্য করেন, "এর চেয়ে ভাল কিছু দেবার মত যদি গান্ধীর কাছে না ছিল তবে কেনই বা তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন? দ্বারকাদাস প্রশ্ন করেন যে, তিনি কি মনে করেন

যে তাঁকে দোষী প্রতিপন্ন করতে এবং তাঁর বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করতে গান্ধীর ঐ প্রয়াস? জিন্না উত্তর দেন, "না না—গান্ধী আমার সঙ্গে অত্যন্ত খোলামেলা ব্যবহার করেছেন এবং আমাদের আলোচনা খুবই ভাল হয়েছিল।"[২৫]

॥ ২৪ ॥

৬ই ডিসেম্বর বড়লাটের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে জিন্না বলেন যে ভারতবর্ষ কখনই এক ছিল না এবং আপাতদৃশ্যমান ঐক্য ইংরেজের সৃষ্টি। সুতরাং তিনি আবার ভারতবিভাজনের দাবি জানান, যা মানতে ওয়াভেল অস্বীকার করেন। দিল্লী থেকে বোম্বাই গিয়ে অনাড়ম্বর ভাবে নিজ জন্মদিবস পালন করার পর প্রাদেশিক লীগের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব মেটাতে জিন্না প্রথমে করাচী ও সেখান থেকে আহমেদাবাদে যান। ১৪ই জানুয়ারী "গুজরাত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে" বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি নিজের অতুলনীয় মানসিক শক্তির ইঙ্গিত দেন: "আমাকে প্লেগের সমতুল্য মনে করা হত এবং লোকে আমাকে এড়িয়ে যেত কিন্তু আমি নিজেকে সবার উপর চাপিয়ে দিয়েছি এবং চলার পথ করে নিয়েছি। অনাহূত এবং অবাঞ্ছিত মনে করা সত্ত্বেও আমি সর্বত্র গেছি। তবে এখন অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে।"[১] পরদিবস এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, "ভারতবর্ষের ব্যাধির একমেব চিকিৎসা হল পাকিস্তান পরিকল্পনা।"[২] ১৬ই জানুয়ারী এক সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তানের দাবি সজোরে তুলে ধরে জিন্না বলেন, "ভারতবর্ষের বিভাজনের ভিত্তিতে আমরা হিন্দু জাতির (nation) সঙ্গে আলোচনায় বসতে ও একটা বোঝাপড়ায় উপনীত হতে ইচ্ছুক ও প্রস্তুত। এছাড়া অগ্রগতির অপর কোন সম্ভাবনা নেই। আমি মিস্টার গান্ধীর কাছে যাই অথবা তিনি আমার কাছে আসুন—এ ব্যাপারটা তুচ্ছ।"[৩]

ইতিমধ্যে ইউরোপে যুদ্ধের অবস্থা মিত্রশক্তির অনুকূল হয়ে আসছিল। এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূর করার জন্য কেন্দ্রীয় পরিষদে কংগ্রেসের নেতা ভুলাভাই দেশাই এবং লীগের সহকারী নেতা লিয়াকৎ আলী খাঁ ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে কেন্দ্রে কংগ্রেস-লীগের সম্মিলিত অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের জন্য এক ফর্মূলায় সহমত হন। ফর্মূলা অনুসারে ব্রিটিশ বড়লাট ও প্রধান সেনাপতিকে স্বীকার করে নিয়ে কেন্দ্রে ভারতীয়দের দ্বারা এক সরকার গঠনের প্রস্তাব করা হয় যার শতকরা ৪০ ভাগ করে সদস্য হবে কংগ্রেস ও লীগের, বাকী ২০ ভাগ শিখ, তপশীলী সম্প্রদায় ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ভিতর থেকে নেওয়া হবে বলে স্থির

করা হয়। ভুলাভাই দেশাই যদিও বড়লাটকে বলেন যে গান্ধী ও জিন্না ইতিপূর্বে এ প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন, জিন্না কিন্তু একথা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেন।[৪] যাই হোক, পরবর্তীকালে কংগ্রেস এবং লীগ—উভয় প্রতিষ্ঠানই সরকারীভাবে এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে।

মার্চে সীমান্ত প্রদেশে লীগ মন্ত্রিসভা বিধানসভায় অনাস্থা প্রস্তাবে পরাজিত হয়ে পদত্যাগ করার পর ডাঃ খাঁ সাহেবের নেতৃত্বে আবার কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হয়। অসুস্থ জিন্নার পক্ষে স্বয়ং সীমান্ত প্রদেশে গিয়ে ঘটনার গতি সামলানো সম্ভব হয়নি, যদিও নানা কারণে দুর্নীতি-অভিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী ঔরঙ্গজেব খাঁর প্রতি তাঁর খুব একটা আকর্ষণ ছিল না। যাই হোক তাঁর পাকিস্তান দিবসের (২৩শে মার্চ) বাণীতে ক্ষুব্ধ হৃদয়ের অভিব্যক্তি প্রকট হয়: "একথা বিশ্বাস করা সম্ভব নয় যে বিন্দুমাত্র আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মানবিশিষ্ট কোন মুসলমান মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে এমন এক মন্ত্রীমণ্ডলীকে স্বীকার করে নেবেন যা সেবাগ্রামে বসবাসকারী মিস্টার গান্ধীর নিয়ন্ত্রণাধীন হবে অথবা তাঁর বা মুসলিম আশা-আকাঙ্ক্ষা ও তাঁদের জাতীয় দাবির বিরোধী কংগ্রেসের কাছে আদেশ নেবে।"[৫] ইতিপূর্বে ১লা ফেব্রুয়ারীতে সৈয়দ আবদুল আজীজকে লিখিত এক পত্রে তিনি কংগ্রেসী মুসলমানদের "বিশ্বাসঘাতক" আখ্যা দেন।[৬]

মে মাসের ৭ই জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের পর ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয় এবং চার্চিলের যুদ্ধকালীন কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা ২৩শে মে পদত্যাগ করে। ৫ই জুলাই নূতন নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত চার্চিল অবশ্য এক অস্থায়ী সরকারের কর্ণধার হন। জুনের প্রথম ভাগ পর্যন্ত বিলাতে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর ওয়াভেল ভারতবর্ষের নেতাদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করার প্রয়াস শুরু করার জন্য তাঁর প্রস্তাবের অনুমোদন পান। সরকারের প্রস্তাবের মূল কথা ছিল প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে বড়লাটের শাসন পরিষদের পুনর্গঠন যাতে বর্ণ-হিন্দু ও মুসলমানদের সংখ্যাসাম্য থাকবে এবং যুদ্ধ পরিচালনা ছাড়া আর সব বিভাগ ভারতীয়দের হাতে থাকবে। প্রশাসন চলবে প্রচলিত সংবিধান অনুসারে। ১৪ই জুন ওয়াভেল এই মর্মে এক ঘোষণা করে বলেন যে ভারতীয় নেতৃবর্গ যদি মিলেমিশে শাসন পরিষদের সদস্য মনোনীত করতে পারেন তবে সর্বোত্তম। নচেৎ তাঁরা তাঁদের মনোমত নামের তালিকা দেবেন যার থেকে বড়লাট চূড়ান্ত তালিকা রচনা করবেন। আর তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে বর্তমান ব্যবস্থাই চলবে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের অতঃপর কারামুক্ত করা হয়। ঐ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি মৌলানা আজাদ ও লীগের সভাপতি জিন্নাসহ ২২টি প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বড়লাট সিমলায় ২৫শে জুন থেকে আলোচনা শুরু করবেন স্থির হয়। গান্ধীও বড়লাটের সঙ্গে আলোচনার জন্য ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, যদিও তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মেলনে যোগদান করেননি। গান্ধীর এই ভূমিকাও জিন্নার দ্বারা নিন্দিত হয়েছিল। ৩০শে জুন এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন যে গান্ধী যদি পাকিস্তানের ভিত্তি স্বীকার করে নেন তাহলে প্রস্তাবিত সিমলা সম্মেলনের কোন আবশ্যকতাই থাকবে না।

সংগঠন হিসাবে লীগ তখন অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত। এই বিবাদ প্রাদেশিক লীগে ব্যাপক এবং এমন কি কেন্দ্রে স্বয়ং জিন্নার নেতৃত্বকেও স্পর্শ করেছে। এছাড়া মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ—বঙ্গ ও সীমান্ত প্রদেশে লীগ মন্ত্রীমণ্ডলের পতন ঘটেছে। সিন্ধুতে লীগ মন্ত্রীমণ্ডল নামেমাত্র। কারণ তাতে মাঝবরাবর চিড় ধরেছে। পাঞ্জাবে কোন দিনই লীগ মন্ত্রীমণ্ডল ছিল না, যদিচ একদা স্যার সিকন্দরের সৌজন্যে লীগ ইউনিয়নিস্ট দলের সঙ্গে কোয়ালিশনে থাকার মর্যাদা পেয়েছিল। নিজের পিছনে এই সমর্থন নিয়ে জিন্না ওয়াভেল প্রস্তাবের সম্মুখীন হলেন।

উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে জিন্না বললেন যে লীগ "পাকিস্তানের মৌলিক প্রশ্নের স্বীকৃতি ব্যতিরেকে কোন সাংবিধানিক ব্যবস্থায় সম্মত হবে না।" তবে বড়লাট ও ব্রিটিশ সরকারের উপর তাঁর আস্থা আছে বলে তিনি এজাতীয় সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। অনেক আলাপ-আলোচনার পরও প্রতিনিধিরা কোন সর্বসম্মত নামের তালিকা দিতে না পারায় ২৯শে জুন বড়লাট সব দলের নেতাদের শাসন পরিষদের সদস্যপদে মনোনয়নের জন্য নিজ নিজ দলের সদস্য-তালিকা দিতে বলেন। আজাদ ও অন্যান্য অনেক নেতা এর জন্য প্রস্তুত হলেও জিন্না তাঁর ওয়ার্কিং কমিটির অনুমোদন ব্যতিরেকে এ-জাতীয় তালিকা দিতে অসম্মত হলেন। সুতরাং সম্মেলন ১৪ই জুলাই পর্যন্ত স্থগিত রাখা হল। ৮ই জুলাই বড়লাটের সঙ্গে জিন্নার দেড়ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা হয়। ওয়াভেলের বিবরণ অনুসারে জিন্না ঐসময়ে অত্যন্ত স্নায়বিক উত্তেজনার ভিতর ছিলেন এবং আমাকে একাধিকবার বললেন, 'আমি আমার শক্তি ও ধৈর্যের শেষ সীমায় উপনীত হয়েছি', তিনি একথাও বলেন, 'লীগকে ধ্বংস না করার জন্য আমি আপনাকে মিনতি জানাচ্ছি।' স্পষ্টতঃ তিনি খুবই বিপাকে পড়েছেন। তবে নিজের ঔদ্ধত্য ও আপোসবিরোধী স্বভাবের জন্য ঐ বিপত্তি প্রধানতঃ তাঁর নিজেরই সৃষ্টি। এখন তাঁর মনে এই আশঙ্কা জেগেছে যে সম্মেলনের

ব্যর্থতার জন্য তাঁকে দায়ী করা হবে। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর যাবতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করার দাবি ছাড়তে প্রস্তুত নন।

ঐ আলোচনার পরও জিন্না তাঁদের দলের সদস্য-তালিকা দিতে সম্মত না হওয়ায় বড়লাট তাঁর অনুরোধ অনুসারে ৯ই তাঁকে লিখিতভাবে এ সম্বন্ধে অনুরোধ করার সঙ্গে সঙ্গে খেদের সঙ্গে তাঁকে জানালেন যে, "আপনি আমার কাছে গ্যারান্টি চেয়েছেন যে প্রস্তাবিত নূতন শাসন পরিষদের যাবতীয় মুসলমান সদস্য বাধ্যতামূলক ভাবে লীগের প্রতিনিধি হবেন। কিন্তু আমার পক্ষে এতে রাজী হওয়া সম্ভব নয়…।" এর জবাবে জিন্না ঐদিনই ঐ পত্র সম্বন্ধে লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত তাঁকে জানালেন। সিদ্ধান্ত হল—যাবতীয় মুসলমান সদস্য কেবল লীগের তালিকা থেকেই নেওয়া লীগের এক "মূল নীতি" এবং তার পূর্তি না হওয়ায় লীগের তরফ থেকে কোন সদস্য-তালিকা পেশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখনীয়, কেবল কংগ্রেসই নয়, এমন কি ইউনিয়নিস্ট নেতা খিজির হায়াৎ খাঁও লীগের এই দাবির তীব্র বিরোধিতা করেন। বড়লাট ১১ই জুলাই আবার জিন্নার সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। কিন্তু জিন্না কেবল অনড়ই রইলেন না, আরও একটি নূতন দাবি তুললেন। এই দাবি হল, প্রস্তাবিত শাসন পরিষদে মুসলমান সদস্যরা কোন প্রস্তাবে আপত্তি করলে পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতি ব্যতিরেকে তা গৃহীত হবে না। বড়লাট জানিয়ে দিলেন যে দুই-এর কোন শর্তই তাঁর পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয় এবং এইভাবে প্রথম সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ হল।[৮]

প্রশ্ন উঠতে পারে—ওয়াভেল যখন বোঝাপড়ার জন্য এতটা উন্মুখ ছিলেন এবং লীগ ছাড়া আর সব দলই যখন তাঁর সঙ্গে সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত ছিল, তখন লীগকে বাদ দিয়ে ওয়াভেল কেন তাঁর শাসন পরিষদ পুনর্গঠন করলেন না? খলিকুজ্জমাঁর বক্তব্য যে ওয়াভেল অন্যান্য দল বা নির্দলীয় মুসলমানদের নিয়ে তাঁর শাসন পরিষদ পুনর্গঠন করতে চেয়েছিলেন এবং এ প্রস্তাবে ভারতসচিব আমেরীর মত চেয়েছিলেন। কিন্তু আমেরী এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। খলিকুজ্জমাঁর মতে, "আর দশ দিন পর লর্ড পেথিক লরেন্সকে নিজের দায়িত্বভার সমর্পণ করার পূর্বে আমার মতে এইটাই ছিল মিস্টার আমেরীর অন্যতম অন্তিম স্মরণীয় কৃতি।"[৯]

সম্মেলনের শেষদিন অর্থাৎ ১৪ই জুলাই জিন্না তাঁর বক্তৃতায় বললেন, "পাকিস্তান এবং অখণ্ড ভারত সরাসরি পরস্পরবিরোধী…। ভারতবর্ষের মুসলমানরা পাকিস্তান অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।" "১৪ই জুলাই-এর তাঁর সংবাদপত্রের বিবৃতিতে জিন্না বড়-

লাটের প্রস্তাবকে মুসলমানদের 'মৃত্যু-পরোয়ানার প্রতীক' এক 'ফাঁদ' রূপে বর্ণনা করলেন এবং যে পরিকল্পনা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার স্পষ্ট স্বীকৃতি দেয় না পুনরায় তাকে অগ্রাহ্য করলেন।" তাঁর ভীতিমূলক মানসিক পীড়া তাঁকে এই কথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্ত করে যে, "...সরকারের যাবতীয় মুসলমান সদস্য লীগের প্রতিনিধি হলেও মন্ত্রীমণ্ডলে তাঁরা সংখ্যালঘু অর্থাৎ মাত্র এক-তৃতীয়াংশ হবেন। জিন্না বলেন যে "তাবৎ সংখ্যালঘুদের" প্রতিনিধিরা "বাস্তব ক্ষেত্রে অবধারিত ভাবে...আমাদের বিরুদ্ধে...ভোট দেবেন...। তপশিলীভুক্ত জাতিসমূহ, শিখ ও খ্রীষ্টান প্রমুখ সংখ্যালঘুদের লক্ষ্য কংগ্রেসেরই অনুরূপ। তাঁদের লক্ষ্য ও আদর্শ হল—অখণ্ড ভারত। জাতিতত্ত্ব ও সংস্কৃতির দিক থেকে তাঁরা হিন্দু সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বন্ধিত।" জিন্না কংগ্রেসের (তাঁর মতে যা হিন্দুদেরও নয়, কেবল বর্ণহিন্দু-দের প্রতিষ্ঠান) বিরুদ্ধে ভারত বিভাগের দাবিকে কেন্দ্র করে যে যুক্তফ্রণ্ট গঠনের পরিকল্পনা করেছিলেন, তার সম্ভাবনা যে বিলীন হয়ে গেছে এ সত্যও তাঁর এই বিবৃতিতে উদ্ভাসিত।[১০] তবে ঐ বিবৃতিতেই "অকপটতার এক বিরল মুহূর্তে জিন্না স্বীকার করেন যে শাসন পরিষদের একজন পাঞ্জাবী ইউনিয়নিস্ট ও দুইজন কংগ্রেসী মুসলমান সদস্য মুসলিম লীগের একেবারে মূল এবং অস্তিত্বেই কুঠারাঘাত করত এবং এ হত 'আমরা যেসব আদর্শের প্রতীক তার শোচনীয় আত্মাবলুপ্তি।' 'এ হত মুসলিম লীগের মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনির সমতুল্য'।"[১১]

ভারতসচিব আমেরীর কাছে পরদিবস জিন্না সম্বন্ধে ওয়াভেল এক গোপন নোটে মন্তব্য করলেন, "...সঙ্কীর্ণচেতা ও উদ্ধত...প্রধানতঃ কংগ্রেসের প্রতি ভীতি ও অবিশ্বাস চালিত...। গান্ধীর মতই এঁর অপর পক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করার ধাত নেই।"[১২] সম্মেলন ভেঙে যাবার সম্ভাবনার সংবাদে উল্লসিত আমেরী ১১ই জুলাই বড়লাটকে জানিয়েছিলেন যে এই সম্মেলনের দৌলতে কংগ্রেস নেতাদের আর এক দফা বোঝানো সম্ভব হয়েছে যে "...আপনি বা আমি নই, মুসলিম লীগই তাঁদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে বাধক...। এবার তাঁদের হয় নীরবে পাকিস্তানকে স্বীকার করে নিতে হবে আর নচেৎ উপলব্ধি করতে হবে যে জিন্নার বদলে তাঁদের যেনতেন-প্রকারেণ মুসলিম সমর্থন লাভ করতে হবে এবং পোষমানা কংগ্রেসী মুসলমানরূপী ভ্রম উপস্থাপিত করে তাঁদের কোন লাভ হবে না।"[১৩] এর সঙ্গে সঙ্গে আমেরী ভারতবর্ষের জনমত যাচাই করার জন্য সাধারণ নির্বাচনের অনুষ্ঠান করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

একথা সত্য যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর সাংবিধানিক আলাপ-আলোচনার প্রথম

ধাপে জিন্নার দাবি স্বীকৃত হল না। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে জিন্নার অভিমতকে উপেক্ষা করে ভারতবর্ষে ক্ষমতা হস্তান্তরের কোন পরিকল্পনা কার্যকরী করা যাবে না।[১৪] অনতিবিলম্বে কেন্দ্রে ও প্রদেশসমূহে সাধারণ নির্বাচনের ফলে জিন্নার এই ভূমিকা মুসলিম-জনমতের স্বাকৃতি পেয়ে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠল।

উচ্চ পর্যায়ে সাধারণ নির্বাচনের দ্বারা ভারতের জনমত যাচাইয়ের কথা উঠলেও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অন্ততঃ দুটি প্রদেশের ছোটলাট কিন্তু সে সময়ে সাধারণ নির্বাচনের পক্ষে ছিলেন না। বাংলার রাজপ্রতিনিধি লর্ড কেসির অভিমত ছিল যে তাঁর প্রদেশের কোন মুসলমান নেতারই "পাকিস্তানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা ছিল না। শেষ অবধি তাঁরা জিন্নার উপর সব কিছু ছেড়ে দিতেন। অর্থাৎ তাঁদের বক্তব্য ছিল—জিন্না এ বিষয়ে সন্তুষ্ট যে অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে পাকিস্তান যুক্তিযুক্ত এবং তাই একথা যথার্থ।"[১৫] পাঞ্জাবের লাট গ্ল্যান্সির আশঙ্কা ছিল যে তখনকার পরিস্থিতিতে নির্বাচন একটা "ধর্মীয় ব্যাপারের নিষ্পত্তি"তে পরিণত হতে পারে এবং তাঁর প্রধানমন্ত্রী খিজির হায়াৎ খাঁরও ধারণা ছিল অনুরূপ। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট গ্ল্যান্সি ওয়াভেলকে লিখলেন যে সিমলা সম্মেলনের পর তাঁর প্রদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাসমূহে জিন্নার প্রভাব অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। "তিনি ইসলামের রক্ষাকর্তারূপে অভিনন্দিত হচ্ছেন···। আমাকে স্বাকার করতে হবে যে পরিস্থিতি দৃষ্টে আমি অত্যন্ত বিচলিত। কারণ আমার মনে হয় অন্ততঃ মুসলমানরা যে একেবারে একটা অলীক প্রশ্ন নিয়ে নির্বাচনযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন এর এক বিপজ্জনক সম্ভাবনা বিদ্যমান···। অজ্ঞান মুসলমানদের বলা হবে যে নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁদের যে প্রশ্নের জবাব দিতে হবে তা হল—আপনারা কি সাচ্চা মুসলমান, না কাফের ও বিশ্বাসঘাতক ?···পাকিস্তান যদি এক অপরিহার্য সত্য হয়, তাহলে আমরা সোজাসুজি এক ব্যাপক রক্তপাতের দিকে ধেয়ে চলেছি।"[১৬]

আসন্ন পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্বন্ধে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের সতর্কীকরণ সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ব্যস্ত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। অন্যান্য প্রদেশের ছোটলাটরা ভারতের রাজনৈতিক অবস্থাটা পরিষ্কার ভাবে বোঝার উদ্দেশ্যে সাধারণ নির্বাচনের পক্ষে তো ছিলেনই, যুদ্ধে বিজয়ী হবার পরও ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করেছিল যে ভারতবর্ষ তাদের হাতছাড়া হতে চলেছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইংলণ্ডের শতবিধ সমস্যায় বিব্রত শ্রমিক সরকার ভারতসাম্রাজ্যরূপী অতিরিক্ত হয়রানির হাঙ্গামা পোয়াতে প্রস্তুত ছিল না। নূতন ভারতসচিব লর্ড পেথিক লরেন্স ভারতের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি প্রকাশ্যে সহানুভূতিশীল ছিলেন। মন্ত্রি-

সভার ভারত বিষয়ক কমিটির অন্যতম সদস্য ক্রিপস ছিলেন তাঁর সহায়ক। অন্য দিকে ভারতবর্ষে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারকে কেন্দ্র করে জনমতই কেবল পুনরপি উদ্বেল হয়ে ওঠেনি, যে কোন আধুনিক শাসক-শক্তির শেষ ভরসা সৈন্যদলেও আনুগত্যের প্রবল অবক্ষয় পরিদৃষ্ট হয় যার জন্য প্রধান সেনাপতি অচিনলেক ২৪শে নভেম্বর এক অতি গোপন পত্রে সতর্ক করে দেন। এর তিন মাস পর (১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬ খ্রীঃ) প্রথমে বোম্বাই এবং তারপর করাচীর নৌ-সৈনিকরা প্রকাশ্য বিদ্রোহ করে। আম্বালার বিমান-বাহিনীর সৈন্যদলের ভিতরও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। এর উপর অনাবৃষ্টির জন্য দেশজোড়া খাদ্যাভাব যার কারণেও জনমানসে অশান্তি বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশ সরকার তাই ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ গণ-পরিষদের সঙ্গে এক চুক্তির দ্বারা ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা করে এবং প্রস্তাবিত গণ-পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্যে প্রথম ধাপ ছিল নির্বাচনের মাধ্যমে জনমত যাচাই করা। বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের ১৮ই সেপ্টেম্বরের এবং প্রধানমন্ত্রী এটলির পরদিবসের ঘোষণায় বলা হয় যে ভারতবাসীদের স্বশাসনের সুযোগ দেবার প্রথম চরণ হিসাবে নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে প্রধান প্রধান ভারতীয় দলসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে বড়লাটের শাসন পরিষদ গঠন করা হবে।

আসন্ন নির্বাচনকে জিন্না তাঁর লক্ষ্য পাকিস্তান প্রাপ্তির ব্যাপারে একটা জীবন-মরণের প্রশ্নরূপে গ্রহণ করে এর জন্য ব্যাপক প্রচার এবং অর্থ (তাঁর ভাষায় চাঁদির বুলেট) প্রাপ্তির কাজে কোমর বেঁধে লেগে পড়েন। বোম্বাই থেকে ৩ লক্ষ, আহমেদাবাদ থেকে ২ লক্ষ এবং এইভাবে দেশের সমস্ত এলাকা থেকে মুসলমানরা লীগের অর্থভাণ্ডারে দান করতে লাগলেন। গান্ধী এবং কংগ্রেস ও তার "সবর্ণ হিন্দু-নেতৃত্বে"র প্রতি তাঁর আক্রমণ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগল। উল-পার্টের ভাষায়, "নাগপুরে প্রকাশ্য অসম্মানের সিকি শতাব্দীর পর তিনি তাঁর যশোহানির ধূলিশয্যা ছেড়ে মৃত্যুর দ্বারদেশে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন জগতের কাছে যেন এই কথা ঘোষণা করতে যে মিস্টার গান্ধী মিস্টার জিন্নার তুলনায় কোন অংশেই শ্রেয় নন—তিনি কেবল জিন্নারই মত অপর এক "প্রমুখ জাতির" নেতা। গান্ধী ও তাঁর আচার-আচরণ সম্বন্ধে জিন্না যেন একটা আবেশের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন এবং গান্ধীর কার্যকলাপের যাবতীয় দিক জিন্নার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা ও জিজ্ঞাসার বিষয়বস্তু হয়ে উঠল।"[১৭]

জিন্নার নিম্নোদ্ধৃত বক্তৃতাংশ গান্ধীর সম্বন্ধে তাঁর মরীয়া মানসিকতার দ্যোতক। ৬ই আগস্ট তিনি বললেন, "সুবিধা মনে হলে তিনি বলেন যে তিনি কারও

প্রতিনিধি নন; তিনি ব্যক্তি হিসাবে কথা বলতে পারেন; তিনি কংগ্রেসের এমন কি চার আনার সদস্যও নন; রাজনৈতিক প্রশ্নের মীমাংসার জন্য তিনি অনশন করেন; নিজেকে শূন্যে পর্যবসিত করে তিনি নিজ অন্তরাত্মার সঙ্গে পরামর্শ করেন; তারপর যখনই আবার তাঁর পক্ষে সুবিধাজনক মনে হয় তিনি কংগ্রেসের চূড়ান্ত ডিক্টেটার হয়ে পড়েন! তিনি মনে করেন যে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিনিধি। মিস্টার গান্ধী এক হেঁয়ালি···। তাঁর সঙ্গে কিভাবে একটা বোঝা-পড়ায় উপনীত হওয়া সম্ভব?" সেই মাসের ১২ই বোম্বাই-এর এক প্রকাশ্য সভায় তিনি এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন যে কংগ্রেস "ছলে বলে কৌশলে" মুসলমানদের এক "অখিল ভারতীয় ইউনিয়নে" প্রলুব্ধ করতে চাইছে এবং তিনি অভিযোগ করলেন যে, "ব্রিটিশের দায়িত্ব পালন করার জন্য তারা (কংগ্রেস) শাসকদের বেয়নেট হাতে তুলে নিয়েছে এবং এই কারণে তারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিবিধ প্রকারের পন্থা অবলম্বন করে। কখনও তারা তোষামোদ করে, কখনও গালিগালাজ বর্ষণ করে, কখনও বা ব্রিটিশের সামনে দাস্যসুখে নতমস্তক, সময়ে আবার তাদের শাসানী দিতে ব্যস্ত···। আমরা কিন্তু এমন কোন ব্যবস্থায় রাজী হতে পারি না যা হিন্দুদের স্বাধীনতা দিয়ে 'হিন্দু-রাজ' প্রতিষ্ঠা করার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের পক্ষে দাসত্বতুল্য হয়।"[১৮] তিনদিন পর জনৈক ইংরেজ সাংবাদিক জিন্নাকে প্রশ্ন করেন যে, অন্ততঃ জনাকয়েক ভাল হিন্দুও কি নেই? এর জবাবে তিনি নাকি বলেন, 'না—নেই।' "[১৯] ১০ই অক্টোবর কোয়েটায় লীগের সভায় গান্ধীর অহিংস সত্যাগ্রহের প্রতি ব্যঙ্গভরে মন্তব্য করে বলেন, "নেতৃত্ব পাবার জন্য প্রথমে পুলিসের লাঠি বর্ষণের সম্মুখে ছাগলের মত বসে থাকা, তারপর জেলে যাওয়া এবং তারপর অভিযোগ করা যে ওজন হ্রাস পাচ্ছে এবং তারপর কায়দা করে কারামুক্ত হওয়া (উচ্চ হাস্যরোল)—আমি ও-জাতীয় সংগ্রামে বিশ্বাসী নই। তবে কষ্টবরণ করার সময় যখন আসবে তখন সর্বাগ্রে আমিই বক্ষে বুলেটের আঘাত বরণ করে নেব।"[২০] কংগ্রেসের উদ্দেশ্য মুসলমানদের "বিধিলিপি জার্মানীর ইহুদীদের মত"[২১] করা—এই জাতীয় তাঁর উক্তি ঐ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মুসলিম জনমত গঠনে সাহায্য করল। ২৭শে অক্টোবর আহমেদাবাদের এক জনসভায় তিনি এক বিচিত্র যুক্তিজাল উপস্থাপিত করলেন: "সব মুসলমানই এক অদ্বিতীয় আল্লায় বিশ্বাসী এবং সেইজন্য তারা একই জাতি (nation)। তাঁরা পাকিস্তান চেয়েছিলেন এবং তা পাবেনও। এ হল তাঁদের মন্ত্রপূতঃ কবচ, তাঁদের রক্ষামন্ত্র—যা তাঁদের শক্তি ও গৌরব বৃদ্ধি করবে···। পাকিস্তানের চন্দ্রমা কিরণ বিকীর্ণ করছে এবং আমরা

সেখানে উপনীত হবই।"[২১]

২১শে নভেম্বর এক জনসভায় জিন্না বলেন, "মিস্টার গান্ধী ও কংগ্রেস আমাদের চূর্ণ-বিচূর্ণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু আমরা এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়েছি যে এই পৃথিবীর কোন মানুষ মুসলিম লীগকে ধ্বংস করার শক্তি রাখে না।" কংগ্রেসের সম্মুখে দুটি বিকল্প তুলে ধরে তিনি বলেন, "তাঁদের হয় পাকিস্তান মেনে নিতে হবে নচেৎ মুসলমানদের পদদলিত করতে হবে। কিন্তু দশ কোটি মুসলমানকে শেষ করা যায় না।" ২৪শে পেশোয়ারের বক্তৃতায় তিনি ঘোষণা করলেন, "আমি যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন মুসলমানদের একবিন্দু রক্তও বৃথা পাত হতে দেব না। মুসলমানদের কোনমতেই আমি হিন্দুদের ক্রীতদাসে পরিণত হতে দিতে পারি না।"[২৩] জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য—"তাঁরা না জাতীয়তাবাদী, না সাচ্চা মুসলমান।" এক বিচিত্র যুক্তিজাল বিস্তার করে তাঁদের উদ্দেশ্যে জিন্না বললেন—"তাঁরা যদি সাচ্চা মুসলমান হন এবং যদি মনে করেন যে লীগের কার্যকলাপ মুসলমানদের হিতের পরিপন্থী, তবে তাঁদের লীগে যোগদান করে এই প্রতিষ্ঠানকে স্বমতে চালিত করা উচিত।"

কুশল মনোবিজ্ঞানী জিন্না ভারতীয় মুসলিম মানসিকতার দুটি দিক—হিন্দু-প্রভুত্বের ভীতি এবং ইসলামী অহমিকাবোধকে তাঁর ১৯৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনী বক্তৃতায় পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগালেন। এমন কি বড়লাট লর্ড ওয়াভেলও লক্ষ্য করেছিলেন যে "ভারতবর্ষের মুসলমান অধিবাসীদের শতকরা ৯৯ জনের মনে হিন্দু-প্রভুত্বের সম্বন্ধে যে আশঙ্কা বিদ্যমান, জিন্না তাঁদের মুখপাত্র…। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু-প্রভুত্ব ও হিন্দু-রাজত্ব সম্বন্ধে যে ব্যাপক অকৃত্রিম ভীতি তা-ই হল মিস্টার জিন্নার ভূমিকার আসল শক্তি।"[২৪]

পেশোয়ারের পূর্বোক্ত জনসভায় তিনি সুকৌশলে দুয়োরানী মানসিকতাকে কাজে লাগিয়ে বললেন, "আমাদের কোন সুহৃদ নেই…। ব্রিটিশ অথবা হিন্দু—কেউই আমাদের মিত্র নয়। আমাদের মনে এ বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা নেই যে উভয়ের বিরুদ্ধেই আমাদের লড়াই করতে হবে। (বেনে হবার জন্য) উভয়েই যদি আমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়, তবুও আমরা ভীত হব না।" অতঃপর তিনি বললেন, "ওঁরা (হিন্দুরা) প্রশ্ন করেন : 'মিস্টার জিন্না ও মুসলিম লীগ কতটা আত্মত্যাগ করেছেন ?' …আমি কিন্তু আপনাদের জিজ্ঞাসা করছি : '১৯২০-২১ খ্রীষ্টাব্দে কারা আত্মত্যাগ করেছিল ?' মিঃ গান্ধী আমাদের কঙ্কালের উপর চড়ে নেতৃত্বের সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েছেন।"[২৫] প্রায় ধূমকেতুর মত আবির্ভূত গান্ধীর জনপ্রিয়তার কারণে ভারতবর্ষের

রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের কেন্দ্রস্থল থেকে একদা অগৌরবজনক ভাবে অপসারিত জিন্নার মনের বহুদিনের সঞ্চিত জ্বালা এইভাবে ফুটে বেরোল।

বলা বাহুল্য গান্ধী, কংগ্রেস ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে এই বিদ্বেষ-বিষ ছড়ানোর একটিই মাত্র উদ্দেশ্য ছিল এবং তা হল নিজেকে মুসলমানদের একমেব স্বার্থরক্ষকরূপে তুলে ধরা ও পাকিস্তানের দাবিই যে তাঁদের কল্যাণের একমাত্র পন্থা এ সম্বন্ধে মুসলিমমানসে তীব্র আবেগ সৃষ্টি করা। পাঞ্জাব ও বঙ্গের ছোটলাটদের জিন্না ও পাকিস্তান দাবি সম্বন্ধে মূল্যায়ন ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে জিন্নার এই ভূমিকা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠল। বাহ্যতঃ স্বাস্থ্যের দোহাই দিলেও মূলতঃ সংগঠনের খুঁটিনাটির ব্যাপারে তাঁর অনীহার জন্য তিনি পূর্ব ভারতে নির্বাচন প্রচারের জন্য যাননি। প্রার্থী নির্বাচনে লীগ পার্লামেণ্টারী বোর্ডকেও তিনি বেশী সময় দেননি। লীগের এসব সংগঠনাত্মক কাজ লিয়াকৎ আলী খাঁর তত্ত্বাবধানে অন্যেরা করেন এবং প্রতিটি প্রদেশে লীগের মধ্যে প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল।[২৬] তবু লীগ ডিসেম্বরের কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচনে ৩০টির মধ্যে সব কটি এবং পরবর্তী ফেব্রুয়ারীতে প্রাদেশিক বিধানসভাসমূহের নির্বাচনে অধিকাংশ (শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ) মুসলিম আসনে বিজয়ী হয়ে জিন্নার এতদিনের দাবি—লীগই মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান—সংবিধানসম্মত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করল।

মুসলমানরা মোট যত ভোট দেন তার শতকরা ৭৫ ভাগ পায় লীগ। "বঙ্গের ১১৯টির মধ্যে ১১৩টি, পাঞ্জাবের ৮৬টির মধ্যে ৭৫টি, সিন্ধুর ৩৪টির মধ্যে ২৭টি আসন লীগ লাভ করে। হিন্দু-সংখ্যাগুরু প্রদেশসমূহেও মুসলমান নির্বাচন ক্ষেত্রসমূহে লীগের বিজয় সমপরিমাণ উল্লেখযোগ্য হয়। সংযুক্ত প্রদেশে ৬৬টির মধ্যে ৫৪টি, বিহারে ৪০টির মধ্যে ৩৪টি, উড়িষ্যার মোট ৪টি আসনের সবগুলি, মাদ্রাজেরও সবগুলি অর্থাৎ ২৯টি, মধ্যপ্রদেশের ১৪টির মধ্যে একটি বাদে সব কয়টি, বোম্বাই-এর ৩০টির মধ্যে সবগুলি এবং আসামের ৩৪টির মধ্যে ৩১টি আসনে লীগ বিজয়ী হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস যেখানে (জমিয়ৎ উলেমা দলের ২জন সহ) ২১টি আসন পায়, লীগের আসন সংখ্যা সেখানে ১৭টি হয়। মোট ৪৯২টি মুসলিম আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ পায় ৪২৫টি। আইনসভাগুলি কাজ করতে আরম্ভ করার পর ঐ আসনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়।"[২৭]

সংগঠনের দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল এবং নির্বাচনযুদ্ধের প্রধান হাতিয়ার পাকিস্তান-দাবি অস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও লীগের এই অভাবনীয় সাফল্যের কারণ

আবিষ্কারের জন্য কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। বলা বাহুল্য এর প্রধান শক্তি ছিলেন জিন্না এবং তাঁর রণকৌশল। মুসলিম জনমানসে তাঁর শক্তিশালী আবেদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ মুসলমানদের মনের হিন্দুভীতি এবং ইসলামী অহমিকাকে উস্কে দেওয়া—একথা একটু পূর্বেই বলা হয়েছে। তাছাড়া শৃঙ্খলা, নীতি-নিয়ম ও আদর্শবাদ বিরহিত এবং গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত প্রাদেশিক লীগ সংগঠনগুলি এক দিক থেকে তাঁর প্রভাব বৃদ্ধির সহায়ক হয়। ফজলুল হক্, সিকন্দর হায়াৎ খাঁ, খিজির হায়াৎ খাঁ অথবা আল্লা বক্সের মত কেউ তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে না ওঠা পর্যন্ত তিনি প্রাদেশিক লীগের যে কোন ধরনের নেতৃত্বকেই স্বীকার করে নিতেন। শর্ত কেবল একটাই—সর্বভারতীয় স্তরের নেতা হিসাবে তাঁকে বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে হবে। যিনি যে উপায়ে প্রাদেশিক লীগের ক্ষমতা করায়ত্ত করুন না কেন, বহু অভিযোগ পেলেও তাঁর বিরুদ্ধে জিন্না সাধারণতঃ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন না। শহরের ধনী ব্যবসায়ী এবং গ্রামের জমিদার-জোতদারদের নেতৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে প্রাদেশিক লীগ সংগঠনগুলি শক্তিশালী হয়। জিন্না কখনও এঁদের আর্থিক স্বার্থবিরোধী কথা বলতেন না। সমাজবাদী বা সাম্যবাদীদের ঈশ্বর ও ইসলাম বিরোধী বলে তাঁদের বক্তব্যকে বিবেচনার অযোগ্য প্রতিপাদিত করায় কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন মুসলমানদের সমর্থনে লীগ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর ব্যবধান রাখার স্বভাব এ ব্যাপারে তাঁর সহায়ক হয়েছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তির তাঁর প্রতি আনুগত্য থাকলে বড় বেশী হলে লিয়াকৎ আলী খাঁ, খলিকুজ্জমাঁ অথবা নবাব মহম্মদ ইসমাইল প্রমুখের মাধ্যমে একটা তদন্ত করিয়ে বা জোড়াতালি দিয়ে শক্তিশালী ব্যক্তির কর্তৃত্ব তিনি বজায় রেখে নিজ সংগঠনকে পুষ্ট করেছেন।

জিন্নার প্রধান লক্ষ্য নিজেকে মুসলিম স্বার্থের একমাত্র প্রবক্তা রূপে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাঁদের স্বার্থরক্ষার জন্য এক নিজস্ব বাসভূমি পাকিস্তানের দাবি। আর লীগকে সমর্থনের অর্থ পাকিস্তান প্রাপ্তি—এইটাই মুসলমান ভোটারদের অনুপ্রাণিত করে। পাকিস্তানের স্বরূপ জিন্না স্বয়ং কখনও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেননি বলে সে সম্বন্ধে তাঁর বিরূপ সমালোচনা হত। কিন্তু এটাও তাঁর এক রণকৌশল ছিল, যার কারণে তিনি অধিকাংশ মুসলমান ভোটারদের সমর্থন পান। কারণ হিন্দু-প্রভুত্বের আশঙ্কায় পীড়িত মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশের মুসলমানরা (যাঁরা লীগের প্রধান শক্তি) পাকিস্তানে তাঁদের আত্মরক্ষা ও আত্মাভিব্যক্তির সম্ভাবনা দেখলেন। সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশের মত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে যে মুসলিমরাজ বা পাকিস্তান হবে—এটা

যেন স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। পাঞ্জাব ও বঙ্গের মত যেখানে মুসলমানদের ঈষৎ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অথচ সুনির্দিষ্ট অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা বা অঞ্চল রয়েছে, সেখানে হিন্দু প্রভুত্বের ভয়কে তেমন ভাবে উস্কে দেবার সম্ভাবনা ছিল না। তাই সেখানকার মুসলমান অধিবাসীদের পাকিস্তান দাবির প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে প্রচার করা হল যে আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োজনে গণভোটের অধিকার (ভারতীয় যুক্তরাজ্যে থাকবে কি না) থাকবে কেবল মুসলমানদের এবং তাই সহজেই প্রদেশের বিভাজন ছাড়াই সমগ্র প্রদেশ পাকিস্তানভুক্ত হবে।

পাঞ্জাবের রাজনীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছোটলাট গ্ল্যান্সির মতে, মুসলমানদের জন্য উপযুক্ত রক্ষাকবচযুক্ত ভারতীয় যুক্তরাজ্য অথবা প্রদেশের বিভাজনের পর পাকিস্তান —এই দুই বিকল্প যদি পাঞ্জাবীদের সামনে থাকত তাহলে তাঁরা প্রথমোক্ত বিকল্প গ্রহণ করতেন।"[২৮] ওয়াভেলের আগ্রহ সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার সম্ভবতঃ ইচ্ছা করেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তাদের সহায়ক জিন্নার পাকিস্তান-দাবির অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রকাশ্যে কোন মন্তব্য করেনি। আসামের ছোটলাট (অ্যাণ্ড্রু ক্লো)-এর মতে, " 'পাকিস্তানের সমস্যাকে জিইয়ে রাখার ব্যাপারে' ব্রিটিশেরও 'কিছুটা অবদান আছে'।" সীমান্ত প্রদেশের ছোটলাট কানিংহামের কথা সুবিদিত। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর তিনি তদানীন্তন বড়লাটকে লেখেন, "আমাদের মুসলিম লীগপন্থীরা এখনও বেশ গোঁড়া এবং ঠিকমত প্রচারকার্য চালিয়ে আমাদের প্রভূত সাহায্য করে চলেছেন। এছাড়া অত্যন্ত সুপরিচিত অনেক মোল্লাসহ নিজ নিজ এলাকায় প্রভাবশীল এমন বহুসংখ্যক ব্যক্তি আছেন, যাঁরা আমাদের পক্ষে কাজ করছেন।"[২৯] ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে আগস্ট কানিংহাম লিনলিথগোকে লেখেন যে, "যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকেই আমরা প্রধানতঃ ইসলামী ধারায় প্রচারকার্য শুরু করে যে পটভূমিকা তৈরী করি", তাছাড়া নির্বাচনে লীগের এমন জয়লাভ "সম্ভবপর হত বলে আমার মনে হয় না"[৩০] (নিম্নরেখ বর্তমান লেখকের)। কংগ্রেস অথবা পাকিস্তান-বিরোধী অপর কোন রাজনৈতিক দলও ঐ দাবির অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে জনমত জাগ্রত করার ব্যাপক প্রয়াস করেনি।[৩১] পক্ষান্তরে নির্বাচনের প্রচারের সময় বহুক্ষেত্রে কংগ্রেস হয় সমস্যাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে[৩২] আর নচেৎ স্থানীয় স্বার্থের জন্য সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে আপোস করেছে। পাকিস্তানের বিরোধিতার ব্যাপারে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধিত অপর একটি দল—আকালী পার্টির ভূমিকাও খুব উজ্জ্বল নয়। নির্বাচনে হিন্দুমহাসভার মুসলমানবিরোধী সাম্প্রদায়িক প্রচার প্রকারান্তরে লীগের পাকিস্তান দাবিকেই শক্তিশালী করে।

১৯৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে যুদ্ধশেষে বরখাস্ত সৈনিকদের (যাদের বড় একটা অংশ ছিল মুসলমান) অসন্তোষ এবং যুদ্ধকালীন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের অনটনের জন্য সরকারী ব্যবস্থার (এর ব্যবসায়ী এবং অসামরিক সরবরাহ বিভাগের কর্মচারীদের অধিকাংশ ছিল হিন্দু) প্রতি ক্ষোভ পাঞ্জাবের শাসকদল ইউনিয়নিস্ট-দের বিপক্ষে এবং লীগের অনুকূলে যায়। এছাড়া ভারতীয় রাজনীতির সুবিধাবাদী চরিত্রও জিন্নার সহায়ক হয়। পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট পার্টি কোন সুসংগঠিত অথবা সুস্পষ্ট রাজনৈতিক বা আর্থিক কর্মসূচীভিত্তিক দল ছিল না। উভয় সম্প্রদায়ের জমিদার ও অভিজাত স্বার্থের সংরক্ষক দলের নেতা খিজির হায়াৎ খাঁ অবশ্য ব্যক্তিগত নেতৃত্বের কারণে জিন্নার বিরোধী ছিলেন। তবে তিনি এও বুঝতেন যে তাঁর নেতৃত্বের ভিত্তি দুই প্রধান সম্প্রদায়কে একসঙ্গে নিয়ে চলা। জিন্নাকে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি বলে স্বীকার না করায় সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ হবার পর মুসলমান সমাজে জিন্নার মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটে। সুতরাং বিভিন্ন দল থেকে মুসলমানদের লীগে যোগদান করার হিড়িক পড়ে যায়। ইউনিয়নিস্ট দলের উপর দলত্যাগের এই হিড়িকের পরিণাম মারাত্মক হয়। এছাড়া পাঞ্জাবের সমাজ-সংগঠনের তিন উপাদান—জমিদার, বিরাদরী (আত্মীয়-কুটুম্ব সম্বন্ধ) এবং পীর বা সাজ্জা নশীনের প্রভাবে ইউনিয়নিস্ট দুর্গ তাসের কেল্লার মত ভেঙে পড়তে থাকে। পাঞ্জাবের কংগ্রেস সভাপতি মিঞা ইফতিকারউদ্দীন, পরিষদীয় দলের ভূতপূর্ব নেতা এবং সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসের নেতা আবদুল কইয়ুম খাঁর নির্বাচনের প্রাক্কালে লীগে যোগদান এই সুবিধাবাদী রাজনীতির নমুনা। অন্যান্য দল ছেড়ে মুসলমান নেতৃবৃন্দের এই ভাবে লীগে যোগদান মুসলিম জনমতকে লীগের অনুকূল করার পক্ষে আরও সহায়ক হয়। বঙ্গেও কংগ্রেস ও কৃষকপ্রজা পার্টির যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তার থেকে বেনো জলের মত লীগে যোগদান করার ঘটনা ঘটে। তপশিলী হিন্দুদের নেতাদের একটা অংশ পদ বা অর্থের লোভে লীগের সহযাত্রী হয়ে রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি জলাঞ্জলি দেয়।

গ্ল্যান্সী বড়লাটকে জানান যে পাঞ্জাবের নির্বাচনে "ইসলাম বিপন্ন" এই ধুয়া প্রবল শক্তি। পীর এবং মোল্লা-মৌলভীদের সাম্প্রদায়িক প্রচার ও ফতোয়া তো ছিলই। ১৯৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে লীগ খোলাখুলি ভাবে ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতাকে জয়লাভের হাতিয়ার করে। ধর্মস্থান এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা লীগের সপক্ষে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন-প্রচারের কাজে ব্যবহৃত হয়। লীগের অনেক প্রচারক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে লীগকে ভোট না দিলে ভোটারের মুসলমানত্ব আর বজায় থাকবে না—তাঁদের বিবাহ অসিদ্ধ হবে, তাঁরা জাতিচ্যুত হবেন, সমবেত

নমাজে ভাগ নিতে পারবেন না এবং মৃত্যুর পর মুসলিম কবরস্থানে তাঁদের মৃতদেহের স্থান হবে না। পাঞ্জাবে (পরে দেশ বিভাগের প্রাক্কালে গণভোটের সময়ে সীমান্ত প্রদেশ ও শ্রীহট্ট জেলায়ও) মুসলমান ভোটারদের বলা হয় যে একদিকে পাকিস্তান এবং অন্যদিকে হিন্দুস্থান বা কাফেরস্থান—এ দুই-এর মধ্যে একটিকে তাঁদের বেছে নিতে হবে। জিন্না এজাতীয় প্রচারের প্রকাশ্য বিরোধিতা করেননি। দুর্ভাগ্যক্রমে ইউনিয়নিস্ট বা অন্যান্য জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক বা আর্থিক আদর্শ ও কর্মসূচীর তুলনায় ধর্মগ্রন্থ, পীর, মোল্লা, মৌলভীদের সাম্প্রদায়িক ভূমিকাকেই নিজেদের সমর্থনে বেশী করে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছিলেন। ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতাই যদি নির্বাচন বৈতরণী পারের কৌশল হয় তাহলে যাঁরা ঐ খেলায় সবচেয়ে বেশী রপ্ত তাঁদের আশ্রয় নেওয়াই মুসলিম ভোটারদের পক্ষে স্বাভাবিক।

সর্বোপরি, "······জিন্নার সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল রণে ভঙ্গ দিতে তাঁর অনিচ্ছা। নিজের বন্দুক আঁকড়ে ধরে থাকার ক্ষমতা এবং ঐ প্রক্রিয়ায় এক ধর্মযুদ্ধের সৈনিকের আত্মবিশ্বাস বুকে নিয়ে নিজের বন্দুকের নলে যেটুকু ভিজে বারুদ তা চেঁছে ফেলে দেবার শান্ত সমাহিত মানসিকতা।

"অবিশ্বাস্য স্নায়ু-শক্তিসম্পন্ন জিন্না অতঃপর দাবি জানালেন যে আগামী নির্বাচনে মুসলমানরা যদি লীগকে সমর্থন জানান তাহলে লীগের 'আর কোন রকম তথ্যানুসন্ধান অথবা গণভোট ছাড়াই বর্তমান প্রদেশগুলির ভিত্তিতে পাকিস্তান দাবি করার' অধিকার জন্মাবে।"৩৩

"নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হবার অত্যল্পকালের মধ্যে (৯-৪-১৯৪৬) লীগের আইনসভার সদস্যগণ এক সম্মেলনে মিলিত হলেন যেখানে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ যুদ্ধং দেহী মার্কা বক্তৃতা দিলেন। বোম্বাই-এর ইসমাইল চুন্দ্রীগড় বললেন যে মুসলমানরা তাঁদের দ্বারা বিজিত যে জাতির উপর ৫০০ বৎসর শাসন করেছেন তাঁদের হাতে মুসলমানদের সমর্পণ করে যাবার কোন অধিকার ব্রিটিশদের নেই। মাদ্রাজের মহম্মদ ইসমাইল ঘোষণা করলেন যে, মুসলমানরা এক জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। সৌকৎ হায়াৎ খাঁ (খিজির হায়াৎ খাঁর যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার একদা সদস্য ও পরে বরখাস্ত) বললেন যে, মুসলমানরা 'একটা সুযোগ পেলে' তাঁরা 'ব্রিটিশ সৈন্যদল ভারতবর্ষে থাকতে থাকতেই কি করতে পারে তার নমুনা দেখিয়ে দেবে।' স্যার ফিরোজ খাঁ নুন সগর্জনে ঘোষণা করলেন যে, তাঁদের যদি কোনো কেন্দ্রীয় সরকার বা হিন্দুরাজত্বের সঙ্গে যুক্ত করতে বাধ্য করা হয়

তাহলে মুসলমানরা যে ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান করবে তা চেঙ্গিজ খাঁ বা হলাকুকে লজ্জিত করবে।

"সম্মেলনে নিম্নোক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়: 'মুসলিম জাতি (nation) অবিভক্ত ভারতবর্ষের ভিত্তিতে রচিত কোন সংবিধানে কিছুতেই সম্মত হবে না এবং এতদুদ্দেশ্যে গঠিত একটিমাত্র সংবিধান রচনাকারী সংগঠনে কোনমতেই অংশগ্রহণ করবে না।' এ প্রস্তাবে দাবি জানানো হল যে উত্তর-পূর্বের বঙ্গ ও আসাম এবং উত্তর-পশ্চিমের পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান নিয়ে গঠিত অঞ্চলসমূহ···যেখানে মুসলমানরা প্রবলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাকে এক সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করা হোক এবং পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের জনগণ নিজ নিজ সংবিধান রচনা করার জন্য দুটি পৃথক গণপরিষদ গঠন করুন। এই দাবী স্বীকার করে নেওয়া এবং অনতিবিলম্বে তার রূপায়ণ কেন্দ্রে এক অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের জন্য মুসলিম লীগের সহযোগিতা পাবার ব্যাপারে অপরিহার্য পূর্ব শর্ত।"[৩৪]

এইভাবে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ কোন্ পথে যাবে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকেই তা নির্ধারিত হয়ে গেল।

॥ ২৫ ॥

পূর্বেই বলা হয়েছে যে নূতন নির্বাচন ঘোষণা প্রসঙ্গে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর ওয়াভেল বলেছিলেন যে, এর পরবর্তী পদক্ষেপ হবে "যথাসম্ভব শীঘ্র এক সংবিধান রচনাকারী প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত" এবং "এমন এক শাসন পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা যার প্রতি ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান দলের সমর্থন থাকবে"। নূতন প্রধানমন্ত্রী এটলিও পরদিবস অনুরূপ মর্মে ঘোষণা করলেন। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পথে এই দ্বিবিধ লক্ষ্যসাধনে সহায়তার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ মন্ত্রীমণ্ডলীর এক প্রতিনিধিদল বা ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণের সিদ্ধান্ত ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী পার্লামেন্টে ঘোষিত হয়। ইতিপূর্বে এক পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধিদল সরেজমিনে অবস্থা দেখে যাবার জন্য ভারত ঘুরে গেছে। তাদের সদস্য মেজর ওয়াইআট-এর কাছে ৫ই ফেব্রুয়ারী জিন্না বলেন যে সার্বভৌম প্রদেশ ও তদুপরি আসামসহ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহ নিয়ে পাকিস্তান ও বাকী অংশ নিয়ে হিন্দুস্থানের উপর সামরিক ভাবে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত এবং প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় তিনি রাজী। তবে তার সদস্য

সংখ্যায় মুসলমান ও অমুসলমান সংখ্যাসাম্য থাকবে এবং সেই কেন্দ্রীয় সরকারের কোন বিধানসভা থাকবে না।[১]

১৫ই মার্চ পার্লামেণ্টে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে এটলী বলেন, "...যত দ্রুত এবং পরিপূর্ণভাবে সম্ভব ভারতবাসীদের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে সম্ভাব্য সর্ববিধ প্রকারে সহায়তা করার উদ্দেশ্য নিয়ে আমার সহকর্মীরা ওদেশে যাচ্ছেন।" ভারতবর্ষের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল এবং গান্ধী-নেহরু প্রমুখের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত নূতন ভারতসচিব লর্ড পেথিক লরেন্সের নেতৃত্বে প্রেরিত এই প্রতিনিধিদলের অপর দুই সদস্য ছিলেন ভারতবর্ষের সমস্যা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ স্যার স্ট্রাফোর্ড ক্রিপস এবং অপর একজন মন্ত্রী স্যার এ. ভি. আলেকজেণ্ডার। প্রতিনিধি-দল ২৩শে মার্চ করাচীতে এবং পরদিবস দিল্লীতে উপনীত হলেন।

সাধারণ নির্বাচনের ফলে একথা স্পষ্ট হয়েছিল যে লীগই মুসলমানদের প্রতি-নিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান এবং ভারতের মুসলিম জনমত প্রবলভাবে পাকিস্তানের সমর্থক।[২] যদিও কেউ কেউ মনে করতেন যে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইনের সীমাবদ্ধ ভোটের অধিকারের জন্য লীগের অধিকাংশ মুসলমান আসনে বিজয়ী হওয়াকে মুসলিম জনমানসের যথার্থ প্রতিফলন বলা যায় না কিন্তু এই একই যুক্তি অন্যান্য দলের প্রতিনিধিত্বের অধিকার সম্বন্ধেও তোলা যেতে পারে। তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য এই পরিমাণে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল যে প্রাপ্তবয়স্কদের মতের ভিত্তিতে নূতন করে জনমত যাচাই করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেবার মত বিলম্ব করতে প্রস্তুত ছিল না। যাই হোক, পাকিস্তানের দাবির ভিত্তিতেই লীগ নির্বাচনে পূর্বোক্ত প্রকারে সাফল্য অর্জন করেছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সম্বন্ধে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তাঁর পূর্বোক্ত ঘোষণায় কেবল এইটুকুই উল্লেখ করলেন যে, "সংখ্যালঘুদের অধিকারাবলী সম্বন্ধে আমরা সচেতন এবং তাঁরা যেন নির্ভয়ে বসবাস করতে পারেন। অবশ্য সেই সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যাগুরুদের অগ্রগতির পথে সংখ্যালঘুদের ভেটো দেবার অধিকারও আমরা দিতে পারি না।"[৩] বলা বাহুল্য ঐ উক্তি লর্ড লিনলিথগো কর্তৃক বিশেষভাবে পুষ্ট ভেদনীতি থেকে ভিন্ন এই সত্য কূটবুদ্ধি জিন্নার দৃষ্টি এড়ায়নি। ১৬ই মার্চ এ সম্বন্ধে এক বিবৃতিদান প্রসঙ্গে তিনি নিজ অসন্তোষ ব্যক্ত করে বললেন যে, "লীগকে এড়িয়ে যাবার" যে কোন প্রচেষ্টা "চূড়ান্ত বিশ্বাসভঙ্গের" নিদর্শন হবে। ৩১শে মার্চ নিউজ ক্রনিকলের বৈদেশিক সম্পাদকের কাছে তিনি নাটকীয়ভাবে ঘোষণা করেন যে, "ভারতবর্ষ বলে কোন দেশের অস্তিত্ব নেই এবং তিনি নিজে...আদৌ ভারতীয় নন।"[৪]

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত লীগের আইনসভার সদস্যদের সম্মেলনে৪ তিনি ১৬ই মার্চের মত নূতন ব্রিটিশ নীতি সম্বন্ধে অপ্রসন্নতা ব্যক্ত করেন।

ক্যাবিনেট মিশন দিল্লী পৌঁছাবার পর থেকে ১৬ই এপ্রিল পর্যন্ত একক ও যৌথ ভাবে এবং আনুষ্ঠানিক ও ঘরোয়া ভিত্তিতে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ,[৫] দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি, বড়লাট ও তাঁর শাসন পরিষদের সদস্যবর্গ এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আলোচনা করেন। ১৮২টি বৈঠকে ৪৭২ জন ভারতীয় নেতার সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁরা ক্ষমতা হস্তান্তরের একটা সর্বজনস্বীকৃত আধার খুঁজে বার করার চেষ্টা করেন। মিশনের সঙ্গে জিন্নার আলোচনার সময়ে তার অন্যতম সদস্য আলেকজেণ্ডার তাঁর চরিত্র ও আলোচনা-পদ্ধতির যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন তা চিত্তাকর্ষক। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখনীয় যে আলেকজেণ্ডার অপর দুই মন্ত্রীর মত কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার বদলে বরং জিন্না ও লীগের প্রতি অধিক আকৃষ্ট ছিলেন। ১৬ই এপ্রিল তিনি তাঁর দিনলিপিতে লেখেন, "স্পষ্ট উত্তর এড়াবার জন্য মনের এতটা ঘোরপ্যাচের পরিচয় দিতে আমি আর কাউকে ইতিপূর্বে দেখিনি। আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে কোটি কোটি মানুষের এজাতীয় জীবন-মরণের প্রশ্ন নিয়ে তার এরকম খেলায় প্রবৃত্ত হবার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ আইনের এক আলাপ-আলোচনায় জয়া হওয়া। তাঁর কৌশল হল প্রথমেই খুব বাড়িয়ে একটা দাবি পেশ করা এবং তারপর এই ভূমিকা নেওয়া যে ঐ দাবি তিনি কমাতে পারবেন না। ইতি-মধ্যে অপর পক্ষ ঐ দাবির কতটা স্বীকৃতি দিতে এগিয়ে আসবেন তার জন্য তিনি অপেক্ষা করবেন।"[৬]

মিশন ভারতীয়দের ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে এবারে মনে মনে প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন এবং এর একটা পন্থাও তাঁরা ছকে নিয়েছিলেন। সবাইকে সে সম্বন্ধেও আভাস দেবার পর এ ব্যাপারে ভাবনা-চিন্তা করে প্রস্তুত হবার জন্য ভারতীয় নেতাদের সময় দেবার উদ্দেশ্যে ১৭ই থেকে ২০শে এপ্রিল পর্যন্ত কাশ্মীরে অবকাশ যাপন করে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করার পর আলোচনার সূত্র পুনর্বার হাতে নেন।

ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ক্যাবিনেট মিশনের ছক ছিল ত্রিসূত্রী। এ সম্বন্ধে ক্রিপস এক অত্যন্ত গোপনীয় নোট তৈরী করেছিলেন। এর প্রথম সূত্র হল ত্রিস্তরীয় "ভারতের যুক্তরাষ্ট্র" যার সদস্য হবে পৃথক পৃথক ভাবে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহ এবং দেশীয় রাজ্যসমূহ। প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্বন্ধ এবং যোগাযোগের মত সীমিত বিষয়ে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা থাকবে। দ্বিতীয় সূত্র এবং প্রথমোক্তের বিকল্প হল : "হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান নামে

ব্রিটিশভারত ভেঙে দুটি ভারতবর্ষ গড়া এবং এর যে কোন একটির সঙ্গে দেশীয় রাজ্যদের যুক্ত হবার আমন্ত্রণ জানানো।" উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের সব কয়টি জেলার জনসাধারণের ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সঠিক সীমানা নির্ধারিত হবে। যেহেতু নিছক ধর্মের ভিত্তিতে দ্বিজাতি তত্ত্বের আধারে পাকিস্তানের দাবি করা হচ্ছে, 'অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তির কথা বিবেচনা করে অমুসলমান সংখ্যা-গরিষ্ঠ এলাকাসমূহকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করা একান্তভাবে অযৌক্তিক হবে। তাছাড়া সেরকম করলে শেষ অবধি প্রস্তাবিত পাকিস্তান এলাকার ভিত্তি দুর্বল হবে। কারণ সেদেশে ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক বিপুল সংখ্যক সংখ্যালঘু থেকে যাবে।' দুই স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে কোন না কোন ধরনের চুক্তি হবে যার বলে প্রয়োজনীয় আর্থিক প্রশ্ন এবং প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও যোগাযোগের মত প্রস্তাবিত রাষ্ট্রদ্বয়ের পক্ষে অতন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাপারে তারা বিলি-ব্যবস্থা করতে পারে। 'দুয়ের কোন পরিকল্পনাই যদি সবার মোটামুটি সমর্থন না পায়…তাহলে আমাদের প্রস্তাব হল যে যে-প্রস্তাবের পক্ষে সর্বাধিক সমর্থন পাওয়া যাবে তা-ই অবিলম্বে কার্যকরী হোক।… আর এ ব্যাপারেও যদি সবার সমর্থন না পাওয়া যায় তাহলে সর্বাধিক সমর্থনপুষ্ট প্রস্তাবকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য আমরা আমাদের সব রকমের প্রভাব খাটাব।'[৭]

প্রথম দুটি বিকল্পের কোনটি সম্বন্ধেই কংগ্রেস ও লীগ একমত হতে না পারায় ক্যাবিনেট মিশন আর এক দফা নূতন প্রস্তাব রচনা করে কংগ্রেস ও লীগের তরফ থেকে সে সম্বন্ধে আলোচনার জন্য উভয় প্রতিষ্ঠানকে প্রতিনিধি মনোনীত করতে বলেন। কংগ্রেস প্রতিনিধিদলে ছিলেন সভাপতি আজাদ নিজে ছাড়া নেহরু, প্যাটেল ও বাদশা খাঁ। লীগের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি জিন্না ছাড়া লিয়াকৎ আলী খাঁ, আবদুর রব নিস্তার ও নবাব মহম্মদ ইসমাইল খাঁ। আলোচনা ৫ই মে থেকে সিমলায় আরম্ভ হল। মিশনের অনুরোধে গান্ধী পরামর্শ দেবার জন্য সে সময়ে সিমলাতে থাকতে রাজী হলেও উভয় দলের প্রতিনিধিদের সংযুক্ত আলোচনায় যোগদানে বিরত ছিলেন। আলোচনার ভিত্তি ছিল ভারত-সচিব কর্তৃক প্রেরিত মন্ত্রীমণ্ডলীর নিম্নোদ্ধৃত নূতন প্রস্তাব: "ব্রিটিশভারতের ভবিষ্যৎ সাংবিধানিক কাঠামো নিম্নরূপ হবে: এক ইউনিয়ন সরকার যার নিম্নোক্ত দায়িত্ব থাকবে—বিদেশ সংক্রান্ত বিষয়, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। প্রদেশ-গুলিকে নিয়ে দুটি গোষ্ঠী তৈরী করা হবে। এদের একটি হবে হিন্দুপ্রধান এবং অপরটি মুসলিমপ্রধান। গোষ্ঠীর সদস্য প্রদেশসমূহ যেসব বিষয়ে নিজেদের গোষ্ঠীর

হাতে সম্মিলিতভাবে বিলিব্যবস্থা করার জন্য ছেড়ে দিতে চাইবেন তা তাঁদের আওতাভুক্ত হবে। বাকী সব বিষয় প্রাদেশিক সরকারসমূহের হাতে থাকবে এবং অবশিষ্ট সার্বভৌম অধিকার থাকবে প্রদেশগুলির হাতে।"

সিমলার ত্রিপক্ষীয় আলোচনার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেও কংগ্রেস ও লীগ—উভয় দলই আলোচনার পূর্বোক্ত ভিত্তি অস্বীকার করে। কংগ্রেসের আপত্তি ছিল ধর্মের ভিত্তিতে প্রদেশসমূহকে গোষ্ঠীবদ্ধ করাতে এবং লীগের বক্তব্য ছিল এই যে প্রস্তাবে স্বাধীন মুসলিম বাসভূমির সম্ভাবনা নেই। যাই হোক, আলোচনা তবুও হল এবং জিন্না কর্তৃক আজাদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক করমর্দনে সম্মত না হওয়ার ঘটনা ছাড়া মোটামুটি ভাল ভাবেই চলল। এর মধ্যে জওহরলাল ও জিন্না পৃথক ভাবে মিলিত হলেন। এর পটভূমিকা হল, কংগ্রেস ও লীগের দ্বিপাক্ষিক আলোচনার প্রস্তাবের উত্তরে জিন্না বলেছিলেন যে তিনি কংগ্রেসের কোন হিন্দু প্রতিনিধির সঙ্গে সানন্দে মিলিত হতে প্রস্তুত। তবু শেষ পর্যন্ত কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হল না। কারণ কংগ্রেস ও লীগের ভূমিকায় মৌলিক পার্থক্য ছিল। লীগ যেখানে দ্বিজাতি তত্ত্বকে আঁকড়ে আছে, কংগ্রেস সেখানে এক জাতি এবং তাই এককেন্দ্রীক সংবিধান ও শাসন ব্যবস্থার উপর জোর দিচ্ছে। অবশেষে লীগ ও কংগ্রেস তাদের পৃথক পৃথক বিকল্প পেশ করল।

লীগের প্রস্তাব ছিল নিম্নরূপ :

১. মুসলিম প্রদেশ ছটি (পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, বেলুচিস্তান, সিন্ধু, বঙ্গ ও আসাম) একত্র করে একটি[৮] গোষ্ঠীভুক্ত করতে হবে। বিদেশ সংক্রান্ত বিষয়, প্রতিরক্ষা এবং প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়া আর যেসব বিষয়ের দায়িত্ব পাকিস্তান গোষ্ঠী এবং হিন্দু প্রদেশগুলির সংবিধান রচনাকারী সংগঠনসমূহের নেবার কথা, তা এই প্রস্তাবিত গোষ্ঠীরও কার্যপরিধির মধ্যে পড়বে।

২. ছটি মুসলিম প্রদেশের জন্য পৃথক একটি সংবিধান রচনাকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করতে হবে।

৩. কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদ এবং যদি কোন আইনসভা থাকে সেখানেও উভয় প্রদেশ-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের সংখ্যাসাম্য থাকবে।

৪. কোন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত প্রদেশের নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বাইরে যাবার অধিকার থাকবে যদি অবশ্য সেই প্রদেশের অধিবাসীরা রেফারেণ্ডাম বা গণভোটের মাধ্যমে সেরকম ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।

৫. পূর্বোক্ত দুই সংবিধান-সভা স্থির করবে যে কেন্দ্রে কোন আইনসভা

থাকবে কি না। কেন্দ্রকে রাজস্ব দেবার জন্য কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে তাও তুই সংবিধান-সভা স্থির করবে। তবে কোনক্রমেই কেন্দ্রকে কর ধার্য করার অধিকার দেওয়া হবে না।

৬. উভয় সম্প্রদায়ের অধিকাংশের স্বীকৃতি ছাড়া কোন গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রদায়িক বিষয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে না।

৭. আইন রচনা, প্রশাসনীয় বা শাসন সংক্রান্ত কোন বিবাদ-সম্পর্কিত বিষয়ে কেন্দ্র তিন-চতুর্থাংশের বহুমত ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত নেবে না।

৮. গোষ্ঠী এবং প্রাদেশিক সংবিধানসমূহে ধর্ম সংস্কৃতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে রক্ষাকবচের ব্যবস্থা থাকবে।

৯. দশ বৎসর কাল ব্যয়িত হয়ে যাবার পর কোন প্রদেশের কেন্দ্র থেকে পৃথক হয়ে যাবার অধিকার থাকবে।[৯]

লাহোর প্রস্তাবের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে যে তার সঙ্গে লীগের পূর্বোক্ত প্রস্তাবের মৌলিক পার্থক্য ছিল। লাহোর প্রস্তাব এবং লীগ আইনসভা সদস্যদের ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই থেকে ৯ই এপ্রিলের সম্মেলনে তার যে সংশোধন করা হয় তাতে স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু লীগের ১২ই মে তারিখের পূর্বোক্ত প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় আইনসভার পরিকল্পনা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। এ ব্যাপারে লীগ ও কংগ্রেসের ভূমিকার মধ্যে যে পার্থক্য তা কেবল পরিমাণগত, গুণগত নয়। লীগ যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারকে তিনটি মাত্র বিষয়ের উপর কর্তৃত্ব দিতে প্রস্তুত, সেখানে কংগ্রেসের বক্তব্য হল—এ-জাতীয় ফেডারেল সরকার সাধারণতঃ যেসব ক্ষমতা পেয়ে থাকে তার সবগুলিই প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় সরকারের থাকবে।

লীগের এই স্পষ্ট প্রতীয়মান পরিবর্তিত ভূমিকার পিছনে জিন্নার বিশেষ অবদান ছিল। ভারত ও পাঞ্জাব-বঙ্গের বিভাজনের সম্ভাব্য সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তাঁর এই অপেক্ষাকৃত নমনীয় ভূমিকা কি না—সেই বিতর্কে প্রবৃত্ত না হয়েও বলা চলে যে এর কারণে লীগ-নেতৃত্বের একাংশের তরফ থেকে তাঁর উপর চাপ পড়ছিল। ওয়াভেলের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে ৯ই মে জিন্না বলেন যে তিনি, "যুক্তিনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছেন।" তবে "তাঁর সমর্থকরা ইতিমধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা শুরু করেছেন যে তিনি" "যে কোন রকমের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাব মেনে নিয়ে" "নতি স্বীকার করেছেন"। জিন্নার মতে, "এ একটা বিরাট সুবিধা করে দেওয়া।"[১০] এ প্রসঙ্গে একথাও স্মরণীয় যে সিমলা আলোচনার সময়ে ওয়াভেল লক্ষ্য

করেছিলেন যে জিন্নার ভিতর "...কংগ্রেস ও তার যাবতীয় কার্যকলাপের প্রতি গভীর অবিশ্বাস বিদ্যমান। কংগ্রেস যে মুসলমানদের বিভক্ত করতে চায় এবং হিন্দু-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠাভিলাষী—এ কথা জিন্না পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাস করতেন।"[১১] ১৩ই মে ওয়াভেলের সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকার সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গেও কংগ্রেস সম্পর্কে এজাতীয় আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেন। ওয়াভেলের বর্ণনা অনুসারে সে সময়ে তাঁকে "ক্লান্ত ও অসুস্থ দেখাচ্ছিল" এবং "তাঁর মনে এই ভয় ক্রিয়া করছিল যে কংগ্রেসের পরিকল্পনা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব হাতে নেওয়া...এবং তারপর প্রদেশগুলির ক্ষমতা হস্তগত করার জন্য শক্তি সংহত করা।"[১২]

ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতি সম্বন্ধে কংগ্রেস ও লীগের একমত হতে না পারায় মিশন ১৬ই মে তার প্রস্তাব ঘোষণা করল। মিশনের এতদসংক্রান্ত বিবৃতিতে তাঁদের ভারতবর্ষে উপস্থিতির পটভূমিকা থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য একটা সর্বজনগ্রাহ্য সূত্র উদ্ভাবনের জন্য তাদের দ্বারা যেসব প্রয়াস করা হয়েছে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে উল্লেখ করে বলা হয় যে যেহেতু ভারতবর্ষের মুসলমানদের মনে প্রবল হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা ন্যায়সঙ্গত আশঙ্কা আছে, তাই তাঁরা ভারতবিভাজন বা পাকিস্তান দাবির প্রশ্নটি খুঁটিয়ে বিচার করেও তা অনুমোদন করতে পারেননি। কারণ প্রস্তাবিত এলাকায় যথেষ্ট মাত্রায় অমুসলমান থাকবেন (উত্তর-পশ্চিম এলাকায় ৩৭·৯৩% এবং উত্তর-পূর্বে ৪৮·৩৯%)। সুতরাং তাঁদের মতে "...মুসলিম লীগের দাবি অনুসারে পাকিস্তান নামক পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দ্বারা সাম্প্রদায়িক সংখ্যালঘুদের সমস্যার সমাধান হবে না। তাছাড়া সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রে পাঞ্জাব, বাংলা ও আসামের যেসব জেলার অধিবাসী প্রধানতঃ অমুসলমান তাদের যুক্ত করার কোন যৌক্তিকতা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। পাকিস্তানের পক্ষে যেসব যুক্তি প্রদর্শন করা হয়ে থাকে আমাদের মতে তার প্রতিটি অমুসলমান এলাকাসমূহকে পাকিস্তানের বাইরে রাখার সপক্ষে প্রয়োগ করা যায়। এই বিষয়টি বিশেষ করে শিখদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।"

অমুসলমান এলাকাগুলি প্রস্তাবিত অঞ্চল থেকে পৃথক করে এক ক্ষুদ্রায়তন সার্বভৌম পাকিস্তানের প্রস্তাবও তাঁরা বাতিল করলেন। কারণ পাঞ্জাব ও বাংলার বিভাজন প্রদেশদ্বয়ের জনসাধারণের একটা বড় অংশের ইচ্ছা ও স্বার্থের পরিপন্থী হবে বলে তাঁদের ধারণা। দুটি প্রদেশের নিজস্ব ভাষা রয়েছে এবং তাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যও সুপ্রাচীন। এছাড়া এর বিরুদ্ধে "জোরালো প্রশাসনিক, আর্থিক ও সামরিক কারণও" বিদ্যমান। আর "শেষ অবধি এই ভৌগোলিক

বাস্তবতাও রয়েছে যে প্রস্তাবিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের অংশদ্বয় প্রায় সাত শত মাইল দূরত্ব দ্বারা খণ্ডিত এবং শান্তিকাল বা যুদ্ধরত অবস্থায় উভয় অংশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা হিন্দুস্থানের উপর নির্ভরশীল হবে।"

অনুরূপ ভাবে তাঁরা কংগ্রেসের পরিকল্পনা, "...যার অধীনে বৈদেশিক ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগের মত সীমিত সংখ্যক বিষয়ের অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত করা ছাড়া প্রদেশসমূহকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেবার কথা বলা হয়েছে" এবং যাতে কোন প্রদেশ "ব্যাপক ভাবে আর্থিক ও প্রশাসনিক পরিকল্পনার সুযোগ নিতে ইচ্ছুক হলে তাকে বাধ্যতামূলক বিষয়সমূহ ছাড়া ঐচ্ছিক ভাবে অন্যান্য বিষয়ের দায়িত্বও কেন্দ্রের হাতে সমর্পণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে" তাও অগ্রহণীয় বলে ঘোষণা করলেন। কারণ দুই ধরনের প্রদেশ (একদল কেন্দ্রকে অধিক ক্ষমতা দিতে ইচ্ছুক, অন্য দল নয়) নিয়ে কাজ করতে গেলে কেন্দ্রে শাসনতান্ত্রিক সংকট দেখা দেবার আশঙ্কা। তাছাড়া কোন কোন প্রদেশ যদি সাধারণ স্বার্থে গোষ্ঠীবদ্ধ হতে চায় তাতে বাধা দেওয়াও উচিত নয়।

তাঁরা তাই ঘোষণার ১৫নং অনুচ্ছেদে প্রস্তাব করলেন :

"১. ভারতবর্ষে এক কেন্দ্রীয় (ইউনিয়ন) শাসন-সংগঠন থাকবে যার অন্তর্ভুক্ত হবে ব্রিটিশভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহ। তার অধীনে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ থাকবে : বৈদেশিক ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং এই সব দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কর হিসাবে ওঠানোর অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের থাকবে।

২. কেন্দ্রের প্রশাসন এবং আইন প্রণয়ন—উভয় বিভাগই থাকবে যাতে প্রতিনিধিত্ব করবে ব্রিটিশভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহ। আইনসভায় গুরুত্বপূর্ণ কোন সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে হলে উপস্থিত এবং মতদানে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের বহুমত ছাড়াও দুটি প্রধান সম্প্রদায়ের সদস্যবর্গের প্রতিটির সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন প্রয়োজন হবে।

৩. কেন্দ্রের আওতাভুক্ত বিষয়াবলী ছাড়া আর সব বিষয় এবং অবশিষ্ট (রেসি-ডিউয়ারি) ক্ষমতা প্রদেশগুলির উপর বর্তাবে।

৪. কেন্দ্রকে যে সব ক্ষমতা দেওয়া হবে তা ছাড়া আর সব ক্ষমতা দেশীয় রাজ্যগুলিতে ন্যস্ত থাকবে।

৫. প্রদেশগুলির নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠী (গ্রুপ) গঠনের অধিকার থাকবে এবং এজাতীয় প্রদেশগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র প্রশাসন-ব্যবস্থা ও আইনসভাও থাকবে। কোন্

কোন্ প্রাদেশিক বিষয় কোন্ প্রদেশগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হবে তা স্থির করবে সেই গোষ্ঠী।

৬. কেন্দ্র ও প্রদেশগোষ্ঠীর সংবিধানে এই ব্যবস্থা থাকবে যে প্রথম দশ বছর পর এবং তারপর প্রতি দশ বছর অন্তর বিশেষভাবে আহূত বিধানসভার সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠদের সমর্থনে যে কোন প্রদেশ সংবিধানের শর্তাবলীর পুনর্বিচার করতে পারবে।"

ভবিষ্যৎ গণপরিষদ গঠন করার প্রক্রিয়া ও তার আসনসংখ্যা ইত্যাদির কথা জানাবার পর অতঃপর ঐ ঘোষণায় বলা হয় যে "সাধারণ" ও মুসলমান—এই দুই সম্প্রদায়ের (পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে এতদতিরিক্ত শিখ) প্রতিনিধি গণপরিষদে থাকবেন। সদস্য নির্বাচন এবং ভবিষ্যৎ প্রশাসনের ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির মাঝখানে তিনটি প্রদেশগোষ্ঠী থাকবে (অনুচ্ছেদ সংখ্যা ১৯)। মাদ্রাজ, বোম্বাই সংযুক্ত প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হবে "ক" প্রদেশগোষ্ঠী। অনুরূপ ভাবে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ও সিন্ধু হবে "খ" গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। বঙ্গদেশ ও আসাম নিয়ে হবে "গ" প্রদেশগোষ্ঠী। ব্রিটিশভারতের ২৯২ জন সদস্যের সঙ্গে দেশীয় রাজ্যসমূহের অনধিক ৯৩ জন সদস্য যুক্ত হয়ে গণপরিষদ সম্পূর্ণ হবে।

গণপরিষদের কার্যপদ্ধতি বর্ণনা প্রসঙ্গে ঐ ১৯নং অনুচ্ছেদে বলা হল :

"এইভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যথাসম্ভব সত্বর নূতন দিল্লীতে মিলিত হবেন। একটি প্রাথমিক সভার অনুষ্ঠান হবে।…অতঃপর প্রতিনিধিরা প্রদেশের ভিত্তিতে "ক", "খ" ও "গ" গোষ্ঠীতে বিভক্ত হবেন।…এই বিভাগগুলি নিজেদের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি প্রদেশের সংবিধান রচনার ব্যবস্থা করবে এবং সেইসব প্রদেশের জন্য কোন গোষ্ঠীগত সংবিধান রচনা করা হবে কিনা ও হলে গোষ্ঠী কোন্ কোন্ প্রাদেশিক বিষয় নিজের হাতে নেবে তাও তারা স্থির করবে। প্রদেশগুলির গোষ্ঠীর বাইরে থাকারও ক্ষমতা থাকবে।…নূতন সাংবিধানিক ব্যবস্থা কার্যকরী হবার পর তাকে যে প্রদেশগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার বাইরে চলে আসার অধিকার যে কোন প্রদেশের থাকবে। নূতন সংবিধান অনুসারে প্রথম সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে যাবার পর নব নির্বাচিত আইনসভা এজাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।"

গণপরিষদ গঠন করে তার মাধ্যমে পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনা করার দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা হিসাবে (অনুচ্ছেদ সংখ্যা ২৩) বড়লাটের উদ্যোগে দেশে এক অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রস্তাব করা হল "…যাতে যুদ্ধের ভারপ্রাপ্ত সদস্যসহ যাবতীয় দপ্তরের দায়িত্ব জনসাধারণের পূর্ণ

আস্থাভাজন ভারতীয় নেতাদের হাতে থাকবে।" এই প্রসঙ্গে একথাও জানানো হল যে বড়লাট ইতিমধ্যে বিভিন্ন দলের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করে দিয়েছেন।

ক্যাবিনেট মিশনের ১৬ই মে তারিখের ঘোষণার এত দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেবার কারণ হল—এইটাই অবিভক্ত রূপে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির শেষ প্রয়াস। এর অপর এক বৈশিষ্ট্য, যা সহজেই দৃষ্টিগোচর তা হল, সীমাবদ্ধ ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্র ও অবশিষ্ট (রেসিডিউয়াল) ক্ষমতার আকর প্রদেশের মাঝখানে মুসলমান ও অমুসলমানের ভিত্তিতে তিনটি প্রদেশগোষ্ঠী গঠন করে অবিভক্ত ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের পরস্পর-বিরোধী দাবির মধ্যে একটি আপোস রফার প্রচেষ্টা। অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ আসামকে বাংলার সঙ্গে "গ" গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা অথবা কংগ্রেস শাসিত সীমান্ত প্রদেশকে পাঞ্জাব ও সিন্ধুর সঙ্গে "খ" গোষ্ঠীতে দেবার প্রস্তাব লীগকে সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা গ্রহণে রাজী করাবার উদ্দীপক বলে মনে হয়। সম্ভবতঃ এই কারণেই ১৬ই মে-এর ঘোষণার ভাষাতেও গুরুতর স্ববিরোধ ছিল। পঞ্চদশ অনুচ্ছেদের পঞ্চম ছত্রে যেখানে বলা হয়েছে যে "প্রদেশগুলির গোষ্ঠী গঠনের স্বাধীনতা থাকবে" ইত্যাদি, উনবিংশতম অনুচ্ছেদে সেখানে নূতন সংবিধান চালু না হওয়া পর্যন্ত প্রদেশগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রদেশগুলির পক্ষে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

১৭ই মে মিশনের নেতা পেথিক লরেন্স এই প্রস্তাব সম্বন্ধে দিল্লী থেকে এক বেতার-ভাষণে অন্যান্য বক্তব্যের সঙ্গে বললেন, "নূতন সংবিধান অনুসারে প্রথম নির্বাচন হবার পর প্রদেশগুলিকে অস্থায়ী ভাবে যে প্রদেশগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার থেকে বেরিয়ে আসার স্বাধীনতা থাকবে।"[১৩] ১৭ই এক সাংবাদিক সম্মেলনে ক্রিপস এবং পরদিবস পেথিক লরেন্স প্রদেশগুলির প্রথমে নির্ধারিত প্রদেশ-গোষ্ঠীর অঙ্গীভূত হবার বাধ্যবাধকতা এবং পরবর্তীকালে বেরিয়ে যাবার অধিকারের কথা ব্যক্ত করেন।[১৪]

ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে প্রায় দেড় মাসের আলাপ-আলোচনায় জিন্নাকে বিগত ছ বৎসরে অনুসৃত তাঁর কৌশল—পাকিস্তানের স্বরূপ ইচ্ছা করে অস্পষ্ট রাখা ত্যাগ করতে বাধ্য হতে হয়। মুসলমানদের স্বতন্ত্র বাসভূমি হিসাবে সার্বভৌম পাকিস্তানের সীমারেখা যে বর্তমানের পাকিস্তান ও বাংলাদেশের এলাকার অতিরিক্ত অপর কোন অঞ্চল হবে না এবং এর ফলে পাঞ্জাব ও বঙ্গের বিভাজন অনিবার্য একথা আলো-চনা প্রসঙ্গে তাঁর এবং অন্যান্য অনেকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১১ই এপ্রিল ব্রিটিশ

মন্ত্রীমণ্ডল নীতিগত ভাবে একথা স্বীকার করে নিয়েছিল যে যুযুধান পক্ষদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের বদলে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এ কাজ নিষ্পন্ন করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে ভারত বিভাজন করেও ইংরেজ এ দেশ ত্যাগ করবে। মিশনের তাই জিন্নাকে তাঁর পাকিস্তান দাবির যথার্থ স্বরূপ বুঝিয়ে দিতে অসুবিধা হয়নি। সম্পূর্ণ পাঞ্জাব ও বঙ্গের প্রস্তাবিত পাকিস্তানে আসার সম্ভাবনা নেই—এই সত্য পাকিস্তানপ্রেমী অনেকের এবং বিশেষ করে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহের মুসলিম নেতাদের মোহভঙ্গের কারণ হয়। তাছাড়া সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদের মধ্যে পাঞ্জাবী মুসলমানদের প্রতি অবিশ্বাস তো ছিলই, সিন্ধুর পাকিস্তান-সমর্থকরাও পাঞ্জাবীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পাকিস্তান গঠনের বদলে স্বতন্ত্র থাকাই অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করতেন।[১৫]

এর উপর মিশন তার ঘোষণার ভূমিকাতেই সার্বভৌম পাকিস্তানের দাবিকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নস্যাৎ করে দিয়েছিল। ব্যাপারটা কেবল জিন্নার পক্ষেই আশাভঙ্গের কারণ ঘটায়নি, পাকিস্তানপ্রেমী তাঁর অনেক সমর্থকদের কাছেও মানসিক আঘাতের কারণ হয়েছিল। এঁদের মধ্যে মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশগুলির মুসলিম নেতারা ছাড়াও মুসলমান ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের নেতারাও ছিলেন, যাঁদের কাছে হিন্দু-প্রভাব-মুক্ত পাকিস্তান তাঁদের ব্যবসায়ী স্বার্থের স্বর্গরাজ্য হবার কথা। ইতিপূর্বে জিন্নার উপর তাঁর অনুগামীদের তরফ থেকে চাপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মিশনের ঘোষণার পর তাঁর উপর এই চাপ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেল।[১৬]

মিশনের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে জিন্না তাই আভাস দিয়েছিলেন যে "খণ্ডিত ও কাটছাঁট" পাকিস্তানের বদলে বৃহদায়তন পাকিস্তান এক সীমিত ক্ষমতাবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় ফেডারেল সরকারের সঙ্গে যুক্ত থাকবে।[১৭] সুতরাং মিশনের ঘোষণা সম্বন্ধে সত্বর সিদ্ধান্ত নেবার জন্য বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত লীগ কাউন্সিলের সম্মুখীন হবার বদলে তিনি সময় নেবার পদ্ধতি গ্রহণ করলেন। প্রত্যুতঃ ক্রিপস প্রস্তাবের সময় থেকেই তাঁর কৌশল ছিল পূর্বাহ্নে সে সম্বন্ধে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত জেনে নিয়ে অতঃপর নিজের পদক্ষেপ স্থির করা। এবারে কিন্তু সে সুযোগ তিনি পাচ্ছিলেন না। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ২৪শে মে তারিখের প্রস্তাবে ক্যাবিনেট মিশনের ঘোষণাকে সরাসরি নাকচ করে এ সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত না নিয়ে কেবল ঐ প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছিল। এদিকে প্রদেশসমূহের বাধ্যতামূলক গোষ্ঠীভুক্তকরণ, "খ" ও "গ" গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসাবে কেন্দ্রীয় ফেডারেশনে যোগ দিলে ফেডারেল মন্ত্রীমণ্ডল ও আইনসভায় সংখ্যাসাম্যের সম্ভাবনা[১৮] (যার

মৌখিক আশ্বাস জিন্না পেয়েছিলেন) এবং ফেডারেশনের কারণে মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশসমূহে মুসলমানদের স্বার্থের সংরক্ষক হবার সম্ভাবনা ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁর পাকিস্তানের মূলতত্ত্ব স্বীকৃত হলেও[১৯] মিশনের ঘোষণায় জিন্নার বহু প্রকাশ্য দাবি নাকচ করা হয়েছিল। তিনি কেন্দ্রে সংখ্যাসাম্য চেয়েছিলেন ঠিকই, তবে কেন্দ্রে কোন আইনসভা থাকুক অথবা কেন্দ্রের হাতে নিজ ব্যয়নির্বাহের জন্য রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার দেওয়া হোক—এ তিনি চান নি। তাঁর অপর এক দাবি ছিল যে যে-কোন "বিতর্কমূলক" বিষয়ে কেন্দ্র সিদ্ধান্ত নিতে পারবে তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে। যেখানে তিনি দাবি করেছিলেন যে কেন্দ্রকে প্রদত্ত সীমাবদ্ধ অধিকার ছাড়া অপর সব বিষয়ে দেশীয় রাজ্যসমূহ ও প্রদেশগুলি সার্বভৌম থাকবে, মিশনের ঘোষণায় সেখানে বলা হল যে প্রদেশগুলির কেবল অবশিষ্ট (রেসিডিউয়াল) ক্ষমতা থাকবে। বছরের গোড়ায় লীগের আইনসভা সদস্যদের সভায় স্থিরীকৃত মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহের একটি মাত্র প্রশাসনিক একক্-এর বদলে মিশনের ঘোষণায় দুটি প্রদেশগোষ্ঠীর ব্যবস্থা ছিল। মিশন প্রস্তাব করেছিল যে নূতন সংবিধান চালু হবার দশ বছর পর যে-কোন প্রদেশের গোষ্ঠীর বাইরে যাবার অধিকার বর্তাবে। কিন্তু জিন্নার দাবি অনুসারে প্রদেশগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের অধিকার ছিল না। আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের প্রথার জন্য প্রস্তাবিত গণপরিষদে মুসলিম আসনের সংখ্যার অধিকতর সুবিধা (weightage) পাবার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়েছিল।

মিশনের প্রস্তাবের প্রতিকূলতা, লীগের সহকর্মীদের কাছ থেকে বিরোধ এবং কংগ্রেসের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না গ্রহণজনিত অনিশ্চয়তার মধ্যে চৌঠা জুন জিন্না ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব গ্রহণে প্রভাবিত করার জন্য তাঁর ওয়ার্কিং কমিটি ও তার পরই লীগ কাউন্সিলের সম্মুখীন হলেন। বাহ্যতঃ তাঁর প্রধান সহায় মিশনের তরফ থেকে বড়লাটের এই মর্মে ব্যক্তিগত আশ্বাস যে "উভয় পক্ষের কারও প্রতি আচরণে আমরা কোন পক্ষপাত করতে চাই না···।" সমালোচক লীগ নেতৃবৃন্দকে তিনি বললেন যে, "আমি আপনাদের বলতে চাই যে পূর্ণ সার্বভৌম পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ছাড়া মুসলিম-ভারত তৃপ্ত হবে না···। এ এক বিরাট ও একটানা সংগ্রাম। প্রথম লড়াই ছিল লীগের প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রের স্বীকৃতিলাভ। সে লড়াই মুসলমানেরা শুরু করেছিল এবং তাতে বিজয়ীও হয়েছে। মিশনের প্রস্তাব স্বীকার করে নেওয়া তাদের পাকিস্তানের জন্য সংগ্রামের সমাপ্তি নয়। পাকিস্তান অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।"[২০]

তিনি এই আশঙ্কাও ব্যক্ত করলেন যে যেহেতু সময় বদলে গেছে এবং লীগের পক্ষে আর ভারতের সাংবিধানিক অগ্রগতির পথে ভেটো প্রয়োগ করা সম্ভবপর নয় তাই এ প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত। কারণ লীগ এ প্রস্তাব বাতিল করলেও ইংরেজ সরকার নিরস্ত হবে না। এবং সেই পরিস্থিতিতে লাভবান হবে একমাত্র কংগ্রেস। ভবিষ্যতে সংখ্যাসাম্যের দাবি স্বীকার করিয়ে নেবার জন্যও বর্তমানে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত এবং তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে এই দাবি স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত লীগ কার্যতঃ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেবে না। বহু অনুনয়-বিনয় ও সম্ভাব্য ভীতিপ্রদর্শন ও যুক্তিজাল বিস্তারের পর অবশেষে কুশলী বাগ্মীর জয় হল এবং ১৩ জন সদস্য বিরুদ্ধে ভোট দিলেও ৬ই জুন লীগ কাউন্সিল জিন্নার প্রস্তাব অনুসারে মিশনের ১৬ই মে তারিখের ঘোষণার দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী—উভয় অংশই গ্রহণ করল। প্রস্তাবে বলা হল যে, "যেহেতু বাধ্যতামূলক গোষ্ঠীবদ্ধতার মাধ্যমে মিশনের পরিকল্পনায় পাকিস্তানের ভিত্তি ও বনিয়াদ অন্তর্নিহিত", লীগ "এই আশা নিয়ে মিশন প্রস্তাবিত সংবিধান রচনার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক যে শেষ অবধি এক সম্পূর্ণ সার্বভৌম পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা এর দ্বারা হবে।"[২১] এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ৭ই জুন বড়লাটের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারে জিন্না নিজের জন্য প্রতিরক্ষা এবং তাঁর দলের অপর দুজন সদস্যের জন্য বিদেশসংক্রান্ত ও পরিকল্পনা বিভাগের দাবি জানালেন। আলোচনা-কালে এবং তারপর ৮ই ও ১২ই জুনের চিঠিতে জিন্না সংখ্যাসাম্যের জন্যও চাপ দিতে থাকলেন।

ইতিমধ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে বড়লাট ও মিশনের আলাপ-আলোচনা চলছিল এবং ওয়ার্কিং কমিটির সভায় তার বিচার-বিবেচনাও হচ্ছিল। ১২ই জুন বড়লাট অন্তর্বর্তী সরকার গঠন সম্পর্কে জিন্না এবং কংগ্রেসের তরফ থেকে জওহরলালকে আমন্ত্রণ জানা-লেন। জিন্না কংগ্রেস সভাপতি আজাদের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসতে প্রস্তুত ছিলেন না বলে এই ব্যবস্থা। কারণ জিন্নার মতে হিন্দুরা কেবল "শত্রু", কিন্তু লীগ বহির্ভূত মুসলমানেরা "বিশ্বাসঘাতক" এবং তাই তাঁদের সঙ্গে কোন কথাবার্তা নয়। একটা বোঝাপড়ার পথ প্রশস্ত করার উদ্দেশ্যে গান্ধী কংগ্রেসকে প্রতিবাদ সহকারে এ প্রস্তাব মেনে নিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে জিন্না এই কারণে আলোচনায় যোগ দিলেন না যে সংখ্যাসাম্যের নীতি তখনও পর্যন্ত মেনে নেওয়া হয় নি। পক্ষান্তরে বড়লাট নেহরুর কাছে আবার প্রস্তাবিত অন্তর্বর্তী সরকারে তপশিলী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিসহ হিন্দু-মুসলিম সংখ্যাসাম্যের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। ১৩ই ও ১৪ই

জুন আজাদ বড়লাটকে দুটি পত্রে জানালেন যে এই শর্তে (এবং লীগ বহির্ভূত মুসলমান প্রতিনিধি থাকবে না জেনে) কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিতে ইচ্ছুক নয়। ১৫ই জুন বড়লাট জানালেন যে প্রস্তাবিত অন্তর্বর্তী সরকারে প্রতিনিধিত্ব হবে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নয়, রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতে এবং মুসলিম লীগের ৫ জন প্রতিনিধি ও কংগ্রেসের ৬ জন প্রতিনিধি থাকবে বলে সংখ্যাসাম্যের কথা ওঠে না। আজাদ উত্তরে জানালেন যে বর্তমান প্রস্তাব ভিন্নরূপে প্রথম সিমলা সম্মেলনের (১৯৪৫ খ্রীঃ) প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি। তফাৎ কেবল এইটুকু যে তখন কংগ্রেস নিজের জন্য নির্ধারিত সংখ্যা থেকে একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান নিতে পারত, এবারে তার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং কংগ্রেসের পক্ষে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব নয়। অবশেষে ১৫ই জুন ওয়াভেল তাঁকে জানালেন যে, "প্রধান দুটি দলের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করার আমার প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। ক্যাবিনেট মিশন ও আমি তাই স্থির করেছি যে অতঃপর আমরা কি করব সে সম্বন্ধে আগামী কাল একটি বিবৃতি জারি করব।"[২১]

ক্যাবিনেট মিশনের ১৬ই জুনের ঘোষণায় জিন্নাসহ ১৪ জন সদস্যবিশিষ্ট এক অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করার কথা ঘোষণা করা হল। এতে লীগের ৫ জন মুসলমান, কংগ্রেসের ৬জন (১ জন তপশিলী সম্প্রদায়ের সদস্যসহ) হিন্দু সদস্য ছাড়াও শিখ, পার্শী ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের এক এক জন করে সদস্যের নাম ছিল। সব দল চাইলে এই সরকার ২৬শে জুন থেকে কাজ আরম্ভ করবে বলে বলা হল এবং এও জানানো হল যে প্রদেশগুলির বিধানসভার অধিবেশন অবিলম্বে আহ্বান করা হচ্ছে যাতে গণপরিষদের সদস্য নির্বাচন সম্পন্ন হয় এবং গণপরিষদ কাজ শুরু করতে পারে। ঘোষণার অষ্টম ধারায় উল্লেখ করা হল যে: "প্রধান দলের দুটি-ই অথবা তাদের মধ্যে কোন একটি যদি উপরোক্ত ধরনের কোয়ালিশন সরকারে যোগ দিতে অনিচ্ছুক হয় তাহলে বড়লাটের অভিপ্রায় হল এই যে যারা ১৬ই মে তারিখের ঘোষণাকে মেনে নিয়েছেন তাঁদের প্রতিনিধিদের নিয়ে যথাসম্ভব প্রতিনিধিত্বমূলক এক অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা।"

অন্তর্বর্তী সরকারের জাকির হোসেনের নাম বাদ দিয়ে কংগ্রেসকে মুসলমানদেরও প্রতিনিধিত্বের অধিকার না দেওয়ায়, বাস্তবে বর্ণহিন্দু ও মুসলমানদের সংখ্যাসাম্য মেনে নেওয়ায়, লীগ প্রদত্ত সদস্যতালিকা অপরিবর্তিত রেখে কেবল কংগ্রেসের তালিকায় রদবদল করায় (শরৎচন্দ্র বসুর স্থলে হরেকৃষ্ণ মহতাব), কোন মহিলা সদস্যের নাম না রাখা (কংগ্রেসের প্রস্তাবিত নাম রাজকুমারী অমৃত কৌর, যিনি

আবার খ্রীষ্টানও), সরকারী বেতনভোগী এবং সরকারের তরফ থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরুদ্ধে মোকর্দমা পরিচালনাকারী অ্যাডভোকেট জেনারেল এন. পি ইঞ্জি-নিয়ারকে মন্ত্রীমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত করা এবং কংগ্রেসের আপত্তি অগ্রাহ্য করে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে ভোটারদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত লীগের আবদুর রব নিস্তারের নাম প্রস্তাবিত তালিকায় রাখা ইত্যাদির কারণে গান্ধী কংগ্রেসকে এ প্রস্তাব গ্রহণ না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কিন্তু নিজেদের জন্য নির্ধারিত সংখ্যার ভিতর একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান নিয়ে এবং আরও কিছু আপোস করে প্রস্তাব গ্রহণের পক্ষপাতী ছিল।

কিন্তু আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রস্তাব গ্রহণের পূর্বে খবর পাওয়া গেল যে জিন্নার এক পত্রের উত্তরে ২০শে জুন বড়লাট তাঁকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে দুটি প্রধান পক্ষের সম্মতি ব্যতিরেকে নামের তালিকায় নীতিগতভাবে কোন পরিবর্তন করা হবে না। এর অর্থ হল কংগ্রেস নিজের জন্য নির্বাচিত সংখ্যার ভিতরও মুসলমান সদস্য নিতে পারবে না[২৩] এবং তপশিলী হিন্দুসহ যে কোন সংখ্যালঘু সদস্যের স্থান রিক্ত হলে সে আসন পূর্ণ করার জন্য দুই প্রধান দলের সঙ্গে পরামর্শ করা হবে। এর দ্বারা অন্যান্য সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে লীগকে ভিটো দেবার অধিকার দেবার সঙ্গে সঙ্গে বড়লাট কংগ্রেস সভাপতিকে প্রদত্ত তাঁর পূর্বতন (১৫ই জুনের পত্রের পঞ্চম অনুচ্ছেদ) প্রতিশ্রুতি—কংগ্রেস-লীগ সংখ্যাসাম্য হচ্ছে না, কারণ কংগ্রেস তপশিলীসহ ৬টি আসন পাচ্ছে—ভঙ্গ করে পিছনের দরজা দিয়ে সংখ্যাসাম্য প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা হয়েছিল। এর উপর ২২শে জুন বড়লাট কংগ্রেস সভাপতিকে লিখলেন যে কংগ্রেসের জন্য নির্ধারিত মন্ত্রীসংখ্যায় একজন মুসলমান সদস্য নেবার জন্য তাঁরা যেন আগ্রহ না করেন। তাঁর মতে, "ক্যাবিনেট মিশন অথবা আমার পক্ষে এ প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভবপর নয় এবং এর কারণ আপনি ভাল ভাবেই জানেন।"[২৪] মিশনের এই ভূমিকা কেবল কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী ভূমিকার পক্ষেই ঘাতক ছিল না, কংগ্রেস সভাপতিকে (আবদুর রব নিস্তার প্রসঙ্গে) লেখা তাঁর ১৪ই জুনের পত্রের প্রতিকূলও ছিল, যেখানে তিনি জানান, "মুসলিম লীগ কর্তৃক প্রস্তাবিত নামে কং-গ্রেসের আপত্তি জানাবার অধিকার আমি মানতে পারি না, যেমন অপর পক্ষের তরফ থেকেও এজাতীয় আপত্তি মানতেও আমি অপারগ।" এছাড়া জিন্নাকে এই প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয় যে, প্রধান পক্ষ দুটির যে কোন একটির আপত্তি থাকলে অন্ত-র্বর্তী সরকার কোন গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকবে" এবং কংগ্রেসের মতে বড়লাট কর্তৃক একান্ত আকস্মিক ভাবে প্রস্তাবিত এমন

গুরুত্বপূর্ণ এই নীতি আইনসভার প্রতি দায়িত্বশীল কোন সরকারের ক্ষেত্রে যদিও বা গ্রহণ করা যায়, অন্তর্বর্তী সরকারের ক্ষেত্রে গৃহীত অবস্থার সৃষ্টি

মিশনের সদস্যদের সঙ্গে গান্ধীসহ কংগ্রেসের নেতাদের আরও অনেক আলাপ-আলোচনা ও পত্রবিনিময় হল। অবশেষে গান্ধী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে মিশনের দীর্ঘমেয়াদী (গণপরিষদ) এবং স্বল্পমেয়াদী (অন্তর্বর্তী সরকার)—কোন প্রস্তাবই গ্রহণযোগ্য নয়। তবে কংগ্রেস নেতাদের গান্ধী তার পরামর্শ অনুসারে নয়, "তাঁদের বিবেকের নির্দেশ" অনুসরণ করার পরামর্শ দিলেন। ২৫শে জুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বিবাদাস্পদ অনুচ্ছেদগুলি সম্বন্ধে তার নিজস্ব ব্যাখ্যাসহ ("সামগ্রিক বিচারে প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব সম্প্রসারণ ও তার শক্তিবৃদ্ধি করার যথেষ্ট অবকাশ থাকার সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠীভুক্ত হবার ব্যাপারেও কোন প্রদেশের নিজ অভিপ্রায় অনুসারে চলার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে এবং অন্য পরিস্থিতিতে যেসব সংখ্যালঘুরা অসুবিধায় পড়তেন তাঁদের সংরক্ষণ দেবারও অবকাশ বিদ্যমান") দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাতিল করল। আজাদ ঐদিনই কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত মিশনকে জানিয়ে দিলেন।

মিশন বিবাদাস্পদ অনুচ্ছেদগুলি সম্বন্ধে কংগ্রেসের ভাষ্য স্বাকার না করে নিজের ভাষ্যে অটল থাকলেও ২৭শে জুন ঘোষণা করল যে দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তাব গ্রহণ করে কংগ্রেস ১৬ই মে তারিখের ঘোষণাকে স্বীকার করে নিয়েছে বলে লীগের সঙ্গে সঙ্গে ঐ প্রতিষ্ঠানও অন্তর্বর্তী সরকারে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারী। তবে তারা স্থির করলেন যে অতঃপর (২৯শে জুন) তাঁরা বিলাতে ফিরে যাবেন ও কিছুদিনের বিরতির পর ভবিষ্যতে বড়লাটই অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের উদ্যোগ-আয়োজন করবেন। ইতিমধ্যে সরকারী কর্মচারীদের নিয়ে এক অস্থায়ী কাজ চালাবার সরকার গঠিত হবে।

ক্যাবিনেট মিশনের তরফ থেকে ২৭শে জুনের ঐ ঘোষণার পূর্বে ২৫শে সন্ধ্যায় কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত জানার পর বড়লাট মিশনের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনার জন্য জিন্নাকে আমন্ত্রণ করেন। জিন্না আশা করেছিলেন যে কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিতে সম্মত না হওয়ায় কংগ্রেস বর্জিত ঐ সরকারে তাঁর ও লীগের প্রাধান্য থাকবে। কিন্তু মিশন তাঁকে সেরকম কোন আমন্ত্রণ না জানিয়ে নিজেদের সিদ্ধান্তের কথা কেবল তাঁকে জ্ঞাপন করল। অতঃপর হতাশায় ক্ষুব্ধ জিন্নার সঙ্গে তাঁদের দীর্ঘ তিন ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা হল। কিন্তু অতীতে জিন্নাকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো অথবা সেই সময়ে তাঁকে এমন কি দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেওয়া এক কথা। কেবল তাঁর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে চলে যাবার কথা ব্রিটিশ রাজপ্রতি-

নিধিরা চিন্তা করতেই অসমর্থ ছিলেন। প্রত্যুতঃ এমন এক পরিস্থিতির কথা অনুমান করে দিন কয়েক পূর্বেই আলোচনান্তে তাঁরা তাঁদের ভূমিকা স্থির করে ফেলেছিলেন।"[২৫]

ঐদিন বড়লাট এক "অত্যন্ত গোপনীয়" মেমোতে এ ব্যাপারে তাঁর প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করলেন: "বলতে গেলে বুদ্ধির খেলায় আমরা কংগ্রেসের কাছে হেরে গেছি। শব্দাবলী ও বাক্যাংশের অর্থকে এইভাবে বিকৃত করার ব্যাপারে কংগ্রেসের ক্ষমতা এবং ভাষার কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির সুযোগ নেওয়ার বৃত্তিকে মিস্টার জিন্না বার বার ভয় করে এসেছেন এবং তাঁর অসহযোগী মানসিকতার পিছনেও এই কারণ··· । সবার মেজাজ উত্ত্যক্ত, মুসলিম লীগ মনে করে তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে··· ।"[২৬] জিন্নার সঙ্গে সেই দীর্ঘ আলোচনা বড়লাটের মতে ছিল এক "শোচনীয় সাক্ষাৎকার···আসল কাজের কথায় উপনীত হবার পূর্বেই···জিন্নার মেজাজ একেবারেই খিঁচড়ে গিয়েছিল, (তিনি) আমাদের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গ ও কংগ্রেসের কাছে আত্মসমর্পণের অভিযোগ করলেন এবং বললেন যে তাঁকে সরকারে যোগদান করার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল।"[২৭]

॥ ২৬ ॥

গুরুতর পীড়িত শরীর[১] ও অনুরূপ আহত মন নিয়ে জিন্না দ্বিতীয় সিমলা সম্মেলনের শেষে শূন্যহস্তে জুলাই-এর প্রথমে বোম্বাই প্রত্যাবর্তন করলেন। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই বোম্বেতে তাঁকে আরও এক গুরুতর আঘাত পেতে হল।

এ আঘাত কংগ্রেসের নেতা জওহরলালের কাছ থেকে বলে তার বিবরণ অপর এক কংগ্রেস নেতা মৌলানা আজাদের জবানীতে শোনাই ভাল। ওয়ার্কিং কমিটির ২৫শে জুনের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য বোম্বেতে ৬ই ও ৭ই জুলাই অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক জরুরী সভা আহুত হয়েছিল।[২] ইতিমধ্যে নেহেরু কংগ্রেসের নূতন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন এবং অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ঐ সভাতেই তিনি আজাদের কাছ থেকে সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। অতঃপর একটু দীর্ঘ হলেও মৌলানার উদ্ধৃতি:

"এরপর এমন এক অতীব শোচনীয় ঘটনা ঘটল যা ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তিত করে দিল। ১০ই জওহরলাল বোম্বাই-এ সাংবাদিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান করলেন এবং তাতে এমন এক বিবৃতি দিলেন যা সাধারণ অবস্থায় হয়ত কেউ গ্রাহ্য

করতেন না। কিন্তু তখনকার সন্দেহ ও বিদ্বেষের পরিস্থিতিতে তা এক অত্যন্ত দুর্ভাগ্যপূর্ণ পরিণতির সূত্রপাত করল।[৩] কোন এক সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক এই প্রস্তাব গৃহীত হবার পর কি কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকারের গঠনপ্রণালীসহ (মিশনের) পরিকল্পনাকে পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করেছে ?

"উত্তরে জওহরলাল বলেছিলেন যে কংগ্রেস 'কোন রকমের চুক্তির বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে যখন যেরকম অবস্থার সৃষ্টি হয় তার মোকাবিলা করার স্বাধীনতা নিয়ে' গণ-পরিষদে যোগদান করবে।

"সংবাদপত্র প্রতিনিধিরা অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এর অর্থ কি এই দাঁড়ায় যে ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনার রদ-বদল হতে পারে ?

"জওহরলাল দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উত্তর দিলেন যে কংগ্রেস কেবল গণপরিষদে যোগ দিতে রাজা হয়েছে এবং নিজেদের অভিরুচি অনুযায়ী ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবের পরিবর্তন বা রদ-বদল করার স্বাধীনতা তার আছে।

"আমাকে একথা লিপিবদ্ধ করতে হবে যে জওহরলালের বক্তব্য ভ্রান্ত ছিল। একথা সত্য নয় যে কংগ্রেসের নিজ ইচ্ছানুসারে পরিকল্পনার পরিবর্তন করার স্বাতন্ত্র্য ছিল। আমরা প্রত্যুতঃ একথা স্বীকার করে নিয়েছিলাম যে কেন্দ্রীয় সরকার ফেডারাল ধরণের হবে। কেন্দ্রায় সরকারের হাতে বাধ্যতামূলক ভাবে তিনটি বিষয় থাকবে এবং অন্যান্য বিষয় প্রাদেশিক তালিকার অন্তর্ভুক্ত হবে। আমরা এ বিষয়েও সম্মত হয়েছিলাম যে 'ক' 'খ' ও 'গ' নামে তিনটি প্রদেশগোষ্ঠী থাকবে। চুক্তির অপরাপর পক্ষের সম্মতি ব্যতিরেকে কংগ্রেসের পক্ষে একতরফা ভাবে এসব ব্যাপারে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।

"মুসলিম লীগ এই জন্য ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল যে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে এর বেশী যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। লীগ কাউনসিলের সভায় শ্রীযুক্ত জিন্না ইতিপূর্বেই বলেছিলেন যে এর চেয়ে ভাল আর কিছু পাওয়া সম্ভব নয় বলে তিনি এ প্রস্তাব গ্রহণের জন্য সুপারিশ করছেন।

"সুতরাং আলোচনার পরিণাম সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জিন্না খুব খুশী ছিলেন না ; কিন্তু অপর কোন বিকল্প ছিল না বলে তিনি পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন। জওহরলালের বিবৃতি তাঁর কাছে বোমার বিস্ফোরণের মত প্রতীয়মান হল। অবিলম্বে এক বিবৃতি জারি করে তিনি বললেন যে কংগ্রেস সভাপতির পূর্বোক্ত ঘোষণার ফলে সমগ্র পরিস্থিতির পুনর্বিচার করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তিনি

তাই লিয়াকৎ আলী খাঁকে লীগ কাউনসিলের এক সভা আহ্বানের নির্দেশ দিয়ে এই ঘোষণা করলেন যে দিল্লীতে লীগ কাউনসিল এই আশ্বাসের ভিত্তিতে ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল যে কংগ্রেসও ঐ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং ঐ পরিকল্পনা ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সংবিধানের ভিত্তি হবে। এখন যখন কংগ্রেস সভাপতি ঘোষণা করেছেন যে গণপরিষদে নিজেদের সংখ্যাধিক্যের[৪] বলে কংগ্রেস এই পরিকল্পনাকে পরিবর্তিত করতে পারে—এর অর্থ এই হয় যে সংখ্যালঘুদের সংখ্যাগরিষ্ঠদের অনুগ্রহ-নির্ভর হয়ে থাকতে হবে। তাঁর মতে জওহরলালের পূর্বোক্ত বিবৃতির অর্থ হল কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনাকে বাতিল করেছে এবং সেই কারণে বড়লাটের উচিত মুসলিম লীগ মিশনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলে ঐ প্রতিষ্ঠানকে সরকার গঠনে আমন্ত্রণ জানানো।

"২৭শে জুলাই বোম্বাই-এ মুসলিম লীগ কাউনসিলের সভা হল। উদ্বোধনী সভায় জিন্না লীগের পক্ষে একমাত্র পন্থা পাকিস্তানের দাবির পুনরুচ্চারণ করলেন। তিনদিন আলোচনার পর কাউনসিল ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা অগ্রাহ্য করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করল। পাকিস্তান প্রাপ্তির জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সিদ্ধান্তও ঐ সভায় গৃহীত হল।

"ঘটনাপ্রবাহ এইভাবে নূতন মোড় নেওয়ায় আমি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলাম। আমি দেখছিলাম যে যে-পরিকল্পনার জন্য আমি এত পরিশ্রম করেছিলাম তা এই ভাবে আমাদেরই কৃতকর্মের ফলে ধ্বংস হতে চলেছে। আমার মনে হল যে সমগ্র পরিস্থিতির পুনর্বিচারের জন্য অবিলম্বে ওয়ার্কিং কমিটির একটি সভা হওয়া প্রয়োজন। এইভাবে ৮ই আগস্ট ওয়ার্কিং কমিটির সেই সভা হল। আমি বললাম যে আমরা যদি পরিস্থিতি রক্ষা করতে চাই তাহলে বলতে হবে যে কংগ্রেসের অভিমত অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাবে ব্যক্ত হয়েছে এবং কোন ব্যক্তি—এমন কি কংগ্রেস সভাপতিও তা পরিবর্তন করতে পারেন না।

"ওয়ার্কিং কমিটির মনে হচ্ছিল যে তার সামনে উভয়সঙ্কট। একদিকে কংগ্রেস সভাপতির মান-মর্যাদার প্রশ্ন। অন্যদিকে এত পরিশ্রম করে আমরা যে বোঝাপড়ায় উপনীত হয়েছিলাম তার ভবিষ্যৎ বিপন্ন। সভাপতির বিবৃতির প্রতিবাদ করলে প্রতিষ্ঠান দুর্বল হবে, আবার ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা বর্জন করলে দেশের সর্বনাশ ঘটবে। শেষ পর্যন্ত আমরা এমন ভাবে প্রস্তাবের খসড়া রচনা করলাম যাতে সাংবাদিক সম্মেলনের উল্লেখ না করে মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনায় অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির পুনঃস্বীকৃতি দেওয়া হল।...

"আমরা আশা করেছিলাম যে ওয়ার্কিং কমিটির এই প্রস্তাবের ফলে শেষরক্ষা হবে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না যে কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা পুরোপুরি গ্রহণ করেছিল। মুসলিম লীগ যদি আমাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করত তাহলে তার মর্যাদাহানি ব্যতিরেকেই পুরাতন অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করতে পারত। শ্রীযুক্ত জিন্না কিন্তু সেদিক দিয়ে গেলেন না এবং বলতে লাগলেন যে জওহরলালের বিবৃতিই কংগ্রেসের আসল মনের কথা। তিনি এই যুক্তিজাল বিস্তার করলেন যে ইংরেজরা দেশে থাকাকালীনই এবং হাতে ক্ষমতা আসার পূর্বেই কংগ্রেস যদি এতবার তার ভূমিকা বদলাতে পারে, তাহলে একবার ইংরেজরা চলে গেলে কংগ্রেস যে আবার তার মত বদলাবে না এবং পুনর্বার জওহরলালের বিবৃতিতে ব্যক্ত ভূমিকা গ্রহণ করবে না, সে ব্যাপারে সংখ্যালঘুদের কাছে নিশ্চয়তা কোথায়?"[৬]

আগস্টের ঘটনাবলী নিয়ে অগ্রসর হবার পূর্বে লীগ কাউনসিলের ২৯শে জুলাই-এর সেই গুরুত্বপূর্ণ সভা এবং লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তাব সম্বন্ধে আর একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। কেন্দ্রে সমান ক্ষমতা পাবার প্রবল সম্ভাবনা দেখা দেবার পর আকস্মিক ভাবে তার থেকে বঞ্চিত হওয়ার ক্ষোভ, হতাশা ও তিক্ততার পরিবেশের মধ্যেও প্রথমে তিনি নিজ কৃতকর্মের অর্থাৎ সার্বভৌম পাকিস্তানের বদলে সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রীয় সরকার এবং ছয়টি প্রদেশের দুটি গোষ্ঠীর সমর্থনে অকুণ্ঠ ভাষায় বলেন, "আমরা স্বেচ্ছায় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তিনটি বিষয় তুলে দিতে চেয়েছিলাম এবং এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা কেমন চলে তা দশ বছর দেখতে প্রস্তুত ছিলাম। আমাদের সিদ্ধান্তে কোন ভুল ছিল না। এর দ্বারা মুসলিম লীগ উচ্চতম স্তরের রাজনৈতিক বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিল।...আমাদের ভিতর সাহস ছিল— কেন্দ্রের হাতে ঐ বিষয়গুলি সমর্পণ করায় ভুল হয়নি।" একত্রে থাকার জন্য তিনি এবং লীগ এতটা আপোসের জন্য প্রস্তুত হলেও কংগ্রেস ও ব্রিটিশ সরকার তাঁদের সঙ্গে কেবল "বিশ্বাসঘাতকতাই" করে নি, কেন্দ্রে তাঁদের ক্ষমতা পাবার পথ রুদ্ধ করেছে। সেই জ্বালা ব্যক্ত করে অতঃপর তিনি বললেন, "সততা ও ন্যায়বিচার পাবার মুসলিম লীগের তাবৎ প্রয়াস—এমন কি মিনতি ও প্রার্থনায়ও কোন রকম সাড়া কংগ্রেসের কাছ থেকে পাওয়া যায় নি। ক্যাবিনেট মিশনও কংগ্রেসের ইঙ্গিতে চলেছে। তার খেলাও নিজস্ব ধরণের।...সমগ্র আলাপ-আলোচনাকালে ক্যাবিনেট মিশন ও বড়লাট কংগ্রেসের আতঙ্ক ও শাসানির প্রভাবাধীন ছিলেন...এবং তাঁদের প্রতিশ্রুত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছেন ও চূড়ান্ত প্রস্তাবে যা ঘোষণা করা হয়েছিল তা বর্জন করেছেন।...কংগ্রেস আদৌ কোনদিন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে নি।

…ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়কুটো আঁকড়ে ধরে, ক্যাবিনেট মিশন তেমনি সেই শর্তাধীন স্বীকৃতিকে…যথার্থ মনে করেন।…বোম্বাই-এ ১০ই জুলাই এক সাংবাদিক সম্মেলনে …পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা সম্বন্ধে কংগ্রেসের নীতি ও দৃষ্টি-ভঙ্গী পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা করে বলেন…যে কংগ্রেস কোন শর্তই স্বীকার করে নি…। তাহলে কোন কিছু কল্পনা করা বা স্বপ্ন দেখার সার্থকতা কোথায়?"[৭]

তিনি আরও বললেন, "প্রতিবাদের কোন রকম আশঙ্কা না করে আমি আপনাদের একথা বলতে পারি যে সমগ্র আলোচনাকালে তিনটি পক্ষের মধ্যে একমাত্র মুসলিম লীগ সম্মানিত প্রতিষ্ঠানরূপে আলোচনা করেছে।…এই সমস্ত আলাপ-আলোচনার ভিতর দিয়ে যে একমাত্র পক্ষ সম্মানসহ ও পরিচ্ছন্ন ভাবে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে তা হল মুসলিম লীগ।…এই সব তথ্য সন্দেহের তিলমাত্র অবকাশ না রেখে সুস্পষ্ট ভাবে একথা প্রমাণ করে যে ভারতবর্ষের সমস্যার একমাত্র সমাধান হল পাকিস্তান। কংগ্রেস ও শ্রীযুক্ত গান্ধী যতক্ষণ মনে করবেন যে তাঁরা সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিনিধি…যে পর্যন্ত তাঁরা এই বাস্তব তথ্য অস্বীকার করবেন যে মুসলিম লীগই মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান এবং যত দিন পর্যন্ত তাঁরা এই দুষ্টচক্রে আবর্তিত হতে থাকবেন, ততদিন কোন বোঝাপড়া বা স্বাধীনতার সম্ভাবনা নেই।…শ্রীযুক্ত গান্ধী এখন বিশ্বজনীন উপদেষ্টার মত কথাবার্তা বলছেন। তিনি জানিয়েছেন যে কংগ্রেস …ভারতবর্ষের জনসাধারণের ন্যাসী।…দেড়শ বছর ধরে যে একক ন্যাসী এদেশে বিদ্যমান তাঁদের সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে। কংগ্রেস আমাদের ন্যাসী হোক এ আর আমরা চাই না। আমরা এখন যথেষ্ট প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছি। মুসলমান-দের একমাত্র ন্যাসী হল মুসলমান জাতি।"[৮]

ব্যক্তিগত ভাবে ক্রিপস ও পেথিক লরেন্সও তাঁর বাক্যবাণ থেকে রেহাই পেলেন না, যদিও তাঁরা যথাক্রমে পার্লামেণ্ট ও লর্ডসভায় মিশনের পরিকল্পনা স্বীকার করার জন্য জিন্নার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। প্রথমোক্ত জন সম্বন্ধে তিনি বললেন, "দুঃখের সঙ্গে আমি একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে স্যার স্ট্রাফোর্ড ক্রিপস তাঁর আইন-জীবির প্রতিভাতে খাদ মিশিয়েছেন।" "মুসলমান প্রতিনিধিদের মনোনয়নের এক-চ্ছত্রাধিকার (জিন্না) পেতে পারেন না"—লর্ডসভায় ভারতসচিবের এই উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করে লীগের ঐ সভায় তিনি বললেন, "আমি ব্যবসায়ী নই। তেলের জন্য আমি কোন সুবিধা চাইছি না অথবা বেনিয়ার মত দরাদরিও করছি না।"[৯] স্পষ্টতঃ এক ঢিলে ইংরেজ ও গান্ধী—দুই পাখীকেই আঘাত করা ছিল তাঁর লক্ষ্য।

বলা বাহুল্য লীগের উগ্রপন্থী ও গোঁড়ারা এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন।

ফিরোজ খাঁ নূন, হসরৎ মোহানী, রাজা গজনফর আলী খাঁ প্রমুখ অনেকের প্রায় জেহাদী স্বরের বক্তৃতা প্রতিনিধিদের হর্ষধ্বনি দ্বারা অভিনন্দিত হল। প্রতিনিধিদের মেজাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ওয়ার্কিং কমিটি দুটি প্রস্তাব পেশ করল এবং তা গৃহীত হল। এর প্রথমটিতে গণপরিষদসহ ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনার স্বীকৃতি প্রত্যাহার এবং দ্বিতীয়টিতে ভবিষ্যতে "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল।

পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের উপর ঐ "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" প্রস্তাবের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ে বলে এখানে তার প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করা প্রয়োজন: "আপোস রক্ষা ও সাংবিধানিক উপায়ে ভারতের সমস্যার একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজে বার করার মুসলিম-ভারতের যাবতায় প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। কংগ্রেস ব্রিটিশের প্রচ্ছন্ন সম্মতিতে ভারতবর্ষে এক বর্ণহিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী একথা সপ্রমাণ করেছে যে ভারতবর্ষের ব্যাপারে ন্যায়বিচার নয়, ক্ষমতার রাজনীতিই সব কিছুর নির্ণায়ক। আর একথাও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে অবিলম্বে এক স্বাধীন ও পূর্ণতঃ সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির কম কোন কিছুতে ভারতের মুসলমানরা শান্ত হবেন না এবং মুসলিম লীগের অনুমোদন ও সম্মতি ব্যতিরেকে দীর্ঘমেয়াদী বা স্বল্পমেয়াদা কোন রকম সংবিধান চাপিয়ে দেওয়া অথবা কেন্দ্রে এক অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের তারা বিরোধিতা করবেন। অখিল ভারত মুসলিম লাগ বিশ্বাস করে যে পাকিস্তান প্রাপ্তি, নিজেদের ন্যায়সঙ্গত দাবি অর্জন, নিজেদের সম্মানরক্ষা এবং বর্তমানের ইংরেজের ও ভবিষ্যতের বর্ণহিন্দুদের দাসত্বের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য মুসলমান জাতির তরফ থেকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হবার সময় এখন এসে গেছে।

"এই কাউনসিল তাই মুসলিম জাতিকে তাঁদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের পিছনে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াতে এবং সব রকমের আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে আহ্বান জানাচ্ছে। উপরে উল্লিখিত নীতি কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের এক কর্মসূচী অবিলম্বে রচনা করার জন্য এই কাউনসিল ওয়ার্কিং কমিটিকে নির্দেশ দিচ্ছে এবং যখন যেখানে প্রয়োজন আসন্ন সংগ্রামে যোগ দেবার জন্য মুসলমানদের প্রস্তুত করার জন্যও ওয়ার্কিং কমিটির উপর দায়িত্ব দিচ্ছে। ইংরেজ শাসকের আচরণের প্রতিবাদ এবং তার প্রতি ক্ষোভ ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে এই কাউনসিল মুসলমানদের অবিলম্বে বিদেশী সরকার প্রদত্ত উপাধিসমূহ বর্জন করার আহ্বান জানাচ্ছে।"[১০]

এইভাবে ভারতবর্ষের অবিভক্ত থেকে স্বাধীন হবার শেষ সম্ভাবনা তিরোহিত

হয়ে গেল। ভারত-বিভাজন অতঃপর কেবল সময়ের ব্যাপার।

যাই হোক, প্রস্তাব গৃহীত হবার পর উপসংহার ভাষণে জিন্না বললেন : "আমরা এক অত্যন্ত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। মুসলিম লীগের সমগ্র ইতিহাস আমরা সাংবিধানিক ছাড়া অপর কোন পন্থা গ্রহণ করি নি...আজ আমাদের এমন অবস্থার মধ্যে ঠেলে দেওয়ার পিছনে কংগ্রেস ও ইংলণ্ড উভয়েরই যোগাযোগ আছে। আমাদের দুই দিক থেকে আক্রমণ করা হয়েছে।...আজ আমরা সংবিধান ও সাংবিধানিক পদ্ধতিকে বিদায় জানিয়েছি। কষ্টকর আলাপ-আলোচনার পুরো সময়টা যে দুই দলের সঙ্গে আমাদের দরাদরি করতে হয় তারা আমাদের দিকে পিস্তল তাগ করে রেখেছিল। এক দলের পিছনে ছিল ক্ষমতা ও মেসিনগান এবং অপর দল সর্বদা অসহযোগ ও গণআইন অমান্য শুরু করার শাসানি দিত। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। আমাদেরও এখন পিস্তল আছে।"[১১]

এখানে সঙ্গত ভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে জিন্না পরিকল্পিত "প্রত্যক্ষ সংগ্রামের" স্বরূপ কি ছিল? কিন্তু সে প্রশ্নের সরাসরি জবাব খোঁজবার পূর্বে পূর্বোক্ত প্রস্তাবের দুটি বাক্যাংশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে যা পরোক্ষ ভাবে এর উত্তর খোঁজার সহায়ক। প্রথম অনুচ্ছেদ "স্বাধীন ও পূর্ণতঃ সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের" অপরিহার্যতার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এ কথারও উল্লেখ করা হয়েছে যে "মুসলিম লীগের সম্মতি ও অনুমোদন ব্যতিরেকে" "দীর্ঘমেয়াদী বা স্বল্পমেয়াদী কোন রকম সংবিধান চাপিয়ে দেওয়া অথবা কেন্দ্রে এক অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের" বিরোধিতা করা হবে। অর্থাৎ এর পরও ক্যাবিনেট মিশনের ১৬ই মে ও ১৬ই জুনের মত কোন পরিকল্পনার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার ও গণপরিষদে যোগ দেবার সম্ভাবনা স্থায়ীভাবে নাকচ করা হচ্ছে না, যদি অবশ্য লীগের "সম্মতি ও অনুমোদন" গ্রহণ করা হয়। এছাড়া ওয়ার্কিং কমিটিকে মুসলমানদের আগামী সংগ্রামের জন্য সংগঠিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়, যা "যখন যেখানে প্রয়োজন" (অর্থাৎ তখনও ঐ স্থিতি আসে নি) শুরু করা হবে।

লীগ কাউনসিলের সভার শেষে জনৈক বিদেশী সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রথমে তিনি বলেন যে এ হবে এক "গণ আইন-বিরোধী (illegal) আন্দোলন।" কিন্তু ইতিমধ্যে সম্ভবতঃ তাঁর আইনজীবী সত্তা প্রবল হয়ে ওঠার পরে ঐ "আইনবিরোধী" শব্দের সংশোধন করে তিনি "অসাংবিধানিক (unconstitutional) শব্দ ব্যবহার করেন।[১২] ৩১শে জুলাই জনৈক ভারতীয় সাংবাদিকের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "এখন আমি আপনাকে সেকথা বলতে

প্রস্তুত নই।"[১৩] দীর্ঘকাল যিনি সমগ্র পাকিস্তানের ধারণাকেই ইচ্ছা করে ধোঁয়াটে রেখেছিলেন—কারণ তাঁর নিজেরই এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা ছিল না—তাঁর পক্ষে "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম"কেও অস্পষ্ট রাখা অস্বাভাবিক নয়। পরোক্ষ সাক্ষ্য এই সিদ্ধান্তের প্রতি চালিত করে যে এ সম্বন্ধে তাঁর মনে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এ কথা সত্য যে "প্রত্যক্ষ সংগ্রামের" কর্মসূচী তৈরী করার জন্য একটি উপসমিতি গঠিত হয়েছিল। কিন্তু ১৬ই আগস্ট মুসলমানদের সাধারণ ধর্মঘট করতে বলা ছাড়া সরকারী ভাবে লীগ এর জন্য অপর কোন কর্মসূচী রচনা করতে সক্ষম হয় নি।

তাই বলে তাঁর এক শ্রেণীর অনুগামীরা কিন্তু তাঁর মত এ ব্যাপারে অন্ধকারে ছিলেন না। তাঁরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নিজেদের মনোমত অর্থ করে নিয়েছিলেন। লীগ সম্পাদক লিয়াকৎ আলী খাঁ বলেন যে এর অর্থ হল, "অসাংবিধানিক পন্থা গ্রহণ করা এবং তা যে কোন রূপ গ্রহণ করতে পারে—আমাদের পরিস্থিতি অনুযায়ী যে কোন রূপ।...কোন পদ্ধতিকেই আমরা বাতিল করতে পারি না। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অর্থ হল আইন-বিরুদ্ধ কার্য।" বাংলার অন্যতম লীগনেতা খাজা নাজিমুদ্দীন বললেন, "শতাধিক প্রক্রিয়ায় আমরা অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারি—বিশেষতঃ আমাদের উপর যখন অহিংসার বন্ধন নেই। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অর্থ কি হবে তা বঙ্গের মুসলিম অধিবাসীরা জানেন এবং তাই তাঁদের এ সম্বন্ধে নেতৃত্ব দিতে যাবার আবশ্যকতা নেই।" সর্দার আবদুর রব নিস্তার আরও এক ধাপ এগিয়ে বললেন যে একমাত্র রক্তপাতের দ্বারাই পাকিস্তান অর্জিত হতে পারে এবং প্রয়োজন পড়লে অমুসলমানদের রক্তপাত করতে হবে। কারণ "মুসলমানরা অহিংসায় বিশ্বাসী নন।"[১৪] লীগের ছোট মাঝারি আরও অনেক নেতা এই জাতীয় জঙ্গী ও হিন্দু-বিরোধী জেহাদী ভাষায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের ডাক দিলেন। মুসলিম লীগের তরফ থেকে জনসাধারণের স্তরে সক্রিয় সংগঠন ছিল তার "লড়কে লেঙ্গে" মার্কা ন্যাশন্যাল গার্ড এবং স্বেচ্ছাসেবকের দল, যাদের রাজনৈতিক শিক্ষা দেবার কোন ব্যবস্থা ছিল না বললেই চলে। তারা সচরাচর পরিচালিত হত মসজিদ ভিত্তিক কট্টর মোল্লা ও পীর প্রভৃতিদের দ্বারা। মুসলিম সমাজে বা তাঁদের অর্থব্যবস্থায় সে সময়ে মধ্যবিত্তদের সংখ্যা যেমন অতীব ক্ষীণ ছিল তেমনি তাঁদের বৃহদাংশের সমর্থনপুষ্ট রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান লীগেও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের একান্ত অভাব। ইতিমধ্যে আহমেদাবাদ, বোম্বাই, এলাহাবাদ, আলীগড়, ঢাকা এবং অন্যান্য স্থানে নিরীহ ব্যক্তিদের উপর অতর্কিতে ছুরিকাঘাত ও অন্যান্য ধরণের আক্রমণের খবর পাওয়া যাচ্ছিল। ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে

আলোচনা চলাকালীন নানা জায়গায় পুলিশ ছোরা-ছুরি ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের রহস্যজনক পুলিন্দা আবিষ্কার করছে খবর পাওয়া যাচ্ছিল। ঈশান কোণে পুঞ্জীভূত ঐ সিঁদুরে মেঘের পরিপ্রেক্ষিতে লীগের উপরের দিকের নেতাদের[১৫] "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস" সম্পর্কিত ব্যাখ্যা নীচের তলার সমর্থক ও কর্মীদের মনে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

ভারতবর্ষের কোণে কোণে অশান্তি ও উত্তেজনার চিহ্ন ফুটে বেরোচ্ছিল। লীগ কাউনসিলের যুদ্ধং দেহি মনোভাবজনিত প্রতিক্রিয়া তার সঙ্গে যুক্ত হল। পেথিক লরেন্সের পরামর্শ সত্ত্বেও ওয়াভেল লীগ কাউনসিলের শাসানির পরিপ্রেক্ষিতে জিন্নার সঙ্গে নূতন করে আলোচনা করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। অথচ দেশের তদানীন্তন বিস্ফোরক পরিস্থিতিতে ইংরেজ সরকার জনপ্রতিনিধিদের ভারতবর্ষের প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত করার অপরিহার্যতা অনুভব করছিলেন। তাই ভারতসচিবের অনুমোদন নিয়ে ৬ই আগস্ট ওয়াভেল জওহরলালকে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করতে আমন্ত্রণ জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাকে এ পরামর্শও দিলেন যে প্রস্তাবিত সরকারের সদস্য-তালিকা স্থির করার পূর্বে জিন্নার সঙ্গে আলোচনা করে লীগসহ কোয়ালিশন গঠন করা বাঞ্ছনীয় হবে। নেহেরু এ দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়ে ১৫ই আগস্ট জিন্নার সঙ্গে লীগের সহযোগিতা পাবার আলোচনা করলেন।

"নেহেরু জিন্নাকে এই আশ্বাস দিলেন যে উভয় পক্ষের মধ্যে বোঝাপড়া ব্যতিরেকে গণ-পরিষদে কোন গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে না। যাবতীয় মতভেদ ফেডারেল আদালতে সিদ্ধান্তের জন্য পাঠানো হবে এবং কংগ্রেস যদিও প্রদেশগোষ্ঠী গঠন অবাঞ্ছনীয় মনে করে এবং কেন্দ্রের অধীনে স্বায়ত্তশীল প্রদেশের অস্তিত্ব কাম্য বিবেচনা করে, 'প্রদেশগুলি চাইলে তাদের গোষ্ঠীবদ্ধ হওয়ার বিরোধিতা কংগ্রেস করবে না। লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে পাঁচটি আসন পাবে, তবে মুসলমান সদস্য মনোনয়নের ব্যাপারে একাধিপত্য দাবি করতে পারবে না।[১৬] জিন্না সে প্রস্তাব বাতিল করলেন এবং নেহেরুর মনে এই ধারণার সৃষ্টি হল যে 'জিন্না যতটা চেয়েছিলেন তার থেকে বেশী অগ্রসর হয়ে পড়েছিলেন এবং এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না।' গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল এই যে আলোচনাকালে জিন্নার একমাত্র প্রস্তাব ছিল এই যে ছয় মাসের জন্য সর্ববিধ কার্যকলাপ স্থগিত রাখা উচিত। এইভাবে জিন্না একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন এবং আশা করছিলেন যে কোথা থেকে কোনও ভাবে কিছু একটা ঘটে যাবে।"[১৭]

ছয় মাস নয়, অনতিবিলম্বেই সেই একটা কিছু ঘটল। তবে তা এমন ভীষণ, ভয়ঙ্কর ও বীভৎস ভাবে যে দেশ-বিদেশের যাবতীয় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে সঙ্গে জিন্নার মত মূলতঃ মডারেট এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক নেতাও নিশ্চয় তার স্বরূপ দেখে আতঙ্কিত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ঘটনাটা হল "প্রত্যক্ষ সংগ্রামের" দিন কলকাতায় লীগ নেতৃত্ব ও বঙ্গের লীগ সরকারের কর্ণধার এবং প্রধানমন্ত্রী শহীদ সুরাবর্দীর প্রত্যক্ষ প্ররোচনা ও প্রশ্রয়ে হিন্দু উৎপীড়ন ও নিধন যজ্ঞের সূত্রপাত। প্রথম তিন দিন এক রকম একতরফা নিগৃহীত হবার পর হিন্দুরাও সংগঠিত হয়ে প্রতিআক্রমণ শুরু করার পর কলকাতার বুকে দীর্ঘকালব্যাপী হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা চলল। এর জের বোম্বাই, করাচী, সীমান্ত প্রদেশ, নোয়াখালি ও বিহার হয়ে প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ল এবং এই ঘটনার ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেকার পারস্পরিক বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেল। পরিণামে ভারত-বিভাজন অনিবার্য হয়ে পড়ল।

মনুষ্যত্বের সাময়িক পরাজয়ের অমানিশা-পর্ব কলকাতার দাঙ্গার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে পাঠকের মনকে পীড়িত করা নিষ্প্রয়োজন। তবে যে দাঙ্গায় কমপক্ষে পাঁচ হাজার (মতান্তরে দশ) নর-নারী-শিশু নিষ্ঠুর ভাবে মৃত, পনের হাজার আহত এবং নারীর সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হয় ও দীর্ঘকাল ব্যবসা-বাণিজ্যসহ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পর্যুদস্ত ও লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ভস্মসাৎ অথবা লুণ্ঠিত হয়, তার স্বরূপ উপলব্ধি করার জন্য তদানান্তন ছোটলাটের ঐদিনকার একটি প্রতিবেদনের অংশবিশেষই যথেষ্ট : "সকাল ৭টা থেকেই উত্তর-পূর্ব কলকাতার মানিকতলা এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে দিনের বাকী অংশে তা চলার সঙ্গে সঙ্গে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে।...অস্ত্র হিসাবে প্রধানতঃ ইঁটের টুকরো ব্যবহৃত হয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই বন্দুক ব্যবহার করেছিল এবং ছুরিকাঘাতের কয়েকটি ঘটনাও জানা গেছে।...এযাবৎ যেসব গোলযোগের খবর পাওয়া গেছে তা স্পষ্টতঃ সাম্প্রদায়িক এবং কোনক্রমেই ব্রিটিশ-বিরোধী নয়—আবার বলছি ব্রিটিশ-বিরোধী নয়।"[১৮] অনুগামীদের উপর নিয়ন্ত্রণবিহীন নেতাদের দায়িত্বজ্ঞান-বিহীন উক্তি ও আচরণের কী পরিণাম হতে পারে কলকাতা থেকে প্রারব্ধ সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডের একটানা ঘটনা তার প্রমাণ।

কলকাতার দাঙ্গা সম্বন্ধে জিন্নার প্রতিক্রিয়াও উল্লেখযোগ্য। জনৈক বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে ঐ মাসের শেষভাগে এ প্রসঙ্গে তিনি বললেন, "কংগ্রেসী সরকারগুলি যদি মুসলমানদের অবদমিত ও পীড়ন করা আরম্ভ করে, তাহলে গোলযোগ নিয়ন্ত্রিত করা অত্যন্ত দুরূহ হবে।...আমার মতে সোজাসুজি পাকিস্তান

প্রতিষ্ঠা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই।...ভারতবর্ষের যথার্থ স্বাধীনতা এবং এই উপমহাদেশের সকল অধিবাসীর কল্যাণ ও সুখের এই হল ত্বরিত পন্থা।”[১৯] যাবতীয় দায়িত্ব অপরের উপর চাপিয়ে দিয়ে তিনি “লীগ ও বঙ্গের লীগ সরকারের বদনাম করার জন্য হিন্দুদের সংগঠিত ষড়যন্ত্র বলে একে আখ্যা দিলেন এবং সব কিছুর জন্য ক্যাবিনেট মিশন, কংগ্রেস ও গান্ধীজীর উপর দোষারোপ করলেন।”[২০] জিন্না গান্ধী ছিলেন না, যিনি স্বসৃষ্ট আন্দোলন হিংসাত্মক হয়ে ওঠায় তার উত্তুঙ্গ অবস্থার মধ্যে প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে পারেন যে আন্দোলন শুরু করে তিনি হিমালয়-সদৃশ ভ্রান্তি করেছেন। অন্তরঙ্গ সহকর্মীদের প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও চৌরীচেরার ঘটনার পর গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন এবং তার থেকেও বড় কথা—এক গণ আন্দোলন প্রত্যাহার করার ক্ষমতাও তাঁর ছিল।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে—রুচি শিক্ষা ও সংস্কারে স্বয়ং এজাতীয় রক্তপাত এবং অন্যবিধ নিষ্ঠুর ও বর্বর ঘটনাবলীর সমর্থক না হয়েও জিন্না কেন কলকাতার দাঙ্গার জন্য যথার্থ দায়ী ব্যক্তিদের প্রকাশ্যে নিন্দা করতে পারেন নি? আর কয়েক মাস পর যখন পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে তাঁর দলের আড়ালে আইন অনুসারে গঠিত সরকার ও ভিন্ন সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের উপর হিংসাত্মক ঘটনাবলীর অনুষ্ঠান হতে থাকে তখনও জিন্নার ভিতর এইভাবে সত্যের সম্মুখীন হবার শক্তির অভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। তাঁর মত প্রখর বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে ঐসব ঘটনার পিছনে যাঁদের গোপন হাত কাজ করছিল তা অবিদিত ছিল না। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে লীগের অসংহত, বিশৃঙ্খল অবস্থা দিয়ে কেবল এমন গুরুত্বপূর্ণ স্থিতির ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। ব্যাপারটার পিছনে নেতৃত্বের চারিত্রধর্ম ক্রিয়াশীল বলে অনুমান হয়। অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতা তাঁদের সম্ভাব্য সমর্থকদের মুখ চেয়ে, তাঁদের সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে প্রযত্ন করেন। জনতার মনোভাব দেখে তাঁরা কথা বলেন বা কাজ করেন যাতে জনসমর্থন বজায় থাকে। করতালিধ্বনি তাঁদের অস্তিত্বের আধার। কোটিকে গুটিক নেতা প্রয়োজনে জনমতবিরোধী কথা বলে জনতাকে অবাঞ্ছিত পথ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার প্রয়াস করার সৎসাহস দেখাতে পারেন। উভয় শ্রেণীর নেতারই অস্তিত্বের ভিত্তি হল স্ব স্ব জীবন-দর্শন। এর সঙ্গে তাঁদের লক্ষ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান। জিন্নার লক্ষ্য কি ছিল? ইতিপূর্বে উল্লিখিত লীগের আইনসভার সদস্যদের এপ্রিলের সভায় তাঁদের সম্বোধন প্রসঙ্গে তিনি যা বলেন তার এক জায়গায় এর আভাস পাওয়া যায়:

“কীসের জন্য আমরা লড়াই করছি? আমাদের লক্ষ্য কি? ধর্মভিত্তিক

শাসনব্যবস্থা অথবা রাষ্ট্র আমাদের লক্ষ্য নয়। ধর্মের ভূমিকা অবশ্যই আছে এবং ধর্ম আমাদের কাছে প্রিয়ও বটে। পার্থিব তাবৎ বস্তু আমাদের কাছে ধর্মের তুলনায় তুচ্ছ। কিন্তু এছাড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অন্য ব্যাপার আছে এবং এ হল আমাদের সামাজিক ও আর্থিক জীবন। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যতিরেকে কি ভাবে আপনারা নিজ ধর্মবিশ্বাস ও আর্থিক জীবনকে রক্ষা করতে সমর্থ হবেন?"[২১]

সুতরাং প্রশ্নটা হল "রাজনৈতিক ক্ষমতার"।

॥ ২৭ ॥

একটি প্রবাদ আছে যে মানুষ যখন নীচের দিকে পড়া শুরু করে তখন তার শেষ গন্তব্যস্থল হল একেবারে শেষতলা। রাজনৈতিক ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষাচালিত জিন্নার পরবর্তী কার্যকলাপ এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসের ভবিষ্যৎ-গতি ঐ প্রবাদবাক্যের অন্তর্নিহিত সত্যের দ্যোতক।

২৪শে আগস্ট বড়লাট ঘোষণা করলেন যে নেহরুর নেতৃত্বে ১৪ জনের অন্তর্বর্তী সরকার পরবর্তী মাসের গোড়ার দিকে কার্যভার গ্রহণ করবে। এর প্রতিবাদে জিন্না মন্তব্য করলেন যে বড়লাট, "মুসলিম লীগ ও মুসলিম-ভারতকে এক প্রবল আঘাত করেছেন। তবে আমি নিশ্চিত ভাবে জানি যে ভারতবর্ষের মুসলমানরা এ আঘাতকে বীরোচিত সহিষ্ণুতা ও সাহস সহকারে সহ্য করবেন এবং অন্তর্বর্তী সরকারে আমাদের ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানজনক স্থান পেতে ব্যর্থ হবার ঘটনা থেকে শিক্ষাগ্রহণে সমর্থ হবেন।...আমি এখনও মনে করি যে বড়লাট যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা অতীব অবিজ্ঞোচিত ও রাজনৈতিক বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। এর পরিণাম বিপজ্জনক ও গুরুতর হবার সম্ভাবনা। অন্তর্বর্তী সরকারে এমন তিনজন মুসলমান সদস্য বড়লাট মনোনয়ন করেছেন যাঁরা মুসলিম-ভারতের শ্রদ্ধা বা আস্থাভাজন নন—একথা তিনি স্বয়ং জানেন। এ ব্যাপারটা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেবার মত।"[১] এর দিনকয়েক পরই প্রস্তাবিত মন্ত্রিসভার জনৈক সদস্য স্যার শাফৎ আহমদ খাঁকে সিমলায় লীগের দুজন উগ্রপন্থী যুবক নিষ্ঠুরভাবে (সাত বার) ছুরিকাঘাত করে মৃতজ্ঞানে তাঁকে রেহাই দেয়। রফি আহমদ কিদওয়াই-এর ভ্রাতা সংযুক্ত প্রদেশের মন্ত্রী শফি আহমদকে মুসৌরীতে হত্যা করা হয়।

দোসরা সেপ্টেম্বর জওহরলাল ও তাঁর তেরজন সহকর্মী অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। কিন্তু লীগ ও তার সমর্থকরা কৃষ্ণবর্ণ পতাকা উত্তোলন করে

এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানালেন। এর প্রতিক্রিয়া বৃহত্তর মুসলিম সমাজে দেখা দিল। প্রতিক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হিন্দু সমাজেও। সব মিলিয়ে ভারতবর্ষের পরিস্থিতি অগ্নি-গর্ভ। মাঝে মাঝে চাপা উত্তেজনা অগ্নিস্ফুলিঙ্গরূপে ফুটে উঠছে বোম্বাই করাচী প্রভৃতি নানা শহরের বিচ্ছিন্ন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়। ওয়াভেল তখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে লীগকে দায়িত্বশীল করার জন্য মন্ত্রিসভায় আনা দরকার। সম্ভবতঃ কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের উচ্চপদস্থ লীগ-হিতৈষীরা ভেবেছিলেন যে তাঁদের আশ্রিত লীগ অন্তর্বর্তী সরকারের বাইরে থেকে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে এবং তাই তাঁরা যে-কোন মূল্যে লীগকে সরকারের অন্তর্ভুক্তি করার প্রয়াসী ছিলেন। একই উদ্দেশ্যচালিত হয়ে ওয়াভেল কংগ্রেসের দাবি সত্ত্বেও অবিলম্বে গণপরিষদ আহ্বান করছিলেন না, যাতে লীগকে তাতে যোগদান করতে রাজী করানো যায়। ভারত-সচিব বড়লাটকে পরামর্শ দিলেন যে গণপরিষদ আহ্বানকে বিলম্বিত করে যেন কংগ্রেসের সঙ্গে বিবাদ না করা হয়। এই সময়ে জনৈক বিদেশী সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে জিন্না তাঁর ক্ষোভ ও হতাশাকে ব্যক্ত করে বলেন, "আঘাত অত্যন্ত গভীর এবং আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের প্রতি এই পরিমাণ তিক্ততা ও বিদ্বেষ প্রদর্শন করা হয়েছে যে এই বাদ-বিবাদকে আরও দীর্ঘায়ত করার উৎসাহ আমাদের নেই।...আমার পক্ষের ওকালতি আমি কখনও করব না।...ব্রিটিশ সরকার যদি বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে তাঁদের বেয়নেট দ্বারা সমর্থন ছাড়া আর কিছু না করেন, তাহলে আমি কেবল এইটুকুই বলতে পারি যে মুসলমানরা তা সহ্য করতে পারবে। তাঁরা যদি আমাকে এখন গ্রেপ্তার করতে চান তবে আমি অবিলম্বে জেলে যেতে রাজী আছি।"[২]

জিন্না কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতার সিংহদ্বার থেকে প্রত্যাবর্তন করতেই বাধ্য হন নি, যে ধরণের অর্থাৎ আইনসভার বক্তৃতা ও আলাপ-আলোচনার রাজনীতিতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন তার সুযোগে বঞ্চিত হয়ে বাধ্যতামূলক ভাবে যবনিকার অন্তরালে নির্বাসিত। সুতরাং পাদপ্রদীপের আলোকের সামনে আসার জন্য তাঁর এই মরীয়া হয়ে প্রয়াস—হয় আলাপ-আলোচনা, নচেৎ কারাবরণের বাসনা। রঙ্গ-মঞ্চের সম্মুখভাগে আসার এই অভিনেতাসুলভ কামনা সব রাজনৈতিক নেতার ভিতরই অল্প-বিস্তর বিদ্যমান। আর পাঠক স্মরণ করবেন যে জিন্না শব্দার্থেও প্রথম সারির অভিনেতা, পিতার অনিচ্ছার কারণে যিনি পেশাদার অভিনেতার জীবন গ্রহণ করা থেকে বিরত হয়েছিলেন।

জিন্নার রাজনৈতিক জীবনেও তখন গভীর সঙ্কট। প্রস্তাবিত পাকিস্তানের

প্রদেশগুলির মধ্যে কেবল সিন্ধু ও বঙ্গেই নূতন সাধারণ নির্বাচনের পর লীগ মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হয়েছিল। কিন্তু লীগ সংগঠন ও নেতৃত্বের দুর্বলতার জন্য সিন্ধুর গোলাম হোসেন মন্ত্রিসভার টলমল অবস্থা। বিধান সভায় সরকার ও বিরোধী দলের সংখ্যা সমান সমান। সুতরাং জি. এম. সৈয়দের গোষ্ঠীর কংগ্রেস ও নির্দলীয় সদস্যদের সহায়তায় গোলাম হোসেনের পরিবর্তে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করার প্রবল সম্ভাবনা ছিল। জিন্নাকে কোণঠাসা করার জন্য কংগ্রেস ঐ পরিস্থিতির সুযোগ নিতে কার্পণ্য করবে না—এ সত্য দিবালোকের মত স্পষ্ট ছিল। সৈয়দের গোষ্ঠী ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবিত প্রদেশ-গোষ্ঠী গঠনেরও প্রকাশ্য বিরোধী ছিল। ঐ অবস্থায় সিন্ধুর ছোটলাট স্যার ফ্রান্সিস মুডি লীগের ত্রাণকর্তার ভূমিকা নিলেন। সৈয়দগোষ্ঠীকে কংগ্রেসের সহায়তায় ক্ষমতা নিতে দেবার বদলে মুডি বিধানসভা ভঙ্গ করে নূতন নির্বাচনের সুপারিশ করলেন এবং লীগকেই অস্থায়ী সরকারের দায়িত্ব দিলেন। স্বভাবতই নূতন নির্বাচনে লীগের কপাল ফিরে গেল এবং পূর্বেই (পাদটীকা সংখ্যা ৯, অধ্যায় সংখ্যা ২৪) বলা হয়েছে যে খলিকুজ্জমাঁ এর জন্য মুডির কাছে অজস্র কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন। লীগের দ্বিতীয় দুর্গ বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দীর সঙ্গে জিন্নার সম্বন্ধ কোন কালেই হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল না। প্রত্যক্ষ সংগ্রামকে উপলক্ষ্য করে সুরাবর্দীর প্রশ্রয়ে তাঁর আশ্রিত সমাজবিরোধী ব্যক্তিরা হিন্দু-নিধন-যজ্ঞে রত হলেও অনতিবিলম্বেই ঐ পদক্ষেপ ব্যুমেরাং হয়ে তাঁর ক্ষমতার উৎসকেই আঘাত করে। ফলে নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সুরাবর্দী বিচলিত হয়ে পড়েন। সুতরাং ৬ই সেপ্টেম্বর তিনি জিন্নার কাছে অনুরোধ জানান যে তাঁকে যেন বাংলার কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গড়ার জন্য আলোচনা শুরু করার অনুমতি দেওয়া হয়। জিন্না ইতিপূর্বে কেন্দ্রসহ মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশসমূহেরও কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গডার কর্মসূচীর প্রবক্তা ছিলেন। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে অন্য প্রদেশে তো দূরের কথা, কেন্দ্রেও তিনি ক্ষমতাপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত এবং মাত্র কয়েকদিন পূর্বে কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকারের কর্ণধার হয়েছে। সুতরাং তিনি সুরাবর্দীর প্রস্তাব এই বলে সরাসরি অগ্রাহ্য করলেন যে কেন্দ্রে লীগ ক্ষমতায় না আসা পর্যন্ত এ প্রশ্ন ওঠে না।[৩]

১৬ই সেপ্টেম্বর থেকে আরম্ভ করে দোসরা অক্টোবর পর্যন্ত জিন্নার সঙ্গে দফায় দফায় দীর্ঘ আলোচনা করার পর বড়লাট লীগকে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিতে রাজী করালেন। জিন্নার এই সময়কার ভূমিকা বর্ণনা প্রসঙ্গে আয়েষা জালাল বলেছেন: "গভীর রাজনৈতিক বিপর্যয়, প্রবল দুর্বিপাক এবং বিরামহীন নিষ্পেষণের খেলার সম্মুখীন হবার পরও জিন্না যে উল্লেখযোগ্য স্থিতিস্থাপকতার পরিচয় দিতেন

তার অন্যতম রহস্য হল—যখন সাধারণ মানুষের মনে হবে যে সর্বনাশ হয়ে গেছে তখনও লড়াই চালিয়ে যাবার তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা। সুতরাং অতঃপর তিনি ঘোষণা করলেন যে, 'শ্লেটকে পরিষ্কার করে মুছে ফেলতে হবে এবং গোড়া থেকে আরম্ভ করতে হবে।' লণ্ডনে গিয়ে তিনি 'অন্যান্য পক্ষের সঙ্গে সমান ভিত্তি'তে আলোচনা করতে প্রস্তুত। এই প্রথমবার জিন্না যে অচলাবস্থা আরও জটিল হয়ে উঠছিল তার সমাধানের জন্য প্রকাশ্যে নিজের প্রস্তুতির কথা ঘোষণা করলেন। জিন্না দেখিয়ে দিলেন যে কংগ্রেস কিছুটা দিতে রাজী হলে তিনি আরও বেশী দিতে প্রস্তুত এবং 'তাঁর বর্তমান দাবির থেকে কম নিয়ে' তিনি পিছনের দিকে ঝুঁকে যাবেন—'বিশেষতঃ যখন কংগ্রেসের লক্ষ্য মনে হয় নিজের ক্ষমতা সংহত করা ও লীগকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা।' তবে কংগ্রেসকে নড়ানো গেল না, কারণ ওয়াভেলের মতে সে দল তখন 'ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছে' এবং দলের হাইকম্যাণ্ড 'সে ক্ষমতার ভাগ আর কাউকে দিতে চায় না'। পক্ষান্তরে ওয়াভেলের মতে জিন্না অস্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন (ভারতীয় ও ব্রিটিশ লেখকদের মতে পিশাচসিদ্ধ অপদেবতা এবং পাকিস্তানের সন্ত উপাখ্যান রচয়িতাদের মতে বিজয়ী বীর) তখন, "অত্যন্ত শান্ত ও যুক্তিনিষ্ঠ এবং মর্যাদা জলাঞ্জলি না দিয়ে যদি সম্ভব হয় তবে একটা বোঝাপড়ায় উপনীত হতে আগ্রহী।" ওয়াভেলের মতে অন্তর্বর্তী সরকারের ক্ষেত্রে জিন্নার 'প্রধান বক্তব্য' হল 'তাঁর ওয়ার্কিং কমিটিকে বোঝাবার মত এমন কিছু চাই যে সব ব্যাপারে তিনি পরাজিত হন নি এবং কংগ্রেসের বশংবদ হিসাবে তিনি সরকারে যোগদান করছেন না।"[৪]

লীগকে অন্তর্বর্তী সরকারে আনার জন্য বড়লাটের আগ্রহের অপর একটি ভাষ্য হল গোড়ায় এর মাধ্যমে লীগকে দায়িত্বশীল করা ওয়াভেলের উদ্দেশ্য হলেও ইতিমধ্যে জওহরলাল ও প্যাটেলের সঙ্গে নানা উপলক্ষে তাঁর সংঘর্ষের জন্যও মন্ত্রী-মণ্ডলে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া করার জন্য লীগের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্তির জন্য তিনি ইচ্ছুক ছিলেন। ওয়াভেলের পরামর্শদাতা উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরাও গতকাল পর্যন্ত যাঁরা বিদ্রোহী ছিলেন, সেই সব কংগ্রেসী নেতাদের অধীনে কাজ করতে অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তাঁরা বরং লীগ নেতাদের সঙ্গে কাজ করা অধিকতর অনুকূল মনে করতেন।[৫] তাঁদের দ্বারা ওয়াভেলের প্রভাবিত হবার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। কংগ্রেসের চাপে ওয়াভেল ৯ই ডিসেম্বর গণপরিষদের প্রথম সভা আহ্বানের জন্য আপাততঃ রাজী হয়েছিলেন। এই সময়ে ওয়াভেলের ধারণা হয়েছিল যে গান্ধীসহ কংগ্রেসের তাবৎ নেতারা লীগের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে ভোগ

করতে ইচ্ছুক নয় এবং তাঁরা চাপ দিয়ে লীগকে গণপরিষদে আনতে চান। কংগ্রেসের নেতৃবর্গও ভারতসচিব ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে বড়লাটের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে দাবি জানিয়েছিলেন যে ওয়াভেলের বদলে আর কাউকে যেন বড়লাট করে পাঠানো হয়।

"তাঁকে স্বমতে আনার জন্য ওয়াভেলের আকুলতা অথবা অন্তর্বর্তী সরকারের তরণীতে ঠাঁই লাভে বঞ্চিত হওয়ার ফলে নেহরু আপাতদৃষ্টিতে যে পরিমাণ ক্ষমতা ও আড়ম্বর ভোগ করছিলেন তজ্জনিত জিন্নার তদানীন্তন হতাশার কারণেই হোক, অক্টোবরের সেই আলাপ-আলোচনা দ্রুত সেই উদ্দেশ্য সাধন করল যা বছরের গোড়ার দিকে ক্যাবিনেট মিশনের তিন মাসের প্রয়াস সত্ত্বেও অলভ্য রয়ে গিয়েছিল। সম্ভবতঃ কলকাতার বিরাট নরমেধযজ্ঞ, বোম্বাই-এর রক্তাক্ত দাঙ্গা অথবা তাঁর কাউনসিলের ধৈর্য্যচ্যুতি কিংবা তাঁর নিজের ক্ষীয়মাণ স্বাস্থ্যজনিত বিয়োগান্তক প্রশান্ত বাস্তব অবস্থা জিন্নাকে রেকর্ড ভঙ্গকারী মাত্র দু' সপ্তাহের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে লীগকে কংগ্রেসের সঙ্গে এক অন্তর্বর্তী কোয়ালিশন সরকারে যোগ দেবার ব্যাপারে একটা বোঝাপড়ায় উপনীত হতে নমনীয় হবার চেয়েও অধিক অগ্রসর হতে অনুপ্রাণিত করেছিল। নেহরু ও কংগ্রেস না তাঁকে গললগ্ন করেছিলেন আর না তাঁর অহমিকার কথা চিন্তা করেছিলেন। পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ঐ রকম নেতিবাচক ইঙ্গিত জিন্নার মনে সম্ভবতঃ এই ধারণার সৃষ্টি করেছিল যে অতঃপর আর দেরি না করে যতক্ষণ ধরার মত একগাছা কাছি আছে এবং জাহাজের কর্তা তাঁকে এমন হৃদ্যতাসহকারে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত, তখন অতিরিক্ত মালপত্র ফেলে দিয়ে নৌযানে উঠে পড়াই বাঞ্ছনীয়।"৬

অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরূপ এবং লীগের প্রতিনিধিদের কোন্ কোন্ দপ্তর দেওয়া হবে এ নিয়েও নেহরু-জিন্না ও বড়লাটের মধ্যে আরও কিছুদিন আলাপ-আলোচনা ও পত্র-বিনিময় হয়েছিল। অন্ততঃ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হিসাবে লীগ প্রথমে স্বরাষ্ট্র দপ্তর চেয়েছিল। ঐ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত প্যাটেল দপ্তর ছাড়ার পরিবর্তে বরং পদত্যাগ করতে প্রস্তুত হন। ফলে কংগ্রেসের সম্মতিক্রমেই লীগের নেতা লিয়াকৎকে তাঁদের মতে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ অর্থদপ্তর দেওয়া হয়। অথচ প্রশাসনে অর্থদপ্তরের গুরুত্ব অপরিসীম। ঐ দপ্তরের অনুমোদন ছাড়া অন্যান্য মন্ত্রক একেবারে শব্দার্থে একটি পয়সাও খরচ করতে পারে না। অর্থবিভাগের প্রবীণ অফিসার চৌধুরী মহম্মদ আলী এবং আরও কয়েকজন পদস্থ ঝানু মুসলিম আমলার পরামর্শে লিয়াকৎ আলী খাঁ কংগ্রেসী সদস্যদের প্রস্তাবে প্রতি পদে এমন বাধাসৃষ্টি করতে থাকেন যে

অন্তর্বর্তী সরকারের কাজকর্ম অচল হবার উপক্রম হবার সঙ্গে সঙ্গে প্যাটেলের মত কূটবুদ্ধিসম্পন্ন নেতাও নাজেহাল হয়ে যে-কোন মূল্যে লীগ প্রতিনিধিদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে মনে মনে প্রস্তুত হন। মাউণ্টব্যাটেন কর্তৃক কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে সর্বাগ্রে প্যাটেলকে ভারতবিভাগে সম্মত করার পিছনে লিয়াকতের দ্বারা অর্থদপ্তরের পরিচালনার তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁর মনে ক্রিয়াশীল ছিল।

অবশেষে লীগ প্রতিনিধিরা "বড়লাটের অনুরোধে" (শাসনপরিষদের সহ-সভাপতি এবং কোয়ালিশনের নেতা জওহরলালের আমন্ত্রণে নয়) ২৬শে অক্টোবর শাসন-পরিষদের সদস্যরূপে শপথগ্রহণ করলেন। জিন্না স্বয়ং লীগের প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন না। সে দলে ছিলেন নেতা লিয়াকৎ আলী খাঁ ছাড়া চুন্দ্রীগড, আবদুর রব নিস্তার, গজনফর আলী খাঁ ছাড়া কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী মুসলমান প্রতিনিধির জবাব—তপসিলী হিন্দু সম্প্রদায়ের যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। জিন্না কর্তৃক শ্রীযুক্ত মণ্ডলকে অন্যতম লীগ প্রতিনিধি করায় দেশবাসীর সঙ্গে সঙ্গে বহু লীগ নেতাও হতবাক্ হয়ে যান। নবাব ইসমাইল খাঁ এর ব্যর্থ বিরোধ করেন। খলিকুজ্জমা প্রশ্ন তোলেন, দ্বিজাতি তত্ত্বের সঙ্গে এটা কি করে খাপ খায়?

জওহরলাল জিন্নাকে লিখেছিলেন যে, "সমগ্র ভারতবর্ষের তরফ থেকে এক সংযুক্ত দল হিসাবে কাজ করার জন্য আমরা তাই লীগের অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদানের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাব।"[৭] কিন্তু উভয় পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের অভাবের জন্য অবস্থা কি রকম দাঁড়াবে তার সূচনা লীগ প্রতিনিধিরা শাসনপরিষদে যোগ দেবার পূর্বেই পাওয়া গিয়েছিল। তাঁদের অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদানের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে লিয়াকৎ ২০শে অক্টোবর করাচীর এক জনসভায় বলেন যে, "কংগ্রেস মনে মনে লীগের যোগদানের বিরোধী" এবং তাই মুসলমানদের নিজ প্রয়াস বিন্দুমাত্র শিথিল করা চলবে না এবং পূর্বের মতই মুসলমানদের নিজেদের চূড়ান্ত লক্ষ্য—পাকিস্তান প্রাপ্তির প্রস্তুতির জন্য লড়াই করতে হবে।[৮] শাসনপরিষদে যোগদানের জন্য মনোনীত অন্যতম সদস্য রাজা গজনফর আলী খাঁও অনুরূপ মনোভাবের পরিচয় দিলেন। লাহোরে ছাত্রদের সম্বোধন করে তিনি বললেন যে তাঁর লক্ষ্য হল, "আমাদের বাঞ্ছিত আদর্শ পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করার উদ্দেশ্যে পা রাখার মত একটু জমি পাওয়া।...অন্তর্বর্তী সরকার হল প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অন্যতম ফ্রন্ট।"[৯] সরকারের সদস্য হিসাবে শপথ গ্রহণ করার কয়েক দিন পূর্বে (১৯শে অক্টোবর) ভারতব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সমর্থনে তিনি আরও বললেন, "কেন্দ্রে কেবল কংগ্রেসীদের সরকার গঠিত হবার পর দেশের অনেক এলাকায় যেসব গোলযোগ ঘটেছে তা এই

কথা সপ্রমাণ করে যে তাঁদের যথার্থ প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত না করলে ভারতের দশ কোটি মুসলমান কোন সরকারের কাছে নতিস্বীকার করবে না।"১০ আমেরিকায় প্রেরিত জিন্নার "ব্যক্তিগত প্রতিনিধি" বাংলার লীগ-নেতা ইস্পাহানীও অনুরূপ প্রকাশ্য মন্তব্য করলেন।

শাসনপরিষদে লীগ-প্রতিনিধিরা কোয়ালিশনের সদস্য হিসাবে তার নেতা নেহরুর নেতৃত্বে যৌথ দায়িত্ব পালনে অস্বীকার করলেন এবং স্বাভাবিক প্রশাসন পরিচালনার পথে পদে পদে সমস্যা সৃষ্টি করতে লাগলেন। তাঁরা বড়লাটের আমন্ত্রণে শাসনপরিষদে যোগ দিয়েছেন বলে তাঁদের আনুগত্য কেবল তাঁরই কাছে, কোয়ালিশনের নেতা নেহরুর প্রতি তাঁদের কোন দায়িত্ব নেই—এই হল তাঁদের ভূমিকা। এমন কি নেহরুকে কোয়ালিশনের নেতা হিসাবে স্বীকার করতেও লীগ প্রস্তুত ছিল না এবং জিন্না বড়লাটের কাছে অন্তর্বর্তী সরকারে নেহরুর সহ-সভাপতি পদ সম্বন্ধেই আপত্তি জানিয়েছিলেন। এ ছাড়া জিন্না লীগ প্রতিনিধিদের সরকারীভাবে মুসলিম স্বার্থের "প্রহরী" হবার পরামর্শ দিয়েছিলেন বলে তাঁরা তদনুরূপ আচরণ করতে লাগলেন। প্রত্যুতঃ সরকার সাম্প্রদায়িক বিবাদের আখড়া এবং সচিবালয় এক পক্ষের অপর পক্ষকে নাস্তানাবুদ করার গোপন ষড়যন্ত্র এবং কার্যকলাপের কেন্দ্র হয়ে উঠল। লীগের প্রতিনিধিদের অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান সব মিলিয়ে ভারত বিভাগের পথকে প্রশস্ত করল। তা ছাড়া লীগ গণপরিষদে অংশগ্রহণ করতে অথবা কংগ্রেসের দাবি এবং বড়লাটের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও ১৬ই মে-র ঘোষণাকে নাকচ করে যে প্রস্তাব ইতিপূর্বে নিয়েছিল তা সংশোধন করতে রাজী হল না। অথচ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করার তা ছিল অপরিহার্য শর্ত।

ইতিপূর্বে ১০ই অক্টোবর ভারতবর্ষ তথা বাংলার অগ্নিকোণে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠেছিল ক্রমশঃ তা দাবানলের রূপ পরিগ্রহ করে সমস্ত দেশকে ছারখার করার আয়োজন করেছিল। অসংখ্য নদী-নালায় সিঞ্চিত, নারিকেল-সুপারির ছায়াঘেরা নোয়াখালির (হিন্দুদের জনসংখ্যা শতকরা ১৯ ভাগেরও কম, বাকি মুসলমান) হিন্দুদের উপর সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমান সমাজবিরোধীদের যে ব্যাপক আক্রমণ হয় তার খবর বঙ্গের লীগ সরকার পুরো এক সপ্তাহ প্রকাশিত হতে দেয় নি। নোয়াখালি, সন্দীপ ও ত্রিপুরার চর অঞ্চলের প্রায় ৫০০ বর্গমাইল বিস্তীর্ণ এলাকায় লীগ সমর্থক সমাজবিরোধীদের নেতৃত্বে "কলকাতার প্রতিশোধ" নেবার জন্য প্রায় পনের দিন যাবৎ হিন্দুদের বাড়ি-ঘর-সম্পত্তির ব্যাপক লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের সঙ্গে সঙ্গে (ঐ পরিস্থিতিতে সঠিক সংখ্যা পাওয়া কঠিন) সহস্রাধিক নর-নারী-শিশু ক্ষমতাদ্বন্দ্বের

শিকার হিসাবে ভবলীলা সাঙ্গ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু হত্যার চেয়েও বীভৎস ব্যাপার ছিল হিন্দু নারীর সম্ভ্রম লুণ্ঠনের এবং তাদের জোর করে মুসলমানদের সঙ্গে বিবাহ দেবার বহু ঘটনা। আর ছিল জবরদস্তি হিন্দুদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করানোর অজস্র উদাহরণ। হাজার হাজার হিন্দু ঐ অঞ্চলে কেবল উদ্বাস্তুই হন নি, যে মুসলমানদের পাশাপাশি তাঁরা শত শত বৎসর যাবৎ বাস করে এসেছেন, এই সব বীভৎস ও জঘন্য ঘটনায় তাঁদের সঙ্গে প্রতিবেশীসুলভ বিশ্বাস ও নির্ভরতার সম্বন্ধই লোপ পাবার উপক্রম হয়। এর কিছুদিন পরে (২৫শে অক্টোবর) "নোয়াখালির প্রতিশোধে" বিহারের ছাপরায় যে মুসলমানবিরোধী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার স্ফুলিঙ্গ দেখা দেয়, ক্রমে ক্রমে তা দাবানলের মত পাটনা, মুঙ্গের, ভাগলপুর ও সাঁওতাল পরগনা প্রমুখ জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। বিহারে নিরীহ মুসলমান নর-নারী ও শিশুদের নোয়াখালির হিন্দুদের মতই নিষ্ঠুর ও অমানবীয় অত্যাচার, অপমান ও উৎপীড়নের শিকার হতে হয়।

নোয়াখালির পটভূমিকার মত বিহারেও প্রশাসনের ব্যর্থতা এবং শাসকদলের একাংশের ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় প্ররোচনা দানের নিদর্শন পাওয়া যায়। অবশ্য জওহরলাল (বিহারে গিয়ে দাঙ্গাকারীদের উপর বিমান থেকে বোমা বর্ষণের প্রস্তাব) সহ কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতারা বিহার সরকারকে দাঙ্গা দমনে সক্রিয় হতে প্রভাবিত করেন। অতঃপর গড়মুক্তেশ্বর, বোম্বাই—প্রায় সমগ্র দেশেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দাবানল ছড়িয়ে পড়ে ভারত-বিভাজনকে অনিবার্য করে তোলে। দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস ও লীগের নেতারা যখন দিল্লীতে ক্ষমতা ভাগাভাগি নিয়ে ব্যস্ত, তখন শ্মশানে শিবের মত গান্ধীর বিচরণ (২৭শে অক্টোবর তিনি নোয়াখালি যাত্রার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন) ও মানুষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করার প্রয়াস ভারতীয় উপমহাদেশের সেই ঘনকৃষ্ণ তমিস্রার পর্বে একমাত্র আলোকবর্তিকা ছিল।

জিন্নাও অবশ্য বিহারের দাঙ্গার পর (১২ই নভেম্বর) এক বিবৃতি প্রসঙ্গে হিন্দুদের দ্বারা ঠাণ্ডা মাথায় মুসলমানদের জবাই করার জন্য দুঃখ ব্যক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে বলেন, "...পাকিস্তানে মুসলমানদের মতই—না, তাঁদের চেয়েও বেশী করে সংখ্যালঘুদের জীবন সম্পত্তি এবং সম্মানের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। মুসলমানরা যদি তাঁদের চিত্তের স্থৈর্য হারান ও প্রতিশোধবৃত্তির পরিচয় দেন এবং এইভাবে আমাদের মহান ইসলাম ধর্মের শিক্ষা ও সুউচ্চ নৈতিক আচারবিধির অনুপযুক্ত প্রতিপন্ন হন তাহলে আপনারা কেবল নিজেদের পাকিস্তানের দাবিই হারাবেন না,

আমাদের আচরণের ফলে রক্তপাত ও নিষ্ঠুরতার এমন এক দুষ্টচক্রের সূত্রপাত হবে, যা অনতিবিলম্বে আমাদের স্বাধীনতার দিনকে বিলম্বিত করবে।"[১১] জিন্নার এই শান্তির ললিত-বাণী তাঁর অনুগামীদের কতজনের কাছে পৌঁছেছিল বলা কঠিন। তবে ইতিমাধ্য "লড়কে লেঙ্গে" মনোভাবে ওতপ্রোত লীগ কর্মী ও সমর্থকদের কাছে যে তা ব্যর্থ পরিহাসে পর্যবসিত হয়েছিল, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

যাই হোক, একদিকে তখন দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন জ্বলছে এবং অন্য দিকে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের জন্য ক্ষতবিক্ষত অন্তর্বর্তী সরকার পঙ্গু ও ঘটনাবলীর অসহায় দর্শক। বঙ্গের হিন্দু-পীড়ন বন্ধ করার জন্য প্যাটেল সেখানকার লীগ মন্ত্রিমণ্ডলকে বরখাস্ত করে কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়িত্ব দেবার প্রস্তাব দিলেন। ঐ প্রস্তাব রাজনৈতিক কথার কথা হলেও তখনকার অবিশ্বাসপূর্ণ পরিস্থিতিতে জিন্না ও লীগকে উত্তেজিত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। বিশেষ যখন অনুরূপ পরিস্থিতিতে বিহারের কংগ্রেস-প্রশাসন সম্বন্ধে কংগ্রেস হাইকমাণ্ড একই নিদান দিচ্ছেন না। এ ছাড়া কংগ্রেসের দাবি হল—লীগকে হয় ক্যাবিনেট মিশনের দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তাব বাতিল করার সিদ্ধান্ত খারিজ করে গণপরিষদে যোগ দিতে হবে, নচেৎ অন্তর্বর্তী সরকার ছাড়তে হবে। কংগ্রেস কিন্তু বাধ্যতামূলক প্রদেশগোষ্ঠী গঠনের ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি না দিয়ে এ ব্যাপারে ফেডারেল কোর্টের রায় মেনে নেবার অধিক অগ্রসর হতে প্রস্তুত নয়। লীগ না মিশনের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করার প্রস্তাব গ্রহণ করবে আর না অন্তর্বর্তী সরকার থেকে পদত্যাগ করবে। জিন্না বরং নভেম্বরের মধ্যভাগে এক বিদেশী সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বললেন যে তাঁর মতে ভারতবর্ষের তদানীন্তন সমস্যার একমাত্র সমাধান হল "পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান" প্রতিষ্ঠায়। তিনি আরও জানালেন যে অন্তর্বর্তী সরকারে লীগ প্রতিনিধিরা রয়েছেন "প্রহরী হিসাবে" এবং দৈনন্দিন প্রশাসনে তাঁরা মুসলিম স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন। কংগ্রেসের চাপে এবং ভারতসচিবের অনুমোদনক্রমে বড়লাট গণপরিষদের সভা আহ্বান করায় জিন্না তার তীব্র প্রতিবাদ করে ২১শে নভেম্বর এক বিবৃতি প্রসঙ্গে জানালেন যে দেশের তখনকার অবস্থায় এ কাজ করা মারাত্মক ভুল হয়েছে এবং ৯ই ডিসেম্বর অর্থাৎ পরিষদের প্রস্তাবিত প্রথম বৈঠকে কোন লীগ-প্রতিনিধি যোগ দেবে না। স্পষ্টতঃ জিন্না বুঝেছিলেন যে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা আদায়ের পথে অন্তর্বর্তী সরকারে থাকা ও গণপরিষদে যোগ না দেওয়া তাঁর হাতে তুরুপের তাস এবং সুকৌশলে তিনি তাই নিয়ে খেলছিলেন। ২৬শে নভেম্বর করাচীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতবর্ষে তখনকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যালঘুদের স্বার্থে

জিন্না লোক-বিনিময়ের প্রস্তাব করেন।

ওয়াভেলের পায়ের নীচে থেকে তখন মাটি সরে যাচ্ছে। ব্রিটিশ সরকার যথা-সম্ভব শীঘ্র ক্ষমতা হস্তান্তরে ইচ্ছুক বলে এ ব্যাপারে কোন বিলম্ব বরদাস্ত করতে রাজী নন। তাই লীগের বাধাদানের নীতিকে প্রশ্রয় দেবার বদলে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও পদক্ষেপ সম্বন্ধে বিরূপ প্রতিবেদন সত্ত্বেও তাঁরা বড়লাটকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে যেন কোন বাধার প্রশ্রয় না দেওয়া হয়। ওয়াভেলের বিরুদ্ধে কংগ্রেস নেতাদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা অন্য বড়লাট পাঠাবার কথা ভাবছেন। লিয়াকতের মাধ্যমে লীগকে গণপরিষদে যোগ দিতে রাজী করতে অসমর্থ হয়ে বড়লাট তাঁর ব্যর্থতার কথা ২৩শে নভেম্বর ভারতসচিবকে জানালেন। অচলা-বস্থা দূর করার জন্য তিনি ওয়াভেলকে ভারতীয় নেতাদের নিয়ে লণ্ডনে এক আলো-চনার জন্য আহ্বান করলেন। বড়লাট ছাড়াও জিন্না (প্রাথমিক অনিচ্ছার পর প্রায় শেষ মুহূর্তে), লিয়াকৎ, নেহরু ও বলদেব সিং সেই আলোচনায় যোগ দিলেন। বলা বাহুল্য অবিশ্বাসের ঐ পরিপ্রেক্ষিতে ৩রা থেকে ৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ঐ বিশদ আলোচনা সত্ত্বেও কোন সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হল না।

জিন্নার ঐ সময়কার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় উড্রো ওয়াইআটের লিপি-বদ্ধ করা তেসরা ডিসেম্বরের এক নোটে। জিন্নাকে আরও কয়েকজন পার্লামেন্টের সদস্যের সঙ্গে পরিচিত করাবার জন্য ওয়াইআট এক ভোজসভার ব্যবস্থা করে-ছিলেন। তাঁর মতে জিন্না তীব্রভাবে বোধ করছিলেন যে কংগ্রেস যখন স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা বাতিল করেছিল তখন তাঁকে সরকার গঠন করতে দেওয়া উচিত ছিল। তাঁর দৃঢ় অভিমত এই যে কংগ্রেস কদাপি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে নি, তার উদ্দেশ্যও কখনও এমন ছিল না বা ভবিষ্যতেও এমন হবে না। বার বার তিনি বলছেন যে কংগ্রেসের একমাত্র অভিসন্ধি হল ক্ষমতা করায়ত্ত করা এবং তাতে বাধাসৃষ্টির জন্য যা-কিছু প্রয়োজন তিনি করবেন। ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবকে বর্তমানে তিনি প্রতারণা ও দমবাজি মনে করেন।…এখন তিনি এই যুক্তিতে প্রত্যাবর্তন করেছেন যে একমাত্র পাকিস্তান সৃষ্টির দ্বারাই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা সম্ভবপর। সিমলাতে তিনটি বিষয়ের ক্ষমতাসম্পন্ন এক কেন্দ্রীয় সরকারের যে প্রস্তাব তিনি করেছিলেন তা চিরতরে অন্তর্হিত বলে মনে হয়।…এ ব্যাপারে তাঁর প্রধান বুলি হল তাঁর কথিত বিহারে হিন্দু কর্তৃক সজ্ঞানে মুসলিম-নিধন। যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে যে কোন ব্যাপারে বোঝাপড়ায় উপনীত হবার দিক থেকে সেদিনকার মত অত খারাপ মেজাজে আর কখনও তাঁকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। গাড়িতে

চড়ার সময়ে শেষ যে কথা আমাকে তিনি বললেন তা হল 'তর্ক-বিতর্ক করার সময় আর নেই' ”।[১২]

পেথিক লরেন্সও সেদিন অপরাহ্ণে জিন্না ও লিয়াকতের সঙ্গে কথা বলে অনুরূপ ধারণা লাভ করেন। পরদিবস জিন্নার সঙ্গে কথা বলার পর প্রধানমন্ত্রী এটলী তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের জানালেন, “মিস্টার জিন্নার বক্তব্যের সারমর্ম ছিল এই যে ভারতবর্ষে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তন করার চেষ্টা করা ভুল হয়েছে।···মিস্টার জিন্নাকে এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় মনে হল যে, গণপরিষদের ব্যাপারে কংগ্রেস আসল কাজ কিছুই চায় না, তাঁর নিজের লক্ষ্য হচ্ছে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের ভিতর শুধু পাকিস্তান লাভ, কংগ্রেসের সঙ্গে কোন রকম বোঝাপড়ায় উপনীত হবার ব্যাপারে তাঁর আস্থা নেই।”[১৩] একই দিন নেহরুর সঙ্গে আলোচনার সময়ে ক্যাবিনেট মিশনের সদস্যরা ও বড়লাট লক্ষ্য করলেন যে তিনিও জিন্না বা লীগের সঙ্গে একযোগে চলতে প্রস্তুত নন। এই অবস্থায় আরও আলোচনার কোন অর্থ ছিল না। এছাড়া গণপরিষদের উদ্বোধনের দিন (৯ই ডিসেম্বর) নেহরু দিল্লীতে থাকতে ইচ্ছুক ছিলেন। সুতরাং ৬ই ডিসেম্বর আলোচনা শেষ হল এবং ধরি মাছ না ছুঁই পানি মার্কা এক বিবৃতিতে ব্রিটিশ সরকার কেবল এইটুকু বললেন যে, “এমন এক গণপরিষদ দ্বারা যদি সংবিধান রচিত হয়, যাতে ভারতীয় জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশের প্রতিনিধিত্ব ছিল না, তাহলে মহামান্য সম্রাটের সরকার অবশ্য···সেই সংবিধান দেশের কোন অনিচ্ছুক অংশের উপর জোর করে চাপিয়ে দেবার কথা চিন্তা করতে পারে না।”

জিন্না ও লিয়াকৎ আরও কয়েকদিন বিলাতে রয়ে গেলেন। জিন্নার পারিবারিক বন্ধু কানজি দ্বারকাদাস আমেরিকা-ফেরত লণ্ডনে তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর সে সময়কার অবস্থা সম্বন্ধে লিখেছেন: “আমি দেখলাম তিনি অসুস্থ ও হতাশাগ্রস্ত।··· আমি তাঁকে বললাম যে···দেশের কি হচ্ছে···তা আমি বুঝতে পারছি না। 'দেশ, কোন্ দেশ?' জিন্না প্রশ্ন করলেন, 'দেশ বলে কোন কিছু নেই। আছে কেবল কিছু হিন্দু মুসলমান।' আমি লক্ষ্য করলাম যে পাকিস্তানের ভিত্তি ব্যতিরেকে জিন্না কোন রকম বোঝাপড়ায় রাজী নন। কংগ্রেস নেতৃবর্গ তাঁর প্রতি অনুচিত আচরণ করেছেন এবং তাঁর বিরূপ সমালোচনা করেছেন বলে জিন্না লড়াই চালিয়ে যেতে চান।···আমি জিন্নাকে বললাম যে, মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস সরকারের বাইরে নিজেদের বিবাদ চালিয়ে যেতে পারে···কিন্তু সরকারের ভিতর একযোগে কাজ করা এবং দেশের জন্য যতটা সম্ভব করা উভয় দলের পক্ষে কি অপরিহার্য নয়? জিন্না উত্তর দিলেন: 'কি বলেন? তা কি ভাবে সম্ভব হবে? আপনি কি বলতে চান

যে, এই কামরার ভিতর আমরা পরস্পরকে চুম্বন করার পর কামরার বাইরে গিয়ে একে অপরকে ছুরিকাঘাত করতে পারি ?'...আমার মনে হল যে কংগ্রেস নেতারা যদি তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিচ্ছেদ না করতেন তাহলে তিনি এতটা তিক্ত হতেন না। তাঁর আত্মমর্যাদা ও অহমিকা বোধ আহত হওয়ায় এবং তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে আঘাত করা হয়েছে এই ধারণা তাঁর মধ্যে সৃষ্টি হওয়ায় তিনি ঐরকম বিরূপ হয়েছিলেন এবং নিজের চতুর্দিকে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের অপচ্ছায়ার সৃষ্টি করেছিলেন।"[১৪]

জিন্নার তদানীন্তন মনোভাবের পরিচায়ক পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে এই সত্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে রাজনীতি-ব্যবসায়ীর নিত্য আরাধ্য—ক্ষমতাপ্রাপ্তির জন্য তিনি উন্মুখ এবং তখনও পর্যন্ত তার থেকে বঞ্চিত থাকার জন্য তিনি অত্যন্ত তিক্ত। তাঁর ভিতর অপরের সহানুভূতি ও প্রীতি পাবার মানবীয় অভীপ্সা বিদ্যমান, যদিও তাঁর নিজের উক্তি ও আচরণ কদাচিৎ তার অনুকূল।

৯ই ডিসেম্বর দিল্লীতে গণপরিষদের উদ্বোধন হল। জিন্না লণ্ডনে থাকলেও তাঁর দলের কোন সদস্যই ঐ পরিষদের কার্যকলাপে যোগদান না করে ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর এবং তাঁর রণকৌশলের প্রতি আস্থাজ্ঞাপন করলেন। কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের দুই শতাধিক সদস্য স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধান রচনার কাজ শুরু করলেন।

বিলাতে ইতিমধ্যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল। ১৩ই ডিসেম্বর কমন্স সভায় ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিতর্ক প্রসঙ্গে বিরোধী দলের নেতা চার্চিল বললেন: "একথা নিশ্চিত যে চার মাস পূর্বে শ্রীযুক্ত নেহরুর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হবার পর থেকে এযাবৎ ভারতবর্ষে হিংসার কবলে যতজনের প্রাণ-বিয়োগ হয়েছে বা যতজন আহত হয়েছেন তাঁদের সংখ্যা বিগত ৯০ বছরে অনুরূপ ভাবে মৃত ও আহতদের সংখ্যার চেয়ে বেশী। সুবিস্তীর্ণ এলাকায় এবং অসংখ্য অখ্যাত গ্রামে এই যেসব নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটেছে তার শিকার হয়েছে প্রধানতঃ মুসলমান সংখ্যালঘুরা। আমাকে নিজ বিশ্বাসের কথা নথিভুক্ত করাতেই হবে এবং তা হল এই যে, ভারতবর্ষে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার যে-কোন প্রয়াস গৃহযুদ্ধ ব্যতিরেকে সফল হবে না। আর এ গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত সেনাবাহিনী বা কোন সংগঠিত গোষ্ঠীর এলাকায় হবে না, হবে হাজার হাজার পৃথক এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন লোকালয়ে। ভারতবর্ষের সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশ...এই ন'কোটি মুসলমানের ...অংশোদ্ভূত...এবং যখন বহু কোটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় তখন "সংখ্যালঘু" শব্দটির কোন তাৎপর্য বা অর্থ থাকে না।"[১৫]

এ সম্বন্ধে উলপার্টের মন্তব্য হল : "চার্চিলের ঐ মন্তব্য ইতিপূর্বে এটলী, ক্রিপস অথবা উড্রো ওয়াইআটের কাছে জিন্না যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন তার থেকে অধিকতর কঠোর ও অনমনীয় ভূমিকা গ্রহণে প্ররোচিত করল। লণ্ডনের এই শেষ প্রবাস তাঁর মনে এই বিশ্বাস পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করল যে এখনও রক্ষণশীল দলের সমর্থনের কী পরিমাণ শক্তি তাঁর পিছনে রয়েছে। এর পরিণামে তাঁর পূর্বতন সেই সিদ্ধান্ত পুষ্টিলাভ করল যে, নেহরু কংগ্রেস গণপরিষদের ঘূর্ণিপাকে এককভাবে ঘুরপাক খেতে থাকুক এবং পদস্থ ব্রিটিশ রাজকর্মচারী ও মুসলমান সম্প্রদায়—যাঁরা দূর থেকে অসম্পৃক্তভাবে এই খেলা দেখছেন তাঁদের বিরাগভাজন হতে থাকুন।"[১৬] জিন্নার প্রতি ব্রিটিশ রাজনৈতিক নেতৃবর্গের একাংশের গভীর সমর্থনের বিবরণ খলিকুজ্জমাঁর বিবরণেও মেলে : "লণ্ডনে থাকাকালীন শ্রীযুক্ত জিন্না অত্যন্ত দায়িত্বশীল মহল থেকে খবর পেয়েছিলেন যে কংগ্রেস যদি ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনার নিজস্ব ভাষ্য পরিহার করে ঐ পরিকল্পনাকে হুবহু গ্রহণে স্বীকৃত না হয়, তাহলে ব্রিটিশ সরকার অনিচ্ছাসত্ত্বেও দেশবিভাজনে সম্মত হবে।"[১৭]

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ওয়াভেলের ভারত থেকে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের প্রস্তাবের পরিপেক্ষিতে ইংলণ্ডের সরকার কর্তৃক ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে আসার সময়-সীমা নির্ধারণ। অতীতে (সেপ্টেম্বর ১৯৪৬) এজাতীয় একটি প্রস্তাব ওয়াভেলের কাছ থেকে পেলেও ব্রিটিশ সরকার তাকে অহেতুক বিপদ-সঙ্কেত ঘোষণাকারী মনে করে তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে নি। কিন্তু ডিসেম্বরে বিলাতে থাকাকালীন ওয়াভেল (উনিও ৬ই ডিসেম্বরের পর রয়ে গিয়েছিলেন) আবার এজাতীয় এক প্রস্তাব (দফায় দফায় ব্রিটিশের প্রত্যাহার এবং অনতিবিলম্বে এই পর্বের সূত্রপাত) সরকারকে দেওয়ায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পর্যুদস্ত ভারতবর্ষের প্রশাসনিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজ সরকার এ বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে মনঃসংযোগে বাধ্য হয়। তবে সুয়েজ খালের পূর্বে স্থিত দেশসমূহে ব্রিটিশ ব্যবসায়িক স্বার্থ এবং কমনওয়েলথের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে রণকৌশলের দিক থেকে ভারতবর্ষের অবস্থিতির গুরুত্ব ইত্যাদির জন্য ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষকে অরাজকতার হাতে সমর্পণ করে চলে আসতে প্রস্তুত ছিল না। এছাড়া সরকারের আশঙ্কা ছিল যে ঐজাতীয় অরাজকতার সুযোগে কেবল ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহই নয়, এমন কি রাশিয়া (ভারতীয় বামপন্থীদের সহায়তায়) বা ইংরেজের প্রতিকূল অপর কোন বিদেশী রাষ্ট্র ভারতবর্ষে ক্ষমতা দখল করে নিতে পারে। মন্ত্রিসভার ভারত-ব্রহ্ম কমিটিতে ১১ই ডিসেম্বর এই প্রস্তাব বিবেচনার সময়ে কোন কোন সদস্য ভারত-

বর্ষের বিভাজনের প্রস্তাব করলেন এবং ওয়াভেল মন্তব্য করলেন যে বর্তমান অবস্থায় সরকারের ঘোষণা করা উচিত যে নবগঠিত গণপরিষদের সংবিধান কেবল হিন্দু এলাকার প্রতি প্রযোজ্য হবে। মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহকে এক পৃথক গণপরিষদ গঠন করার জন্য উৎসাহিত করা যেতে পারে।[১৮] অনুমান করা যেতে পারে যে, তাঁর চিন্তা ও পরিকল্পনার অনুরণন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের উচ্চমহলে শুনতে পেয়ে নিজের পদক্ষেপ সম্বন্ধে জিন্না আরও নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

ওয়াভেল কিন্তু ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর বিভাজন-কেন্দ্রিক দেশবিভাগের প্রস্তাবের অনুকূল ছিলেন না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দফায় দফায় ব্রিটিশের ভারত থেকে প্রত্যাহারের প্রথম চরণের বাস্তব রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করিয়ে বিবদমান দুই পক্ষকে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একটা বোঝাপড়ায় উপনীত হতে বাধ্য করা। মন্ত্রী-মণ্ডল ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী এ প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত বাতিল করলেও ভারতবর্ষ ছেড়ে আসার একটা সময়-সীমা নির্ধারণ করা সাব্যস্ত করে। বড়লাট এবং পাঞ্জাব ও বঙ্গের মত যে দুই প্রদেশের ব্রিটিশ শক্তির অপসারণের প্রক্রিয়ায় সর্বাধিক প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা, তার ছোটলাটদের সুস্পষ্ট পরামর্শ অগ্রাহ্য করে ২০শে ফেব্রুয়ারী কিয়দংশে ভবিষ্যৎ বড়লাট মাউন্টব্যাটেন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এটলী কর্তৃক সরকারী ভাবে এই মর্মে ঘোষণা ভারত-বিভাজন ও তজ্জনিত গণহত্যাকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। তবে সে সম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে।

জিন্নার বিলাতে থাকাকালীন ১৪ই ডিসেম্বর কিংসওয়ে হলে মুসলমানদের সভায় পাকিস্তান দাবির সপক্ষে জোরালো ভাষায় বলা ছাড়া অপর একটি ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। আকালী নেতা সর্দার বলদেব সিং-এর মতে, ঐ সময়ে এক ব্যক্তিগত আলোচনা প্রসঙ্গে জিন্না বলেন: "বলদেব সিং, এই দেশলাই বাক্সটি দেখছেন তো! এর আকারের পাকিস্তানও যদি আমাকে দেওয়া হয়, আমি তা সানন্দে স্বীকার করে নেব। কিন্তু আমি আপনার সহায়তা-প্রার্থী। আপনি যদি শিখদের মুসলিম লীগের সঙ্গে হাত মেলাতে রাজী করতে পারেন তাহলে আমরা এমন এক গৌরবজনক পাকিস্তান পাব যার দেউড়ি খাস দিল্লীতে যদি নাও হয় অন্ততঃ দিল্লীর কাছাকাছি হবে।"[১৯] পরবর্তীকালে জিন্নার এজাতীয় এক প্রস্তাব আকালী দলের তদানীন্তন নেতা মাস্টার তারা সিং সরকারী ভাবে অগ্রাহ্য করলেও শিখেদের সহযোগিতায় বৃহত্তর পাকিস্তান প্রাপ্তির এই প্রস্তাবের মাধ্যমে দুটি প্রশ্ন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাহলে মুসলিম বাসভূমি হিসাবে পাকিস্তানের দাবি কি শুধুই কথার কথা? না এ প্রস্তাব পাকিস্তানের জন্য অধিকতর এলাকা পাবার উদ্দেশ্যে ক্ষমতার রাজনীতি

প্রভাবিত হয়ে আর এক প্রয়াস ?

ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে জিন্না ও লিয়াকৎ প্যান-ইসলামিক সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য আরব লীগের অতিথিরূপে কায়রোতে কয়েক দিনের জন্য যাত্রাবিরতি করেছিলেন। মিশরের প্রধানমন্ত্রীর কাছে আলোচনা প্রসঙ্গে ১৭ই ডিসেম্বর তিনি বলেছিলেন : "পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পরই কেবল ভারতীয় ও মিশরীয় মুসলমানরা যথার্থ স্বাধীন হবেন। তা না হলে হিন্দু সাম্রাজ্যবাদী রাজত্বের বিপদ মধ্যপ্রাচ্য পার হয়ে তার থাবা বাড়িয়ে দেবে।" মিশর ও প্যালেস্টাইনের আরব নেতাদের সঙ্গে তাঁর আলোচনার বিবরণ দিতে গিয়ে ২০শে ডিসেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন : "মধ্যপ্রাচ্যের কাছে এক হিন্দু-সাম্রাজ্য কী বিপদের কারণ হতে পারে এ সম্বন্ধে তাঁদের বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি এই আশ্বাসও দিয়েছি যে, পাকিস্তান জাতি ও গাত্রবর্ণ নির্বিচারে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামকারী সকল জাতির সঙ্গে সহযোগিতা করবে।...যদি এক হিন্দু-সাম্রাজ্যের পত্তন হয় তাহলে তার অর্থ হল, ভারতবর্ষে এবং এমন কি অন্যান্য মুসলিম দেশেও ইসলামের অবসান। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় সম্বন্ধ আমাদের মিশরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে। আমরা যদি নিমজ্জিত হই, সকলেই ডুববেন।"[২০]

পাঠকের স্মরণ হবে যে, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রতীক জিন্না একদা এই কারণে গান্ধীকে খিলাফৎ নিয়ে মাতামাতি করা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন যে প্যান-ইসলাম-কেন্দ্রিক ঐ আন্দোলনের ঐস্লামিক অযৌক্তিক কুসংস্কারের পৃষ্ঠপোষকতা করার আশঙ্কা। সেই জিন্নার প্যান-ইসলামের প্রবক্তা হয়ে আরব দেশের মুসলমান নেতৃবৃন্দকে "হিন্দু সাম্রাজ্যবাদী রাজ্যের" বিভীষিকা প্রদর্শন অবশ্যই ইতিহাসের এক পরিহাস।

২১শে ডিসেম্বর ভারতবর্ষের মাটিতে পা রাখার পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে জিন্না ঘোষণা করেন যে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের ৬ই ডিসেম্বরের ব্যাখ্যা মেনে না নেওয়া পর্যন্ত লীগের ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করার প্রস্তাব পুনর্বিবেচনা করার অবকাশ নেই। স্পষ্টতঃ লণ্ডনে প্রাপ্ত আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতিসমূহ তাঁর কণ্ঠে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে।

॥ ২৮ ॥

মাউণ্টব্যাটেনের মতে, "স্পষ্টতঃ জিন্নাই ছিলেন সমস্ত ব্যাপারটার চাবিকাঠি।"[১] হুডসনের বক্তব্য হল, "ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পুনর্জন্মলাভ করার মহানাটকের

শেষ অঙ্কের তাবৎ প্রমুখ কুশীলবদের মধ্যে জিন্না ছিলেন 'সর্বপ্রধান'।[২] "তাঁর নিজের লোক ছাড়া অপর কারও দ্বারা লিখিত ইতিহাস এম. এ. জিন্নাকে তাঁর সুউচ্চ কৃতিত্বের যথাযোগ্য স্বীকৃতি দেবে না। তবু গান্ধী বা অপর যে-কোন নেতার হাতে নয়, ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের সেই নববর্ষের দিনে ভারতবর্ষের ভবিতব্যের চাবিকাঠি ছিল জিন্নার হাতে।"[৩]

স্বাধীনতার প্রাক্কালীন ভারতবর্ষে জিন্নার ভূমিকা সম্বন্ধে আরও অনেকের এ জাতীয় উক্তি উদ্ধৃত করা যায়। সুতরাং ঐ সময়কার ভারতবর্ষের পরিস্থিতির কথঞ্চিৎ পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

ভারতবর্ষকে আর ব্রিটেনের অধীনে রাখা সম্ভব নয় উপলব্ধি করে শ্রমিক দলের সরকার ভারতবাসীকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত। সুয়েজের পূর্বস্থিত বিশাল অঞ্চলে ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক স্বার্থে ঐ দেশের মিত্রভাবাপন্ন কোন শক্তিশালী সরকার ভারতবর্ষে থাকা দরকার। সেই সরকারের কমনওয়েলথের সদস্যও হওয়া বাঞ্ছনীয় এইজন্য। সুতরাং শ্রমিক সরকার অন্ততঃ ভারতের কোন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে ইচ্ছুক। কিন্তু এজাতীয় সরকার গঠনের প্রথম ধাপ সংবিধান রচনাকারী গণপরিষদে দুই প্রধান দলের অন্যতম মুসলিম লীগ যোগ দিতে প্রস্তুত নয়, যদিও বড়লাটের কাছে জিন্নার এতদুদ্দেশ্যে মৌখিক প্রতিশ্রুতি দেবার পর লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিয়েছে। লীগের দাবি—মুসলমানদের স্বতন্ত্র বাসভূমির কাছাকাছি একটা ব্যবস্থা ক্যাবিনেট মিশনের ১৬ই মে তারিখের প্রস্তাবের বাধ্যতামূলক প্রদেশসমূহের গোষ্ঠী রচনার ভিতর ছিল। ঐ শর্তে লীগ তিনটি প্রদেশ-গোষ্ঠীর সমবায়ে গঠিতব্য সীমিত কর্তৃত্ববিশিষ্ট কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবেও রাজী ছিল। কিন্তু কংগ্রেস সে প্রস্তাব স্বীকার করেছে নিজ ব্যাখ্যাসহ। অর্থাৎ কংগ্রেস বাধ্যতামূলক প্রদেশগোষ্ঠী গঠনে সম্মত নয়। বড় বেশী হলে এ ব্যাপারে ফেডারেল আদালতের রায় মানতে প্রস্তুত। কারণ কংগ্রেস-শাসিত অমুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ আসাম ও নির্বাচনে লীগের কর্মসূচীকে প্রত্যাখ্যান করে কংগ্রেসের সঙ্গে নিজেদের ভাগ্যকে যুক্তকারী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে জোর করে প্রস্তাবিত পাকিস্তান প্রদেশগোষ্ঠীতে ঠেলে দেওয়া—বাধ্যতামূলক প্রদেশগোষ্ঠী গঠনের প্রশ্নে মিশনের এই ব্যাখ্যা লীগের অনুকূল।[৪] সুতরাং লীগ গণপরিষদ বয়কট করার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারকে বিবাদের আখড়ায় পরিণত করে স্বাভাবিক প্রশাসন চালানো অসম্ভব করে দিয়েছে। অকার্যকারী সরকারের কর্ণধার নেহরু প্যাটেল পযুদস্ত ও ক্ষিপ্ত। লীগ প্রতিনিধিরা যোগ দেবেন এই আশায় গণপরিষদ সংবিধান

রচনার ব্যাপারে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। কারণ লীগ প্রতিনিধিদের সম্মতি বিনা সংবিধান সীমান্ত প্রদেশ ছাড়া অপরাপর মুসলিম সংখ্যা-গরিষ্ঠ প্রদেশে প্রবর্তন করা যাবে না। ইংরেজ সরকার সেই সংবিধানকে স্বীকৃতি দিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে তার সম্ভাবনা কম। লীগ হয় গণ-পরিষদে যোগ দিক, নচেৎ অন্তর্বর্তী সরকার ছাড়ুক—কংগ্রেসের এই দাবির প্রতি লীগ কর্ণপাত করছে না। বড়লাট এ ব্যাপারে মনস্থির করতে অক্ষম।

এদিকে কলকাতা, নোয়াখালি, ত্রিপুরা ও বিহারের বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং সংখ্যালঘুদের উপর অমানবীয় উৎপীড়নের পর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে নি। সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব পুনঃস্থাপনের জন্য গান্ধী নোয়াখালি-ত্রিপুরার মাটিতে নিজেকে মিলিয়ে দেবার সুদুশ্চর তপস্যায় রত। ক্ষমতা হস্তান্তরের কেন্দ্র দিল্লীতে সাময়িক ভাবে যেতে পর্যন্ত তিনি রাজী নন। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও থেকে থেকে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হচ্ছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং কংগ্রেস-লীগ বোঝাপড়া ছাড়া কোন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। লীগ এ বিষয়ে মনোযোগ দেবার বদলে পাকিস্তানের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কথাই বলে চলেছে। সুতরাং তখনকার সেই অচলাবস্থা দূর করার চাবিকাঠি জিন্নার হাতে—এ কোন অত্যুক্তি নয়।

বিশেষ করে শ্রমিক দলের বাইরের এক শ্রেণীর প্রভাবশালী ইংরেজের সমর্থন জিন্না পাচ্ছিলেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ভারত-ব্রহ্ম কমিটির আলোচনার এবং খলিকুজ্জমাঁর বিবরণের যে উল্লেখ করা হয়েছে তাতে এর আভাস আছে। চার্চিলের পার্লামেন্টের বক্তৃতা থেকেও এর সমর্থন মেলে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ব থেকেই জিন্না চার্চিলের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ রেখে আসছিলেন। এমন কি বিভক্ত পাঞ্জাব ও বাংলার ভিত্তিতে "বিকলাঙ্গ ও কীটদষ্ট" পাকিস্তান যাতে অতঃপর জিন্না স্বীকার করে নেন তার জন্য মাউন্টব্যাটেন রোগে শয্যাশায়ী চার্চিলের সঙ্গে (২২শে মে ১৯৪৭ খ্রীঃ) দেখা করে জিন্নার জন্য এক বিশেষ বার্তা নিয়ে আসেন।[৫] পূর্ববর্তী অধ্যায়ে কেন্দ্রীয় সরকারের এক শ্রেণীর উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীর ভূমিকার উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁরা কংগ্রেসী নেতাদের অধীনে কাজ করা সুখকর মনে করতেন না। অন্তর্বর্তী সরকারে লীগকে আনা এবং কংগ্রেস ও লীগ দুই দলের প্রতিনিধিদের যুযুধান শিবিরে বিভক্ত করে অচলাবস্থা সৃষ্টি করার পিছনে ঐ শ্রেণীর কর্মীদেরও হাত ছিল। ঐসব ইংরেজ রাজকর্মচারীদের মনোভাবের নিদর্শন পাওয়া যায় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের তদানীন্তন ডিরেক্টর স্যার নরম্যান পি. এ স্মিথ কর্তৃক ১৯৪৭

খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বড়লাটকে পাঠানো তাঁর প্রতিবেদনে। প্রতিবেদনের নিম্নোদ্ধৃত অংশ উল্লেখযোগ্য ঃ

"ব্রিটিশের দৃষ্টিকোণ (থেকে)…এ খেলা এযাবৎ সুচারুরূপেই খেলা হয়েছে …কংগ্রেস ও লীগ উভয়কেই কেন্দ্রীয় সরকারে আনা হয়েছে…এর দ্বারা ভারতের সমস্যাকে সাম্প্রদায়িকতার উপযুক্ত প্রেক্ষাপটে খাড়া করা সম্ভবপর হয়েছে…। শ্বাস নেবার এই যে সময় পাওয়া গেল তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে…। গুরুতর সাম্প্রদায়িক গোলযোগও যেন আমাদের বিচলিত করে সক্রিয় হতে প্ররোচিত না করে। কারণ (আমরা সক্রিয় হলে) ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের পুনঃপ্রবর্তন হবে।…গুরুতর সাম্প্রদায়িক গোলযোগ বীভৎস হলেও এক স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যার দ্বারা ভারতের সমস্যার সমাধান স্বতই হয়ে যাবে।"৬

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবের উপর ব্রিটিশ সরকারের ৬ই ডিসেম্বরের ভাষ্য সম্বন্ধে কংগ্রেস সরকারী ভাবে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল ৬ই জানুয়ারীর নিম্নোদ্ধৃত প্রস্তাবে ঃ

"বিশেষতঃ আসাম এবং উঃ পঃ সীমান্তের মত কোন কোন প্রদেশ এবং পাঞ্জাবের শিখরা ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশনের ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে তারিখের পরিকল্পনা এবং তার থেকেও বেশী করে ব্রিটিশ সরকার কৃত তার ৬ই ডিসেম্বরের ভাষ্যের ফলে যে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন তা অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি উপলব্ধি করে। সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁদের উপর এভাবে কোন কিছু চাপিয়ে দেওয়া বা তাঁদের কোন কিছু করতে বাধ্য করার প্রচেষ্টার সঙ্গে কংগ্রেস নিজেকে যুক্ত করতে পারে না। এই নীতি স্বয়ং ব্রিটিশ সরকার কর্তৃকও স্বীকৃত। বিভিন্ন ভাষ্যের কারণে যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে তা দূরীকরণের জন্য অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি (তাই)…প্রদেশ গোষ্ঠীগুলিতে যে পদ্ধতি অনুসৃত হবে সে ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের ভাষ্যকে মেনে নেবার পরামর্শ দিতে সম্মত হচ্ছে। তবে একথা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে এর পরিণামে কোন প্রদেশকে কোন কিছু করতে বাধ্য করা হবে না…। কাউকে বাধ্য করার কোন প্রচেষ্টার নিদর্শন দেখা গেলে কোন প্রদেশ বা তার অংশবিশেষের স্বীয় জনসাধারণের ইচ্ছাকে রূপ দেবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার থাকবে।"

এইভাবে কংগ্রেস বাধ্যতামূলকভাবে প্রদেশসমূহের গোষ্ঠীভুক্তির প্রস্তাব মেনে নিল বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনিচ্ছুক প্রদেশ বা প্রদেশের অংশবিশেষের উপর তা চাপিয়ে দেওয়া যাবে না ঘোষণা করে একই নিঃশ্বাসে প্রথমোক্ত স্বীকৃতিকে

অস্বীকারও করল। এর ফলে যেমন লীগের সন্তুষ্টিবিধান হল না, তেমনি ভারত-বিভাজনের স্বীকৃতির বীজও বপিত হল।[৭]

জিন্না ও লীগের উপর কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া যা হবার তা-ই হল। ৩১শে জানুয়ারী করাচীতে অনুষ্ঠিত লীগের ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে কংগ্রেসের ঘোষণাকে, "অসাধু কৌশল ও শব্দের কারচুপির বাড়া আর কিছু নয়" আখ্যা দিয়ে গণপরিষদকেই অবজ্ঞাভরে "রাং" (rump) ও এর নির্বাচনকে "বেআইনী" অভিহিত করা হল। কারণ লীগের মতে গণপরিষদে কংগ্রেস ছাড়া আর কোন দলের সদস্য নেই। লীগ দাবি জানাল, ব্রিটিশ সরকারকে ঘোষণা করতে হবে যে "কংগ্রেস...১৬ই মে তারিখের ঘোষণাকে মেনে নেয় নি" এবং এই কারণে গণপরিষদকে বাতিল করা হোক। ওয়ার্কিং কমিটির ঐ প্রস্তাবে আরও বলা হল যে, এ অবস্থায় ক্যাবিনেট মিশনের ১৬ই মে তারিখের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্তকে পুনর্বিচার করার জন্য লীগ কাউন্সিলের সভা আহ্বান করার সার্থকতা নেই। ওয়ার্কিং কমিটি একথাও ঘোষণা করল যে ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা নিশ্চিত ও চূড়ান্ত ভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভার কয়েক দিন পূর্বে অর্থাৎ ২৪শে জানুয়ারী অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল যা লীগের প্রভাব-বহির্ভূত পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের পরিস্থিতিতে গুণগত পরিবর্তন সৃষ্টি করল। খলিকুজ্জমাঁর জবানবন্দী অনুসারে ঘটনাটি হল, "...মালিক খিজির হায়াৎ খাঁর দিল্লী প্রবাসকালে ছোটলাটের আদেশ-ক্রমে স্বরাষ্ট্র সচিব কর্তৃক মুসলিম লীগ স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে জনসাধারণকে উত্তেজিত করার রসদ সরবরাহ করা হল। অতঃপর এক জোরালো আন্দোলন শুরু হয়ে গেল এবং প্রধানমন্ত্রী দিল্লী থেকে প্রত্যাবর্তন করে দেখলেন যে পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।"[৮] ২৬শে জানুয়ারী জিন্না এক বিবৃতিতে পাঞ্জাব সরকারের ঐ কার্যের নিন্দা করার সঙ্গে সঙ্গে বড়লাটকে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অনুরোধ জানালেন। নচেৎ এর পরিণাম গুরুতর হতে পারে বলে তাঁকে সতর্কও করে দিলেন।

পাকিস্তানেরে "পা" অর্থাৎ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ পাঞ্জাবের উপর বহুদিন যাবৎ জিন্নার দৃষ্টি থাকলেও, এমন কি ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে লীগের হাওয়া বয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ঐ প্রদেশে লীগ মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হয় নি। মুসলিম আসনে ইউনিয়নিস্ট পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও ঐ দলের নীতি অনুসারে মুসলমান, হিন্দু ও শিখদের প্রতিনিধি নিয়ে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল খিজির হায়াৎ খাঁর নেতৃত্বে।

পাঞ্জাবের লীগ মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য জিন্না এবং লীগের তীব্র ইচ্ছা সত্ত্বেও তা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই "প্রত্যক্ষ সংগ্রামে"র প্রস্তাবের আড়ালে পাঞ্জাবের লীগ এই উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হয়েছিল এবং জিন্নার উদ্যোগে গঠিত ও তাঁর ব্যক্তিগত নেতৃত্বে চালিত লীগের আধা সামরিক সংগঠন ন্যাশনাল গার্ড প্রায় যুদ্ধের উদ্দেশ্যেই প্রস্তুত হচ্ছিল।[৭] ন্যাশনাল গার্ডকে পাঞ্জাবের ছোটলাট জেনকিন্স হিটলার ও মুসোলিনীর এজাতীয় বাহিনীর (কালো-কুর্তা ও ঝটিকা-বাহিনী) সমগোত্রীয় মনে করতেন। এই ন্যাশনাল গার্ডদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন পাঞ্জাবের তদানীন্তন ছোটলাট গ্ল্যান্সি ও বড়লাট ওয়াভেল ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুন মন্তব্য করেন যে এর জন্য আমাদের জিন্নার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে, যাতে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ পরিহার করা যায়।" যাই হোক, লাহোরের ন্যাশনাল গার্ডের সদর কেন্দ্রে এক হাজারেরও বেশী লৌহ-শিরস্ত্রাণ পাওয়া গিয়েছিল এবং সংগঠনের প্রধান কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

খলিকুজ্জমাঁর পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিতে যার ইঙ্গিত আছে—ন্যাশনাল গার্ড প্রতিষ্ঠানকে বেআইনী ঘোষণা করা এবং তার প্রধান কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের ফলে লীগ "ব্যক্তি-স্বাধীনতা"র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করল এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে লীগ স্বেচ্ছাসেবকেরা সর্বত্র আইন অমান্য শুরু করলেন। খিজির অবশ্য শান্তি ক্রয়ের আশায় দ্বিতীয় দিনেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু যে আন্দোলন আসলে তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলের পরিবর্তে পাঞ্জাবে লীগ শাসন কায়েমের উদ্দেশ্যে সংগঠিত, তা এতে থামবে কেন? আন্দোলনকারীরা তাই অতঃপর প্রকাশ্যেই খিজিরের পদত্যাগ দাবি করে দিকে দিকে সংঘর্ষে লিপ্ত হলেন। ক্ষমতার জন্য বহুদিন যবনিকার অন্তরালে অপেক্ষমাণ সৌকৎ হায়াৎ খাঁ আইন অমান্যের জন্য দেড় কোটি মুসলমানকে পথে নামাবার হুমকি দিলেন। সদ্য কংগ্রেস ত্যাগ করে লীগে যোগদানকারী "সমাজবাদী" জমিদার নেতা ও সংবাদপত্রের মালিক মিঞা ইফতিকারউদ্দীন লীগের তরফ থেকে কংগ্রেসী ধরনের আইন অমান্য আন্দোলন চালাতে লাগলেন। মামদোতের নবাব, ফিরোজ খাঁ নুন, মিঞা মমতাজ, দৌলতানা প্রমুখ লীগ নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হওয়া সত্ত্বেও আন্দোলন পাঞ্জাবের প্রায় সব শহরে ছড়িয়ে পড়ল। লীগের আন্দোলনকে শান্তিপূর্ণ বলে ভূয়সী প্রশংসা করলেও একই নিঃশ্বাসে খলিকুজ্জমাঁ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, "বহু স্থলে হয়ত মুসলমানেরা মাত্রাজ্ঞান হারিয়েছিল এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু করেন..." ইত্যাদি। পাঞ্জাব এবং তার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে জনমতকে মুসলমান বনাম

অমুসলমান—এইভাবে দুই পৃথক শিবিরে বিভক্ত করার ব্যাপারে এ আন্দোলন প্রবল সহায়ক হয়েছিল এবং শেষ অবধি দোসরা মার্চ খিজিরের পদত্যাগের পর পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে প্রায় গৃহযুদ্ধের স্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল।

৩১শে জানুয়ারী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ক্যাবিনেট মিশনের ১৬ই মে তারিখের প্রস্তাব চূড়ান্ত ভাবে নস্যাৎ করার পরের দিন জওহরলাল বড়লাটের সঙ্গে দেখা করে সঙ্গত ভাবেই লীগ সদস্যদের অন্তর্বর্তী সরকার থেকে বরখাস্ত করার দাবি জানালেন এবং বললেন, নচেৎ কংগ্রেস প্রতিনিধিরাই সরকার থেকে পদত্যাগ করবেন। ৬ই ফেব্রুয়ারী কংগ্রেস আনুষ্ঠানিক ভাবে এই দাবি চিঠির মাধ্যমে পেশ করল। তবে ইতিমধ্যে এটলী ওয়াভেলকে জানালেন যে পরবর্তী বড়লাট মনোনীত হয়ে গেছেন এবং তাই তিনি যেন অনতিবিলম্বে পদত্যাগ করেন। অবশ্য বিগত ডিসেম্বরে লণ্ডনে থাকাকালীনই তাঁকে আভাস দেওয়া হয়েছিল যে তিনি মন্ত্রীমণ্ডলের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভারত সম্পর্কিত নীতির যথাযথ রূপায়ন করতে পারছেন না বলে ব্রিটিশ সরকার তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি খুঁজছেন।

পাঞ্জাবের পরিস্থিতি দৃষ্টে ব্রিটিশ মন্ত্রীমণ্ডলের ৫ই ফেব্রুয়ারীর সিদ্ধান্তের নিম্নোদ্ধৃত অংশ উল্লেখযোগ্য : "ভারতবর্ষে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।…(সম্ভবতঃ) মিস্টার জিন্নার উদ্দেশ্য হল ঐরকম স্থিতি সৃষ্টি করা। …পাঞ্জাবে তাদের (মুসলিম লীগের) কার্যকলাপের কী পরিণাম হবে তা বলা কঠিন।… এর ফলে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হবে কিনা, শেষ অবধি তার উপরই লীগ গুরুতর অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারবে কিনা তা নির্ভর করছে।"[১০] অসামরিক প্রশাসন ভারতবর্ষের বহু এলাকাতেই অকার্যকরী প্রতিপন্ন হয়েছিল। সরকারী কর্মচারী এবং পুলিসের বিরুদ্ধে দাঙ্গার সময়ে স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতের বহু অভিযোগ ছিল। যে কোন আধুনিক সরকারের শেষ ভরসা —সামরিক বাহিনীতেও যদি বিভেদ ও বিপর্যয় শুরু হয়, তাহলে প্রশাসন চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। এটলী মন্ত্রীমণ্ডলের দুশ্চিন্তার সম্যক কারণ ছিল।

লীগের গণপরিষদে যোগ না দেবার সিদ্ধান্তের জন্য যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে তেসরা ফেব্রুয়ারী ওয়াভেল ধাপে ধাপে কর্তৃত্ব প্রত্যাহারের এক প্রস্তাব ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার কাছে পাঠালেন। যেহেতু দেশে স্বাভাবিক প্রশাসন চালানো অসম্ভব হয়ে পড়েছিল তাই এই পরিকল্পনা এবং এর পূর্ণাহূতি ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষে যখন ইংরেজ সৈন্য ভারত ছেড়ে চলে যাবে তখন। তবে দেশে যাতে আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয় তার জন্য ইংরেজ সৈন্যের ভারত ত্যাগ প্রকাশ্যে ঘোষণা করা

হবে না। কিন্তু কংগ্রেস ও লীগের নেতারা এটা জানবেন, যাতে অন্ততঃ অতঃপর তাঁরা দায়িত্বশীল হয়ে ভবিষ্যৎ প্রশাসন পরিচালনার জন্য পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। সাম্রাজ্যের স্বার্থে ওয়াভেল তখনও পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরোধী এবং প্রশাসনের শেষ শরণ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর বিভাজনও তিনি চান না। তবে একান্ত ভাবেই তা যদি অপরিহার্য হয়ে ওঠে তবে সুপরিকল্পিত ভাবে এবং যথোপযুক্ত সময় নিয়ে তা করা তাঁর প্রস্তাবের অন্যতম অঙ্গ। আকস্মিক ক্ষমতা হস্তান্তরে যে আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবার আশঙ্কা, তা পরিহার করার জন্য তাঁর এই দফায় দফায় ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব।

ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা নাকি ১৭ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ঐ পরিকল্পনা পায় নি। ইতিমধ্যে এটলী সরকার একটা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ভারত থেকে চলে আসার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার এক পরিকল্পনা রচনা করে ফেলেছে যা প্রধানমন্ত্রী ২০শে ফেব্রুয়ারী ঘোষণা করবেন। শুধু ওয়াভেল নন, যে দুটি প্রদেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবার সর্বাধিক আশঙ্কা—সেই বঙ্গ ও পাঞ্জাবের ছোটলাটরাও যথাক্রমে ১৪ই ও ১৬ই ফেব্রুয়ারী ভারত ছেড়ে চলে আসার সময়-সীমা প্রকাশ্যে ঘোষণার বিরুদ্ধে অভিমত দিয়েছিলেন। তাঁদের মতে এতে সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক আরও খারাপ হবে এবং বিবদমান প্রধান রাজনৈতিক দল দুটির একমত হবার সম্ভাবনা তিরোহিত হবে। ১৭ই ফেব্রুয়ারী ওয়াভেল ভারতসচিবকে জোর দিয়ে অনুরোধ করলেন যে প্রস্তাবিত ঘোষণায় যেন ভারত ছাড়ার সময়-সীমা বেঁধে না দেওয়া হয়। এটলী কিন্তু সে অনুরোধে কর্ণপাত করলেন না।

২০শে ফেব্রুয়ারী এটলী তাঁর নূতন ঘোষণা প্রচার করলেন। তাতে বলা হল যে, ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে দায়িত্বশীল ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে চলে আসতে চায়। তবে ঐ সময়ের মধ্যে "পরিপূর্ণ ভাবে প্রতিনিধিত্বমূলক গণপরিষদের দ্বারা" সংবিধান রচিত হয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করার মত পরিস্থিতি দেখা না দিলে "মহামান্য সম্রাটের সরকারকে চিন্তা করতে হবে যে নির্দিষ্ট দিনে ব্রিটিশ-ভারতের ক্ষমতা কার হাতে হস্তান্তর করা হবে—ব্রিটিশ-ভারতের সমগ্র অংশের কোন রকমের কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অথবা কোন কোন এলাকায় বর্তমান প্রাদেশিক সরকারগুলির হাতে কিংবা অপর কোন ভাবে যা সর্বাধিক যুক্তি-যুক্ত এবং ভারতবর্ষের জনসাধারণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা হিতকারী পরিগণিত হয়।"[১১] এর সঙ্গে সঙ্গে একথাও ঘোষণা করা হল যে নূতন বড়লাট হিসাবে লর্ড লুই মাউন্ট-ব্যাটেন মার্চের মধ্যেই কর্মভার গ্রহণ করবেন।

এটলীর পূর্বোক্ত ঘোষণায় সরাসরি পাকিস্তান মেনে না নিলেও ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে বিগত ১৬ই মে তারিখের পর প্রথমবার প্রকাশ্যে সংশয় প্রকাশিত হয়েছিল যে একটিমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্ভব নাও হতে পারে। প্রয়োজনে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হতে পারে, একথাও বলা হয়েছিল। ২১শে বড়লাট নেহরু ও লিয়াকতের সঙ্গে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। বড়লাটের মতে নেহরু আসন্ন দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তবে কংগ্রেস-লীগ বোঝাপড়া না হলে পাঞ্জাব ও বঙ্গের বিভাজনের সম্ভাবনার কথাও বললেন। লিয়াকৎ নিজে কোন অভিমত দিলেন না। বড়লাট জিন্নাকে আলোচনার জন্য দিল্লীতে আসার জন্য অনুরোধ জানালেও, অসুস্থতার জন্য তিনি মার্চের মধ্যভাগের পূর্বে আসতে অপারগ জানা গেল। তবে ২৪শে জিন্না বোম্বাই থেকে এটলীর ঘোষণা সম্বন্ধে মন্তব্য করলেন : "মুসলিম লীগ তার পাকিস্তান দাবির তিলমাত্র ছাড়বে না। ১০ কোটি মুসলমানদের মুক্তির ঐ একমাত্র পথ।"[১২] অতঃপর লীগের সামনে মুখ্য প্রশ্ন হল, বঙ্গ ও সিন্ধু (সেখানে নূতন নির্বাচনের ফলে ইতিমধ্যে শক্তিশালী লীগ মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হয়েছে) ছাড়া প্রস্তাবিত পাকিস্তান এলাকার বাকী প্রদেশগুলির শাসনভার কি করে হস্তগত করা যায়। আসামের অবস্থা অনিশ্চিত। পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা পাবার উপায় নেই। কারণ ঐ দুই প্রদেশের বিধানসভাতেই লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। সুতরাং নিয়মতন্ত্র-বহির্ভূত পন্থায় প্রাণপণ চেষ্টা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

"ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে লাহোর অমৃতসর সহ ছটি শহরে প্রবলতর হিংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে পাঞ্জাবে বিস্ফোট তীব্রতর হল। লীগের তরুণ সমর্থকদল 'আদালত ও সাধারণ নাগরিকদের ঘর-বাড়ি আক্রমণ করে সেখানে ব্রিটিশ পতাকার বদলে মুসলিম লীগের পতাকা উত্তোলন করা শুরু করলেন।' কয়েকজন পুলিস এবং বহু অসামরিক ব্যক্তির মৃত্যু ও আহত হবার ঘটনার পর খিজিরের মনোবল ভেঙে পড়ল এবং তিনি যাবতীয় বন্দীদের মুক্তি দিয়ে একমাসকাল ব্যাপী সভা-সমিতির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে এবং এক সর্বদলীয় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের আশা নিয়ে—ছোটলাট জেনকিন্সের মতে যা 'একান্তই অসম্ভব'—মুসলিম লীগের সঙ্গে একটা 'বোঝাপড়া'র সিদ্ধান্ত করলেন। লীগ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করেছিল, 'উচ্ছৃঙ্খল জনতা' কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী ডাঃ খাঁ সাহেবের পেশোয়ারের বাড়ি ঘেরাও করে তার সবগুলি জানালা ভেঙে

চুরমার করল এবং পুলিস নিষ্ক্রিয় ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে 'গুলি চালাবার আদেশ উপেক্ষা করল'।"[১৩]

ফেব্রুয়ারীর শেষে লিয়াকৎ অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করলেন। মৌলানার মতে বাজেটের মূল নীতি সম্বন্ধে লিয়াকৎ পূর্বাহ্নে কংগ্রেসী সদস্যদের সম্মতি নিয়েছিলেন। বাজেটে (গান্ধীর আগ্রহে) লবণ-কর রদ করার সিদ্ধান্ত ও তার জন্য যে ঘাটতি তা দূর করার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর উচ্চহারে কর ধার্য করার প্রস্তাব করা হয়। অধিকাংশ ব্যবসায়ী হিন্দু ও কংগ্রেস সমর্থক। তাই তাঁদের উপর এই অতিরিক্ত করধার্যকে তখনকার অবিশ্বাসের পরিবেশে কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশের পরিপন্থীই নয়, হিন্দু বা কংগ্রেসবিরোধীও মনে করা হয়।

পূর্বে যেমন বলা হয়েছে, দোসরা মার্চ খিজির হায়াৎ খাঁ পদত্যাগ করলেন এবং এইভাবে লীগের হিংসাত্মক প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জয় হল। পাঞ্জাবের জনমত সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত হবার উপক্রম হলেও লীগ কিন্তু তখনই পাঞ্জাবে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করতে পারল না। লীগ নেতা মামদোতের নবাব তাঁর ৮০ জন বিধানসভার সদস্যের অতিরিক্ত মাত্র ৩ জন দলত্যাগীর সমর্থন সংগ্রহে সমর্থ হলেন। কিন্তু তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হয় না। লীগের সাম্প্রদায়িক ভূমিকায় হিন্দু ও শিখ সদস্যরা তার সঙ্গে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক নয়। সুতরাং ঐ প্রদেশে ৯৩ ধারা বা ছোটলাটের শাসন কায়েম হল।

"'পাকিস্তান' বলতে ঠিক কি বোঝায় সে সম্বন্ধে অমুসলমানদের সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি না দেওয়া পর্যন্ত অবিভক্ত পাঞ্জাবে লীগের পক্ষে সরকারের কর্ণধার হওয়া সম্ভব ছিল না। নাজিমুদ্দীনকে পাঞ্জাব সরকারের সঙ্গে লীগের একটা বোঝাপড়া করিয়ে দেবার জন্য পাঠানো হয়েছিল। সমস্যার মূল ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি এক অবিশ্বাস্য স্বীকারোক্তি করেন: 'পাকিস্তান বলতে কি বোঝায় তা (তিনি) জানেন না', প্রত্যুত 'মুসলিম লীগের কেউ-ই তা জানে না এবং এইজন্য লীগের পক্ষে সংখ্যা-লঘুদের সঙ্গে কোন দীর্ঘমেয়াদী আলোচনা চালানো কঠিন।'...পাঞ্জাবকে অবিভক্ত রাখার অনুকূল কোন ফর্মুলা যে জিন্না প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে পারেন নি তার থেকেই তিনি কোন্ বিষয়কে প্রাথমিকতা দিতে চেয়েছিলেন তা বোঝা যায়। এজাতীয় কোন ফর্মুলা পাঞ্জাবের অমুসলমানদের গ্রহণযোগ্য হতে হলে অসাম্প্রদায়িক হওয়ার দরকার ছিল এবং সেই কারণে কেন্দ্রে জিন্নার ভূমিকাকে ব্যাহত করত। কেন্দ্রে জিন্নার ভূমিকা তখন অন্ততঃ সাময়িক ভাবে হলেও স্পষ্টতঃ সাম্প্রদায়িক-ভঙ্গিযুক্ত। সুতরাং পাঞ্জাবকে বিশৃঙ্খলার অভিমুখে যেতে দেওয়া হল।"[১৪]

পাঞ্জাবের অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটতে থাকল। "জেনকিন্স ৭ই মার্চ ওয়াভেলকে লিখলেন, 'গতকাল অমৃতসর নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা গেছে। সন্ধ্যানাগাদ শহর একেবারে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।…মনে হয় শহরের অধিকাংশ অধিবাসী অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করে ফেলেছে…বহু অট্টালিকা আগুনে পুড়েছে। শহর থেকে… পলায়নরত অসংখ্য নর-নারী বিশৃঙ্খলাকে আরও বিকট করে তুলেছে এবং… রাওলপিণ্ডি থেকে…লুট…ও প্রচণ্ড দাঙ্গার খবর পাওয়া গেছে, যেখানে ২৫ জন মৃত ও সম্ভবতঃ ১০০ জন আহত। শিয়ালকোট ও জলন্ধরও দাঙ্গা-কবলিত। এসব ঘটনা সর্বদাই তিনটি স্তরের ভিতর দিয়ে যায়—প্রবল উন্মাদনা, যৎপরোনাস্তি আতঙ্ক এবং অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ।'"[১৫] "আশেপাশের বিধ্বস্ত গ্রামাঞ্চল থেকে হাজার হাজার উদ্বাস্তু রাওলপিণ্ডিতে সমবেত হওয়া শুরু করলেন। 'অমুসলমান-দের উপর আক্রমণ অত্যন্ত বর্বরতা সহকারে সংগঠিত করা হয়েছে।'—জেনকিন্স ১৭ই মার্চ এই মর্মে তারবার্তা পাঠালেন। 'রাওলপিণ্ডির ডেপুটি কমিশনারের বিশ্বাস, একমাত্র তাঁর জেলাতেই হতাহতের সংখ্যা ৫০০০ হবে।' ঐদিন ছোটলাট আরও লিখলেন যে, পাঞ্জাবের দূরবর্তী অঞ্চলসমূহ থেকে ক্রমশঃ যে খবর আসছে তার থেকে একটা 'সংগঠন ও ষড়যন্ত্রে'র আভাস ফুটে উঠেছে। '…রাওলপিণ্ডির বিভিন্ন অংশে যেন একযোগে…বিস্ফোরণ ঘটেছে…এবং সেসব যেন সুপরিকল্পিত ও নিখুঁত ভাবে কার্যকরী করা। প্রভাবিত জেলাসমূহের সব মুসলমানই মনে হয় এইসব ঘটনাবলীর সঙ্গে যুক্ত অথবা তার প্রতি সহানুভূতিশীল। সপ্তম ডিভিসনের সেনাধ্যক্ষ আমাকে বলেছেন…কোন কোন ক্ষেত্রে অমুসলমানদের প্রতি আক্রমণ সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত অফিসার– পেনসন-প্রাপ্তদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে…। যেসব স্থানীয় সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের সঙ্গে আমি কথা বলার সুযোগ পেয়েছি…তাঁদের মুখমণ্ডল চাপা ক্রোধে কৃষ্ণবর্ণ…অমুসলমানরা সরকারী কর্মচারী এবং বিশেষ করে পুলিসদের প্রতি তীব্রভাবে বিরূপ'।"[১৬]

পেনড্রেল মুনের মতে মুসলমান জনসাধারণ তখন, "…হঠাৎ যেন কোন পূর্ব-নির্ধারিত ইঙ্গিত পেয়ে নিজেদের যথার্থ স্বরূপে বাইরে বেরিয়ে এবং হাতে অস্ত্র নিয়ে ও কোথাও কোথাও লৌহ শিরস্ত্রাণ মাথায় দিয়ে এমন ব্যাপক ভাবে হত্যা লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগে প্রবৃত্ত হল যার ব্যাপকতার তুলনা পাঞ্জাবের বিগত একশত বৎসরের ইতিহাসে বিরল।"[১৭]

উত্তর ভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে বঙ্গ ও বিহারের চিতা তখনও বহ্নিমান। গান্ধী এবারে (৫ই মার্চ, ১৯৪৭) মানুষের শুভবুদ্ধি ফিরিয়ে আনার আর শান্তি

প্রতিষ্ঠার "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে" মিশন নিয়ে নোয়াখালি থেকে বিহারে। গান্ধীর একদল সহকর্মী নোয়াখালিতে তাঁর ব্রত চালিয়ে যাচ্ছেন। সীমান্ত গান্ধীসহ অপর একদল সহকর্মী বিহারে সাধনায় রত।

কিন্তু সীমান্ত গান্ধীর নিজের ঘরে ইতিমধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। "স্থানীয় লীগ" পরিচয়ের অন্তরালে লীগেরই ক্ষমতালিপ্সু এক গোষ্ঠী আইনসঙ্গত কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলকে পদত্যাগে বাধ্য করার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছে। প্রদেশের শহর ও গ্রামাঞ্চলে অমুসলমানদের উপর ব্যাপক নিপীড়ন ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেছে। কাজ চালানো গোছের আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য সেনাবাহিনীকে তলব করতে হচ্ছে। তবুও পেশোয়ারের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে অমুসলমানদের হত্যা লুঠপাট ও তাদের সম্পত্তিতে অগ্নিসংযোগ বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না। হাজারা জেলাতে বলপূর্বক ধর্মান্তঃকরণ এবং মন্দির ও গুরুদ্বারা ভস্মসাৎ করার ঘটনার বিবরণ পাওয়া গেছে। ছোটলাট ক্যারো লীগের আন্দোলনকে প্রোৎসাহিত করেছেন বলে তাঁকে অবিলম্বে পদচ্যুত করার জন্য ১৯শে মার্চ নেহরু বড়লাটকে লিখলেন।

ভারতবর্ষে তখন যে রক্তগঙ্গা বইছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে ৬ই মার্চ ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ভারত সম্পর্কিত বিতর্কে চার্চিলের বক্তৃতা জিন্নার পক্ষে দুই দিক থেকে উৎসাহবর্ধক বলা চলে। প্রথমতঃ জওহরলালের নেতৃত্বে "বর্ণ-হিন্দু"দের সরকার গড়তে দেওয়া তাঁর মতে এক "মৌলিক ভ্রান্তি" হয়েছে, কারণ তা এক "সম্পূর্ণ সর্বনাশে" পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ অতঃপর ভারত-বিভাজন যখন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে তখন ব্রিটিশ সরকারের ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ক্রিপ্‌স প্রস্তাব অনুসরণ করা উচিত ছিল। খলিকুজ্জমাঁর মতে এই প্রস্তাব দ্বারা চার্চিল "মুসলমানদের অধিকতর এলাকা দেবার জন্য প্রদেশসমূহের বিভাজন এড়াবার চেষ্টা করেছিলেন।"[১৮]

৮ই মার্চ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এটলীর ২০শে ফেব্রুয়ারীর ঘোষণায় ব্রিটিশের ভারত ছাড়ার নির্দিষ্ট সময়-সীমা নির্ধারণ করে দেওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে আসন্ন গুরুতর দায়িত্ব নেবার জন্য প্রস্তুতি জানাল। সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্কিং কমিটি এই সিদ্ধান্তও ঘোষণা করল যে, লীগের অসহযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে পাঞ্জাব ও বঙ্গকে স্বতন্ত্রভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করার সম্ভাবনা দেখা দিলে ঐ দুই প্রদেশেরও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভাজন করতে হবে। কংগ্রেস এও সিদ্ধান্ত করে যে, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সরকার থেকে লীগের পদত্যাগের জন্য আর চাপ দেওয়া হবে না। জওহরলাল বরং লিয়াকতের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাঁকেও সাড়া

দেবার জন্য অনুরোধ জানালেন। ৯ই জওহরলাল এক পত্রে ওয়াভেলকে ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলেন।

অবশেষে কংগ্রেস সরকারী ভাবে প্রদেশ (এবং তাই স্বভাবতই ভারত) বিভাজনে সম্মত হল। অর্থাৎ পাকিস্তানের দাবি প্রচ্ছন্নভাবে স্বীকৃত হল। উল্লসিত জিন্না ১২ই মার্চ বোম্বের মুসলমান সাংবাদিকদের বললেন, "আমাদের আদর্শ, আমাদের লক্ষ্য, আমাদের মূল ও বুনিয়াদী সিদ্ধান্তসমূহ···কেবল হিন্দু-প্রতিষ্ঠানদের থেকে ভিন্নই নয়, তারা বরং পরস্পরবিরোধী···। একটা সময় ছিল যখন পাকিস্তানের কথাকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া হত। কিন্তু আমি আপনাদের একথা বলতে চাই যে অপর কোন সমাধানই নেই যা আমাদের জনসাধারণের পক্ষে গৌরব ও সম্মান-জনক···ইনশা আল্লা আমরা পাকিস্তান পাব।"[১৯]

ভারত ত্যাগের পূর্বদিন ওয়াভেল শেষবারের মত তাঁর শাসন পরিষদের সদস্যদের সভায় সভাপতিত্ব করার শেষে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রসঙ্গে বললেন, "এক অতীব দুরূহ সময়ে ও সন্ধিকালে আমি বড়লাট হয়েছিলাম। যথাসাধ্য আমি আমার দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি। তবে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হল যার জন্য আমি পদত্যাগে বাধ্য হলাম। এই প্রশ্নে পদত্যাগ করে আমি ঠিক করেছি কিনা তা ভবিষ্যৎ ইতিহাসই বিচার করবে। তবে আপনাদের কাছে আমার আবেদন এই যে আপনারা তাড়াহুড়া করে কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না।"[২০]

॥ ২৯ ॥

ওয়াভেলের উত্তরাধিকারী ভারতের সর্বশেষ ইংরেজ বড়লাট মাউণ্টব্যাটেন কিন্তু তাঁর পূর্বসূরীর পরামর্শের বিপরীত তাড়াহুড়া করে সিদ্ধান্ত গ্রহণেরই নীতি গ্রহণ করেছিলেন। ব্রিটিশ সম্রাটের নিকটাত্মীয়, নৌবাহিনীর অতি উচ্চপদস্থ অফিসার, প্রখর বুদ্ধিমান এবং অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন তাঁর অনুরূপ সুন্দরী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্না স্ত্রী লেডি এডউইনা সহ ২২শে মার্চ পদার্পণ করে ২৪শে থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর পিছনে ব্রিটিশ মন্ত্রীমণ্ডলীর পূর্ণ সমর্থনের শক্তি। এই সমর্থন এত প্রবল ছিল যে তাঁর কাজ করতে সুবিধা হবে বলে ব্রিটিশ সরকার মাউণ্টব্যাটেনের দাবিতে পেথিক লরেন্সের বদলে লিস্টওয়েলকে নূতন ভারত-সচিব নিযুক্ত করেন। প্রত্যুতঃ ভারতের শেষ বড়লাট হতে রাজী হবার পূর্বে তেসরা জানুয়ারী এটলীর কাছে মাউণ্টব্যাটেন এই শর্ত রেখেছিলেন যে, অবিলম্বে ইংলণ্ডকে

ভারত ছাড়ার সময়-সীমা ঘোষণা করতে হবে।[১] এর ফলে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে—এই আশঙ্কা পাঞ্জাব ও বাংলার ছোটলাটদের ছিল—এ আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখেছি। ওয়াভেলও এ ব্যাপারে দুই ছোটলাটের সঙ্গে সহমত ছিলেন বলে তাঁকে প্রায় অমর্যাদাকর ভাবে পদত্যাগ করতে বাধ্য হতে হয়।

কুশলী জনসম্পর্ক-আধিকারিকদের প্রচার এবং মাউণ্টব্যাটেন দম্পতির মোহময় ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত বিশেষতঃ জওহরলাল ও আরও কোন কোন কংগ্রেস নেতার তাদের সম্পর্কে দুর্বলতার জন্য মাউণ্টব্যাটেনকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণে প্রায় ত্রাণকর্তা বলে চিত্রিত করার প্রয়াস করা হয়েছে। একথা সত্য যে বিভাজিত স্বাধীন ভারতবর্ষের সেই সহস্র সমস্যাজড়িত জন্মলগ্নে মাউণ্টব্যাটেন স্বভাবতঃ অন্যান্য কুশীলবদের তুলনায় অসম্পৃক্ত হওয়ায় ধীর মস্তিষ্কে শিশুরাষ্ট্রের প্রভূত সেবাও করেন। কিন্তু জন্মগত অভিজাত অহঙ্কারের সঙ্গে রূপ, ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি ও ক্ষমতা হস্তান্তরের নাটকে তাঁর কেন্দ্রীয় ভূমিকার কারণ এক প্রবল উন্নাসিকতা তাঁর চরিত্রের অঙ্গীভূত হয়েছিল। এর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সরকারী জীবনীকারের মতে তার কার্যপদ্ধতিতে "কিছুটা স্বীয় উদ্দেশ্যসাধন বৃত্তি এবং এমন কি ছলনাও পরিত্যাজ্য ছিল না" এবং উদ্দেশ্য ও উপায়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন আরও অনেকের মত মাউণ্টব্যাটেন স্বয়ং জানতেন যে, "কখনও কখনও তার কার্যকৌশল অনৈতিকতার সীমা স্পর্শ করলেও তিনি বিশ্বাস করতেন যে অপেক্ষাকৃত মঙ্গলের জন্য কিছুটা ছল-চাতুরীর শরণ নেওয়া যেতে পারে।"[২] এর ফলে ৪০ কোটি মানুষের দেশে ক্ষমতা হস্তান্তরের মত এত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারকে তিনি প্রায় "গেলাম, দেখলাম, জয় করলাম"-এর মত মানসিকতা চালিত হয়ে দেশবিভাগকে অপরিহার্য ও অশোভন ভাবে ত্বরান্বিত করেন যার ফলে হাজার হাজার নর-নারী-শিশুর মৃত্যু ও মৃত্যুযন্ত্রণা এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের সহস্রবিধ দুর্দশা ঘটেছিল। ইতিহাসে ব্যক্তিরও কী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, বড়লাট হিসাবে মাউণ্টব্যাটেনের কার্যকলাপ তার অপর এক নিদর্শন।

অবশ্য সত্যের খাতিরে স্বীকার করতে হবে যে ভারত-বিভাজনের জন্য মন তৈরী করে নিয়ে মাউণ্টব্যাটেন বড়লাটের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন নি, যদিও একজন বিখ্যাত ভারতীয় এদেশে পদার্পণ করার পূর্বেই তাঁর কাছে এর জন্য সুপারিশ করেন। ইনি হলেন লণ্ডনের ভারতীয় লীগের সম্পাদক এবং নেহরুর অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন ও ব্যক্তিগত দূততুল্য কৃষ্ণ মেনন। ১৩ই মার্চ মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণ মেনন বলেন যে, তদানীন্তন পরিস্থিতির সমাধান হল উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বে দুটি "পাকিস্তান" প্রতিষ্ঠা। কলকাতার বদলে পূর্ব পাকিস্তানের

যে বন্দরের প্রয়োজন তার জন্য যত ব্যয়ই হোক, চট্টগ্রামকে উন্নত করে পাকিস্তানের হাতে দেওয়া উচিত—এই অভিপ্রায় কৃষ্ণ মেনন ব্যক্ত করেন। এর পরও তিনি একাধিকবার ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে জওহরলালের অভিমতের প্রবক্তা হিসাবে বড়লাট ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন।[৩]

১৮ই মার্চ ভারত রওনা হবার প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী এটলী ভবিষ্যৎ বড়লাটকে যে নির্দেশ দেন তাতে বলা হয়: "মহামান্য সম্রাটের সরকারের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হল, গণপরিষদের মাধ্যমে সম্ভব হলে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে ব্রিটিশ-ভারত ও ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহ নিয়ে একটি মাত্র শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন···। সকল পক্ষকে সম্মিলিত ভাবে এই উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হবার জন্য আপনার শক্তিতে যতটা কুলোয় আপনি তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবেন···। পহেলা অক্টোবরের মধ্যে আপনার যদি মনে হয় যে এক-কেন্দ্রিক সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে কোন বোঝাপড়ায় উপনীত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই···তাহলে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য আপনার মতে কোন্ পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত সে সম্বন্ধে মহামান্য সম্রাটের সরকারকে জানাবেন···ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া যাতে যথাসম্ভব নির্বিঘ্ন হয় তার জন্য এতদাভিমুখে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হবে তার প্রতি ভারতীয় নেতাদের পরিপূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া বাঞ্ছনীয়।"[৪]

মাউণ্টব্যাটেনকে প্রদত্ত পূর্বোক্ত নির্দেশাবলী ভারতীয় রাজনীতির তদানীন্তন জটিল পরিস্থিতিতে একাধারে ক্রম-অপ্রচলিত ও পরস্পরবিরোধী হওয়া সত্ত্বেও ক্যাবিনেট মিশনের ১৬ই মে তারিখের প্রস্তাবানুসারে সর্বজনস্বীকৃত সমাধান খুঁজে বার করার জন্য দায়িত্ব নেবার দিন থেকেই নেহরু ও লিয়াকতের সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেন আলোচনা শুরু করলেন। এছাড়া আলোচনার উদ্দেশ্যে দিল্লীতে আসার জন্য জিন্না ও গান্ধীকে তিনি আমন্ত্রণ জানালেন।

দাঙ্গাপীড়িত বিহারে সদ্ভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে সাময়িক ক্ষান্তি দিয়ে গান্ধী ৩১শে মার্চ থেকে তেসরা এপ্রিল পর্যন্ত দিল্লীতে বড়লাটের সঙ্গে আলোচনা করলেন। ১লা এপ্রিল আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূর করার জন্য এক দুঃসাহসিক প্রস্তাব দিলেন। বললেন যে, বড়লাট যেন তদানীন্তন অন্তর্বর্তী সরকারকে ভঙ্গ করে দিয়ে জিন্নাকেই নিজ মনোমত সদস্যদের নিয়ে নূতন সরকার গঠন করতে আমন্ত্রণ জানান। গান্ধী প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, যতদিন সেই সরকার সকল ভারত-বাসীর মঙ্গলজনক পন্থা অনুসরণ করবে ততদিন কংগ্রেস যাতে জিন্নার সরকারকে আন্তরিক সমর্থন জানায় তার ব্যবস্থা তিনি করবেন। কোন্ পন্থা তাবৎ দেশবাসীর

পক্ষে হিতকর তার সালিশী হবেন স্বয়ং মাউণ্টব্যাটেন—একথাও গান্ধী বললেন। ভারত-বিভাজন পরিহার করার এ প্রস্তাব জিন্না গ্রহণ করতেন কিনা সন্দেহ। কারণ এতে সর্বদাই তাঁকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের কৃপাপরবশ হয়েই থাকতে হত। তবে ৫ই এপ্রিল থেকে জিন্নার সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনের যে আলোচনা হয়, সে-সময়ে তিনি তাঁর কাছে গান্ধীর এ প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করেন নি। এর সম্ভাব্য কারণ এই যে, ঐ দিনই নেহরুকে গান্ধীর প্রস্তাব জানাবার পর তিনি এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন যে, দীর্ঘদিন ক্ষমতা হস্তান্তরের আলোচনার সঙ্গে যুক্ত না থাকার জন্য গান্ধী এরকম অবাস্তব সমাধানের প্রস্তাব করেছেন। অবশ্য ১১ই এপ্রিল গান্ধী এক পত্রে বড়লাটকে জানান যে কংগ্রেস নেতারা তাঁর ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন।[৫]

৫ই এপ্রিল থেকে শুরু করে ১১ই এপ্রিল পর্যন্ত জিন্নার সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনের একটানা আলোচনা চলে, যার শেষে বড়লাটের ধারণা হয় যে "শ্রীযুক্ত জিন্না মানসিক রোগগ্রস্ত"। প্রথম দিনের আলোচনার শেষে মাউণ্টব্যাটেন তাঁর সচিবের কাছে মন্তব্য করেন, "ওরে বাবা! ভদ্রলোক হিমশীতল ছিলেন। সাক্ষাৎকারের অধিকাংশ সময় তাঁর জমে যাওয়া অবস্থা দূর করতেই কাটে।"[৬] প্রথম দিনের আলোচনায় মাউণ্টব্যাটেন একটানা যুক্ত ভারতবর্ষের পক্ষে যুক্তিজাল বিস্তার করেন। "জিন্না 'কোন বিরুদ্ধ যুক্তি দেখান নি। তিনি এই ধারণা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন যে, কোন কথা তিনি যেন শুনতেই পাচ্ছিলেন না।' তবে ধারণারও বাড়া এ, তাঁর তাবৎ প্রয়াস ও লক্ষ্য ছিল না শোনা—তিনি তাঁর মনস্থির করে নিয়েছিলেন। মাউণ্ট-ব্যাটেনের এতদিনের বিশ্বাস—মানুষ যুক্তিচালিত, তার প্রতি প্রকাশ্য অবজ্ঞা তাঁর আচরণে ফুটে উঠেছিল। জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পূর্বে মাউণ্টব্যাটেন কখনও চিন্তা করতে পারেন নি যে, 'এজাতীয় সম্পূর্ণ দায়িত্ববোধের অভাববিশিষ্ট কোন ব্যক্তির পক্ষে তাঁর মত অত ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া' সম্ভব।"[৭]

বড়লাটের কর্মচারীদের প্রধান জেনারেল ইসমের মতে তখন "শ্রীযুক্ত জিন্নার মানসিক গঠনের প্রভাবশালী উপাদান ছিল হিন্দুদের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা ও ঘৃণা। প্রত্যুতঃ তিনি মনে করতেন যে, তাবৎ হিন্দু মনুষ্যেতর জীব যাদের সঙ্গে মুসলমানদের পক্ষে একত্র বসবাস করা অসম্ভব।"[৮] "প্রথম কয়েক সপ্তাহে মাউণ্টব্যাটেন এক জিন্না বাদে আর সবার সঙ্গে ভারতবর্ষের ঐক্য সম্বন্ধে কিছুটা নাটকোচিত সংলাপ বলে কাটালেন। তবে গান্ধী ছাড়া আর সকলেই ভিতরে ভিতরে বুঝে গিয়েছিলেন যে, ভারতীয় ঐক্যের আদর্শ পরাজিত হয়ে গেছে। ১১ই এপ্রিলে তাঁর সহকর্মীদের

সঙ্গে আলোচনার সময়ে মাউন্টব্যাটেন স্বীকার করলেন যে জিন্নাকে তাঁর ভূমিকা থেকে সরানো সম্ভবপর নয় এবং তাঁর সম্মতি ব্যতিরেকে একমাত্র সেনাবাহিনীর অস্ত্রবলেই ভারতবর্ষে ঐক্য জোর করে চাপানো সম্ভব···। ইসমেকে ভারতবর্ষের বিভাজনের একটি পরিকল্পনা রচনা করার দায়িত্ব দেওয়া হল।"[৯]

প্রথমোক্ত সুদীর্ঘ আলোচনা থেকে শুরু করে দোসরা জুনের মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাব সরকারী ভাবে উপস্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত নানা আলোচনা প্রসঙ্গে জিন্না বড়লাটকে জানান যে তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া না করলে মুসলমানরা কোন প্রস্তাব মানবেন না এবং তাঁর দাবি হল ভারতবাসীদের মধ্যে মতৈক্য স্থাপন করার ব্যর্থ প্রয়াস না করে ব্রিটিশ সরকারকেই একটা রোয়েদাদ দিতে হবে। সেই রোয়েদাদে পাকিস্তানকে নীতিগত ভাবে মেনে নিতে হবে এবং পাকিস্তানের নিজস্ব সৈন্যবাহিনীও থাকবে। তারপর লীগ সংখ্যাসাম্যের ভিত্তিতে কোন কেন্দ্রীয় প্রশাসন-ব্যবস্থায় যোগদান করতে পারে। মাউন্টব্যাটেন জানান যে জিন্নার সেই প্রস্তাব স্বীকার করে নিলেও নিছক সেনাবাহিনীকে ঐভাবে ভাগ করতে পাঁচ বছর সময় লাগবে। অথচ ব্রিটিশ ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুনের পর কোনমতেই ভারতে থাকতে প্রস্তুত নয়। ব্রিটিশ সত্যসত্যই এত তাড়াতাড়ি চলে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শুনে জিন্না বিস্মিত ও বিচলিত হন এবং অবিশ্বাসের হাসি হেসে বড়লাটকে প্রশ্ন করেন যে, তাহলে তাঁরা কি ভারতকে বিশৃঙ্খলা রক্তপাত ও গৃহযুদ্ধের কবলে ফেলে চলে যাবেন? মাউন্টব্যাটেন অতঃপর বলেন যে, জিন্নাকে হয় ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব স্বীকার করতে হবে আর নচেৎ খণ্ডিত পাঞ্জাব ও বিভক্ত বঙ্গ সহ পাকিস্তান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। জিন্না বলেন যে, পাঞ্জাব ও বঙ্গ বিভাজনের দাবি কংগ্রেসের "ধাপ্পা"। এর উদ্দেশ্য হল "তাঁকে ভয় দেখিয়ে পাকিস্তানের দাবি থেকে নিরস্ত করা।" তাঁর মতে পাকিস্তানে যথেষ্ট অমুসলমান সংখ্যালঘু থাকলে পাকিস্তান হিন্দুস্থানের সঙ্গে দরাদরি করার ব্যাপারে অধিকতর শক্তিশালী অবস্থায় থাকবে। বড়লাটের কাছে তিনি মিনতি জানালেন যে "বঙ্গ ও পাঞ্জাবের ঐক্য যেন নষ্ট না করা হয়। কারণ (ঐ দুই প্রদেশের) সাধারণ জাতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান: এক ইতিহাস, এক ধরনের জীবনযাত্রাপদ্ধতি; এবং যেখানে হিন্দুদের ভিতর কংগ্রেসের সদস্যের তুলনায় বাঙালী বা পাঞ্জাবীর মানসিকতা প্রবলতর।"[১০] বড়লাট জিন্নাকে জানিয়ে দিলেন যে ভারত বিভাগের পক্ষে তাঁর তাবৎ যুক্তি পাঞ্জাব ও বঙ্গ বিভাজনের পক্ষেও প্রযোজ্য এবং ঐ দুই প্রদেশের অমুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অস্বীকার করা সম্ভব নয়। জিন্না তখন পৃথক পৃথক ভাবে প্রদেশগুলিকে ক্ষমতা হস্তান্তর করার পরামর্শ দিলেন, যাতে অন্ততঃ কংগ্রেস কেন্দ্রে

ক্ষমতা লাভ থেকে বঞ্চিত হয়। জবাবে মাউণ্টব্যাটেন জিন্নাকে পৃথক পৃথক ভাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলিকে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য তাঁকে সাহায্য করতে আমন্ত্রণ জানান। বলা বাহুল্য জিন্নার পক্ষে মাউণ্টব্যাটেনের এই চালের জবাব দেওয়া সম্ভব ছিল না। পাকিস্তানের দুই প্রধান প্রদেশের বিভাজনের দায়িত্ব নিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। বড়লাটের সঙ্গে তাঁর আলোচনার বিবরণ জানাবার জন্য তিনি লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা তো আহ্বান করলেনই না, বড়লাটকে অনুরোধ জানালেন যে প্রদেশগুলির অভিমত যাচাই-এর পদ্ধতি যেন খোলসা করে ব্যক্ত করা না হয়।[১১]

ইতিমধ্যে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা ও হানাহানির বিরতির কোন নিদর্শন নেই। এপ্রিলের মাঝামাঝি এক সরকারী পরিসংখ্যান অনুসারে পাঞ্জাবে বিগত এক মাসে ৩৫০০ জনের মৃত্যু হয়, যার ছয় ভাগের এক ভাগ মুসলমান এবং বাকী হিন্দু ও শিখ। ছোটলাট জেনকিন্সের অভিজ্ঞতা এই যে, পাঞ্জাবের লীগ নেতারা তাঁদের যুব কর্মীদের দাঙ্গায় অংশগ্রহণ করার মধ্যে নিন্দার কিছু দেখছেন না। তাঁর বক্তব্য —পারলে তিনি স্বয়ং এবং পাঞ্জাবের ইংরেজ কর্মচারীরা এই মুহূর্তে সে প্রদেশ ছেড়ে চলে যেতে প্রস্তুত। কারণ "আমাদের মনে হচ্ছে যে আমরা এখন এমন মানুষদের মধ্যে বসবাস করছি যাঁরা নিজেদের ধ্বংস করতে কৃতনিশ্চয়।"[১২] উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে হিন্দু-শিখ নিধন-যজ্ঞ বন্ধ করতে কংগ্রেস সরকার অক্ষম, উপরন্তু কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মত জিন্না ৭ই মে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খাঁ সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন যে, তাঁর অনুগামীদের প্রতি সর্বতোভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে।[১৩] ডেরা ইসমাইল খাঁ শহরের অর্ধেক ভস্মসাৎ। বোম্বাই ও বারানসীতে কারফিউ। কলকাতায় থেকে থেকে দাঙ্গা। ভারতের জনমত দ্রুত মুসলমান অমুসলমান—দুই যুযুধান শিবিরে বিভক্ত হচ্ছে। দেশ-বিভাজনের গুজব ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ঘটনা বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ব্যাপক বাস্তত্যাগও শুরু হয়ে গেছে।

পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য মাউণ্টব্যাটেন কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের এক যৌথ শান্তি-আবেদন জারি করার অনুরোধ করলেন। উভয় দলই এ প্রস্তাবে রাজী হলেও এবং আবেদনের বয়ান স্বীকৃত হলেও, কংগ্রেসের তরফ থেকে সে আবেদনে দলের সভাপতি কৃপালনী স্বাক্ষর করবেন শুনে লীগ সভাপতি জিন্না পিছিয়ে গেলেন। বললেন, কৃপালনীর মত একজন "অজ্ঞাত সাধারণ ব্যক্তির" সঙ্গে একযোগে তাঁকে স্বাক্ষর করতে বলা লীগের অসম্মান। তাঁর মর্যাদা রক্ষার জন্য গান্ধীর চেয়ে

নীচু দরের কারও সই করা চলবে না। কংগ্রেস প্রথমে এ দাবির বিরোধিতা করলেও শেষ অবধি নতি স্বীকার করল। জিন্না ইংরাজীতে সই করলেন এবং গান্ধী করলেন ইংরাজী ছাড়াও হিন্দি ও উর্দু—উভয় ভাষাতেই। ১৫ই এপ্রিল জারি করা ঐ যৌথ আবেদনে বলা হল:

"কারা আক্রমণকারী আর কারা তার শিকার ছিল—এ বিচারে না গিয়ে আমরা সাম্প্রতিক আইন-শৃঙ্খলার বিরোধী হিংসাত্মক ঘটনাবলীর জন্য গভীর পরিতাপ ব্যক্ত করছি। এই সব ঘটনা ভারতের সুনামের উপর দুরপনেয় কলঙ্ক লেপন করছে এবং নির্দোষ ব্যক্তিদের আত্যন্তিক দুঃখ-দুর্দশার কারণ হয়েছে।

"রাজনৈতিক লক্ষ্য সাধনের জন্য হিংসার সহায়তা নেওয়াকে আমরা সর্বথা নিন্দা করি এবং দল-মত-নির্বিশেষে ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের কাছে এই আবেদন জানাই যে তাঁরা কেবল হিংসা ও বিশৃঙ্খলার যাবতীয় কার্যকলাপ থেকেই দূরে থাকবেন না, লেখায় এবং কথায়ও এজাতীয় পদক্ষেপের প্ররোচনাদানকারী শব্দাবলী পরিহার করবেন।"[১৪]

দাঙ্গাগ্রস্ত এলাকায় ঐ যৌথ আবেদন মুদ্রিত করে ব্যাপকভাবে ছড়ানো হলেও তার কোন সুফল দেখা গেল না। পক্ষান্তরে লীগের মুখপত্র "ডন" এই প্রয়াসকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে তার ১৮ই এপ্রিলের সংখ্যায় মন্তব্য করল: "দুই জনগোষ্ঠী এবং দুই জাতি নিজেদের বিশিষ্ট নেতাদেরই মাত্র শ্রদ্ধা করবে—এ না হলে এজাতীয় এক আবেদনের কারণ কিসের জন্য দেখা গেল?" যাই হোক, ভারত-বিভাজনের জন্য জিন্নার মন তৈরী হয়ে গেলেও এই পর্যায়ে জিন্না এক অভিমত ব্যক্ত করেন যে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানকে নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়ায় উপনীত হতে হবে। কারণ, "পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান শেষ পর্যন্ত কাছাকাছি এলেও —এবং তাঁর অনুমান ও বিশ্বাস এই যে এমনটা হবে—কোন শক্তিশালী আক্রমণকারীর সম্মুখে এককভাবে দাঁড়াতে পারবে না।"[১৫] কিন্তু সম্ভবতঃ গণপরিষদে ২৮শে এপ্রিল "ইউনিয়ন পাওয়ার্স কমিটি"র যে প্রথম প্রতিবেদন পেশ হয় এবং তার ফলে সীমিত ক্ষমতাযুক্ত এক কেন্দ্রের সঙ্গে পাকিস্তানের যোগসূত্র স্থাপনের জিন্নার ক্ষীণ আশা চিরতরে লুপ্ত হয়।[১৬]

অতঃপর উভয় পক্ষের পক্ষে গ্রহণীয় একটা সমাধানসূত্র খুঁজে বার করার জন্য জিন্না ও গান্ধীর সঙ্গে বড়লাট ভবনে এক আকস্মিক সাক্ষাৎকার হল। এই ব্যর্থ আলোচনার বিবরণ দান প্রসঙ্গে অ্যালান ক্যাম্পবেল জনসন লিখেছেন: "ঘটনাচক্রে সাক্ষাৎকার দুটির সময় অভিন্ন হয়ে গেল এবং মাউণ্টব্যাটেনের ভিতর গত তিন

বছরের মধ্যে এই প্রথম নেতৃদ্বয়কে মিলিত হতে দেবার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং সামাজিক সৌজন্যবোধ ছিল। কিন্তু পরস্পরকে নমস্কারাদি জানাবার আনুষ্ঠানিকতা একবার সমাপ্ত হবার পর উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎকার মাউন্টব্যাটেনের সব হিসাব-কিতাবকে মিথ্যা প্রমাণিত করল। কারণ বেশ কিছুটা ব্যবধানে উপবিষ্ট গান্ধী ও জিন্না তাঁদের কণ্ঠস্বরকে প্রয়োজনীয় উচ্চগ্রামে তুলতে অসমর্থ হলেন। এর ফলে তাঁদের দুজনকে দূর থেকে মূকাভিনয়ে নিরত দুই বৃদ্ধ ষড়যন্ত্রকারীদের মত প্রতীয়মান হতে লাগল।" প্রথম প্রয়াসের ব্যর্থতার পর মাউন্টব্যাটেনের পীড়াপীড়িতে গান্ধী ৬ই মে আবার জিন্নার সঙ্গে মিলিত হলেন। এবার মিলনস্থল জিন্নার আগ্রহে তাঁর নিবাসে। প্যাটেলসহ গান্ধীর অন্তরঙ্গরা অনেকে এভাবে তাঁর জিন্নার বাসগৃহে গিয়ে মিলিত হবার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু গান্ধী মান-মর্যাদার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে জিন্নার বাড়িতে গিয়ে দ্বিতীয়বার ব্যর্থ আলোচনা করলেন। আলোচনা-শেষে জিন্না এক বিবৃতিতে জানালেন যে গান্ধী ভারত-বিভাজনের নীতিতে বিশ্বাস করেন না, অথচ তাঁর নিজের বিশ্বাস হল, "পাকিস্তান কেবল অপরিহার্যই নয়, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যাবলীর একমেব বাস্তব সমাধান।"[১৮] এই আলোচনার পর জিন্না মাউন্টব্যাটেনকে লিখলেন যে, "পাকিস্তানের প্রশ্ন আলাপ-আলোচনার বিষয় নয়।"[১৯]

ক্ষমতা হস্তান্তর সংক্রান্ত পরবর্তী প্রসঙ্গে যাবার পূর্বে বঙ্গের মুসলিম লীগের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের কথা অতঃপর বলা প্রয়োজন। অন্তর্বর্তী সরকারে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে বাংলা থেকে লীগের প্রতিনিধি করা ঐ প্রদেশের লীগের উভয় গোষ্ঠীর নেতা সুরাবর্দী ও নাজিমুদ্দীন কারও কাছেই প্রীতিপ্রদ হয় নি। সুরাবর্দী ও শরৎচন্দ্র বসুর সার্বভৌম বঙ্গের প্রস্তাবের পটভূমি এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য। পরবর্তীকালে এই প্রস্তাব নিয়ে আন্তরিকভাবে অগ্রসর হবার জন্য যদিও সুরাবর্দীর নাম এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, এর যথার্থ জনক কিন্তু বঙ্গীয় লীগের সম্পাদক ও সুরাবর্দী-গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা আবুল হাসেম। হাসেম লীগের মধ্যে বিরলসংখ্যক প্রগতিশীল নেতাদের অন্যতম, কুশলী সংগঠক ও প্রভাবশালী বাগ্মী ছিলেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে একাধিক বৈঠকে মিলিত হয়ে তাঁরা সার্বভৌম বঙ্গের প্রস্তাবের খসড়া রচনা করলেন। এর মূল কথা হল বঙ্গের বিভাজন নয়, এক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে বিকাশ। ব্রিটিশ সরকারের ২০শে ফেব্রুয়ারীর ঘোষণার পর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভার বঙ্গ বিভাজনের দাবি এবং ক্রমশঃ হিন্দু মালিকানার সংবাদপত্র ও কংগ্রেসের একাংশ সহ অন্যান্য দলের নেতাদের

কণ্ঠেও এর প্রতিধ্বনি ওঠে। কমিউনিস্ট পার্টি গোড়া থেকেই আত্মনিয়ন্ত্রণের নামে পাকিস্তানের দাবির সমর্থন করছিল। চৌঠা এপ্রিলের এক প্রস্তাবে বঙ্গীয় কংগ্রেস ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গের যেসব এলাকা ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হতে চায় তাদের সে অধিকার দেবার অর্থাৎ পাকিস্তানের পটভূমিকায় বঙ্গ বিভাজনের দাবি জানায়।

বঙ্গ বিভাজনের দাবি অতঃপর লীগের এক শ্রেণীর নেতাদের কাছে আকস্মিক আঘাতরূপে প্রতীয়মান হয়। বঙ্গের একাংশ নিয়ে পাকিস্তান গড়ার বদলে তাঁরা অখণ্ড বঙ্গের জন্য জনমত সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয় মনে করেন। সুরাবর্দীও কলকাতা ও নোয়াখালির দাঙ্গার পর উপলব্ধি করেছিলেন যে তাঁর নেতৃত্বের নিরাপত্তার জন্য হিন্দু-মুসলমানের মিলিত রাজনীতিই বাঞ্ছনীয়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ৮ই মার্চের প্রস্তাবে পরোক্ষভাবে ভারত-বিভাজন স্বীকার করে নেবার পর থেকে বঙ্গের কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসু প্রকাশ্যেই বঙ্গবিভাগের বিরোধিতা করছিলেন। অপর এক কংগ্রেস নেতা কিরণশঙ্কর রায়ও এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গী হলেন। এর সঙ্গে সুরাবর্দীর প্রয়াস মিলিত হওয়ায় সার্বভৌম বঙ্গের আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল। প্রথম দিকে নাজিমুদ্দীনও এর সমর্থক ছিলেন। সার্বভৌম বঙ্গে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুরা রাজনৈতিক ক্ষমতার যথোচিত অংশ পাবেন—এই প্রতিশ্রুতি সুরাবর্দী ও আবুল হাসেম দিলেন। শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে সুরাবর্দী ও আবুল হাসেমের কয়েক দফা আলোচনার পর তেসরা মে প্রাদেশিক লীগের ওয়ার্কিং কমিটি বাংলার ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্বন্ধে হিন্দু নেতাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য ৬ জন সদস্যের একটি উপসমিতি গঠন করল।

কিন্তু প্রাদেশিক লীগের আক্রাম খাঁ গোষ্ঠী সুরাবর্দী ও হাসেম প্রচারিত বাঙালী জাতীয়তাবাদের বদলে মুসলিম জাতীয়তাবাদের সমর্থক ছিল এবং তাই পাকিস্তানের কাঠামোর বাইরে বাংলার হিন্দুদের সঙ্গে কোন রকম বোঝাপড়ার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাঁরাও বঙ্গ বিভাজনের বিরোধী, তবে অবিভক্ত বঙ্গকে পাকিস্তানের অঙ্গীভূত করার জন্য। শরৎচন্দ্র বসু ও সুরাবর্দী এ ব্যাপারে পৃথক পৃথক ভাবে গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। তিনি রাজনৈতিক চুক্তির উপর গুরুত্ব দেবার বদলে হিন্দুদের মনের যে ভয় ও অবিশ্বাসের জন্য তাঁরা বঙ্গ বিভাগের পক্ষে, তা দূর করার জন্য চেষ্টা করার পরামর্শ দেন। প্রস্তাবের প্রথম প্রবক্তা আবুল হাসেমও গান্ধীর সমর্থন পাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি গান্ধীকে বিশেষ প্রভাবিত করতে পারেন নি।[২০] সুরাবর্দী ১৪ই ও ১৫ই মে এ ব্যাপারে যথাক্রমে বড়লাট ও জিন্নার

সঙ্গে আলোচনা করেন। মাউণ্টব্যাটেনও ইতিপূর্বে (২৬শে এপ্রিল) এ সম্বন্ধে জিন্নার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন।[২১] তখন জিন্না এ প্রস্তাবের বিরোধী না হলেও পরবর্তীকালে বঙ্গীয় লীগের জিন্নাপন্থী-রূপে পরিচিত আক্রাম খাঁ (ইনিও বঙ্গবিভাজনের বিরোধী, তবে সম্পূর্ণ বঙ্গকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য) ও নাজিমুদ্দীন গোষ্ঠীর প্রভাবে সার্বভৌম বঙ্গের প্রকাশ্য সমর্থন করা থেকে বিরত থাকেন। এর ফলে ২৮শে মে প্রাদেশিক লীগের ওয়ার্কিং কমিটি সার্বভৌম বঙ্গের প্রস্তাবের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে নিজেদের ভবিষ্যৎ সর্বতোভাবে জিন্নার উপর সমর্পণ করে। জওহরলাল ও প্যাটেলের মত কংগ্রেস নেতারা তো এর বিরোধী ছিলেনই। হাইকম্যাণ্ডকে এড়িয়ে প্রাদেশিক স্তরে এ রকম গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা তাঁদের পছন্দ ছিল না। এ ছাড়া তাঁদের মনে আশঙ্কা ছিল যে সমগ্র বঙ্গই তাহলে শেষ অবধি পাকিস্তানের কবলিত হবে। প্রাদেশিক লীগের মত প্রদেশ কংগ্রেস কোন স্তরেই সরকারী ভাবে এ প্রস্তাবের সঙ্গে যুক্ত হয় নি। সুতরাং সুরাবর্দী ও শরৎচন্দ্র বসুর প্রস্তাব অবশেষে পরিত্যক্ত হল।[২২]

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের বিভাজন করে ক্ষমতা হস্তান্তরের এক পরিকল্পনা নিয়ে মাউণ্টব্যাটেনের তরফ থেকে ইসমে বিলাতে গেছেন এবং ব্রিটিশ মন্ত্রীমণ্ডল তার কিছুটা পরিবর্তনের পর অনুমোদন করে ১০ই মে বড়লাটকে পাঠিয়ে দিয়েছে। মাউণ্টব্যাটেন ভেবেছিলেন যে কংগ্রেস ও লীগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁর পরিকল্পনা রচিত বলে তা উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য হবে। তবু কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ ছিল বলে আর কাউকে সেই পরিকল্পনা না দেখিয়ে কেবল জওহরলালকে একান্তভাবে সেটি দেখতে দেন। বড়লাটের অতিথি হয়ে নেহেরু তখন সিমলায়। তিনি বড়লাটের কাছে তীব্রভাবে এর বিরোধিতা করেন। কয়েকদিন পর ঐ পরিকল্পনা সম্বন্ধে জিন্নার প্রতিক্রিয়া জানাতে বলায় তিনিও কঠোর ভাবে তার বিরোধিতা করে লেখেনঃ "মুসলিম লীগ বঙ্গ ও পাঞ্জাবের বিভাজনে সম্মত হতে পারে না।...ঐতিহাসিক, আর্থিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক দিক থেকে এর যুক্তি নেই। এই প্রদেশ দুটি প্রায় এক শতাব্দী যাবৎ নিজ নিজ বিশিষ্ট জীবনযাত্রা পদ্ধতির বিকাশসাধন করেছে...এবং এদের বিভাজনের যে একমাত্র যুক্তি উপস্থাপিত করা হচ্ছে তা হল যেসব এলাকায় হিন্দু ও শিখেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই সব অঞ্চলকে অন্যান্য অঞ্চল থেকে পৃথক করতে হবে।...এর পরিণাম প্রদেশদ্বয়ের জীবনে এবং সকল সম্প্রদায়ের পক্ষে সর্বনাশা হবে।...আপনারা যদি এজাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন—যা আমার মতে এক চরম সিদ্ধান্ত হবে—

কলকাতাকে পূর্ব বঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করা উচিত হবে না···সর্বনাশ যদি অবধারিত হয়ই, কলকাতাকে এক মুক্ত বন্দরে পরিণত করা উচিত।"[২৩] বাংলাকে অবিভক্ত রাখার জন্য জিন্না যেমন একসময়ে সুরাবর্দী ও শরৎচন্দ্র বসুর প্রস্তাবে প্রচ্ছন্ন সমর্থন জানিয়েছিলেন, পাঞ্জাবকে অবিভক্ত-রূপে পাকিস্তানে পাবার জন্য তিনি শিখ-নেতাদের নেহরু-প্যাটেলের তুলনায় অনেক বেশী সুবিধা দেবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বড় দেরিতে জিন্না ভারত-বিভাজনের দাবির যুক্তিসঙ্গত পরিণতি বঙ্গ ও পাঞ্জাব বিভাগের বিপজ্জনক পরিণামের কথা উপলব্ধি করেছিলেন।

"যে 'দুই জাতি' তত্ত্বের বলে জিন্না কেন্দ্রে লীগের জন্য ক্ষমতার অংশ পাবার আশা পোষণ করেছিলেন তা অতঃপর এক তলোয়ারে পরিণত হয়ে তাঁর পাকিস্তানকে যথাযথ আকারে কর্তন করা আরম্ভ করেছিল। জিন্নার রণকৌশলের পুনরুদ্ধারের একমাত্র উপায় ছিল পাঞ্জাব ও বঙ্গকে অবিভক্ত রাখার জন্য ঐ দুই প্রদেশে প্রাদেশিক স্তরে একটা বোঝাপড়া হওয়া। কিন্তু সাত বছর যাবৎ 'পাকিস্তানে'র জন্য উচ্চৈঃস্বরে প্রচার ও আসল অর্থনৈতিক অভিযোগসমূহকে ক্রমবর্ধমানহারে সাম্প্রদায়িক পরিভাষায় ব্যাখ্যা করার পরিণামস্বরূপ সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠে কোন রকম ব্যবস্থাগ্রহণ প্রত্যুতঃ অসম্ভব ছিল।···পরিস্থিতির সবচেয়ে বড় স্ববিরোধ ছিল এই যে জিন্নার পক্ষে তাঁর অনুগামীদের বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হতে এবং কেন্দ্রে তাঁর দাবি স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত অন্যান্য সম্প্রদায়ের সদস্যদের প্রয়োজনীয় সুবিধা দিতে পরামর্শ দেবার উপায় ছিল না। অথচ পাঞ্জাব ও বঙ্গের লীগ নেতারা তাঁদের প্রদেশ অবিভক্ত রাখার কোন রকম একটা সূত্র উদ্ভাবন করতে সক্ষম না হওয়া পযন্ত কেন্দ্রে তাঁর দাবি পূর্ণ করার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। যে নেতার দাবি এজাতীয় টলটলায়মান ভিত্তির উপর স্থাপিত, তাঁর পক্ষে চূড়ান্ত সমাধানের কোন শর্ত নির্দেশ করা সম্ভবপর নয়।"[২৪]

ভারতের পরিস্থিতি তখন এতই অগ্নিগর্ভ যে ১৯শে মে বড়লাট ব্রিটিশ মন্ত্রীমণ্ডলীকে জানান যে, "কোন না কোন রূপে পাকিস্তানের দাবি মেনে না নিলে মুসলিম লীগ অস্ত্রধারণ করবে।"[২৫]

যাই হোক, বড়লাট তাই ভি.পি. মেননের সাহায্যে পূর্বোক্ত পরিকল্পনার সংশোধন করে তার অনুমোদনের জন্য আবার বিলাতে পাঠান এবং ইসমের পরামর্শে মন্ত্রীমণ্ডলীকে সে সম্বন্ধে বোঝাবার জন্য ১৮ই মে স্বয়ং বিলাতে যান। নেহরু লিখিত-ভাবে সংশোধিত পরিকল্পনা সাধারণভাবে অনুমোদন করেন। জিন্না এতে মোটামুটি সম্মতি জানালেও কিছু লিখে দিতে অস্বীকার করেন। তবে ২১শে মে রয়টারের

প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তিনি প্রস্তাবিত পাকিস্তানের উভয় অংশের সঙ্গে সংযোগের জন্য এক ৮০০ মাইল লম্বা করিডর বা সংযোগ-ভূমি দাবি করেন[২৬] এবং ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার কাছে এক তারবার্তা প্রেরণ করে পাঞ্জাব ও বঙ্গের বিভাজন সম্বন্ধে দুই প্রদেশের অভিমত গণভোটের মাধ্যমে যাচাই করার দাবি করেন। ঐ বক্তব্যেই জিন্না ভবিষ্যৎ পাকিস্তানের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রথমবার একটা স্পষ্ট ধারণা দেবার চেষ্টা করেন এবং বলেন যে পাকিস্তান ধর্ম-ভিত্তিক রাষ্ট্র হবে না। পাকিস্তানে "হবে এক জনপ্রিয়, প্রতিনিধিত্বমূলক ও গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা"—যেখানে মন্ত্রীমণ্ডল পার্লামেণ্টের প্রতি দায়িত্বশীল থাকবে এবং উভয় প্রতিষ্ঠান "জাতি ধর্ম বা সম্প্রদায়ের পার্থক্য না করে শেষ পর্যন্ত নির্বাচকমণ্ডলী ও জনসাধারণের প্রতি দায়িত্বশীল থাকবে।" পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের প্রতি তিনি আশ্বাসবাণী দিলেন যে তাঁরা "সুরক্ষিত এবং নিরাপত্তাযুক্ত"। কারণ তাঁরা "জাতি ধর্ম বর্ণের পার্থক্য নির্বিশেষে ...পাকিস্তানের নাগরিক" হবেন। সেইজন্য তাঁর মনে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তাঁদের প্রতি "ন্যায়সঙ্গত সমুচিত আচরণ করা হবে" এবং "পার্লামেণ্টের যৌথ বিবেক স্বয়ং এই বিষয়ের নিশ্চয়তা হবে যাতে সংখ্যালঘুদের প্রতি কোন অবিচার করা হতে পারে—এমন কোন আশঙ্কা তাঁদের মনে না থাকে।"[২৭] উভয় রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন যে তা হৃদ্যতাপূর্ণ হবে বলে তাঁর আশা। কারণ "পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের মধ্যে উভয়ের পারস্পরিক স্বার্থে এবং যে-কোন আক্রমণেচ্ছুক বহিঃশক্তির বিরুদ্ধে একটা জোট-বাঁধা চুক্তি বা সন্ধি হবে বলে আমি বিবেচনা করি।"

অবশেষে "মাউণ্টব্যাটেনের সংশোধিত প্রস্তাবেও ব্রিটিশ মন্ত্রীমণ্ডলীর সম্মতি পাওয়া গেল। ক্ষমতা হস্তান্তরের দিনকে আরও এগিয়ে আনার উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব শীঘ্র ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট যাতে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করে তার জন্য মাউণ্টব্যাটেন বিরোধী পক্ষের নেতা চার্চিলের সঙ্গে ২০শে মে কথা বলেন। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে এবং উভয় উপনিবেশই ব্রিটিশ কমন-ওয়েলথের মধ্যে থাকবে একথা জেনে চার্চিল প্রস্তাবিত আইন প্রণয়নে তাঁর দলের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। 'মাউণ্টব্যাটেন যখন জানালেন যে নেহরু ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনে এই শর্তে রাজী হয়েছেন যে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে এবং জিন্না তখনও ইতস্তত: করছেন তখন চার্চিল বিস্মিতভাবে বললেন, 'ঈশ্বরের দোহাই তিনিই একমাত্র ব্যক্তি ব্রিটিশের সাহায্য ছাড়া যাঁর চলে না।' কোন প্রকার দ্বিধার পরিণামে পাকিস্তানের কি বিপদ হতে পারে তার প্রতি

দৃষ্টি আকর্ষণ করে মুসলিম নেতার কাছে চার্চিল এক ব্যক্তিগত বাণী পাঠালেন।"[২৮] চার্চিলের পরামর্শের সারমর্ম ছিল: "দুই হাত বাড়িয়ে আপনি যদি এই প্রস্তাব গ্রহণ না করেন তবে ব্যাপারটা পাকিস্তানের জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন হবে।"

২৩শে মে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা সরকারী ভাবে অনুমোদন করে। দোসরা জুন মাউন্টব্যাটেন ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে স্বাধীনতা দেবার তাঁর ঐতিহাসিক প্রস্তাবে ভারতীয় নেতাদের সম্মতি পাবার জন্য তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলেন। জিন্নাসহ লিয়াকৎ আলী খাঁ ও আবদুর রব নিস্তার ছিলেন লীগের পক্ষে। কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন জওহরলাল ও বল্লভভাই ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের সভাপতি কৃপালনী। এছাড়া আকালীদের তরফ থেকে ছিলেন সর্দার বলদেব সিং। প্রস্তাবের সারমর্ম হল পাঞ্জাব ও বঙ্গের বিভাজন করে মুসলমান ও অমুসলমানের ভিত্তিতে অবিলম্বে পাকিস্তান ও ভারতবর্ষ নামক দুই রাষ্ট্রের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অথচ কংগ্রেস শাসিত সীমান্ত প্রদেশ এবং কংগ্রেস শাসিত অথচ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ আসামের শ্রীহট্ট জেলা কোন্ রাষ্ট্রে যোগদান করতে চায় তা নির্ধারিত হবে গণভোটের দ্বারা। ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে বড়লাট বললেন যে প্রস্তাবের মূল বক্তব্য সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই তাঁদের জানানো হয়েছে এবং তাই সেইদিনই মধ্যরাত্রির ভিতর তাঁদের চূড়ান্ত অভিমত তাঁকে জানাতে হবে। "মাউন্টব্যাটেন এমন এক দ্রুত পদক্ষেপে তাঁদের সামনে ঠেলে নিয়ে যেতে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েছিলেন যে তাঁদের মধ্যে কারও পক্ষে এ ব্যাপারে পুনর্বিচার করা অথবা প্রস্তাবের বিশদ বিবরণ নিয়ে কোন রকম হৈ-চৈ বাধাবার অবকাশ না জোটে।"[২৯]

কংগ্রেস প্রতিনিধিরা সীমান্ত প্রদেশের গণভোট এবং নূতন দুই ডোমিনিয়নের একটি কমনওয়েলথ না ছাড়লে অপরটি ছাড়তে পারবে কিনা সে সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা ছাড়া মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাব মেনে নিলেন। জিন্না কিন্তু পাঞ্জাব ও বঙ্গ বিভাজনের ব্যাপারে লীগ ওয়ার্কিং কমিটির আপত্তির কথা জানালেন এবং তাঁর কাউন্সিলের অনুমোদন ছাড়া আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর সম্মতি জানাতে প্রস্তুত হলেন না। মাউন্টব্যাটেনের খুব চাপাচাপির ফলে তিনি অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে প্রস্তাব সম্বন্ধে তাঁর স্বীকৃতি জানালেন। "মাউন্টব্যাটেনের কোন কথাই তাঁকে বিচলিত করতে সমর্থ হল না।...'এই যদি আপনার মনোভাব হয়, তাহলে কংগ্রেস ও শিখদের নেতারা আগামীকাল সকালের সভায় এ প্রস্তাবে চূড়ান্ত স্বীকৃতি দেবেন না। তার পরিণামে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে এবং সম্ভবতঃ চিরকালের জন্য আপনি আপনার পাকিস্তান হারাবেন।' 'যা হবার তা-ই হবে'—এই ছিল তাঁর একমাত্র প্রতিক্রিয়া! 'মিস্টার

জিন্না! এই বোঝাপড়ায় উপনীত হবার জন্য যে প্রভূত পরিশ্রম করতে হয়েছে আপনি তা ভণ্ডুল করে দিন—এ আমি হতে দিতে পারি না। আপনি যখন মুসলিম লীগের তরফ থেকে এ প্রস্তাবে স্বীকৃতি দিতে রাজী হচ্ছেন না, তখন আমি নিজেই তাঁদের হয়ে কথা বলব।...আমার শর্ত কেবল একটিই এবং তা হল এই যে সকালের সভায় আমি যখন বলব যে, 'মিস্টার জিন্না আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং তা আমি স্বীকার করে নিয়েছি ও তাতে আমি সন্তুষ্টও বটে, আপনি তখন কোনক্রমেই তার প্রতিবাদ করবেন না। আর তারপর আমি যখন আপনার দিকে তাকাব, আপনি স্বীকৃতিসূচক...মাথা নাড়বেন।' এ প্রস্তাবের প্রত্যুত্তর দিলেন জিন্না ঐ মাথা নেড়ে।"[৩০]

পরদিবসের (তেসরা জুন) ভারতীয় নেতাদের আনুষ্ঠানিক সভায় পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে মাউণ্টব্যাটেনের প্রস্তাবে জিন্নার সম্মতি পাওয়া গেল। সম্মতি পাওয়া মাত্রই বড়লাট দেশবিভাগকে কার্যকরী করার জন্য অতঃপর যেসব পদক্ষেপ নিতে হবে তার জন্য পূর্বপ্রস্তুত এক দলিল ভারতীয় নেতাদের হাতে তুলে দিলেন। ভারত ব্যবচ্ছেদের ভীষণ বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে তাঁদের মনে যে আলোড়ন সৃষ্টি হল তার বিবরণ মাউণ্টব্যাটেন প্রায় অগ্নিশিখায় লেলিহান রোম নগরী দৃষ্টে নীরোর মত মানসিকতা চালিত হয়ে লিপিবদ্ধ করে গেছেন: "উপস্থিত সকলে এই আঘাতের ফলে এমন প্রচণ্ডভাবে বিহ্বল হয়ে পড়লেন...'যে ব্যাপারটা যদি অমন বিয়োগান্তক না হত তবে তাকে মজাদারই বলা যেত।' ঘটনাটা বিয়োগান্তক হবার কারণ হল এই যে কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ কোন দলই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উপর-উপর ভাবে ছাড়া চিন্তা করে নি। তাদের কাছে স্বাধীনতা প্রাপ্তি এবং দেশ বিভাজনই এক স্বয়ং-সম্পূর্ণ লক্ষ্য ছিল। এবারে তাঁরা বুঝলেন যে এ কেবল সূত্রপাত।"[৩১] তেসরা জুন সন্ধ্যায় দিল্লী বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে বড়লাট ও নেহরুর পর জিন্না বিশ্বকে তাঁর দীর্ঘদিনের প্রয়াসের সাফল্য—পাকিস্তান অর্জনের সংবাদ ঘোষণা করলেন। অতঃপর পাকিস্তানের জন্ম কেবল সময়ের ব্যাপার।

জুনের ৯ই দিল্লীর ইম্পিরিয়াল হোটেলের বলরুমে লীগ কাউন্সিলের সভা হল। কিন্তু পাঞ্জাব ও বঙ্গের বিভাজন-বিরোধী লীগ প্রতিনিধিদেরই একাংশের তীব্র বিরোধের ফলে সভা শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালিত হতে পারে নি। কোন কোন বক্তা একে "বিশ্বাসঘাতকতা" এবং "পাকিস্তানের দুরদৃষ্ট" আখ্যা দেন। তাঁদের সব সময়ের হাতিয়ার বেলচা কাঁধে খাকসাররা জিন্নার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য জোর করে হোটেলের মধ্যে প্রবেশ করে। তাঁদের সভা থেকে বহিষ্কৃত করতে

লীগের ন্যাশনাল গার্ডদের বিশেষ বেগ পেতে হয়। আলোচনা-শেষে লীগ কাউন্সিল "চূড়ান্ত ফয়সালা" নয়, "আপোস" হিসাবে বিপুল সংখ্যাধিক্যে (বিপক্ষে মাত্র ১১টি ভোট পড়ে) পরিকল্পনা গ্রহণ করার স্বীকৃতি দেয়। ১৫ই জুন অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিও বিপুল সংখ্যাধিক্যে ওয়ার্কিং কমিটির দেশবিভাগের প্রস্তাব অনুমোদন করে। তবে এর জন্য গান্ধীকে সদস্যদের কাছে আবেদন করতে হয়েছিল এবং তারপরও বিশেষ করে সমাজবাদী গোষ্ঠী এর বিপক্ষে ভোট দিয়েছিল। বঙ্গ ও পাঞ্জাবের বিধানসভা যথাক্রমে ২০শে ও ২৩শে জুন প্রদেশ বিভাজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২৬শে জুন সিন্ধু বিধানসভা সংখ্যাধিক্যে এক নূতন গণপরিষদে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। ইতিমধ্যে প্রবল সাম্প্রদায়িক প্রচারের মধ্যে শ্রীহট্ট ও সীমান্ত প্রদেশে গণভোট-পর্ব সমাপ্ত হয়। ৭ই জুলাই শ্রীহট্ট ৫৫,৫৭৮ ভোটের সংখ্যাধিক্যে বঙ্গ ও সেই কারণে পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্তির সিদ্ধান্ত নেয়। সীমান্ত প্রদেশে "পাখতুনীস্তানের" দাবিতে গণভোট গৃহীত না হবার প্রতিবাদে তত্রস্থ কংগ্রেস সরকারীভাবে তাতে অংশগ্রহণ না করলেও ১৭ই জুলাই যখন তার পরিণাম ঘোষিত হয় তখন দেখা যায় যে "পাকিস্তানে"র পক্ষে ২৮৯, ২৪৪ এবং "হিন্দুস্থানে"র পক্ষে মাত্র ২,৮৭৪টি ভোট পড়েছে। এইভাবে জিন্না যাকে "বিকলাঙ্গ ও কীটদষ্ট" পাকিস্তান বলে ক্ষোভ করেছিলেন তা বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে।

জিন্না ইতিমধ্যে দিল্লী থেকেই তাঁর নূতন রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষার জন্য সাংবিধানিক লড়াই চালিয়ে গেলেন। কংগ্রেসের দাবি ছিল যে ভারত বিভাগ ও পাকিস্তানের গণপরিষদ গঠন আনুষ্ঠানিকভাবে স্থির হয়ে যাবার পর লীগ প্রতিনিধিদের অন্তর্বর্তী সরকার থেকে বিদায় নিতে হবে। কিন্তু জিন্নার যুক্তি অনুসারে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রস্তাবিত ভারতের স্বাধীনতার বিল গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত বড়লাট কংগ্রেসের দাবি স্বীকার করতে সম্মত হলেন না। জিন্না এর পর প্রস্তাব করলেন যে দিল্লীতেই যুগপৎ ভারত ও পাকিস্তানের গণপরিষদের অধিবেশন হোক। মাউন্টব্যাটেন এর অনুকূল হলেও কংগ্রেসের নেতৃবর্গ কোনমতেই ভারতের মাটিতে পাকিস্তানের গণ-পরিষদের সভার অনুষ্ঠানে সম্মতি দিলেন না। জিন্না প্রথমে চেয়েছিলেন যে মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাবিত উভয় ডোমিনিয়নের সম্মিলিত বড়লাট (Super Governor General) হিসাবে ভারত বিভাগের প্রক্রিয়ার তদারকী ও প্রয়োজনে মধ্যস্থতা করুন। ব্রিটিশ সরকার তাঁদের প্রতিনিধির মধ্যস্থতা করার প্রস্তাব স্বীকার করে নি, তবে ভারত বিভাগের খুঁটিনাটি সহজ করার উদ্দেশ্যে উভয় রাষ্ট্রের একই বড়লাটের প্রস্তাবে রাজী হয়েছিলেন। কংগ্রেস ইতিপূর্বেই মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের নিয়ম-

তান্ত্রিক বড়লাট হবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। জিন্নাও এরকম প্রস্তাবের আভাস দিয়েছিলেন। কিন্তু ১লা জুলাই জিন্না মাউণ্টব্যাটেনকে জানিয়ে দিলেন যে তিনিই পাকিস্তানের প্রথম বড়লাট হতে চান।

হতবুদ্ধি রাজপ্রতিনিধিকে জিন্না বললেন, "আমার পদমর্যাদার দিক থেকে দেখতে গেলে আমারই পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং আর সকলে তদনুসারে কার্য করবেন।"৩২ মাউণ্টব্যাটেন জিন্নার এ প্রস্তাব শুনে সিদ্ধান্ত করলেন যে তিনি হয় উন্মাদ হয়ে গেছেন আর নচেৎ উৎকট ধরনের "আত্মগরিমা"র ব্যাধিতে ভুগছেন। মাউণ্টব্যাটেনের যুক্তি, তর্ক, অনুরোধ এবং এমন কি শাসানী উপেক্ষা করেও জিন্না তাঁর দাবিতে অটল রইলেন। শিব রাও-এর মতে গোলটেবিল বৈঠকের সময়ে এক জ্যোতিষী জিন্নাকে বলেন যে কর্মজীবনের শেষে তিনি এক স্বতন্ত্র দেশের প্রধান হবেন। তাঁর অবচেতন মনে শুধু বড়লাট হবার পিছনেই নয়, স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবির পিছনেও ঐ ভবিষ্যদ্বাণী ক্রিয়া করে থাকতে পারে।৩৩ ডঃ আয়েষা জালালের মতে মাউণ্টব্যাটেন কংগ্রেস-ঘেঁষা এবং তাঁর মাধ্যমে কংগ্রেস পাকিস্তান এলাকায় লীগ ও জিন্নাবিরোধী কার্যকলাপে উস্কানি দিতে পারে ইত্যাদি বিবেচনা ছাড়াও, "জিন্নার মনে হয়েছিল যে সেনাবাহিনীর বিভাজনের ক্ষেত্রে ঐ পদে থাকায় তাঁর অপেক্ষাকৃত সুবিধা হবে এবং পাকিস্তানের প্রদেশগুলির উপর কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেবার জন্য তাঁর কাছে যা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ছিল তা হল সৈন্য-বাহিনী।"৩৪ এত ক্ষমতা অপর কাউকে দেওয়া সমীচীন নয়, দেশের প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর কাছ থেকে আদেশ নিতে হবে এবং তা ছাড়া ঐ পদে অভিষিক্ত হলে তিনি মাউণ্টব্যাটেন ও এটলী প্রমুখের সঙ্গে সমানে সমানে কথা বলতে পারবেন ও কায়েদ-এ-আজম হিসাবে তাঁর সৃষ্ট নূতন রাষ্ট্রে একমাত্র ঐ পদই তাঁর পক্ষে শোভন—এসব মানসিকতাও ঐ সিদ্ধান্তের পিছনে কাজ করে থাকবে। প্রথম এসিয়াবাসী হিসাবে ঐ উচ্চ পদ অধিকার করার আকাঙ্ক্ষাও জিন্নার মনে ছিল। যে কাল-ব্যাধিতে তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন তার কথা তিনি ও তাঁর চিকিৎসক ছাড়া আর কেউ (এমন কি ভগ্নী ফতিমাও না) না জানলেও তার গুরুত্ব সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবহিত ছিলেন। তাঁর ক্ষীয়মান স্বাস্থ্য উদ্বেগের কারণ হচ্ছিল। উলপার্টের মতে ক্ষমতা ভোগ করার সময় আর নাও মিলতে পারে—এই মানসিকতা তাঁর পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের পিছনে ক্রিয়া করার প্রবল সম্ভাবনা।৩৫

৬ই জুলাই জিন্না ভারতবর্ষে যেসব মুসলমানদের থেকে যেতে হচ্ছে তাঁদের এই পরামর্শ দিলেন যে, "সংখ্যালঘুরা যে রাষ্ট্রের অধিবাসী তার প্রতি অনুগত হবেন।"৩৬

১৩ই জুলাই জিন্না এক সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের "আশ্বাস" দেন যে তাঁর সদ্যজাত ডোমিনিয়নে তাঁদের 'ধর্ম, বিশ্বাস, জীবন, সম্পত্তি এবং সংস্কৃতির সংরক্ষণ' দেওয়া হবে।" তিনি আরও বলেন যে সংখ্যালঘুরা "ভেদভাব রহিত ভাবে সর্ববিষয়ে পাকিস্তানের সমান অধিকারবিশিষ্ট নাগরিক হবেন।... ভারতবর্ষের সংখ্যালঘুদের প্রতিও একই নীতি প্রযোজ্য হবে।...শ্রীযুক্ত জিন্না এই আন্তরিক বিশ্বাস ব্যক্ত করলেন যে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হবে।"[৩৭] দেশবিভাগ একবার স্বীকার করে নেবার পর তার রূপায়নের বাধক কোন রকম অশান্তির চিহ্ন দেখা দিলেই তা কঠোর হস্তে—এমন কি সামরিক বাহিনী নিয়োগ করে দমন করা হবে—মাউন্টব্যাটেনের এই গুরুগম্ভীর প্রতিশ্রুতিকে[৩৮] ব্যঙ্গ করেই যেন ইতিমধ্যে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার আগুন ভারতবর্ষের দিকে দিকে লেলিহান হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেল সংখ্যালঘুদের বাস্তুত্যাগ। আর কয়েকদিন পরে র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ ঘোষিত হবার পরই এই হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ও বাস্তুত্যাগ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়ে বিশ্বের ইতিহাসে মনুষ্যের দুর্দশার অদ্বিতীয় নিদর্শনরূপে লিপিবদ্ধ হবে।

এই পটভূমিকায় ৭ই আগস্ট অসংখ্য মানুষের "পাকিস্তান জিন্দাবাদ" ও "কায়েদ-এ-আজম জিন্দাবাদ" ধ্বনির মধ্যে জিন্না বড়লাটের ডাকোটা বিমানে করাচী বিমানবন্দরে প্রস্তাবিত নবরাষ্ট্রের রাজধানীতে পদার্পণ করলেন। বিমান-বন্দর থেকে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট সরকারী বাসগৃহ (যা পূর্বে ছোটলাটের নিবাস ছিল) পর্যন্ত সমগ্র পথ জনসাধারণের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনে সাড়া দেবার পর সিঁড়ি দিয়ে ঐ সুরম্য হর্ম্যের ভিতর প্রবেশ করতে করতে তাঁর নবনিযুক্ত সহায়ক নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট এস. এম. আসানকে উদ্দেশ করে জিন্না বললেন, "জানো, আমার জীবিতকালে পাকিস্তান দেখে যেতে পারব—এমন আশা আমি কখনও করি নি। আমরা যা অর্জন করেছি তার জন্য ঈশ্বরের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।"[৩৯] ঐদিনই স্থায়ীভাবে ভারতবর্ষ ছাড়ার পূর্বে যাঁরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছিলেন তাঁদের ধন্যবাদ দেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "অতীতকে কবর দিতে হবে এবং আসুন আমরা হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান নামক এই দুই স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের শুভারম্ভ করি। হিন্দুস্থানের সমৃদ্ধি ও শান্তির জন্য আমি কামনা জানাই।"[৪০]

আমাদের জিন্না-জীবনবৃত্ত-পরিক্রমার সমাপ্তিও এইখানে।

জিন্নার জীবন ও কৃতির মূল্যায়নের দ্বারা এ আলোচনার উপসংহার করা হবে।

সার্বভৌম ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের সৃষ্টি নিঃসন্দেহে জিন্নার সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতি। "পাকিস্তান মহম্মদ আলী জিন্নার একক অবদান,"[১]—এ কোন অত্যুক্তি নয়। মাত্র সাত বৎসরের কুশলী রাজনৈতিক পদক্ষেপের দ্বারা তিনি একেবারে শব্দার্থে অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন। এর পিছনে ছিল তাঁর দুই জাতি তত্ত্ব। অর্থাৎ ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের সঙ্গে কেবল সম্পর্কশূন্যই নয়, পরস্পরবিরোধী দুই স্বতন্ত্র জাতি (nation) এবং তাই তারা এক রাষ্ট্রে থাকতে পারবে না। সুতরাং মুসলমানদের ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও শিক্ষা ইত্যাদির ন্যায়সঙ্গত বিকাশের জন্য তাঁদের এক পৃথক সার্বভৌম বাসভূমি চাই। এর নাম পাকিস্তান।

পরিক্রমা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে কিভাবে এককালের "হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের রাজদূত" জিন্না মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের (অপর মতে অস্মিতা বা আত্মাভিব্যক্তির) কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পাকিস্তানের জনকে পরিণত হলেন। কিন্তু আমরা এ-ও লক্ষ্য করেছি যে পাকিস্তানের সম্ভাবনা দিক্‌চক্রবালে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কখনও মৌন-ভাবে ইশারায়-ইঙ্গিতে, আবার কখনও বা বড়লাটের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে মুখর-ভাবে পাঞ্জাব ও বঙ্গ বিভাজনের বিরুদ্ধে অভিমত ব্যক্ত করে জিন্না তাঁর দ্বিজাতি তত্ত্ব-ভিত্তিক পাকিস্তান দাবিরই বিরোধিতা করেছিলেন। প্রাপ্তির দ্বারদেশে উপনীত হয়ে কাম্যবস্তুর বিরোধিতা করার মধ্যে যুগপৎ ট্র্যাজিডি ও চরিত্রের অসামঞ্জস্য বিদ্যমান। জিন্নার জীবনের এই আদ্যন্ত বিয়োগান্তক দিকের কথা আমরা ক্রমশঃ পর্যালোচনা করব।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা তাঁর ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই-এর এক সাংবাদিক সম্মেলনের বক্তব্যের উল্লেখ করেছি যাতে প্রস্তাবিত পাকিস্তান এলাকার সংখ্যালঘু-দের প্রতি কোন ভেদ-ভাব করা হবে না এবং তাঁরা মুসলমানদের সঙ্গে সমান অধিকারসম্পন্ন নাগরিক হবেন—এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে এই আশাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে ভারতবর্ষেও সংখ্যালঘুদের (ভারত-বিভাজনের সময়ে ৪ কোটিরও বেশী মুসলমান ভারতে থেকে যান) প্রতি অনুরূপ আচরণ করা হবে। ১৮ই আগস্টের জিন্নার ঈদ-উল-ফিতরের বাণী উল্লেখযোগ্য : হিন্দুস্থানের সংখ্যালঘু আমাদের ভাই-বন্ধুরা নিশ্চিত থাকতে পারেন যে আমরা কখনই তাঁদের

উপেক্ষা করব না বা বিস্মৃত হব না। আমাদের হৃদয় তাঁদের সঙ্গে রয়েছে এবং তাঁদের সাহায্য করার জন্য কোন প্রয়াসকেই আমরা কঠিন মনে করব না। আর তাঁদের মঙ্গলবিধানের জন্য প্রয়াস করব। কারণ আমি স্বীকার করি যে এই উপমহাদেশের মুসলমান সংখ্যালঘু প্রদেশসমূহই আমাদের বাঞ্ছিত লক্ষ্য পাকিস্তান অর্জনের আন্দোলনে অগ্রণী ছিল এবং তার পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরেছিল।"২ ভারতের সংখ্যালঘুদের নিজ রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকার পরামর্শ দেবার পর ভিন্ন রাষ্ট্র থেকে তাঁদের জন্য চিন্তা ব্যক্ত করার স্ববিরোধ জিন্নার মত কুশাগ্রবুদ্ধি আইনজীবী যে বোঝেন নি তা মনে হয় না। তবে আবেগের প্রভাবমুক্ত হওয়া মানুষের পক্ষে সহজ নয়, তা সে মানুষ জিন্নার মত লোকদৃষ্টিতে আবেগবিহীন মনে হলেও। প্যাটেলের মতে আবেগ-বিরল কড়া ধাতের বাস্তববাদী রাজনৈতিক নেতা পাকিস্তানের হিন্দুদের জন্য একাধিকবার প্রকাশ্যে এজাতীয় মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। যাই হোক, প্রশ্ন হল—উভয় রাষ্ট্রেই সংখ্যালঘুদের সংখ্যাগরিষ্ঠদেরই সমান রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া যদি তাঁর কাম্য ছিল তাহলে দেশ বিভাগের দাবি তিনি ওঠালেন কেন? জিন্নার সমালোচকরা বলতে পারেন যে, ১৩ই জুলাই-এর তাঁর প্রতিশ্রুতি দেশবিভাজনের প্রাক্কালে প্রস্তাবিত পাকিস্তান এলাকার সংখ্যালঘুদের প্রতি ছলনা যাতে তিনি তাঁর বাঞ্ছিত পাকিস্তান তাঁদের অনাবশ্যক বিরোধ ছাড়াই পেয়ে যান। কিন্তু পরবর্তীকালেও (২৫শে অক্টোবর) রয়টারের প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তিনি "পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের সমান অধিকারসম্পন্ন নাগরিকরূপে অভিহিত করেন।"৩

পাকিস্তান নিছক মুসলমানদের দেশ হোক এ যে তিনি চান নি তার আরও কয়েকটি প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। বেশ কয়েকটি হিন্দু ও শিখ সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশীয় রাজ্যের নৃপতিদের পাকিস্তানে যোগ দেবার জন্য তিনি ব্যর্থ প্রয়াস করেন। একাধিক দায়িত্বশীল শিখ নেতাদের কাছে প্রতিশ্রুতি দেন যে পাকিস্তানে তাঁদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষিত হবে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর মুসলিম লীগকে অসাম্প্রদায়িক ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে তার দরজা অমুসলমানদের জন্যও খুলে দেবার প্রস্তাব তিনি করেন এবং লিয়াকৎ আলী খাঁও এর সমর্থন করেন। কিন্তু লীগের অন্যান্য নেতাদের বিরোধিতার ফলে তাঁর এ ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি। দেশবিভাজনের পর পাকিস্তানে অবস্থানকারী সাংবাদিক এম. এস. এম. শর্মার কাছে জিন্না নিজেকে সংখ্যালঘুদের সংরক্ষক বলে পরিচয় দেন। দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত ও পাকিস্তান ত্যাগে প্রস্তুত হিন্দু উদ্বাস্তুদের দুঃখ-দুর্দশায় জিন্নার চোখে জল আসার ঘটনা শ্রীযুক্ত শর্মাও

লিপিবদ্ধ করেছেন। গান্ধীর সম্বন্ধেও তাঁর অভিমত কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছিল। শ্রীযুক্ত শর্মার মতে লীগ কাউন্সিলের এক সভায় তিনি বলেন যে, "মিস্টার গান্ধী মুসলমানদের প্রকৃত বন্ধু এবং···ভারতবর্ষের মুসলমানদের সম্মিলিতভাবে তাঁর পাশে দাঁড়ানো উচিত।" পাকিস্তানের অমুসলমান সরকারী কর্মচারীরা যাতে ওদেশে থেকে যান তার জন্য তিনি ও লিয়াকৎ আগ্রহশীল ছিলেন।[৪] পূর্বোক্ত ঘটনাবলীর অনেক-গুলিরই হয়ত প্রতিকূল ভাষ্য করা যায়। কিন্তু তার জন্য জিন্নার সংখ্যালঘুদের প্রতি দরদ মিথ্যা হয়ে যায় না।

অনুরূপ এক মন্তব্য তিনি করেন মৃত্যুর সাত মাস পূর্বে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের কাছে এক বেতারবার্তা সম্প্রচার প্রসঙ্গে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধান কি ধরনের হবে এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানান, "আমি নিঃসন্দেহ যে এ হবে গণতান্ত্রিক ধাঁচের···। ইসলাম ও তার আদর্শবাদ আমাদের গণতন্ত্রের শিক্ষা দিয়েছে। এর শিক্ষা হল মানুষে মানুষে সাম্য, ন্যায়বিচার ও সবার প্রতি উচিত আচরণ···। আর যাই হোক, পাকিস্তান শাস্ত্রচালিত যাজকসম্প্রদায় পরিচালিত ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হবে না। আমাদের দেশে হিন্দু, খ্রীষ্টান, পার্শী প্রমুখ বহু অমুসলমান রয়েছেন, কিন্তু তাঁরা সবাই পাকিস্তানী। অপর যে কোন নাগরিকের মতই তাঁরা সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন এবং পাকিস্তানের কাজ-কর্মে তাঁদের ন্যায়সঙ্গত ভূমিকা পালন করবেন।"[৫]

তাছাড়া প্রথম অধ্যায়ে উদ্ধৃত পাকিস্তান গণপরিষদের সভাপতি হিসাবে ১১ই আগস্টের তাঁর প্রথম বক্তৃতা (ঐ বক্তৃতা স্বতঃস্ফূর্ত ছিল, কোন লিখিত নোটের ভিত্তিতে নয়। তাঁর জীবনীকারদের মতে অতঃপর আর যে কটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে তিনি ভাষণ দিয়েছিলেন তার কুত্রাপি তিনি স্বতঃস্ফূর্ত বক্তৃতা দেবার সুযোগ পান নি) সম্বন্ধে কি বলা হবে? ঐ গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতাটির আরও একটু পর্যালোচনা প্রয়োজন। তবে তার পূর্বে ভারতীয় গণপরিষদের মুসলিম লীগ সদস্যদের সঙ্গে তাঁর যে সর্বশেষ আলোচনা হয় সে সম্বন্ধে লীগ দলের নেতা খলিকুজ্জমাঁর জবানীতে শোনা যাক:

"দেশবিভাগের পর যেসব মুসলমান ভারতবর্ষে রয়ে যাবেন তাঁদের গভীর সঙ্কট স্বয়ং শ্রীযুক্ত জিন্না উপলব্ধি করেন। মনে আছে যে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পহেলা আগস্ট স্থায়ীভাবে করাচীতে চলে যাবার কয়েক দিন পূর্বে ভারতবর্ষের গণপরিষদের মুসলমান সদস্যদের বিদায় জানাবার জন্য শ্রীযুক্ত জিন্না তাঁদের তাঁর ১০নং ঔরঙ্গজেব রোডের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানালেন। যেসব মুসলমানরা ভারতবর্ষে থেকে যাবেন

তাঁদের অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রিজওয়ানউল্লা বেশ কয়েকটি বিব্রতকারী প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। সেইদিনের মত আর কখনও আমি শ্রীযুক্ত জিন্নাকে অমন অপ্রতিভ অবস্থায় দেখি নি। এর কারণ সম্ভবতঃ এই যে, অদূর ভবিষ্যতে মুসলমানদের ভাগ্যে কি আছে ততদিনে তিনি স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করতে পারছিলেন। পরিস্থিতি জটিল ও হতবুদ্ধিকর দেখে আমি আমার বন্ধু ও সহকর্মীদের আলোচনা বন্ধ করতে বললাম। আমার বিশ্বাস আমাদের ঐ বিদায়-সভার পরিণামস্বরূপ শ্রীযুক্ত জিন্না প্রথম অবকাশেই তাঁর ১১ই সেপ্টেম্বরের বক্তৃতায় তাঁর দ্বিজাতি তত্ত্বকে বিসর্জন দিয়েছিলেন।"[৬]

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে লাহোরে দ্বিজাতি তত্ত্বরূপী যে বিষবৃক্ষের বীজ জিন্না বপন করেছিলেন, বিচ্ছিন্নতাবাদের অনুকূল ক্ষেত্র,[৭] সাম্রাজ্যবাদী ভেদনীতির সার এবং সাম্প্রদায়িক প্রচার, ঈর্ষা, অবিশ্বাস ও দ্বন্দ্বের জলসিঞ্চনে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে তা বিশাল মহীরুহের আকার ধারণ করে হিন্দু ও মুসলমানকে দুই যুযুধান শিবিরে বিভক্ত করতে সমর্থ হয়। তারপর জিন্নার কুশলী রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং তদনুরূপ চালে সেই বিষবৃক্ষে যখন আর দেড় বৎসরের মধ্যে পাকিস্তান ও অবশিষ্ট ভারত—পরস্পরের প্রতি গভীর অবিশ্বাসে ওতপ্রোত দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপী ফল ধরে, তখনও একদা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের এবং পরবর্তীকালে পৃথক জাতি (nation) মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবির প্রবক্তা জিন্নার ট্র্যাজেডির গভীরতার পরিমাপ করা সহজসাধ্য নয়। কিন্তু তাঁর ট্র্যাজেডির পরিমাপ করার প্রয়াসের পূর্বে জিন্নার সেই ১১ই আগস্টের স্বতঃস্ফূর্ত বক্তৃতা—যার ব্যাপক প্রচার পরবর্তীকালের পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের বিশেষ কাম্য ছিল না—তার আরও কিছু অংশ উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। প্রথম অধ্যায়ে উদ্ধৃত অংশের পূর্বে বক্তৃতার গোড়ার দিকে তিনি বলেন:

"কিন্তু প্রশ্ন হল, যা করা হয়েছে তার থেকে ভিন্ন কিছু করা সম্ভব বা বাস্তবে সাধ্য ছিল কি!…বিভাজন হতই। হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান উভয় পক্ষেই এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁরা এই বক্তব্যের সঙ্গে সহমত নন, এ পদক্ষেপ যাঁদের মনোমত নয়। কিন্তু আমার বিচারে সমাধানের অপর কোন উপায় ছিল না এবং আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে ভবিষ্যৎ ইতিহাস এই পদক্ষেপের সমর্থনে তার রায় দেবে। আর তার চেয়েও বড় কথা হল এই যে, যতই দিন যাবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একথা প্রমাণ হবে যে এই ছিল একমেব সমাধান।…সম্মিলিত ভারতবর্ষের কোন পরিকল্পনা বাস্তবে কদাপি কাজ করত না এবং আমার মতে তা আমাদের প্রচণ্ড সর্বনাশের স্থিতিতে নিক্ষেপ করত। হয়ত এই অভিমত যথার্থ;

হয়ত যথার্থ নয় ; তবে তা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।"

ভারত-বিভাজনের যৌক্তিকতা ভবিষ্যৎ ইতিহাস সপ্রমাণ করবে—এই আশা জিন্না ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু বিগত চল্লিশ বছরের মধ্যে জিন্নার সে আশা পূর্ণ হয় নি। অবশ্য ইতিহাসের বিস্তীর্ণ পটভূমিকায় চল্লিশ বছর কিছুই নয়। পাকিস্তানের সৃষ্টির সাত মাসের মধ্যে (২১শে মার্চ, ১৯৪৮) ঢাকায় তাঁর ঐতিহাসিক বক্তৃতার একাংশের (পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে একমাত্র উর্দু) বিরোধিতা করে বাংলা-দেশের যে আন্দোলন দানা বাঁধতে আরম্ভ করে, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের শেষে স্বাধীন বাংলাদেশের রক্ত ও অশ্রুঝরা আর্বির্ভাবে তার পূর্ণাহুতি হবার সঙ্গে সঙ্গে জিন্নার আশাকে চিরতরে অলীক প্রমাণিত করে ভারতীয় উপ-মহাদেশে দ্বিজাতি তত্ত্বের স্থায়ী কবর রচিত হয়। যাই হোক, এখানে উল্লেখযোগ্য যা তা হল দেশ-বিভাজনের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে অত শীঘ্র জিন্নার নিজের মনেই সন্দেহ যা পাকিস্তানের গণপরিষদের সদস্যদের সম্মুখে তিনি এতদিনের সাধনালব্ধ ফল করায়ত্ত হবার পূর্ব-মুহূর্তে স্বগতোক্তির মত ব্যক্ত করেছিলেন।

ঐ বক্তৃতার শেষাংশে জাতি তথা বিশ্বের সামনে রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে তিনি নিজের জন্য যে ভূমিকা নির্ধারণ করেছিলেন তা কোনক্রমেই সাম্প্রদায়িকতাবাদী নয়ঃ "রাজনৈতিক ভাষায় যাকে পূর্ব সংস্কার এবং দুর্ভাবনা আখ্যা দেওয়া হয়, অর্থাৎ পক্ষপাত ও স্বজনপোষণের প্রশ্রয় না দিয়ে আমি সর্বদা ন্যায়বিচার ও উপযুক্ত আচরণের নীতির দ্বারা চালিত হব। আমার দিগ্‌দর্শক নীতি হবে ন্যায়বিচার ও পূর্ণ নিরপেক্ষতা এবং আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আপনাদের সমর্থন ও সহযোগিতার দ্বারা পাকিস্তান বিশ্বের অন্যতম মহান রাষ্ট্রে পরিণত হবে—এ আশা আমি করতে পারি।"

একথা সত্য যে পাকিস্তান তার জনকের প্রতিশ্রুতি—সকল নাগরিকদের প্রতি ন্যায়বিচার ও নিরপেক্ষতা—পরবর্তীকালে রক্ষা করতে পারে নি। তবে এর জন্য জিন্নার ওপর দোষারোপ করা চলে না। কারণ এর কিছুদিন পরই অসুস্থতার কারণে দেশের আসল প্রশাসনক্ষমতা দ্রুত অন্যের হাতে চলে যায়। আর তা ছাড়া আমাদের ভারতরাষ্ট্রও যে তার জনক গান্ধী ও প্রধান রূপকার জওহরলালের বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের প্রদত্ত বহু আন্তরিক প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারে নি তার জন্য তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। উপকথার নায়কদের মতই রাজনৈতিক নেতারা যেসব শক্তির জন্ম দেন পরবর্তীকালে ইচ্ছা করলেও তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেন না।

ভারত-বিভাজনের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের যে বীজ জিন্নার মনে উপ্ত হয়েছিল, র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ ঘোষণার পরবর্তীকালের গৃহযুদ্ধ ও তজ্জনিত মানবীয় দুঃখের গভীরতা-দৃষ্টে তা তাঁর মনে মহীরুহের আকার ধারণ করে তাঁকে অত্যন্ত পীড়িত করত। এ বিষয়ের সাক্ষ্য পাওয়া যায় তাঁর সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ ব্যক্তি ভগ্নী কুমারী ফতিমা জিন্নার স্মৃতিকথায়ঃ···"তাঁর সম্মানে বিজয়োল্লাসের লগ্নেও কায়েদ-এ-আজম গভীর অসুস্থ ছিলেন।···দুঃখ ও বেদনার্ত চিত্তে এ আমি লক্ষ্য করতাম। আহারে তাঁর রুচি ছিল না বললেই চলে এবং ঘুমিয়ে পড়ার ইচ্ছাও তিনি যেন হারিয়ে ফেলেছিলেন। সীমান্তের উভয় পার্শ্ব থেকে যে সময়ে গণহত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুটের চরম দুর্দশাপূর্ণ ঘটনাবলীর বিবরণ আসছে, তখন তাঁর ঐ রকম অবস্থা। জলযোগের সময়ে ঐসব গণহত্যার বিবরণ আমার সঙ্গে আলোচনা করে তাঁর দিনের সূত্রপাত হত এবং মাঝে মাঝেই অলক্ষিত ভাবে তাঁর রুমাল নিজের আর্দ্র চক্ষুকে আবরিত করত···।"[৮]

দেশ-বিভাজনের জন্য জিন্নার এই ক্ষোভ ও অশ্রুমোচন কেবল মুসলমানদের জন্য, একথা মনে করা ভুল হবে। জিন্নার অন্যতম জীবনীকার হেক্টর বলিথোর কাছে তাঁর গুণগ্রাহী বন্ধু এবং দেশবিভাগের সময়ে করাচীর মেয়র পার্শী জামসেদ নসর-ওয়ানজী জিন্নার সম্বন্ধে বলেনঃ "আমার সানুনয় মিনতি—বিশ্বাস করুন শ্রীযুক্ত জিন্না মানব-দরদী ছিলেন। চোখের জল ফেলার ব্যাপারে কোন দিনই তাঁর মধ্যে কোন প্রবণতা ছিল না—না, আদৌ না। কিন্তু দুবার আমি তাঁকে অশ্রুমোচন করতে দেখেছি। একবার দেশবিভাগের পর ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে। সে সময়ে আমি তাঁর সঙ্গে হিন্দুদের এক শিবিরে গিয়েছিলাম। এঁরা পাকিস্তানে থেকে গিয়েছিলেন। শিবিরের বাসিন্দা সেই সব হিন্দুদের দুর্দশা দেখে তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁর গালের উপর দিয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে দেখেছি।"[৯]

পাকিস্তানের স্বরূপ দেখে জিন্নার হতাশা সম্বন্ধে আরও দুটি সাক্ষীর জবানবন্দী উদ্ধৃত করে এ প্রসঙ্গের ইতি করা হবে। প্রথমটি হল নিজামের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী এবং জিন্নার অনুগামী মীর লায়েক আলী, যাঁর মতে, "সেদিন ছাড়া জীবনে আর কখনও শ্রীযুক্ত জিন্নাকে আমি অমন আবেগাভিভূত দেখি নি। তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন যে বিমান-বন্দর থেকে আসার সময়ে আমি উদ্বাস্তুদের বসতি···দেখেছি কি না?···তা অবশ্যই চোখে পড়েছিল। জনসাধারণের ব্যাপক দুর্গতির কথা বলার সময়ে কয়েক বার তাঁর গণ্ডদেশ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।"[১০]

দ্বিতীয়জন হলেন আমেরিকার "লাইফ" পত্রিকার সাংবাদিক ও ফোটোগ্রাফার মার্গারেট বৌরক হোয়াইট, ভারত-বিভাজনের আনুষঙ্গিক মানবীয় দুঃখ-দুর্দশার চিত্র ও বিবরণ লিপিবদ্ধ করার জন্য যিনি বিখ্যাত। ফতিমার সঙ্গে বন্ধুত্বের কারণে তিনি দেশবিভাগের তিন মাস পর জিন্নার অন্তরঙ্গ পোর্ট্রেট তোলার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং এই গ্রন্থে সেটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর বিবরণ হল :

"বাঞ্ছিত দেশ প্রাপ্তির কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁর প্রায় দেবতুল্য উত্তুঙ্গ আশা-ভরসা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। এমন কি তুচ্ছতম সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারেও তাঁর মধ্যে একটা পক্ষাঘাতগ্রস্ত অক্ষমতার সৃষ্টি হয়েছিল। নিজেকে বিস্ময়করভাবে একটা কোটরের মধ্যে আবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে জিন্না এমন কি তাঁর মন্ত্রীদের সঙ্গেও দেখা করতেন না।[১১]...

"(ফতিমা আমাকে বললেন যে) ক্লোজ-আপ ছবি নেবার জন্য আমি যেন তাঁর কাছে না যাই। যখন তাঁর মুখমণ্ডল দেখলাম তখন ঐ পরামর্শের কারণ বুঝতে পারলাম। সে মুখমণ্ডলে ভীতিজনক পরিবর্তন ঘটে গেছে। মনে হল, চৈতন্যের এক ধরনের অসাড়তার আবরণের তলে আতঙ্কের কাছাকাছি একটা ভাব সংগুপ্ত রয়েছে। আমি ফোটো নেওয়া শুরু করলাম এবং প্রতিটি ফোটো নেবার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর ভগ্নী জিন্নার সামনে এসে তাঁর মরীয়া হয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাত ধীরে ধীরে খুলে দেবার চেষ্টা করলেন।"

জিন্নার মাথার টুপিটি বদলে দেবার জন্য লেখিকা তাঁর ভগ্নীকে অনুরোধ করেছিলেন। একগাদা টুপির মধ্যে থেকে একটি বেছে নিয়ে তার জন্য উদ্যোগ করতেই :

"বিখ্যাত নেতা বিরক্তি সহকারে হাত নেড়ে পশমের সব ফেজগুলিসহ তাঁর ভগ্নীকে দূরে থাকতে ইঙ্গিত করলেন। অবাধ্য নিষ্ঠুর শিশুর মত তিনি বলতে লাগলেন, 'না, না, না।' এইটাই বোধহয় তাঁর শেষ পোর্ট্রেট ছিল ...।

"জিন্নার মুখমণ্ডলে যে উৎপীড়িতের ছবি দেখেছি তা নিয়ে আমি অনেক চিন্তা করেছি। আমার বিশ্বাস জীবন-সায়াহ্নে জিন্না নিজের কার্যকলাপের যে হিসাব-নিকাশ করছিলেন এ তারই আভাস। উচ্চস্তরের বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও মেধার অধিকারী হবার জন্য তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি কী করেছেন। ডাঃ ফাউস্টের মত তিনি একটা চুক্তি করেছিলেন, যার শর্ত থেকে কখনও তিনি মুক্ত হতে পারেন নি। সংগ্রামের চূড়ান্ত উত্তেজনার মুহূর্তে কুসংস্কারের যাবতীয় নারকীয় শক্তিসমূহের সহায়তা নিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন এবং এখন এই রক্তাক্ত বিজয় তাঁর মুখে বিস্বাদ ঠেকছিল।"[১২]

লেখিকার বক্তব্যে কিছুটা আত্মবাদী (সাবজেকটিভ) প্রবণতা আছে ঠিকই, তাছাড়া তাঁর পক্ষে তখন জানা সম্ভব ছিল না যে মৃত্যুদূত ইতিমধ্যে জিন্নার উপর নিজ পরোয়ানা জারি করে গেছে। দীর্ঘদিন যাবৎ তাঁর যক্ষার প্রকোপ তো ছিলই, ইদানীং ক্যানসারও তাঁর ফুসফুসে শিকড় ছড়াতে আরম্ভ করেছে। মনের উপর আসন্ন মৃত্যুর প্রচণ্ড চাপের অংশ গ্রহণ করার কেউ নেই তাঁর আশেপাশে—এমন কি ভগ্নীও নন। রাজনীতির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতাধারীদের দুরদৃষ্ট—পাছে উত্তরাধিকারের লড়াই-এ জীবিত অবস্থাতেই তাঁদের রঙ্গমঞ্চের পার্শ্বদেশে ঠেলে দেওয়া হয় তাই চরমতম অসুস্থতার সময়ে আত্মজনের সেবা-শুশ্রূষা ও সহানুভূতি পাবার বদলে সে সংবাদ গোপন রেখে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের অভিনয় করে যেতে হয়। যাই হোক, তবু মনের সঙ্গে যুদ্ধে জর্জর, ক্ষতবিক্ষত একজন মহাকাব্যের নায়ক সদৃশ ব্যক্তির চরিত্রের অন্তরঙ্গ চিত্রের ঝলক পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি থেকে মেলে। বলা বাহুল্য জিন্নার মনের ভিতর এই উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষোভের একটা বড় কারণ দেশবিভাগ ও তার থেকে উদ্ভূত সমস্যা।

মৃত্যুর (১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮) মাত্র এক পক্ষকাল পূর্বে ২৭শে আগস্ট ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে জাতির উদ্দেশ্যে জিন্না যে বাণী দেন তাতেও এক রণক্লান্ত সেনাপতির আশাভঙ্গের প্রবল অভিব্যক্তি : "বিগত বৎসরের রক্তস্নান ও তার পরিণাম —লক্ষ লক্ষ নরনারীর ব্যাপক বাস্তুত্যাগ—এক অভূতপূর্ব গুরুতর সমস্যার উদ্রেক করেছিল। এই বিপুল উদ্বাস্তু জনস্রোতকে নূতন আশ্রয় দিতে গিয়ে আমাদের কর্মশক্তি ও সম্পদের উপর যে অভাবনীয় চাপ পড়ে তাতে উভয় দিক থেকেই আমাদের ভেঙে পড়ার মত অবস্থা হয়। ঐ কাজের ব্যাপকতা ও বিপুলতা আমাদের প্রায় নিমজ্জিত করার উপক্রম করেছিল—কোনমতে আমরা আমাদের মাথাটুকুকে শুধু জলের উপর ভাসিয়ে রাখতে পেরেছি।"[১৩]

অতঃপর আমরা জিন্নার কৃতির মূল্যায়ন করব। জিন্না দাবি করেছিলেন যে, ভারতের বিভাজন করে মুসলমানদের স্বতন্ত্র বাসভূমি পাকিস্তানের সৃষ্টি করলেই হিন্দু ও মুসলমান সদ্ভাব সহকারে থাকতে পারবে। কলকাতার শোচনীয় গণহত্যার পর থেকে ভারতবর্ষের কোণে কোণে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার যে আগুন জ্বলে ওঠে এবং বিশেষ করে অন্তর্বর্তী সরকারে লীগ প্রতিনিধিদের অসহযোগের ফলে যে অচলাবস্থা দেখা দেয় তার পরিপ্রেক্ষিতে জওহরলাল যাকে উত্ত্যক্ত হয়ে "মাথা কেটে ফেলে মাথাব্যথার চিকিৎসা" আখ্যা দিয়েছিলেন, সেই মানসিকতা চালিত হয়ে হিন্দু জনতার বড় একটা অংশ ও হিন্দু মহাসভার নেতৃবর্গই নয়; এমন কি কংগ্রেসেরও

অধিকাংশ নেতা শেষ অবধি দেশবিভাগের অনুকূল হয়েছিলেন। কিন্তু দুই রাষ্ট্রের সৃষ্টির ফলে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের অবসান ঘটেছে কি ?

স্পষ্টতঃ পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর একটি দ্ব্যর্থহীন—"না"। যে সমস্যা একটি রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা আন্তর্জাতিক রূপ ধারণ করেছে মাত্র। কাশ্মীরের পরোক্ষ যুদ্ধের কথা ছেড়ে দিলেও এযাবৎ ভারত ও পাকিস্তানবাসী তিন-তিন-বার যুদ্ধক্ষেত্রে একে অপরের মুখোমুখি হয়ে পরস্পরকে হত্যা করেছে। এটা জিন্নার কাম্য ছিল না।[১৪] যে ভারতবাসীরা ইংরেজ আমলে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য বার বার প্রতিরক্ষা খাতে খরচ কম করার জন্য দাবি জানাত, বিভক্ত হবার পর পূর্বতন ভারতের উভয় অংশ সোৎসাহে প্রতিরক্ষার ব্যয় গগনচুম্বী করে তোলার প্রক্রিয়ায় বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ হিসাবে নিজেদের অস্তিত্ব সানন্দে মেনে নিয়েছে। ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের নিত্য বর্ধমান অবিশ্বাস্য অঙ্কের সামরিক ব্যয়ের মূল কারণ পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস। এ ছাড়া পরস্পরকে উত্ত্যক্ত করার যেসব অসংখ্য ঘটনা অতীতে ঘটেছে এবং প্রায় প্রত্যহই ঘটছে তার বিবরণ দিতে গেলে এক স্বতন্ত্র মহাভারত হয়ে যাবে। দ্বিজাতি-তত্ত্বের পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তানে সংখ্যালঘুরা জিন্নার আশার অনুসরণে নিরপেক্ষ ব্যবহার ও সমান অধিকার পায় নি। পশ্চিম পাকিস্তান স্বাধীনতা প্রাপ্তির লগ্নে মোটামুটি হিন্দু সংখ্যালঘুশূন্য হলেও সংখ্যালঘু পীড়নের মানসিকতা সেখানে শিয়া, আহমদিয়া এবং এমন কি মুজাহিরদের (উদ্বাস্তু) মধ্যে নতুন সংখ্যালঘু সৃষ্টি করে নিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে দেশবিভাগের সময়ে যে প্রায় এক কোটি হিন্দু সংখ্যালঘু ছিল, স্বাভাবিক কারণে তার সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটার বদলে দফায় দফায় উদ্বাস্তু হবার ফলে সংখ্যা হ্রাসই পেয়েছে। বাংলাদেশের জন্মের ফলে ঐ দেশে সংখ্যালঘুদের অবস্থা কিছুটা অনুকূল হলেও, মুজীব-পরবর্তী-কালে ওদেশের রাজনীতিতে পুনরায় ঐস্লামিক গোঁড়ামির প্রভাব বৃদ্ধি পাবার ফলে তাঁদের অবস্থা আজও অনিশ্চিত। তাছাড়া বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের পক্ষে যে নূতন হাওয়ার রেশ দেখা যায় তার কৃতিত্ব আর যারই হোক, জিন্নার নয়। ভারতবর্ষের অবস্থাও খুব গৌরবজনক নয়। দেশবিভাগের সময়ের ৪ কোটি মুসলমান ৫ কোটিতে দাঁড়ালেও এবং ধর্মনিরপেক্ষতার রাষ্ট্রীয় নীতির ফলে মুসলমানরা সংবিধান, আইন ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে এদেশে সমান অধিকার পেলেও তাঁদের বড় একটা অংশ আজও দেশবিভাগজনিত ঐতিহাসিক ভূকম্পনের প্রভাব জয় করে দেশের জনজীবনের মূল ধারার সঙ্গে সম্মিলিত হতে পারেন নি। গোঁড়া ও পশ্চাৎগামী মনোভাবকে আশ্রয় করে তাঁরা তাঁদের পূর্বপুরুষদের ভারত-বিভাজনের দাবির ঐতিহ্য

বহন করছেন। একথা দুঃখজনক হলেও সত্য যে ভারতবর্ষ এখনও হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার কলঙ্কমুক্ত নয়। হিন্দু মৌলবাদ যেন পাল্লা দিয়ে সংগঠিত হচ্ছে।

দেশবিভাগের ফলে মুসলমানদের নিজস্ব দেশের (home-land) আকাঙ্ক্ষারও কি পূর্তি হয়েছে ? আদৌ না। পাকিস্তানের নেতা ওয়ালি খাঁর হৃদয়স্পর্শী উক্তি : "ভারত-বিভাজন মুসলিমদের বিভাজন"[১৫] এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ভারতীয় উপ-মহাদেশের মুসলমানরা তিনটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হওয়ায় তাঁদের অস্মিতা বিপন্ন।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লীগের দিল্লী অধিবেশনে জিন্না সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রসঙ্গে বলেছিলেন : "আমার জীবিতকালে এটা ঘটবে কিনা জানি না। তবে আমার এই কথা আপনারা তখন মনে করবেন; আর একথা আমি কারও প্রতি কোন বিদ্বেষ বা দুর্ভাবনা-চালিত হয়ে বলছি না। কোন কোন জাতি পরস্পরকে হয়ত লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় নিহত করেছে এবং তবুও আজকের শত্রু আগামী কালের মিত্র। এর নাম ইতিহাস।"[১৬] প্রচ্ছন্নভাবে হলেও দ্বিজাতি-তত্ত্বের বিষ—সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাস এবং বিদ্বেষ এই পরিমাণে ভারতীয় উপমহাদেশে ছড়িয়ে গেছে যে জিন্নার পূর্বোক্ত আশা সাকার হবার স্পষ্ট সম্ভাবনা এখনও দিকৃচক্রবালে দৃষ্টিগোচর নয়। এর সম্ভাবনা রয়েছে ভারতবর্ষের সংস্কৃতি-সমন্বয়ের ঐতিহ্যে যার অনুশীলন গান্ধীর মত জিন্নাও একদা করেছিলেন। ভারত-বিভাজনের সিদ্ধান্তের পর আরও অনেকের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লীগের দুই নেতা খলিকুজ্জমাঁ ও সুরাবর্দীও এর যৌক্তিকতা উপলব্ধি করেছিলেন। এতদুদ্দেশ্যে কাজ করার জন্য ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে গান্ধীর প্রস্তাব নিয়ে তাঁরা উভয়ে পাকিস্তানে জিন্নার কাছে গিয়েছিলেন। কিন্তু জিন্নার উৎসাহের অভাবে তাঁদের সে প্রয়াস অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছিল।[১৭] ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানের পথ বিভেদ নয়—ঐক্য, দ্বন্দ্ব নয়—সমন্বয়, এই চ্যালেঞ্জ স্বাধীনতা-পূর্ব যুগের মত আজও বিদ্যমান।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে জিন্নার কংগ্রেস ছাড়ার কারণ, গান্ধীর সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সংঘাত ছাড়াও গান্ধী-নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ গণআন্দোলনে জিন্নার অনীহা—এ আমরা সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে দেখেছি। মূলতঃ অভিজাত এবং নিয়ম-তান্ত্রিক জিন্নার ব্রিটিশ-শাসনের বিরোধের ক্ষেত্র সেযুগের আরও অনেকের মত ছিল আইনসভা, সংবাদপত্র এবং ইংরাজী-নবীশ শিক্ষিত সমাজের সভা। গান্ধী এর পরিবর্তে শিক্ষিত নিরক্ষর নির্বিশেষে দেশের সাধারণ মানুষদের ব্রিটিশবিরোধী প্রত্যক্ষ অহিংস গণসংগ্রামে—অসহযোগ, আইনঅমান্য ও নানাবিধ সত্যাগ্রহে

ব্রতী করেন। আমরা দেখেছি যে সুযোগ পেলেই জিন্না এজাতীয় আন্দোলনের নিন্দা করেছেন। কিন্তু এর পাশাপাশি নিজের অগোচরে অভিজাত ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনপদ্ধতি নিজের জন্য সংরক্ষিত রেখে লীগের ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের লখনউ অধিবেশনের সময় থেকে তিনি ক্রমশ গণনেতাতেও পরিবর্তিত হয়েছেন। গণনেতার এক বিশিষ্ট উপাদান লোকমনোরঞ্জনকারী বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও জনসাধারণের হাততালি পাবার মানসিকতা—লীগের পরবর্তী বৎসরের অর্থাৎ লাহোর অধিবেশনের পরিবেশ সৃষ্টি ও তাঁর নিজের বক্তৃতায় পূর্ণমাত্রায় ছিল। যে দ্বিজাতি তত্ত্বকে তিনি মাত্র সাত বৎসর পর প্রকাশ্যভাবে বাতিল করবেন তাকে তাঁর বাক্‌চাতুর্যের সাহায্যে বেদবাক্যের রূপ দেওয়া তাঁর গণনেতায় রূপান্তরিত হবার অন্যতম প্রক্রিয়া। পাকিস্তান দাবির সপক্ষে পরবর্তীকালে তাঁর এক-একটি চটকদার বিবৃতি ও বক্তৃতা—যার সর্বশেষ হল পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী এক ভূখণ্ড দাবি —জিন্নার করতালি-অভিলাষী গণআন্দোলনের নায়কের ভূমিকায় উত্তরণের আবার একটি ধাপ। আর ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তাবের পর থেকে তো তিনি পূর্ণমাত্রায় লোকমনোরঞ্জনকারী গণনেতা। এ ছাড়া বড় বড় সভা ফেস্টুন ব্যানার ও ইসলামী প্রতীকসহ শোভাযাত্রা বিক্ষোভ কালো পতাকা প্রদর্শন আইনঅমান্য ইত্যাদি বহুবিধ গণমুখী রাজনৈতিক কর্মসূচী এই পর্যায়ে তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত লীগ নিয়েছিল।

গান্ধীও গণআন্দোলনের নায়ক ছিলেন। কিন্তু এর অপরিহার্য পরিণতি লোকমনোরঞ্জনকারী নেতা হবার হাত থেকে তিনি নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন তাঁর চরিত্রের আধ্যাত্মিক অন্বেষণা-বৃত্তি ও অহিংসা-নিষ্ঠার জন্য। এর প্রভাবে আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী ভারতবর্ষে তাঁর সৃষ্ট অসহযোগরূপী গণআন্দোলনের উত্তাল ব্যাপ্তির মধ্যে ছোট্ট একটি জনপদ চৌরীচেরার হিংসার দৃষ্টান্ত দেখে তিনি তাঁর "হিমালয় সদৃশ ভ্রান্তি" হয়েছে একথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে অপর কোন সহকর্মীর সঙ্গে পরামর্শ বিনাই আন্দোলন প্রত্যাহার করার নির্দেশ দিতে পেরেছিলেন। এবং এর চেয়েও বিস্ময়কর সত্য এই যে তাঁর সে নির্দেশ পালিতও হয়েছিল। কিন্তু কলকাতা নোয়াখালি এবং তারপর পাঞ্জাব সীমান্তপ্রদেশে লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বীভৎস হিংসা ও বিশৃঙ্খলার জন্ম দিলেও, নিয়মতান্ত্রিক জিন্না তার অসহায় দর্শক, এমন কি প্রকাশ্যে ঐ আন্দোলন প্রত্যাহার করার কথা চিন্তাও করতে পারেন নি। অবশ্য তাঁর ওরকম আহ্বানে যে কোন সাড়া মিলত একথা বলা যায় না। পাঞ্জাব, সীমান্তপ্রদেশ এবং আসামেও লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তাবের নামে যাঁরা

হিংসা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে অগ্রণী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই জিন্নার লীগের কেউ নন, প্রতিষ্ঠানের সদস্য বা অনুশাসনের অধীন নন—এ কথা জিন্না ও তদানীন্তন লীগ-নেতৃত্ব একাধিকবার প্রকাশ্যে বললেও সেইসব ব্যক্তি বা তাঁদের ক্রিয়াকলাপকে জিন্না প্রকাশ্যে নিন্দা করতে পারেন নি, নিয়ন্ত্রণ করা তো সুদূরপরাহত। বরং ঐসব দুষ্কৃতির পিছনে হিন্দু সমাজ, কংগ্রেস বা গান্ধীর ষড়যন্ত্র "আবিষ্কার" করে জিন্না নিজের সাফাই গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐসব ক্রিয়াকলাপকে নির্বিবাদে চলতে দিয়েছেন। জিন্নার নেতৃত্বের ভঙ্গী জনতার রাজনৈতিক চেতনা ও সংস্কৃতির মানকে নেতৃত্বের পরশপাথরের ছোঁয়ায় ধীরে ধীরে উন্নত করার পরিবর্তে জনতার প্রচলিত মানের কাছে আত্মসমর্পণের এক অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। বলা বাহুল্য জিন্নার জীবন ও কর্মের অপর এক বিয়োগান্তক অধ্যায় এ।

তবে ন্যায়বিচারের খাতিরে স্বীকার করতে হবে যে অন্ততঃ এই ক্ষেত্রে অসম বিধায়ে জিন্না ও গান্ধীর তুলনা অচল। কারণ ইতিপূর্বেই আমরা দেখেছি যে ঘটনাচক্রে রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে পড়লেও গান্ধী মূলতঃ রাজনৈতিক পুরুষ ছিলেন না। গান্ধীর এক বিখ্যাত উক্তি হচ্ছে—তাঁর উদ্দেশ্য "রাজনীতির অধ্যাত্মীকরণ"। তাই এ ব্যাপারে জিন্নার সঙ্গে তুলনা চলতে পারে দেশ-বিদেশের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবর্গের সঙ্গে যাঁরা জনসাধারণের নেতৃত্ব করতে এসেও ক্ষমতা-প্রাপ্তির প্রারম্ভিক সোপান—জনপ্রিয়তার অনুশীলন করতে করতে শেষ পর্যন্ত জন-মনোরঞ্জনকারীতে পর্যবসিত হন, অর্থাৎ জনগণের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নে নেতৃত্ব দেওয়া তো দূরের কথা, তাঁরাই জনসাধারণের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন। ডাঃ ফাউস্টের শয়তানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবার এই আধুনিক নিদর্শন—রাজনীতি-ব্যবসায়ীর বিয়োগান্তক পরিণাম—যত প্রবল ও প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্নই হোন না কেন, জিন্না এড়াতে পারবেন এ একান্তভাবেই অসম্ভাব্য।

পাকিস্তান আন্দোলন চলাকালীন আগাগোড়া তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বলা সত্ত্বেও জিন্নার অপর এক ট্র্যাজিডি হল পাকিস্তানে সামরিক শাসনের ভিত্তি স্থাপন করে যাওয়া। জিন্নার স্বভাবের উগ্রতা যা প্রায় স্বেচ্ছাচারের পর্যায়ে পড়ে তা আমরা লক্ষ্য করেছি। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তাঁর কর্মপদ্ধতি, মুসলমান স্বার্থের একমাত্র প্রবক্তা হবার সাধনায় যা ভিন্নমত বরদাস্ত করতে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। নেতা এবং অনুগামী জনতা এইভাবে দীর্ঘকাল রাজনীতির ক্ষেত্রে একটিমাত্র রাগিণীর আলাপনে অভ্যস্ত হলেন। যখন ক্ষমতা পাবার সময় এল জিন্না জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত

প্রধানমন্ত্রী হবার বদলে গভর্নর জেনারেল হওয়া পছন্দ করলেন, কারণ গভর্নর জেনারেল প্রধানমন্ত্রীকে নির্দেশ দিতে সক্ষম। নবসৃষ্ট পাকিস্তানের কেবল প্রধান-মন্ত্রীকেই জিন্না মনোনীত করেন নি, মন্ত্রীসভার তাবৎ সদস্য তাঁর দ্বারা মনোনীত হয়। দীর্ঘকাল ধরে তিনি লীগের সভাপতি ছিলেন। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হবার পরও সে-পদে রয়ে গেলেন। এইভাবে একই ব্যক্তির হাতে রাজনৈতিক দল, প্রশাসন এবং ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনা সংক্রান্ত তাবৎ ক্ষমতা কেন্দ্রীত হল। কার্যতঃ এবং স্বভাবে জিন্না নিছক সাংবিধানিক গভর্নর জেনারেল ছিলেন না। ঐ পদ গ্রহণ করার পরও তাঁর হাতে কাশ্মীর এবং সীমান্ত অঞ্চল বিভাগের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ছিল। গণপরিষদে প্রস্তাব করে তিনি গভর্নর জেনারেল হিসাবে নিজের কর্তৃত্ব বাড়িয়ে নেন। এছাড়া কায়েদ-এ-আজম হিসাবে জনমানসে তাঁর নিজস্ব প্রভাব তো ছিলই। প্রধানমন্ত্রীর অজ্ঞাতে অন্যান্য মন্ত্রীদের তো বটেই, এমন কি প্রাদেশিক গভর্নর, মন্ত্রী ও বিভাগীয় সচিবদের তিনি সরাসরি নির্দেশ দিতেন। পাকিস্তান-প্রাপ্তিতে তাঁর ভূমিকা ও সে-দেশে তাঁর অদ্বিতীয় জনপ্রিয়তার জন্য এজাতীয় ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করার কথা কেউ চিন্তা করতে পারতেন না। সংসদীয় সরকারের বিধিবিধান গভর্নর জেনারেল জিন্নার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। "উদ্দেশ্যের দিক থেকে শাসক হিসাবে জিন্নার রাজনৈতিক আচরণে হয়ত প্রশ্ন তোলা যায় না। তবে পরবর্তীকালে পাকিস্তানের অদৃষ্টে যা ঘটে তার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আচরণের পুনর্মূল্যায়ন করার অবকাশ আছে। নিজের হাতে অধিক ক্ষমতা কেন্দ্রীত করে এবং একসঙ্গে এত-গুলি পদ অধিকার করে তিনি এমন এক নজির সৃষ্টি করলেন যা অপেক্ষাকৃত নীচু-দরের মানুষরা অনুকরণ করতে অত্যন্ত প্রলুব্ধ হবে। আর সত্যসত্যই সে প্রলোভন তাঁদের মধ্যে এসেছিল।[১৮]

"মুসলিম লীগের উপর জিন্নার হয়ত প্রায় একনায়কের মত কর্তৃত্ব ছিল। তবে নিজের চতুষ্পার্শ্বে তিনি যে পাকিস্তানের বাগ্‌জাল রচনা করেছিলেন, তিনি স্বয়ং তার এক বন্দীতে পর্যবসিত হন। ১৯৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ জিন্না সে সম্বন্ধে কি ভাবেন না ভাবেন তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে পাকিস্তানের ধ্যান-ধারণায় এক নিজস্ব প্রাণ সঞ্চার হয়। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের উদ্দীপন, ইংরেজদের এদেশে নিজ শাসনের সমাপ্তি-পর্ব ত্বরান্বিত করার আকাঙ্ক্ষা, শিখদের নিজ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত, কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে, তার আয়তন যাই হোক না কেন, এক শক্তিশালী এককেন্দ্রীক ভারতবর্ষ পাবার উত্তরোত্তর বর্ধিত ইচ্ছা—এসবের

উপর জিন্নার কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ভারতবর্ষে ইসলামের ভবিতব্য বলে পাকিস্তান অপরিহার্য হয়ে ওঠে নি, এ সম্ভব হয় বিশেষ এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে একাধিক পরস্পরবিরোধী শক্তির সংহতির ফলে। জিন্নার হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ সত্ত্বেও এমন কি তিনি যদি দীর্ঘজীবিও হতেন, তবু একই কারণে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পর তাঁর পক্ষে পাকিস্তানের ভিতর অনতিবিলম্বে যেসব সংঘাত ও সংঘর্ষ দেখা দিয়েছিল তার উপর বিজয়ী হওয়া সম্ভব হত না। কারণ পাকিস্তান যদি অপরিহার্য হয়ে থাকে, তাহলে বাংলাদেশও অপরিহার্য। কেউ যদি তাঁর লক্ষ্য সিদ্ধির পন্থা নির্বাচনে সতর্ক না হন তাহলে দেখা যাবে যে পন্থাই তাঁর জন্য লক্ষ্য স্থির করে দিয়েছে।"[১৯] জিন্নার জীবন ও কর্মের ট্র্যাজিডির গভীরতা পরিমাপ প্রসঙ্গে উদ্ধৃতির শেষ বাক্যটি বিশেষরূপে লক্ষণীয়।

জিন্নার ব্যক্তিগত জীবনও সমান বিয়োগান্তক। তাঁর প্রথমা পত্নী অল্প বয়সে—জিন্না বিলাতে অধ্যয়নরত অবস্থাতেই মারা যান। বেশী বয়সে ধর্ম, আচার-ব্যবহার, মানসিকতা এবং সর্বোপরি বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও প্রণয়সূত্রে জিন্না যাঁকে বিবাহ করলেন তাঁর সঙ্গে তাঁর দাম্পত্য-জীবন সুখের হয় নি। মোকর্দমা ও রাজনীতি নিয়ে জিন্না এত ব্যস্ত থাকতেন যে তাঁর স্ত্রী রুট্টি উপেক্ষিতা ও নিঃসঙ্গ বোধ করতে করতে অবশেষে মানসিক হতাশার শিকার হন এবং তাঁকে একরকম পরিত্যাগ করেই চলে যান। এক ভারতবিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা হিসাবে এ ঘটনা জিন্নার পক্ষে কম অসম্মানজনক ও মনোবেদনামূলক হয় নি। রুট্টির মৃত্যুও হয় অল্পবয়সে শোচনীয় পরিস্থিতির মধ্যে। একমাত্র সন্তানকন্যা দীনাকে জিন্না স্বভাবতই খুবই স্নেহ করতেন। তবে ইংলণ্ড থেকে বোম্বাই-এ প্রত্যাবর্তনের পর আবার আদালত ও রাজনীতির চাপে তার প্রতিও জিন্না প্রয়োজনীয় দৃষ্টি দিতে পারেন নি। পিতার কর্ম ও মনোজগতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন দীনা নিজের জন্য পতি নির্বাচন করে মায়ের অর্থাৎ পার্শী সম্প্রদায় থেকে। স্বভাবতই ততদিনে মুসলমান সমাজের অদ্বিতীয় নেতা হিসাবে জনসমাজে স্বীকৃত জিন্নার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার প্রতিও এ এক প্রবল চ্যালেঞ্জ ছিল। পিতার অহমিকার কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। সুতরাং "জিন্না তাঁর স্বাভাবিক কর্তৃত্বপূর্ণ ভঙ্গীতে মেয়েকে বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ মুসলমান যুবক রয়েছে এবং তাদের মধ্যে দীনা কাউকে বাছতে পারতেন।" জিন্নার এ মনোভাব ইসলাম-নিষ্ঠার বদলে বরং ইসলামের রক্ষাকর্তারূপে জনমানসে তাঁর যে ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল এবং যা তাঁর পাকিস্তান দাবির প্রবল সহায়ক তা বজায় রাখার জন্য, এ সত্য উপলব্ধি করতে বেগ পেতে হয় না। অতঃপর সেই তরুণী যে

বাবার সঙ্গে পাল্লা দিতে আদৌ পিছপা নয় জবাব দিল : "বাবা, ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ মুসলমান মেয়ে ছিল। তাহলে তুমি কেন তাদের একজনকে বিবাহ করো নি?"[২০] এই "ঔদ্ধত্য" ও "বিদ্রোহ" সচরাচর আনুগত্য পেতে অভ্যস্ত জিন্না বরদাস্ত করতে পারেন নি। দীনার সঙ্গে বাকী জীবন তাঁর আর হৃদ্য-সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় নি। কন্যাকে কদাচিৎ পত্র লিখতে হলে তিনি তাঁর নাম ধরে নয়—"শ্রীমতী ওয়াডিয়া"রূপে সম্বোধন করতেন। পরিচিত মহলে কন্যার কোন উল্লেখ পর্যন্ত করতেন না। এমন কি তাঁর কোন কন্যা আছে তাও স্বীকার করতেন না। অর্থাৎ এখানেও রাজনীতির যূপকাষ্ঠে সন্তান-প্রেমের বলিদান। জিন্নার একমাত্র সন্তান দীনা কেবল তাঁর শেষকৃত্যের সময়ে পাকিস্তানে গিয়েছিলেন। কন্যা জামাতা অথবা দৌহিত্র-দৌহিত্রী জিন্নার সাধের পাকিস্তানকে স্বদেশরূপে গ্রহণ করেন নি।

জিন্নার বাহ্যজীবন যেমন তাঁর পারিবারিক সম্বন্ধকে প্রভাবিত করেছিল, তেমনি অন্তর্জীবন—বিশেষ করে তার আনন্দ ও বেদনা, সাফল্য ও হতাশা—তাঁর বহির্জীবন অর্থাৎ রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও পদক্ষেপকে প্রভাবিত করে থাকবে। কিন্তু তার প্রতি আলোকপাত করা আরও গবেষণাসাপেক্ষ ব্যাপার।

কাশ্মীরের প্রতি জওহরলালের মতই জিন্নারও একটা অন্ধ আবেগজনিত আকর্ষণ ছিল। ভারত সরকারের সামরিক হস্তক্ষেপের ফলে তথাকথিত উপজাতীয় অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ঐ রাজ্যের পাকিস্তান-ভুক্তির প্রয়াস বিফল হওয়ায় তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এর পরিণামে তাঁর ভিতর ভারত এবং তার সব কিছুর প্রতি বিরোধিতা করার একটা মানসিকতা ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর থেকে গড়ে উঠেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দেশ-বিভাগোত্তর ভারতে মুসলমানদের অসহায় মানসিকতা ছাড়াও উৎপীড়নের কারণে তাঁদের দলে দলে উদ্বাস্তু হয়ে[২১] পাকিস্তানে গিয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে সংগ্রাম করে জীবনযাপন করতে বাধ্য হবার জন্য গভীর মনোবেদনা। সম্ভবতঃ এই মানসিকতার চূড়ান্ত নিদর্শনস্বরূপ ২৪শে অক্টোবর ঈদুজ্জোহার বাণীতে তিনি বলেন : "শত্রুদের আঘাতের জন্য আমাদের নবজাত রাষ্ট্র রক্তমোক্ষণ করছে। ভারতবর্ষে আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের বলির পশুর মত অবস্থা। মুসলমান এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় তাঁদের সাহায্য ও সহানুভূতি ছিল বলে তাঁদের উপর অত্যাচার হচ্ছে।"[২২] এর ছয় দিন পর লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেডিয়াম থেকে এক জনসমাবেশকে সম্বোধন প্রসঙ্গেও তাঁর অনুরূপ তিক্ত মনোভাব ফুটে ওঠে : "আত্মরক্ষার উপায়বিহীন নির্দোষ ব্যক্তিদের যেভাবে সুপরিকল্পিত ভাবে জবাই করা হচ্ছে, তা ইতিহাসে উল্লিখিত চূড়ান্ত অত্যাচারীর

জঘন্য কুকীর্তিসমূহকেও ম্লান করে দেবে। সততা, সৌজন্য ও মর্যাদার প্রাথমিক নীতিকে উপেক্ষাকারী এক গভীর ও সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের শিকার আমরা। এই সব পাপের শক্তির সঙ্গে লড়াই করার সাহস ও বিশ্বাস আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করার জন্য আমরা ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ।"[২৩]

এক সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিন্দুগোষ্ঠীর প্রতিনিধির হাতে "অযৌক্তিক ভাবে মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতকারী" ও "পাকিস্তানের দালাল"রূপে চিহ্নিত হবার অভিযোগে নিহত গান্ধীর স্মৃতিতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান এক সংক্ষিপ্ত প্রকাশ্য শোকবার্তায় বলেন, "তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান ছিলেন" এবং ঐ ঘটনা হল "হিন্দু জাতির (Nation) এক ক্ষতি"। প্রায় তিন দশকের মুখ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃত্যুর পর অন্ততঃ তাঁর প্রতি ন্যায়বিচার করেন নি—একথা "ইংরেজ ভদ্রলোক" জিন্না সম্ভবতঃ অনতিবিলম্বেই উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে নিজের ভুল স্বীকার করা জিন্নার স্বভাববিরুদ্ধ। তাই নিউ ইয়র্কের একটি ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের সহ-সভাপতির সঙ্গে গান্ধী-তিরোধানের কয়েক দিন পর আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি তাঁর মুখ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্পর্কে সংশোধিত অভিমত ব্যক্ত করেন: "জিন্না···প্রকাশ্য বিবৃতিতে যা বলেছিলেন তার তুলনায় অনেক উদার ভাবে গান্ধী সম্বন্ধে বলেন এবং একথাও স্বীকার করেন···যে মুসলমানদের পক্ষে এ কী পরিমাণ ক্ষতিকারক হয়েছে।"[২৪]

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একাধিকবার নিজের ভূমিকা পরিবর্তন করার জন্য জিন্নার প্রতি অব্যবস্থচিত্ততার অভিযোগ উঠতে পারে। একদা গান্ধীর সম্বন্ধে জিন্না বলেছিলেন যে, তিনি এক "প্রহেলিকা" এবং এ অপবাদ—যদি একে অপবাদ আখ্যা দেওয়া যায়—তাঁর সম্বন্ধে অধিকতর প্রযোজ্য। প্রত্যুতঃ জিন্নার চরিত্রের এই দিকটির বর্ণনাপ্রসঙ্গে ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত চার্চিলের এক চিরায়ত উক্তির উদ্ধৃতি দেবার লোভ সংবরণ করা কঠিন— "একটি ধাঁধার মধ্যে রহস্যে আবরিত প্রহেলিকা।"[২৫] কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা জানেন যে মানুষ একই সঙ্গে একাধিক জটিল উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত হয়। আর জিন্না তো মূলতঃ রাজনৈতিক পুরুষ ছিলেন যাঁদের আদর্শ সর্বথা ম্যাকিয়াভেলীর The Prince না হলেও নিঃসন্দেহে চাণক্যের "মনসা চিন্তয়েৎ কর্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ"।

দেশ-বিভাজনের কিছুদিন পরই যে প্রশ্ন উঠেছিল এবং বর্তমানে নূতন করে যে প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হচ্ছে তা হল—জিন্না কি সত্যসত্যই ভারত বিভাগ করে মুসলমানদের এক স্বতন্ত্র বাসভূমি সার্বভৌম পাকিস্তান চেয়েছিলেন? সমসাময়িক

হবার ফলে মৌলানা আজাদের পক্ষে ভিতরের কথা জানার সম্ভাবনা বেশী ছিল এবং জিন্নার প্রতি অন্যায় পক্ষপাতিত্ব করার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে ওঠার আশঙ্কা নেই। কারণ উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক আদৌ হৃদ্যতামূলক ছিল না। তাঁর অভিমত হল: "সম্ভবতঃ শেষ অবধি পাকিস্তান জিন্নার একটা দরাদরির বিষয় ছিল।"[২৬] ভিতরের খবর আরও যাঁদের জানার সম্ভাবনা, ভারতের সেই ব্রিটিশ কর্তৃ-পক্ষের মতেও[২৭] —অন্তত: প্রথম দিকে জিন্না এই মানসিকতা দ্বারা চালিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত মজুমদার থেকে আরম্ভ করে সাম্প্রতিক কালের ডঃ আয়েষা জালালের মত আরও অনেক জিন্না-গবেষকেরও এই মত। তাঁদের বক্তব্য—কংগ্রেস ভারত বিভাজনে রাজী হয়ে যাবে, একথা জিন্না স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। পাকিস্তানের দাবি—তাঁর নিজের দলের জন্য অধিকতর সুযোগ-সুবিধা আদায়ের কৌশল ছিল। যদিচ অন্যদিকে পীরজাদা থেকে আরম্ভ করে শরীফ অল মুজাহিদ এবং মুহম্মদ সালীম আহমদের [২৮] মত আধুনিক পাকিস্তানী ও অনীতা ইন্দর সিং-এর মত ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মতে গোড়া থেকেই জিন্না কেবল মুসলিম স্বার্থের সংরক্ষক ছিলেন এবং পাকিস্তানে তার পূর্ণাহুতি। মনের আসল কথা জিন্না কোন আত্মজীবনী বা ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করে যান নি বলে এ ব্যাপারে আমাদের পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য পরীক্ষা করে দেখা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। এর সর্বাপেক্ষা জোরালো সাক্ষ্য হল ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে আলোচনার সময়ে লীগের বিকল্প প্রস্তাব—যাতে সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নেওয়া হয়েছিল (অধ্যায় সংখ্যা ২৫) এবং মিশনের ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে তারিখের প্রস্তাব লীগ কর্তৃক গ্রহণ। ঐ প্রস্তাবে পাকিস্তানের দাবি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বাতিল করা হলেও জিন্না যে তা গ্রহণ করেছিলেন—এটা পাকিস্তান দাবির প্রতি তিনি যে কতটা গুরুত্ব দিতেন তার এক নিদর্শন। একথা সত্য যে ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করার সময়ে লীগ ওতে "পাকিস্তানের সারমর্ম" আছে বলে ঘোষণা করে। কিন্তু এটা যে এতদিন যাঁদের পৃথক পাকিস্তানের জন্য উত্তেজিত করা হয়েছে তাঁদের ভোলাবার জন্য রাজনৈতিক বাক্‌চাতুরী, একথা বুঝতে বিলম্ব হয় না। সুতরাং জিন্না সত্যসত্যই পাকিস্তানের জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন কিনা—এই সংশয়ের জোরালো ভিত্তি আছে।

তাহলে কেন তিনি পাকিস্তানের জন্য এমন মরীয়া হয়ে আন্দোলন করেছিলেন? আর কেনই বা তাঁর চরিত্রে কিঞ্চিৎ পূর্বে আলোচিত এমন স্ববিরোধ ছিল? এর বড় একটা কারণ সম্ভবতঃ রাজনীতি অর্থাৎ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অধিগত করার অভীপ্সা। কদাচিৎ কোন রাজনৈতিক পুরুষ লক্ষ্য ও উপায়ের বিচার করেন।

জিন্নাও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না।

সর্বশেষে আর একটি প্রশ্ন, ভারতীয় উপমহাদেশের বিগত কয়েক শতাব্দীর তো বটেই, সম্ভবতঃ আগামী কয়েক শতাব্দীরও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা, যার পরিণামে ভারতবর্ষ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মত তিনটি রাষ্ট্রের প্রায় ১০০ কোটি নর-নারীর রক্তমোক্ষণ হচ্ছে এবং আরও কতদিন হবে তা ভবিষ্যৎই জানে, সেই দেশবিভাগের জন্য দায়ী কে? বিশেষ করে পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য-প্রমাণের জন্য জিন্নাকে যদি সন্দেহাবসরে মুক্তি দিতে হয়, তাহলে আসামীর কাঠ-গড়ায় দাঁড়াবার জন্য বাকী থাকেন কারা?

ব্রিটিশ সরকার সাম্রাজ্যবাদী শাসন বজায় রাখতে ভেদনীতির সাহায্য নিয়ে ভারত-বিভাজনে একটি বড় ভূমিকা নিয়েছিল।[২৯] ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রাক্কালে বিশেষ করে ভারতে কর্মরত উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারীদের একটা বড় অংশ তাঁদের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জকারী কংগ্রেসের বিরোধিতার জন্য লীগের ভারত-বিভাগের দাবিতে পরোক্ষ ভাবে তো বটেই, বহু সময়ে প্রত্যক্ষ ভাবেও সাহায্য করেন। এটা সাম্রাজ্যবাদের চিরকালের নীতি বলে ভারতের বেলায় বিশেষ করে ইংরেজদের দোষ দেওয়া যায় না। এছাড়া ক্ষমতা হস্তান্তরের নীতি-নির্ধারক এটলির সরকার এবং প্রথম দিকে বড়লাট মাউণ্টব্যাটেনও ভারত বিভাগের পক্ষে ছিলেন না।

লীগ ছাড়া অপর যে দল আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দোহাই দিয়ে পাকিস্তানের দাবির সমর্থন করেছিল তা হল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। বিশেষভাবে ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করার নীতি গ্রহণ করার পর থেকে ঐ দল পাকিস্তান-প্রস্তাব ও মুসলীম লীগের সমর্থন করা আরম্ভ করে। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের গান্ধী-জিন্না আলোচনার সময় থেকেই এই দলের ধুয়া ছিল: কংগ্রেস লীগ মিলনের পথে স্বাধীন হও। এ দলের তদানীন্তন সর্বভারতীয় সম্পাদক শ্রীপূরণচন্দ্র জোশীর স্বীকৃতি হচ্ছে: "আমরাই মুসলমানদের পাকিস্তানের দাবি কংগ্রেসসেবীদের কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছি।" লাহোরের (পাকিস্তান) প্রস্তাব কংগ্রেসের ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের লাহোর-প্রস্তাবেরই অনুরূপ "একটি স্বাধীনতা প্রস্তাব" এবং স্বরাজের মত "পাকিস্তানও মুসলিমদের জন্মগত অধিকার"[৩০] ইত্যাদি। ডঃ গঙ্গাধর অধিকারী[৩১] সহ আরও অনেক বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতাও মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণ দাবির নামে পাকিস্তানের জন্য ওকালতী করেন। এক সাম্প্রতিক গ্রন্থের[৩২] তথ্য অনুসারে অধিকারী গোপনে পাঞ্জাব লীগের ১৯৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনী ইস্তাহার (যার মূল কথা পাকিস্তান) রচনা করেন এবং এর অন্তিম রূপ দেন

জিন্না। কিন্তু এসব সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টিকে পাকিস্তানের জন্য দায়ী করা যায় না। ঐ দলের ঐ ভূমিকার পিছনে বড় বেশী হলে "জনযুদ্ধের" থিসিস চালিত হয়ে সোভিয়েট রাশিয়াকে সাহায্যের উদ্দেশ্য ও এই সুযোগে মুসলমান সমাজে প্রভাব বিস্তারের মানসিকতা ক্রিয়াশীল ছিল। কিন্তু তদানীন্তন ভারতবর্ষে ঐ দলের রাজনৈতিক প্রভাব তখন এমন ছিল না যার জন্য তার পাকিস্তানের দাবির সমর্থনে ঘটনার গতিপথ খুব একটা প্রভাবিত হবে।

কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে ইসলামী মৌলবাদের উদ্দীপনকারী খিলাফত আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া, আসামের জন্য ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবের বাধ্যতামূলক গোষ্ঠীবদ্ধ হবার প্রস্তাবের বিরোধিতা করা এবং সর্বশেষে গৃহযুদ্ধের হাত এড়াবার জন্য অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যদের কাছে ওয়ার্কিং কমিটির দেশবিভাগের প্রস্তাবকে মেনে নেবার জন্য ওকালতী করার জন্য গান্ধীর নাম এ প্রসঙ্গে উচ্চারণ করা হয়। তবে গান্ধী যে ভারত-বিভাজনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন—তার সপক্ষে শতবিধ সাক্ষ্য উপস্থাপিত করা যেতে পারে। কিন্তু তার জন্য একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন। তাই সাফল্যের পূর্বক্ষণে তাঁর ব্যর্থতার ট্র্যাজিডির গভীরতা ব্যক্তকারী—কংগ্রেস কর্তৃক ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের দোসরা জুন সরকারী ভাবে ভারত-বিভাগ মেনে নেবার পূর্বদিন অতি ভোরে তাঁর হৃদয়বিদারী অর্ধস্বগতোক্তির উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হতে হবে।[৩৩] গান্ধীর পরামর্শ অগ্রাহ্য করে এবং তাঁর অজ্ঞাতে নেহেরু ও প্যাটেল ৮ই মার্চ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের মাধ্যমে পাঞ্জাব-বিভাজনের যে দাবি করেন তারই পূর্ণাহুতি হয় দোসরা জুনের মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাবের স্বীকৃতিতে। কিন্তু জওহরলালও স্বেচ্ছায় নয়, নিরুপায় হয়ে ঐ অবস্থায় উপনীত হন।[৩৪] ভবিষ্যতে ভারতবর্ষকে একসূত্রে বন্ধন (দেশীয় রাজ্যসমূহের ভারতভুক্তির) করার নায়ক বল্লভভাই প্যাটেল সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য।[৩৫] কংগ্রেসের প্রথম সারির আরও অনেক নেতাই এর[৩৬] ব্যতিক্রম নন।

হিন্দু মহাসভার নেতারা ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে—ভারত-বিভাজন যখন মোটামুটি সম্ভাবনার পর্যায়ে পর্যবসিত এবং দেশের হিন্দু জনমতও যখন ভারত-বিভাগের সপক্ষে মুখর—পাঞ্জাব ও বঙ্গের সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভাজন দাবি করে যতটা সম্ভব বেশী এলাকা ভারতবর্ষে রাখার জন্য সাধ্যমত প্রয়াস করেন বলে শেষ অবধি এই শোচনীয় ঘটনার জন্য ঐ দলের উপরও দোষারোপ করা যায় না। তাহলে?

গ্রীক নাটকের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা সফোক্লিসের সৃষ্ট নায়ক-নায়িকা এবং বিশেষ করে রাজা ঈডিপাসের কথা এ প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে পড়ে। এক অদৃশ্য শক্তির অঙ্গুলি-

হেলনে দীপশিখাভিমুখী পতঙ্গের মত তারা ট্র্যাজিডির অভিমুখে ছুটে চলে। শত প্রয়াস সত্ত্বেও শোচনীয় পরিণতি এড়াতে পারে না। নিষ্কলুষকেও দোষীর সঙ্গে শাস্তি ভোগ করতে হয়। ভারতবর্ষের বিভাজনও সম্ভবতঃ সেই শক্তির খেলা। নচেৎ ভারত-বিভাজনের বিরোধী হয়েও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কুশীলবরা ক্ষমতা হস্তান্তররূপী নাটকের শেষ অঙ্কে কোন রকম ব্যতিক্রম ছাড়াই বার বার এমন ভূমিকা কেন গ্রহণ করলেন যার জন্য দেশবিভাগ অপরিহার্য হল? কিন্তু ইতিহাসকারের পক্ষে তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্র ছেড়ে এমন কি ইতিহাসের দর্শনের খোঁজেও অপরের এলাকায় প্রবেশ করা বিপজ্জনক। তাই এ প্রসঙ্গের এখানেই ইতি করা বাঞ্ছনীয়।

জিন্না : পাকিস্তান/নতুন ভাবনা

পাদটীকা

॥ ১ ॥

১. এই তথ্য ভ্রান্ত। জিন্না তার পরবর্তী নাগপুর কংগ্রেসের পর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন।

২. An Autobiography ; দ্য বডলি হেড, লণ্ডন (১৯৫৫) ; ৬৭ পৃষ্ঠা।

৩. হেক্টর বলিথো কর্তৃক Jinnah : Creator of Pakistan (অতঃপর Jinnah রূপে উল্লিখিত হবে) ; জন মারি, লণ্ডন (১৯৫৪) ; গ্রন্থের ১৯৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৪. ১৬১ পৃষ্ঠা।

৫. বি. শিব রাও ; India's Freedom Movement ; ওরিয়েন্ট লংম্যান, দিল্লী (১৯৭২)।

৬. সমগ্রন্থ ; ১২৫ পৃষ্ঠা।

৭. সমগ্রন্থ ; ১২৬ পৃষ্ঠা।

৮. মাহমুদাবাদের রাজা ; Some Memories। স্ট্যানলি উলপার্ট কর্তৃক Jinnah of Pakistan (অতঃপর Jinnah রূপে উল্লেখিত) ; অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউইয়র্ক (১৯৮৪) গ্রন্থের ৭৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৯. এ ব্যাপারে তাঁর এক কালের ঘনিষ্ঠ অনুগামী এবং সহকর্মী মহম্মদ করীম চাগলার বক্তব্য (Roses in December) ; ভারতীয় বিদ্যাভবন ; বোম্বাই (১৯৭৩) নিম্নরূপ : "গান্ধীজী, নেহেরু ও অন্যান্যদের প্রতি তিনি কঠোর এবং রূঢ় উক্তি প্রয়োগ করতেন। কিন্তু গোখলে, তিলক ও তাঁদের অভিমতের প্রতি জিন্নার মনে ছিল গভীর প্রশংসা ও শ্রদ্ধার ভাব।" (পৃঃ ১৪) তিলকের প্রতি জিন্নার শ্রদ্ধার ব্যাপারে চাগলা অপর একটি ঘটনারও উল্লেখ করেছেন। তিলকের প্রতি ছয় বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দানকারী বিচারপতি ডাভরকে সরকার নাইট উপাধি দিলে বোম্বাই হাইকোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশন তাঁকে সংবর্ধনা জানাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাবৎ ব্যবহারজীবীদের কাছে এ সম্বন্ধে একটি বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে তাঁদের ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানায়। জিন্না ঐ বিজ্ঞপ্তির উপর তীব্র ভাষায় এই মন্তব্য লিখে উদ্যোক্তাদের কাছে তা ফেরত পাঠান যে তিলককে

দণ্ডাদেশ দানকারী বিচারককে সম্মান করার প্রস্তাব করার জন্য তাঁদের লজ্জিত হওয়া উচিত। বিচারপতি স্বয়ং তাঁর সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথা বলার পরও জিন্না নিজের মন্তব্য প্রত্যাহার করতে অস্বীকৃত হন। এ ঘটনা তাঁর স্বাধীনচেতা মনোভাব এবং তিলকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার দ্যোতক (পৃঃ ১৫)।

১০. ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল জিন্না তাঁর মক্কেল ধনাঢ্য পার্শী স্যার দীনশা পেটিটের কন্যা রত্তনবাই বা রত্তিকে বিবাহ করেন। স্যার দীনশা এই বিবাহের তীব্র বিরোধী ছিলেন এবং আদরিনী কন্যাকে সমস্ত জীবন ক্ষমা করেন নি। ভিন্ন ধর্মের তরুণীর সঙ্গে এই প্রেমঘটিত বিবাহ জিন্নার আধুনিক এবং গোঁড়ামি বর্জিত অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার লক্ষণ। তবে তাঁর প্রথম বিবাহ হয় ১৬ বৎসর বয়সে তদানীন্তন প্রথা অনুযায়ী বিলাতযাত্রার প্রাক্কালে। বালিকা বধূ এমিবাই অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং প্রথম বার বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর জিন্না আর তাঁকে দেখতে পান নি।

১১. সমগ্রন্থ, ১২৫ পৃষ্ঠা।

১২. সমগ্রন্থ, পৃঃ ১২৬। এমন কি ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দেও জিন্না কট্টর ইসলাম অনুসারীদের কী পরিমাণ বিরোধী ছিলেন তার বিবরণ এক সাম্প্রতিক গ্রন্থে (ডঃ আফজল ইকবাল, Islamisation of Pakistan ; ইদারাহ-ই-অদাবিয়ৎ-ই-দিল্লী, দিল্লী (১৯৮৪); পৃঃ ২৫) পাওয়া গেছে। প্রবীণ লীগনেতা ও ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসনের মন্ত্রী এম. এ. হারুণ লেখককে জানান যে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে একবার জিন্নাকে যখন বলা হয় যে তিনি ইসলাম সম্বন্ধে বলার সময় শরীয়তের উল্লেখ করেন না বলে উলেমারা তাঁর সমালোচক, তখন জিন্না তীব্রভাবে মন্তব্য করেন : "কার শরীয়ৎ? হানিফীদের? হুমবলীদের? শাআফিদের? মালিকীদের? জাফরীদের? আমি নিজেকে এর মধ্যে জড়াতে চাই না। এই ক্ষেত্রে পদার্পণ মাত্র উলেমারা নিজেদের বিশেষজ্ঞরূপে দাবি করে অগ্রণীর ভূমিকা নেবেন এবং আমি আদৌ চাই না যে ব্যাপারটা উলেমাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক। তাঁদের সমালোচনার কথা আমি জানি। কিন্তু আমি তাঁদের ফাঁদে পা দিতে চাই না।"

১৩. সমগ্রন্থ ; পৃঃ ৫৫। কিন্তু চাগলা হয়ত জানতেন না যে অভিনয়কলার প্রতি জিন্নার গভীর আগ্রহ ছিল। ব্যারিস্টারী পাস করার পরও তাঁর ইংলণ্ডে পেশাদার অভিনেতা হবার শখ ছিল যা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন পিতৃপ্রভাবে। আইনজীবী এবং রাজনৈতিক নেতা হিসাবে সমস্ত দিন গলদঘর্ম হয়ে পরিশ্রম

করার পরও তিনি শেক্সপীয়রের রচনা আবৃত্তি করে আত্মমনোরঞ্জন করতেন (উলপার্ট ; সমগ্রন্থ ; পৃ: ১৪)।

১৪. সমগ্রন্থ ; ১২১ পৃষ্ঠা।

১৫. ১৪.'৬. ১৯৮১

১৬. বসন্ত টি. কৃপালনী ; Jinnah's Last Legal Battle ; ২৭. ৩. ১৯৮৩

॥ ২ ॥

১. শরীফ অল মুজাহিদ ; Quaid-I-Azam Jinnah—Studies in Interpretation ; কায়েদ-এ-আজম আকাদেমী, করাচী ১৯৮১ ; এস. কে. মজুমদার, Jinnah and Gandhi—Their Roles in India's Quest for Freedom ; ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা (১৯৬৬) ; উলপার্ট ; Jinnah ; এম. এইচ. সঈদ ; The Sound of Fury—A Political Study of Mohammad Ali Jinnah (অতঃপর Sound of Fury রূপে উল্লেখিত) ডকুমেণ্ট প্রেস, নূতন দিল্লী (১৯৮১) এবং বলিথো ; Jinnah।

২. এ তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে।

৩. এ পদবী গুজরাতের হিন্দুদের মধ্যেও আছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের ১১ সংখ্যক পাদটীকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিব রাও-এর গ্রন্থের উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য।

৪. এই তারিখ ও স্থান নিয়েও মতভেদ বিদ্যমান।

৫. কোন কোন গবেষকের মতে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ।

৬. মহামান্য আগা খাঁ ; The Memoires of Aga Khan ; (১৯৫৪) ; উলপার্ট কর্তৃক পূর্বোক্ত গ্রন্থে (পৃ ২৬) উদ্ধৃত।

৭. এ সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্যের জন্য রাজেন্দ্রপ্রসাদের India Divided ; হিন্দ্ কিতাবস, বোম্বাই (১৯৪৬) পৃ: ৯৪—১১৯ এবং রামগোপালের Indian Muslims—A Political History (1858—1947) (অতঃপর Indian Muslims রূপে উল্লেখিত) ; এশিয়া পাবলিশিং হাউস, বোম্বাই (১৯৫৯) পৃ: ৯৭-১০২ দ্রষ্টব্য।

॥ ৩ ॥

১. ডাঃ বি. পট্টাভি সীতারামাইয়া ; The History of the Congress ;

প্রথম খণ্ড ; কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি, এলাহাবাদ (১৯৩৫) ; ১৫-৪২ পৃষ্ঠা।

২. সমগ্রন্থ , ৪১ পৃষ্ঠা।

॥ ৪ ॥

১. কাউন্সিলের বক্তৃতার বিবরণ , মজুমদার , সমগ্রন্থ ; ২১ পৃষ্ঠা।

২. সীতারামাইয়া ; সমগ্রন্থ ; ১৮৭ পৃষ্ঠা।

৩. শরীফ অল মুজাহিদ ; সমগ্রন্থ ; ৫১৫ পৃষ্ঠা।

৪. মজুমদার , সমগ্রন্থ , ২২ পৃষ্ঠা ,

৫. ইতিমধ্যে (ডিসেম্বর ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের সম্রাটের ঘোষণায়) বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে গেছে এবং বিহার ও উড়িষ্যাকে বাংলা থেকে পৃথক এক প্রদেশে পরিণত করার আয়োজন হচ্ছে।

৬. কিছুদিন পূর্বে ত্রিপোলী ও বল্কান যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং মুসলমান ধর্মগুরু ও পার্থিব ব্যাপারেও প্রধান খলিফার পীঠস্থান তুরস্ক এই যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়ে। উভয় যুদ্ধেই ইংরেজ তুরস্কের স্বার্থবিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করায় ভারতীয় মুসলমানদের ভিতর তুরস্কের সপক্ষে ও ইংরেজদের বিপক্ষে একটা মানসিকতা দানা বাঁধতে থাকে। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া কর্তৃক পারস্যের অংশবিশেষ গ্রাস এবং ইংরেজদের রাশিয়ার প্রতি সমর্থনও মুসলমানদের ইংরেজের সমালোচক করে তোলে। এ ছাড়া বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় লীগের নেতারা ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন। স্বভাবতই মুসলীম লীগের কার্যকলাপেও তাই পূর্বের ইংরেজদের অনুগত ভূমিকার পরিবর্তে ইংরেজবিরোধী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। জিন্নার প্রতি লীগের আকর্ষণ বোধহয় এই সব কারণে। এ ছাড়া জিন্না তখন ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে সমানতালে পাঞ্জা লড়িয়ে তরুণ হীরো এবং দেশের প্রথম সারির নেতা। লীগের তদানীন্তন নেতৃত্ব এমন একজন মুসলমান নেতাকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে নিজ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদাবৃদ্ধি করতে চাইবেন—এইটাই স্বাভাবিক।

৭. রাজেন্দ্রপ্রসাদ , সমগ্রন্থ ; ১১৮ পৃষ্ঠা।

॥ ৫ ॥

১. সম্ভবতঃ মহম্মদ আলী এবং ওয়াজির হাসান।

২. Mohammad Ali Jinnah, an Ambassador of Unity। পৃঃ

১১। মজুমদার কর্তৃক সমগ্রন্থের ২৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৩. শরীফ অল মুজাহিদ ; সমগ্রন্থ ; ৫১৭ পৃষ্ঠা।

৪. মতলুবুল হাসান সঈদ ; Muhammad Ali Jinnah : A Political Study (অতঃপর Jinnah রূপে অভিহিত হবে) ; লাহোর (১৯৪৫) ; পৃঃ ৫১। মজুমদার কর্তৃক সমগ্রন্থের ২৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৫. সঈদ , Jinnah , পৃঃ ৫১। মজুমদার কর্তৃক সমগ্রন্থের ২৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৬. ডি. জি. টেণ্ডুলকর ; Mahatma , প্রথম সংস্করণ (১৯৫১) ; প্রথম খণ্ড ; ১৮৭ পৃষ্ঠা।

৭. শরীফ অল মুজাহিদ ; সমগ্রন্থ ; ৫১৮ পৃষ্ঠা।

৮. সমগ্রন্থ , ৫১৮ পৃষ্ঠা।

৯. সকল সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় স্বায়ত্তশাসনের জন্য আগ্রহী রূপান্তরিত মুসলীম লীগ।

১০. টেণ্ডুলকর ; সমগ্রন্থ ; প্রথম খণ্ড ; ২৪ পৃষ্ঠা।

১১. সীতারামাইয়া , সমগ্রন্থ ; প্রথম খণ্ড ; ২০৯ পৃষ্ঠা।

১২. শরীফ অল মুজাহিদ , সমগ্রন্থ ; ৫১৮ পৃষ্ঠা।

১৩. টেণ্ডুলকর ; সমগ্রন্থ ; প্রথম খণ্ড ; ২১৮ পৃষ্ঠা।

১৪. সঈদ ; Jinnah ; পৃঃ ১২০। মজুমদার কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ২৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১৫. টেণ্ডুলকর ; সমগ্রন্থ ; প্রথম খণ্ড ; ২৩১ পৃষ্ঠা।

১৬. সীতারামাইয়া ; সমগ্রন্থ ; প্রথম খণ্ড ; ৪৩-৪৪ পৃষ্ঠা।

১৭. সঈদ ; Jinnah ; পৃঃ ৬৪। মজুমদার কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ২৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১৮. টেণ্ডুলকর ; সমগ্রন্থ ; প্রথম খণ্ড ; ২৩৫ পৃষ্ঠা।

১৯. সুরাট কংগ্রেসের দক্ষযজ্ঞের পর এই আবার চরমপন্থীরাও কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন।

২০. এম. আর. জয়াকর ; The Story of My Life ; ভারতীয় বিদ্যাভবন, বোম্বাই ; পৃঃ ১৫৬। মজুমদার কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ২৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

২১. জয়াকর ; The Story of My Life ; পৃঃ ১৬১। মজুমদার কর্তৃক তার গ্রন্থের ২৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

২২. সঈদ ; Jinnah, পৃঃ ১৫৯। উলপার্ট কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ৫২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

২৩. কেন্দ্রীয় আইন সভার বাজেট বিতর্ক। ১৯১৭-১৯১৮। উলপার্ট কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ৫৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

২৪. সঈদ, Jinnah ; পৃঃ ১৮১। উলপার্ট কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ৫৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১. ইসলামের প্রথা অনুযায়ী ধর্মগুরু এবং প্রথম দিকের ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের নিবাস আরবদেশের রাষ্ট্রপ্রধান একই ব্যক্তি এবং তাঁর উপাধি হল খলিফা। প্রথম খলিফা হজরৎ আবু বকর-এর (৬৩২-৬৩৪ খ্রীঃ) পর আরও কয়েকজন খলিফা আরবদেশের হলেও কালক্রমে খলিফার পদ তুরস্কের রাষ্ট্রপ্রধানের আয়ত্তাধীন হয়। মুসলীম ধর্মস্থানগুলিও তাঁর শাসনের অধীনে ছিল। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইংরেজের প্রশ্রয়ে আরবরা তুর্কীদের সঙ্গে তাঁদের পুরাতন বিবাদের নিষ্পত্তি করার সুযোগ পায় এবং তাঁরা খলিফাশাসিত তুরস্ক থেকে পৃথক হয়ে যান। এর পরিণামে আরব ও মেসোপোটামিয়ায় (ইরাকে) অবস্থিত মুসলীম ধর্মস্থানগুলি খলিফার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। বিশ্বের আরও অনেক দেশের মত ভারতের মুসলমানরাও এর জন্য ইংরেজের প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। ইংরেজদের অনেক অনুরোধ-উপরোধ করা সত্ত্বেও তুরস্কের সঙ্গে চূড়ান্ত শান্তিচুক্তি করার সময়ে খলিফার পূর্ব কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় খলিফার কর্তৃত্ব বা খিলাফৎ আবার প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলন ভারতবর্ষের মুসলমানরা আরম্ভ করেন।

২. চৌধুরী খলিকুজ্জমাঁ ; Pathway to Pakistan ; লংম্যানস গ্রীন ; লাহোর (১৯৬১) ; ৪৩ পৃষ্ঠা।

৩. সৈয়দ শরীফুদ্দীন পীরজাদা (সম্পাদিত) ; Quaid-e-Azam Correspondence ; মেট্রোপোলিটান বুক কোং ; দিল্লী (১৯৮২), ৮৩-৮৪ পৃষ্ঠা ;

৪. মহম্মদ ইউসুফ খাঁ ; The Glory of Quaid-e-Azam ; লাহোর (১৯৭৬) ; পৃঃ ৩০-৩১। উলপার্ট কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ৬১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৫. পীরজাদা (সম্পাদিত) ; সমগ্রন্থ ; ৬৫ পৃষ্ঠা।

৬. সীতারামাইয়া ; সমগ্রন্থ ; প্রথম খণ্ড ; ২৭৫ পৃষ্ঠা।

১. ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয়তাবাদী শক্তিকে খর্ব করার জন্য কী ভাবে মুসলিম লীগের জন্ম হয়, তা আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখেছি। এক বিচিত্র আকস্মিকতা হল এই যে হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠাও প্রায় একই সময়ে। তবে বিশের তো বটেই এমন কি ত্রিশের দশকের প্রথমার্ধেও কংগ্রেসের নেতারা হিন্দুধর্মাবলম্বী হলে হিন্দু মহাসভায় এবং মুসলমান হলে মুসলীম লীগের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকতেন তার নজির আছে। জিন্না, আলী ভ্রাতৃদ্বয়, হাকিম আজমল খাঁ, ডাঃ আন্সারী, ফজলুল হক, চৌধুরী খলিকুজ্জমাঁ প্রভৃতি এইভাবে যুগপৎ লীগ ও কংগ্রেসের উচ্চপদস্থ নেতা ছিলেন। অনুরূপভাবে লালা লাজপৎ রায়, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রমুখ অনেকে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা উভয় প্রতিষ্ঠানেরই প্রথম সারির নেতারূপে পরিগণিত হতেন। আবার মৌলানা আজাদ, রফি আহমদ কিদওয়াই, মোতিলাল, দেশবন্ধু ও গান্ধীর মত এর ব্যতিক্রমও ছিল।

২. অধ্যাপক শান মহম্মদ; The Indian Muslims, সপ্তম খণ্ড; মীনাক্ষী প্রকাশন, মীরাট।

৩. টেণ্ডুলকর; সমগ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা।

৪. খলিকুজ্জমাঁ; সমগ্রন্থ; ৫৭ পৃষ্ঠা।

৫. খলিদ-বিন-সঈদ; Pakistan, The Formative Phase; ৬৫-৬৬ পৃষ্ঠা। জে. জে. পাল কর্তৃক Jinnah and Creation of Pakistan; সিধুরাম পাবলিকেশনস, দিল্লী (১৯৮৩); গ্রন্থের ৪৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৬. সব দেশের সব যুগের আদর্শবাদীদের ভূমিকার এই দুঃখজনক দিক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়াও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

৭. বহুকাল যাবৎ বিচ্ছিন্নতাবাদের শিকার মুসলমান জনসাধারণকে জাতীয় আন্দোলনের মূল প্রবাহে সম্মিলিত করার উদ্দেশ্যে গান্ধী খিলাফতের সমর্থন এবং অসহযোগের নেতৃত্ব করার মত ঝুঁকি নিয়েছিলেন—এমন একটা অভিমতও গান্ধীর সপক্ষে আছে। কিন্তু গান্ধীর ভূমিকা আমাদের মূল আলোচ্য নয়।

৮. পীরজাদা; সমগ্রন্থ; ৮৭-৮৮ পৃষ্ঠা।

৯. জয়াকর; Story of My Life; প্রথম খণ্ড; ৪০৫ পৃষ্ঠা। মজুমদার কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ৩৮-৩৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১০. ডঃ গোপাল (সম্পাদিত); Jwaharlal Nehru—Selected Works; ওরিয়েন্ট লংম্যানস, নূতন দিল্লী; প্রথম খণ্ড, ১৬৭-৬৯ পৃষ্ঠা।

১. উলপার্ট ; সমগ্রন্থ ; ৭৫ পৃষ্ঠা।

২. সীতারামাইয়া, সমগ্রন্থ ; প্রথম খণ্ড ; ৩৮৯ পৃষ্ঠা।

৩. পীরজাদা ; সমগ্রন্থ ; ৩৬-৪৫ পৃষ্ঠা।

৪. রাজেন্দ্রপ্রসাদ ; সমগ্রন্থ ; ১২২-১২৩ পৃষ্ঠা।

৫. সমগ্রন্থ ; পৃঃ ১২৪-১২৬। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় শাসক-শক্তির ভূমিকা সম্বন্ধে খলিকুজ্জমাঁর গ্রন্থেরও ৭০-৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৬. খলিকুজ্জমাঁরও এই মত। তাঁর গ্রন্থের ৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৭. এম. তুফাইল আহমদ ; Roshan Mustaqubal ; পৃষ্ঠা ৪১০। রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ১২২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৮. সঈদ ; Jinnah ; পৃষ্ঠা ৩০৫। মজুমদার কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ১০৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৯. সৈয়দ শরীফুদ্দীন পীরজাদা, Foundations of Pakistan : All India Muslim League Documents (অতঃপর Foundations রূপে উল্লেখিত); করাচী (১৯৬৯) ; প্রথম খণ্ড ; পৃষ্ঠা ৫৭৬-৫৭৭। উলপার্ট কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ৮২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১০. সঈদ ; Jinnah ; পৃঃ ৩০৯-৩১০। মজুমদার কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ১০৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১১. টেণ্ডুলকর ; সমগ্রন্থ ; দ্বিতীয় খণ্ড ; ১৭৯ পৃষ্ঠা।

১২. পীরজাদা ; Foundations ; প্রথম খণ্ডের ৫৮১ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতির ভিত্তিতে। উলপার্ট ; সমগ্রন্থ ; পৃঃ ৮৩।

১৩. সঈদ ; সমগ্রন্থ ; ১১৭ পৃষ্ঠা।

১৪. টেণ্ডুলকর ; সমগ্রন্থ ; দ্বিতীয় খণ্ড ; ২১৫ পৃষ্ঠা।

১৫. সমগ্রন্থ ; ২২২ পৃষ্ঠা।

১৬. শরীফ অল মুজাহিদ ; সমগ্রন্থ ; ৫৪০ পৃষ্ঠা।

১৭. জিন্নার এই ভূমিকা গান্ধীরও পরোক্ষ স্বীকৃতি পায়। দ্রষ্টব্য—টেণ্ডুলকর ; সমগ্রন্থ ; দ্বিতীয় খণ্ড ; ২৫৭ পৃষ্ঠা।

১৮. এ তথ্য শরীফ অল মুজাহিদ প্রদত্ত (সমগ্রন্থ ; পৃঃ ৫৫০)। সীতারামাইয়া নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক এজাতীয় এক ফর্মুলা গৃহীত হবার কথা বললেও (সমগ্রন্থ ; প্রথম খণ্ড ; পৃঃ ৫২৮-৫২৯) এবং তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি

শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এর জন্য উন্মুখ ছিলেন স্বীকার করলেও এর সঙ্গে জিন্না বা লীগের সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করেন নি। টেণ্ডুলকর অবশ্য এ ব্যাপারে জিন্নার ভূমিকার কথা স্বীকার করেছেন (সমগ্রন্থ; দ্বিতীয় খণ্ড; ৩৮০-৩৮১ এবং ৪০২ পৃষ্ঠা)।

১৯. খলিকুজ্জমাঁ; সমগ্রন্থ; ৮৯ পৃঃ।

২০. স্যার মহম্মদ শফীর নেতৃত্বাধীন লীগ লাহোরে মিলিত হয়। সরকারী অংশ জিন্নার নেতৃত্বে কলকাতায় অধিবেশনের অনুষ্ঠান করে।

২১. খলিকুজ্জমাঁ; সমগ্রন্থ, ৯১ পৃষ্ঠা।

২২. উলপার্ট; সমগ্রন্থ, ৯০ পৃষ্ঠা।

॥ ৯ ॥

১. চাগলা; সমগ্রন্থ; ৯৪ পৃষ্ঠা।

২. Collected Works of Mahatma Gandhi (অতঃপর CWMG রূপে উল্লেখিত হবে), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, নূতন দিল্লী; খণ্ড ৩৬; ১৫ পৃষ্ঠা।

৩. ডঃ গোপাল (সম্পাদিত), সমগ্রন্থ, তৃতীয় খণ্ড; ৩৭ পৃষ্ঠা।

৪. সীতারামাইয়া; সমগ্রন্থ; প্রথম খণ্ড; ৫৪৬-৫৪৭ পৃষ্ঠা।

৫. রামগোপাল; সমগ্রন্থ; ২০১ পৃষ্ঠা।

৬. সমগ্রন্থ; ১৮৬ পৃষ্ঠা।

৭. সমগ্রন্থ; ২১২ পৃষ্ঠা।

৮. নেহেরু রিপোর্টের বিষয়মুখ ইতিহাস ও বিশ্লেষণের জন্য সমগ্রন্থের পৃঃ ১৯৮-২০৪ দ্রষ্টব্য। এ প্রসঙ্গে শরীফ অল মুজাহিদ; সমগ্রন্থ; পৃঃ ১৫৮-১৬৫ এবং খলিকুজ্জমাঁ; সমগ্রন্থ; ৯৩-৯৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৯. পীরজাদা; সমগ্রন্থ; XXII—XXIV পৃষ্ঠা।

১০. সমগ্রন্থ; XXI পৃষ্ঠা।

১১. রাজেন্দ্রপ্রসাদ; সমগ্রন্থ, ১৩০ পৃষ্ঠা।

১২. সঈদ; Jinnah; ৪৩৩-৪৩৪ পৃষ্ঠা।

১৩. সমগ্রন্থ; ৪৩৪-৪৩৫ পৃষ্ঠা।

১৪. হেক্টর বলিথো; সমগ্রন্থ; ৯৫ পৃষ্ঠা।

১৫. খলিকুজ্জমাঁ ; সমগ্রন্থ ; ৯৪ পৃষ্ঠা।

১৬. আত্মকথা (হিন্দি) ; সাহিত্য সংসার, পাটনা (১৯৪৭) ; ৩০৪ পৃষ্ঠা।

১৭. রামগোপাল , সমগ্রন্থ , ২০৪ পৃষ্ঠা।

১৮. এখানে উল্লেখযোগ্য যে খলিকুজ্জমাঁ তাঁর গ্রন্থে লীগের অধিবেশনে গোলযোগের কথা স্বীকার করলেও বলেছেন যে, "যাই হোক, এই সভার সময়ে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং তা হল এই যে কেউই পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা বজায় রাখার ব্যাপারে সুপারিশ করেন নি এবং উভয় গোষ্ঠীই যুক্ত নির্বাচন প্রথার পক্ষে ছিলেন।" (সমগ্রন্থ , পৃঃ ৯৯) জিন্নার নেতৃত্বাধীন তদানীন্তন লীগের এ এক কৃতিত্ব স্বীকার করতে হবে।

॥ ১০ ॥

১. রামগোপাল , সমগ্রন্থ ; ২১১ পৃষ্ঠা।

২. সমগ্রন্থ , ২০৬ পৃষ্ঠা।

৩. সমগ্রন্থ ; ২০৬-২০৯ পৃষ্ঠা।

৪. শরীফ অল মুজাহিদ ; সমগ্রন্থ , ৪৭৯-৪৮১ পৃষ্ঠা।

৫. সঈদ , Jinnah ; ৫০৩ পৃষ্ঠা।

৬. ডঃ গোপাল (সম্পাদিত) ; সমগ্রন্থ , অষ্টম খণ্ড ; পৃষ্ঠা ২৪ (পাদটীকা সংখ্যা ৬ দ্রষ্টব্য)।

৭. পাঠক দেখেছেন যে এ তথ্য ভুল। কংগ্রেসের সভায় নয়, জিন্না সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন।

৮. আগা খাঁ ; সমগ্রন্থ ; পৃঃ ২২১। উলপার্ট কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ১০৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৯. সমগ্রন্থ ; ২০ পৃষ্ঠা।

১০. Glimpses of Quaid-i-Azam, করাচী (১৯৬০) ; পৃঃ ৭৪-৭৫। শরীফ অল মুজাহিদ কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ১৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১১. রাজেন্দ্রপ্রসাদ ; সমগ্রন্থ , ১৩২ পৃষ্ঠা।

॥ ১১ ॥

১. রামগোপাল ; সমগ্রন্থ ; ২২০ পৃষ্ঠা।

২. খলিকুজ্জমাঁ ; সমগ্রন্থ ; ১০১ পৃষ্ঠা।

৩. এটা রামগোপাল এবং উলপার্টের দেওয়া তথ্য। কিন্তু খলিকুজ্জমাঁর বক্তব্য : "এই সভায় মুসলীম লীগ কর্তৃক চোদ্দ দফা······স্বীকৃত হয় এই শর্তে যে যখন কংগ্রেস আর সমস্ত দফা মেনে নেবে তখন লীগ যুক্ত নির্বাচন-ব্যবস্থাতে রাজী হতে পারে।" তাঁর গ্রন্থের ১০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৪. টেণ্ডুলকর ; সমগ্রন্থ ; দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৯১ পৃষ্ঠা।

৫. চাগলা, সমগ্রন্থ, ৯৭ পৃষ্ঠা।

৬. সমগ্রন্থ ; পৃঃ ১০৪। সংগ্রামে অনীহা এবং ব্রিটিশ ছত্রছায়া (ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন) থেকে বঞ্চিত হবার আশঙ্কা সম্ভবতঃ তাঁদের এজাতীয় মানসিকতা গঠনের পক্ষে উদ্বুদ্ধ করে। তবে খলিকুজ্জমাঁ বা ডাঃ আন্সারী তখনই কংগ্রেস ছাড়েন নি। আইন অমান্য আন্দোলনের প্রক্রিয়ায় কংগ্রেসের "ডিক্টেটার" মৌলানা আজাদ গ্রেপ্তার হবার পর ডাঃ আন্সারী এবং সেপ্টেম্বরে তিনিও গ্রেপ্তার হবার পর খলিকুজ্জমাঁ "ডিক্টেটার" নিযুক্ত হন। যদিও ইতিপূর্বে কংগ্রেসের নির্দেশে রফি আহমদ কিদওয়াই কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করলে সেই আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়ে খলিকুজ্জমাঁ কংগ্রেসের নির্দেশের অবহেলা করেছিলেন। সমগ্রন্থ ; ১০৭ পৃষ্ঠা।

৭. জামালউদ্দীন আহমদ স্থলেরী, My Leader ; প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৫২৯। জে. জে. পাল কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ৬৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৮. মজুমদার ; সমগ্রন্থ ; ১২৫ পৃষ্ঠা।

৯. উলপার্ট ; সমগ্রন্থ ; ১১৭ পৃষ্ঠা।

১০. সীতারামাইয়া ; সমগ্রন্থ ; প্রথম খণ্ড ; ৭১৭ পৃষ্ঠা।

১১. খলিকুজ্জমাঁ ; সমগ্রন্থ ; ১০৮-১০৯ পৃষ্ঠা।

১২. সমগ্রন্থ ; ২৩১-২৩২ পৃষ্ঠা।

॥ ১২ ॥

১. রাজেন্দ্রপ্রসাদ ; সমগ্রন্থ ; ১৩৪ পৃষ্ঠা।

২. সমগ্রন্থ ; ২২৭ পৃষ্ঠা।

৩. ডঃ রামমনোহর লোহিয়া ; Guilty Men of India's Partition ; রামমনোহর লোহিয়া সমতা বিদ্যালয় ন্যাস ; হায়দ্রাবাদ—১২ (১৯৭০) ; ৯ পৃষ্ঠা।

৪. My Public Life ; জর্জ অ্যালেন অ্যাণ্ড আনউইন, লণ্ডন (১৯৫৪) ; ৬৮ পৃষ্ঠা।

৫. সমগ্রন্থ , ২৩৩ পৃষ্ঠা।

৬. পীরজাদা (সম্পাদিত) , সমগ্রন্থ ; ২১ পৃষ্ঠা।

৭. উলপার্ট ; সমগ্রন্থ , ১২৬ পৃষ্ঠা।

৮. মহম্মদ করীম চাগলা ; সমগ্রন্থ ১০২-১০৩ পৃষ্ঠা। এম. এইচ. সঈদের Sound of Fury অনুসারে (১৭১ পৃষ্ঠা) "আমি প্রথমে ভারতীয় তারপর মুসলমান" মন্তব্য করার পর জিন্না ঐ বক্তৃতায় বলেন : "এর সঙ্গে সঙ্গে আমি একথাও বিশ্বাস করি যে মুসলমানদের স্বার্থ উপেক্ষা করে কোন ভারতবাসী কখনও তাঁর স্বদেশের সেবা করতে পারবেন না।......একথা আমি প্রকাশ্যে বলেছি। কোন দলবিশেষের প্রতি আমার নজর নেই। জনপ্রিয়তার প্রতি আমার কোন আকাঙ্ক্ষাও নেই। খোলাখুলি আমি আপনাদের বলছি যে হিন্দুরা মূর্খ, তাঁরা যে দৃষ্টিভঙ্গী আজ গ্রহণ করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে বলব যে তাঁরা একান্তভাবে মূর্খ। অধিকাংশ হিন্দুরই নিজেদের মস্তিষ্ক ও মনের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই—আপনারা একথা না জানলেও আমি একথা জানি। আমি আপনাদের বলতে পারি যে হিন্দুদের ভিতর সাহস ও বিশ্বাসেব সৃষ্টি না হলে (তাঁরা মুসলমানদের ভয়ে ভীত) এই ভারতবর্ষ কোনদিনই স্বরাজ পাবে না। ব্যাপারটা যৌথ বা পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থা অথবা পাঁচ-দশটা আসনের নয়। হিন্দুদের প্রয়োজনীয় সাহস নেই এবং হিন্দুরা মুসলমানদের সম্বন্ধে ভীত।"

৯. দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে জিন্নার ভূমিকা সম্বন্ধিত তথ্য শরীফ-অল-মুজাহিদের গ্রন্থের ৫৬৫-৬৭ পৃষ্ঠা থেকে গৃহীত।

১০. স্যার শফী কর্তৃক পৃথক নির্বাচন-প্রথার কট্টর সমর্থকের ভূমিকা ছেড়ে কিছুটা দেওয়া-নেওয়ার ভিত্তিতে একাধিক বিকল্প প্রস্তাব দেওয়ার পরোক্ষ সমর্থন অবশ্য মেলে (দ্রষ্টব্য রামগোপাল ; সমগ্রন্থ ; পৃঃ ২৩২-৩৩)। এছাড়া দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকের প্রাক্কালে ভারতবর্ষে সফরকালীন ৮ই আগস্ট ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদে সংযুক্ত প্রদেশ মুসলীম সম্মেলনে জিন্নার ভাষণের অংশবিশেষও এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়। তিনি বলেন :

"আমার মতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল হিন্দু-মুসলিম সমঝোতার সমস্যা। এ সম্বন্ধে আমি কেবল এইটুকুই বলতে পারি যে আমার আন্তরিক বিশ্বাস এই যে হিন্দুদের পাঞ্জাব ও বঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেবার-প্রস্তাবে সম্মত হওয়া

উচিত। আর তা যদি তাঁরা দেন তবে অত্যল্প সময়ের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়ে যেতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি।

"দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, পৃথক বনাম যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থার। সবাই প্রায় জানেন যে পাঞ্জাব ও বঙ্গে (মুসলমানদের) সংখ্যাগরিষ্ঠতা মেনে নিলে, আমি ব্যক্তিগত-ভাবে যৌথ নির্বাচন-ব্যবস্থার ভিত্তিতে বোঝাপড়ায় উপনীত হওয়া পছন্দ করব (করতালি)। তবে আমি একথাও জানি যে মুসলমানদের মধ্যে অনেকে— আমার মনে হয় অধিকাংশই পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার সমর্থক। আমার ভূমিকা হল এই যে আমি বরং পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার ভিত্তিতেও একটা বোঝাপড়া কাম্য মনে করব। করব এই আশা ও বিশ্বাস নিয়ে যে যখন আমরা নূতন সংবিধানকে রূপ দেব এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই যখন অবিশ্বাস, সন্দেহ ও পারস্পবিক ভীতির প্রভাবমুক্ত হবে এবং যখন তারা তাদের স্বাধীনতা পাবে, আমবা তখন কালোপযোগী মানসিকতার পরিচয় দিতে পারব ও সম্ভবতঃ আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণার তুলনায় অনেক তাডাতাড়ি পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার অবসান হবে।" (রামগোপাল, সমগ্রন্থ, ২৩৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত)।

১১. সমগ্রন্থ, ১১৩ পৃষ্ঠা।

১২. পীরজাদা (সম্পাদিত), সমগ্রন্থ, পৃঃ ২১-২৪

১৩. খলিকুজ্জমাঁ, সমগ্রন্থ, ১১৮ পৃষ্ঠা।

১৪. Mahatma Gandhi—The Last Phase (অতঃপর Last Phase রূপে উল্লেখ করা হবে) প্রথম খণ্ড, নবজীবন, আহমেদাবাদ (১৯৬৫); ৭৫ পষ্ঠা।

॥ ১৩ ॥

১. চাগলা, সমগ্রন্থ, ১০৩ পৃষ্ঠা।

২. উলপার্ট, সমগ্রন্থ, ১৩৫ ও ১৩৬ পৃষ্ঠা।

৩. গুলাম আলী আল্লানা, Quaid-i-Azam Jinnah : The Story of a Nation, লাহোর (১৯৬৭), ২৩৯ পৃষ্ঠা। অ্যালেন হেইস মিরিয়াম কর্তৃক Gandhi VS Jinnah : The Debate over the Partition of India; মিনার্ভা অ্যাসোসিয়েটস, কলিকাতা (১৯৮০) গ্রন্থের ৪০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৪. সৈয়দ আবদুল লতীফ, The Great Leader; লাহোর (১৯৬১), ১২৫ পৃষ্ঠা। অ্যালেন হেইস মিরিয়াম কর্তৃক সমগ্রন্থের ৪০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৫. চাগলা ; সমগ্রন্থ ; ১০৩-১০৪ পৃষ্ঠা।

৬. শরীফ-অল-মুজাহিদ, সমগ্রন্থ ; ৫৬৮ পৃষ্ঠা।

৭. সীতারামাইয়া, সমগ্রন্থ (প্রথম খণ্ড), ৯৬৪-৯৬৮ পৃষ্ঠা।

৮. সীতারামাইয়া, সমগ্রন্থ (প্রথম খণ্ড) ; ১০০০-১০০১ পৃষ্ঠা

৯. উলপার্ট ; সমগ্রন্থ ; ১৩৭-১৩৮ পৃষ্ঠা।

১০. উলপার্ট ; সমগ্রন্থ ; ১৩৯ পৃষ্ঠা।

১১. সমগ্রন্থ ; (প্রথম খণ্ড), ১০০৯ পৃষ্ঠা।

১২. আত্মকথা (হিন্দি), ৪২৫-২৭ পৃষ্ঠা।

১৩. Sound of Fury, ১৭৯ পৃষ্ঠা।

॥ ১৪ ॥

১. সঈদ ; Sound of Fury ; ১৮৩-৮৪ পৃষ্ঠা।

২. হেক্টর বলিথো ; সমগ্রন্থ ; ১১১ পৃষ্ঠা।

৩. সঈদ, Sound of Fury ; ১৮৫-৮৬ পৃষ্ঠা।

৪. রামগোপাল, সমগ্রন্থ, ২৪৪ পৃষ্ঠা।

৫. খলিকুজ্জমাঁ, সমগ্রন্থ, ৪১৭ পৃষ্ঠা।

৬. এই পর্যায়ে জিন্নার প্রবল সমালোচক জওহরলালও এমন কি একথা স্বীকার করেছিলেন। দ্রষ্টব্য ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর এবং ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দেব ২০শে ফেব্রুয়ারী জওহরলাল কর্তৃক যথাক্রমে নবাব মহম্মদ ইসমাইল খাঁ ও জিন্নাকে লিখিত পত্র ডঃ গোপাল (সম্পাদিত), সমগ্রন্থ ; অষ্টম খণ্ড ; ২০১ ও ২২৩ পৃষ্ঠা। এ প্রসঙ্গে তাঁর ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী প্রদত্ত সংবাদপত্রের বিবৃতিও উল্লেখযোগ্য ; সমগ্রন্থ ; ২০৯ পৃষ্ঠা।

৭. রামগোপাল ; সমগ্রন্থ ; ২৪২ পৃষ্ঠা।

৮. India Divided ; ১৪২ পৃষ্ঠা।

৯. সঈদ ; Sound of Fury ; ১৮৭-৮৮ পৃষ্ঠা।

১০. টেণ্ডুলকর ; সমগ্রন্থ ; চতুর্থ খণ্ড, ১০৮ পৃষ্ঠা।

১১. উলপার্ট ; সমগ্রন্থ ; ১৪০ পৃষ্ঠা।

১২. জে. জে. পাল ; সমগ্রন্থ ; ৭২ পৃষ্ঠা।

১৩. স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহরায় ; **Parliamentry Government in**

India ; থ্যাকার স্পিঙ্ক ; কলিকাতা (১৯৪৩) ; পৃঃ ৩৬৭। জে. জে. পাল কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১৪. উলপার্ট ; সমগ্রন্থ , ১৪৪-৪৫ পৃষ্ঠা।

১৫ ॥

১. খলিকুজ্জমাঁ ; সমগ্রন্থ , ১৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা।

২. ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস থেকে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরের মধ্যে ইকবাল জিন্নাকে ১৩টি পত্র লিখে মুসলমানদের পৃথক বাসভূমির যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন। জিন্নাও পত্রগুলির উত্তর দেন, যার নকল অবশ্য পাওয়া যায় না। পত্রগুলি পুস্তিকার আকারে প্রকাশের সময় জিন্না তার ভূমিকাতে লেখেন : "তাঁর (ইকবালের) বক্তব্য বহুলাংশে আমার অভিমতের অনুকূল ছিল এবং ভারতবর্ষের সাংবিধানিক সমস্যাসমূহের অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়নের পর তাঁব বক্তব্য আমাকে একই সিদ্ধান্তের অভিমুখে নিয়ে যায়। এই সিদ্ধান্ত কালক্রমে মুসলিম ভারতের সম্মিলিত ইচ্ছায় পরিণত হয় এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব—জনসাধারণের মধ্যে যা "পাকিস্তান প্রস্তাব" রূপে খ্যাত—রূপপরিগ্রহ করে।" ইকবালের চিঠিগুলির মধ্যে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুনের চিঠির নিম্নোদ্ধৃত অংশ বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য , "……পূর্বে আমি যেভাবে বলেছি মুসলিম প্রদেশগুলির এক পৃথক ফেডারেশনই হচ্ছে একমাত্র পন্থা যার দ্বারা আমরা ভারতবর্ষে শান্তি স্থাপন করতে পারি এবং অমুসলমানদের আধিপত্য থেকে মুসলমানদের রক্ষা করতে পারি। উত্তর-পশ্চিম ও বঙ্গের মুসলমানদের কেন ভারতবর্ষের এবং ভারতের বাইরের অন্যান্য জাতির মত পৃথক জাতি মনে করা যেতে পারে না যারা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারী ?" পীরজাদা (সম্পাদিত) ; সমগ্রন্থ ; ১৩৮-৪২ পৃষ্ঠা। পাকিস্তান সৃষ্টির ব্যাপারে ইকবাল ও জিন্নার পারস্পরিক ভূমিকা সম্বন্ধে সি. এম. নঈম (সঃ) **Iqbal Jinnah and Pakistan** ; জিন্না পাবলিশিং হাউস, দিল্লী (১৯৮২) এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

৩. আজাদ ; সমগ্রন্থ ; ১৬০ পৃষ্ঠা।

৪. সীতারামাইয়া ; সমগ্রন্থ (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৬৯) ৯ পৃষ্ঠা।

৫. ডঃ গোপাল (সঃ) ; অষ্টম খণ্ড ৫২১-২২ পৃষ্ঠা। রচনাটি প্রথমে ছদ্মনামে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের মডার্ন রিভিয়ু (কলকাতা) পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং সেকালে বহুল আলোচনার বিষয়বস্তু হয়।

৬. সমগ্রন্থ ; পঞ্চম খণ্ড ; ৪৭ পৃষ্ঠা।

৭. সঈদ ; Sound of Fury ; ৩৪৭ পৃষ্ঠা।

৮. উলপার্ট ; সমগ্রন্থ , ৬৮ পৃষ্ঠা।

৯. খলিকুজ্জমাঁ ; সমগ্রন্থ , ১৭২ পৃষ্ঠা। এই রকম অপর একটি উদাহরণ—ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের এক আইনকে *ultra vires* বলে চাগলার সঙ্গে তর্ক করা—চাগলা তাঁর গ্রন্থের ৫৩-৫৪ পৃষ্ঠায় দিয়েছেন।

১০. ডঃ গোপাল (সম্পাদিত) ; সমগ্রন্থ ; অষ্টম খণ্ড ; ৫৩৮ পৃষ্ঠা।

১১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য সমগ্রন্থ ১-৪২ এবং ১১৯-২৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১২. সমগ্রন্থ , ১৪৮ পৃষ্ঠা।

॥ ১৬ ॥

১. ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের তেসরা এপ্রিল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী মুসলিম লীগ এ সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত প্রস্তাব গ্রহণ করে: "……সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থা যে উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত হয়েছিল তার পরিপূর্তি করতে ব্যর্থ হয়েছে। এবং এ ব্যবস্থা সম্প্রদায় ও দেশের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক রূপে প্রতিপাদিত হয়েছে।…হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণ, যারা আজ সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের কারণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন তারা যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থার মাধ্যমে সমস্বার্থে একত্র না হলে প্রত্যুতঃ জনগণের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন অসম্ভব। পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থা বাংলার জনসাধারণের জন্য শক্তি অথবা সমৃদ্ধি—কোন কিছুরই ব্যবস্থা করতে পারে নি এবং সেই কারণে জনগণ আজ স্বার্থপর ব্যক্তিদের দ্বারা তাদের স্বার্থসাধনের জন্য শোষিত হচ্ছে।" (রামগোপাল ; সমগ্রন্থ : ২৪১ পৃষ্ঠা)। পরবর্তী বৎসরের ২৬শে নভেম্বরও বাংলার লীগ কর্তৃক অনুরূপ মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২. কিন্তু বঙ্গীয় কংগ্রেসের নেতা শরৎচন্দ্র বসু ফজলুল হকের পরামর্শদাতা ও ঘনিষ্ঠ সহকর্মী নলিনীরঞ্জন সরকারের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে বিরূপ হবার জন্য কোয়ালিশনে রাজী না হওয়ায় শ্রীযুক্ত সরকার লীগের সঙ্গে কৃষক প্রজা পার্টির কোয়ালিশনের ব্যবস্থা করে দিয়ে ফজলুল হক্‌কে লীগের শিবিরে যুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে লীগের প্রভাব বৃদ্ধি এবং বঙ্গবিভাজনের পথ প্রশস্ত করেন। (দ্রঃ ডঃ শীলা সেন , Muslim Politics in Bengal 1937-47 ; ইমপেক্স ইণ্ডিয়া, নূতন দিল্লী (১৯৭৬) ; পৃঃ ৯৩। এ প্রসঙ্গে কালীপদ বিশ্বাসের যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায় ; ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা (১৯৬৬) ; পৃঃ ৩২ ও ৩৬-৩৭ দ্রষ্টব্য।)

৩. খলিকুজ্জমাঁর মতে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর ও ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে কংগ্রেসের প্রাদেশিক নেতা গোবিন্দবল্লভ পন্থ প্রথমবার কিদওয়াই ও দ্বিতীয়বার মোহনলাল সাকসেনার সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে এসে মুসলিম ইউনিটি বোর্ডের সঙ্গে সহযোগিতায় প্রদেশের আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য অনুরোধ করেন। (সমগ্রন্থ: পৃঃ ১৪৩)। দীর্ঘকালের কংগ্রেস নেতা মুসলিম আসনে জেতার নির্বাচন-কৌশল হিসাবে মুসলিম ইউনিটি বোর্ডের অন্যতম স্রষ্টা ঐ একই কারণে লীগের নামে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে মনস্থ করায় সংযুক্ত প্রদেশে কংগ্রেস ও লীগ একটা পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। এছাড়া কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের বিশিষ্ট সদস্য মৌলানা আজাদ সহ আরও অনেকের বক্তব্যই এর সপক্ষে। পরোক্ষভাবে বললেও কংগ্রেসের সরকারী ইতিহাসকার ডাঃ সীতারামাইয়ার সাক্ষ্যও এর অনুকূলে। (দ্রঃ সমগ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬৮৯-৯০)।

৪. রামগোপাল, সমগ্রন্থ, ২৪৫-৪৭ পৃষ্ঠা।

৫. ডঃ সর্বপল্লী গোপাল, Jwaharlal Nehru—A Biography; প্রথম খণ্ড; অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, দিল্লী (১৯৮১), ২২৭ পৃষ্ঠা।

৬. রামগোপালের মতে হাফিজ সাহেবকে মন্ত্রীত্বের লোভ দেখিয়ে লীগ ছাড়তে প্ররোচিত করা হয় যদিও অবশ্য পরে তিনি বিধানসভার সদস্যপদে ইস্তফা দিয়ে নিজের জনপ্রিয়তার জন্য কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে পুনর্নির্বাচিত হন।

৭ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে নেহেরু কর্তৃক ২১শে জুলাই ১৯৩৭ খ্রীঃ লিখিত পত্র; ডঃ গোপাল সম্পাদিত, সমগ্রন্থ, অষ্টম খণ্ড; ১৬৯-৭০ পৃষ্ঠা।

৮. ডঃ সর্বপল্লী গোপালের মতে: "জিন্নার মনে এই আশঙ্কা জেগেছিল যে খলিকুজ্জমাঁ হয়ত কোয়ালিশনের থেকেও এগিয়ে গিয়ে লীগকে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত করতে রাজী হয়ে যাবেন। তাই তিনি স্বয়ং লখনউ-এ উপনীত হয়ে পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখার ভিত্তিতে আলোচনা চালিয়ে যাবার অধিকার দেন।" (Jwaharlal Nehru; প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২২৭)।

৯. সমগ্রন্থ; প্রথম খণ্ড, ২২৩-২২৮ পৃষ্ঠা।

১০. ৪৮১ পৃষ্ঠা।

১১. শ্রী গান্ধী আশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমানে তার মূল সংস্থার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিচিত্রনারায়ণ শর্মার ১৪ই জুলাই ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দের পত্র।

১২. রামগোপাল; সমগ্রন্থ; ২৪৮ পৃষ্ঠা।

১৩. The British Impact on India ; (১৯৫২) ; ৩৪০ পৃষ্ঠা। হক্টর বলিথো কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ১১৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

॥ ১৭ ॥

১. রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্তৃক সমগ্রন্থের ১৪৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

২. খলিকুজ্জমাঁ, সমগ্রন্থ ; ১৬৩-৬৪ পৃষ্ঠা।

৩. সমগ্রন্থ ; ১৬৮ পৃষ্ঠা।

৪. এ ব্যাপারে কংগ্রেসের হাতও কালিমামুক্ত ছিল না। এ প্রসঙ্গে কংগ্রেস প্রার্থী শেরওয়ানীকে লেখা জওহরলালের ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের তেসরা জুলাই-এর পত্র দ্রষ্টব্য। ডঃ গোপাল (সম্পাদিত), সমগ্রন্থ, অষ্টম খণ্ড ; ১৪৮-৪৯ পৃষ্ঠা।

৫. কংগ্রেসও যে এ দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল তা বলা যায় না। প্রাদেশিক লীগের সভাপতি নবাব মহম্মদ ইসমাইল খাঁকে লিখিত ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বরের চিঠিতে (ডঃ গোপাল সম্পাদিত) ; সমগ্রন্থ, অষ্টম খণ্ড, ২০১-২০২ পৃষ্ঠা। কংগ্রেস সমর্থক অহ্‌রর ও মৌলভীরা এরকম করছেন, একথা জওহরলাল স্বীকার করেছেন।

৬. বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে যে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এ গান গাওয়া হয়েছে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে একে মুসলিম-বিদ্বেষী বলা অযৌক্তিক হলেও গানটিকে যে পৌত্তলিকতায় অবিশ্বাসীদের গ্রহণ করা কঠিন একথা সত্য। এর জন্য সব দিক থেকে বিচার করে স্বাধীনতা আন্দোলনের বহু ঐতিহাসিক স্মৃতি ও আবেগ-বিজড়িত এই গানটির মাত্র প্রথম দুই স্তবককে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সঙ্গত কারণেই তার ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর থেকে ১লা নভেম্বরের সভায় কংগ্রেসের সভা-সমিতিতে গাইবার স্বীকৃতি দেয়। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে স্বাধীনতার পর সামরিক বাহিনীর ব্যাণ্ডে বাজানোর অনুপযুক্ত এই অজুহাতে প্রধানতঃ জওহরলাল এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের উদ্যোগে বন্দেমাতরম্ গানকে জাতীয় সঙ্গীত রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি।

৭. দুর্ভাগ্যক্রমে তাবৎ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পক্ষে পীড়াদায়ক সরকারী অনুষ্ঠানে এইসব প্রথা ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা সত্ত্বেও এদেশ থেকে অদ্যাবধি সম্পূর্ণরূপে লোপ করা সম্ভব হয় নি।

৮. উলপার্ট ; সমগ্রন্থ ; ১৪১ পৃষ্ঠা।

৯. CWMG ; ৬৫ খণ্ড ; ২৩১ পৃষ্ঠা।

১০. আজাদ ; সমগ্রন্থ ; ১৬১-৬২ পৃষ্ঠা।

১১. ডঃ গোপাল (সম্পাদিত) ; সমগ্রন্থ ; অষ্টম খণ্ড ; ১৮২ পৃষ্ঠা।

১২. CWMG ; ৬৬ খণ্ড ; ২১২ পৃষ্ঠা।

১৩. নিজের কৃষক প্রজা দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বঙ্গীয় বিধান সভায় ও তার বাইরে কংগ্রেস নেতাদের দ্বারা হক্ সাহেবের বিরুদ্ধে ক্রমাগত বিরূপ প্রচারের জন্ত নিজ মন্ত্রীমণ্ডলীর অস্তিত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্বে তাঁকে ইতিমধ্যে সম্পূর্ণভাবে লীগের শরণাগত হতে হয়েছে। লীগের লখনউ-এর প্রকাশ্ব অধিবেশনে প্রতিনিধিদের "আল্লাহ্ আকবর" ধ্বনির মধ্যে জিন্নার সঙ্গে আলিঙ্গন করে হক্‌সাহেব লীগে যোগদান করার কথা ঘোষণা করেন। তাঁর লীগে যোগদান ঐ প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব ভারতে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদকে পুষ্ট করে। (দ্রঃ ডঃ শীলা সেন , সমগ্রন্থ , ১১৫-২২ পৃষ্ঠা)।

১৪. মূলতঃ অসাম্প্রদায়িক কিন্তু উচ্ছ্বাস ও আবেগপ্রবণ হক্‌সাহেব প্রকাশ্ব সম্মেলনে ভাষণপ্রসঙ্গে ১৭ই অক্টোবর বলেন, "হিন্দু কংগ্রেসের মন্ত্রীরা যদি নিজেদের প্রদেশে সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালিয়ে যাবার নীতি বজায় রাখেন তাহলে আমি এই মঞ্চ থেকে ঘোষণা করতে চাই যে যদি তাতে আমার প্রাণও চলে যায় তবু আমি বঙ্গে তার প্রতিশোধ নেব।" খলিকুজ্জমাঁর জবানবন্দী অনুসারে (সমগ্রন্থ , ১৭১ পৃষ্ঠা) ঐ বক্তৃতায় হক্‌সাহেব "এত দূর পর্যন্ত যান যে, বলেন যে উত্তর প্রদেশে একজনের প্রাণ যাবার শোধ তুলতে বঙ্গে তিনি দুইজনের প্রাণ নেবেন।" আবেগের তাড়নায় এজাতীয় বেফাঁস উক্তি করে হক্‌সাহেব একাধিক বার নিজের রাজনৈতিক জীবনে সমস্যা সৃষ্টি করেছিলেন।

১৫. জি. আল্লানা (সম্পাদিত) ; Pakistan Movement ; ১৪৩ পৃষ্ঠা। অ্যালেন হেইস মিরিয়াম কর্তৃক সমগ্রন্থের ৫৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১৬. উলপার্ট ; সমগ্রন্থ ; ১৫৩ পৃষ্ঠা।

১৭. রামগোপাল ; সমগ্রন্থ ; ২৫১ পৃষ্ঠা।

॥ ১৮ ॥

১. ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মে তারিখের চিঠিতে গান্ধী জিন্নার মধ্যস্থতা করার যে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন লখনউ বক্তৃতায় জিন্না তার প্রকাশ্ব সমালোচনা করেন। এর পূর্বে অবশ্ব জুলাই মাসে এক প্রকাশ্ব বিবৃতিসহ গান্ধীর ঐ চিঠিটি তিনি সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন। ঐ বিবৃতিতেও কিছুটা বোঝাপড়ার মনোভাব

প্রতিফলিত হয়েছিল। তিনি বলেন, "মুসলমানদের এবং জনসাধারণকে আমি আশ্বাস দিতে চাই যে অতীতে যা-ই ঘটে থাকুক না কেন, আমি আদৌ তার দ্বারা প্রভাবিত নই এবং হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে একটা সম্মানজনক বোঝাপড়াকে আমার মত আর কেউ স্বাগত জানাবে না। আমার মত অপর কেউ এ ব্যাপারে সহায়তা করার জন্য এত উন্মুখ হবেন না। আমার আন্তরিকতার নিদর্শন স্বরূপ আমি মিস্টার গান্ধীকে সূচনা পাঠিয়েছিলাম······।" (সঈদ ; Jinnah , ৫৬২ পৃষ্ঠা)।

২. CWMG ; ৬৬তম খণ্ড ; ২৫৭ পৃষ্ঠা।

৩. পীরজাদা (সম্পাদিত) ; সমগ্রন্থ ; ৮৯ পৃষ্ঠা।

৪. CWMG , ৬৬তম খণ্ড ; ৩৫০ পৃষ্ঠা।

৫. পীরজাদা (সম্পাদিত), সমগ্রন্থ , ৯১ পৃষ্ঠা।

৬. সমগ্রন্থ , ৯৩ পৃষ্ঠা।

৭. জেটল্যাণ্ড , Essayez (লণ্ডন, ১৯৫৯). ২৪৭ পৃষ্ঠা। উলপার্ট কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ১৬২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৮. Templewood Papers , চতুর্থ খণ্ড। ডঃ গোপাল কর্তৃক Jwaharlal Nehru , প্রথম খণ্ডের ২২৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৯. সঈদ ; Sound of Fury , ২২০ পৃষ্ঠা।

১০. সঈদ , Jinnah ; ৬২৪ পৃষ্ঠা।

১১. রামগোপাল , সমগ্রন্থ , ২৬৫ পৃষ্ঠা।

১২. বিহারের তদানীন্তন মন্ত্রী এবং পরবর্তীকালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ডঃ সৈয়দ মাহমুদ মন্ত্রীসভার পদত্যাগের পর ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর জওহরলালকে লিখিত এক পত্রে অভিযোগ করেন যে বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল "উপযুক্ত ভাবে ও কুশলতা সহকারে শাসন করতে ব্যর্থ হয়েছে" এবং ঐ মন্ত্রীমণ্ডল ছিল "প্রাদেশিকতা, জাতিগত (caste) পক্ষপাত ও সনাতনী মানসিকতায় ওতপ্রোত।" (দ্রষ্টব্য : পাদটীকা সংখ্যা ২, পৃঃ ৩৯৭। ডঃ গোপাল (সম্পাদিত) ; সমগ্রন্থ ; দশম খণ্ড)। এজাতীয় মানসিকতার অপর একটি নিদর্শন খুব সম্ভব উৎসাহ ও শ্রদ্ধার আতিশয্যে পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্ল কর্তৃক সেণ্ট্রাল প্রভিন্সের প্রধান মন্ত্রীপদে ডাঃ খারের স্থলাভিষিক্ত হবার কিছুদিন পরই (৭।৯।১৯৩৮) এই মর্মে সরকারী আদেশ জারি করা যে সরকারী নথিপত্রে গান্ধীজীর উল্লেখ করতে হলে "মহাত্মা" অভিধা বাধ্যতামূলক। (দ্রষ্টব্যঃ সি. বি. দালাল ; **Gandhi 1915—1948 : A Detailed Chronology** ; নূতন দিল্লী (১৯৭১) ; পৃঃ ১২৪ ;

পাদটীকা ৬)। কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে লীগের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মুসলমানদের অভিযোগের বিশদ তথ্যাবলী সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য: কে. কে. আজিজ (সম্পাদিত) Muslims Under Congress Rule—1937-39; দুই খণ্ড; রিনায়েসান্স পাবলিশিং হাউস, দিল্লী (১৯৮৬)।

১৩. রামগোপাল; সমগ্রন্থ; ২৬৬ পৃষ্ঠা।

১৪. উলপার্ট; সমগ্রন্থ; ১৭৩ পৃষ্ঠা।

১৫. ডঃ গোপাল; Jwaharlal Nehru; প্রথম খণ্ড, ২৩৯ পৃষ্ঠা।

১৬. রামগোপাল; সমগ্রন্থ, ২৬৪ পৃষ্ঠা।

১৭. সমগ্রন্থ; ২৬৫ পৃষ্ঠা।

১৮. সমগ্রন্থ; ১৭৯ পৃষ্ঠা।

১৯. রাজনীতি-ব্যবসায়ীদের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—মনে এক, কথায় অন্য স্বভাবের অনেক উদাহরণ জিন্নার জীবন থেকে দেওয়া যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে হেক্টর বলিথো কর্তৃক উল্লিখিত জনৈকা শিক্ষিতা মুসলিম গৃহবধূর সাক্ষ্য উল্লেখ করাই যথেষ্ট। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে জিন্না তাঁর ভগ্নী ফতিমা সহ ২৫ দিন কোয়েটাতে এক ভদ্রলোকের অতিথি হয়ে বাস করে বেলুচিস্তানের উপজাতীয় নেতাদের লীগের ছত্রছায়াতলে নিয়ে আসার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। সাধারণতঃ পর্দাবিহীন ফতিমা প্রায় সর্বত্র জিন্নার অনুগামিনী হতেন। কিন্তু উপজাতীয়রা পর্দাপ্রথায় গভীর ভাবে বিশ্বাসী এবং একে ঐস্লামিক জীবনচর্যার অপরিহার্য অঙ্গ মনে করতেন। গৃহকর্তা জিন্নাকে পরামর্শ দিচ্ছিলেন যে উপজাতীয়দের প্রস্তাবিত এক জনসভায় ফতিমার জিন্নাব সঙ্গে যাওয়া সমীচীন নয়। তাঁর আধুনিকা স্ত্রী স্বামীর পরামর্শের প্রতিবাদ করে বললেন যে ফতিমার অবশ্যই যাওয়া উচিত এবং এইভাবে এ কুসংস্কার উচ্ছেদের পথে এক ধাপ এগোনো যাবে। জিন্না সবিশেষ ক্রুদ্ধ হয়ে মহিলাকে বললেন, "'এদের মধ্যে চার বছরের পরিশ্রমকে ব্যর্থ করে দেবার চেষ্টা আপনি করছেন।' তাঁর বক্তব্যের তাৎপর্য অবশ্য ছিল উপজাতীয়দের মধ্যে মুসলিম লীগের প্রতি সহানুভূতির ভাব গড়ে তোলার জন্য তাঁর চার বছরের প্রয়াস।" (সমগ্রন্থ; ১২৩ পৃষ্ঠা)।

২০. পীরজাদা (সম্পাদিত); সমগ্রন্থ; ১৪২ পৃষ্ঠা।

॥ ১৯ ॥

১. ডঃ গোপাল (সম্পাদিত); সমগ্রন্থ; নবম খণ্ড; ৩৫৫-৩৫৬ পৃষ্ঠা।

২. হেইসকে লেখা লিনলিথগোর ১৭. ৪. ১৯৩৯-এর চিঠি। ডঃ গোপাল; Jwaharlal Nehru; প্রথম খণ্ড; ২৪০ পৃষ্ঠা।

৩. লিনলিথগো কর্তৃক জেটল্যাণ্ডকে লেখা ৫. ৯. ১৯৩৯-এর চিঠি। ডঃ গোপাল কর্তৃক নেহেরু জীবনীর প্রথম খণ্ডের ২৫৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৪. জিন্নার সঙ্গে আলোচনার বিবরণ লিনলিথগো কর্তৃক জেটল্যাণ্ডকে ৯. ৯. ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রেরিত এবং জিন্নার সঙ্গে আলোচনার বিবরণ ব্রাবোর্ন কর্তৃক জেটল্যাণ্ডকে ১৯. ৮. ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রেরিত। ডঃ গোপাল কর্তৃক তাঁর নেহেরু জীবনীর প্রথম খণ্ডের ২৪০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। উলপার্ট; সমগ্রন্থ; পৃঃ ১৭০ দ্রঃ।

৫. উলপার্ট; সমগ্রন্থ; ১৭০ পৃষ্ঠা।

৬. শরীফ অল মুজাহিদ; সমগ্রন্থ; ৫৮৭ পৃষ্ঠা।

৭. গ্লেনডেভন, Linlithgo; পৃ ১৩৮। উলপার্ট কর্তৃক সমগ্রন্থের ১৭১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। জিন্নার ৪. ৯. ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের সাক্ষাৎকারের লিনলিথগো কর্তৃক প্রস্তুত বিবরণ। ডঃ গোপাল কর্তৃক তাঁর নেহেরু জীবনীর প্রথম খণ্ডের ২৫৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৮. সীতারামাইয়া; সমগ্রন্থ; দ্বিতীয় খণ্ড; ১৩৯ পৃষ্ঠা।

৯. সমগ্রন্থ; ১২৯ পৃষ্ঠা।

১০. খলিকুজ্জমা; সমগ্রন্থ; ২১৯-২২০ পৃষ্ঠা।

১১. জেটল্যাণ্ডের কাছে লিনলিথগোর ১৮. ৯. ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের চিঠি।

১২. সীতারামাইয়া; সমগ্রন্থ (দ্বিতীয় খণ্ড), ১৭৫ পৃষ্ঠা।

১৩. ভি. পি. মেনন তাঁর The Transfer of Power in India (অতঃপর Transfer of Power রূপে উল্লেখিত); ওরিয়েন্ট লংম্যানস, দিল্লী (১৯৫৭) গ্রন্থের ৭২ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে কংগ্রেসের সঙ্গে অন্তর্বর্তী সমাধানের জন্য এসময়ে (নভেম্বর ১৯০৯) জিন্না যে পঞ্চসূত্রী প্রস্তাব দেন তার প্রথম দফায় প্রদেশগুলিতেও লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার প্রস্তাব করা হয়েছিল।

১৪. এই পর্যায়ের জিন্না-নেহেরু আলোচনার জন্য ডঃ গোপাল (সম্পাদিত); সমগ্রন্থ; দশম খণ্ড; পৃ ৩৫৫-৩৯১ দ্রষ্টব্য।

১৫. শীলা সেন; সমগ্রন্থ; পৃ ১২৭। এর কয়েক মাস পরই অবশ্য সিদ্দিকী ক্ষমাপ্রার্থনা করে আবার লীগে ফিরে আসেন।

১৬. শরীফ অল মুজাহিদ; সমগ্রন্থ; ৫৯০ পৃষ্ঠা।

১৭. সমগ্রন্থ; ৫৯১ পৃষ্ঠা।

১৮. ঐ রচনায় জিন্না এমন এক সংবিধানেরও দাবি জানান যাতে, "ভারতবর্ষে উভয় জাতি (Nations) তাঁদের একই মাতৃভূমির শাসনকার্যের অংশীদার হতে পারেন।" লাহোর প্রস্তাব পেশ করার মাত্র দুই মাস পূর্বে "উভয় জাতির" জন্য একই সংবিধান যার দ্বারা তাঁরা "একই মাতৃভূমির" শাসনকার্যের অংশীদার হতে পারেন—একথা বলা কৌতূহলোদ্দীপক। মুসলমান সংখ্যাগুরু প্রদেশ (যাদের সমর্থন ছাড়া লীগের চলবে না) ও সংখ্যালঘু প্রদেশসমূহের (যাদের হাতে প্রত্যুতঃ লীগের নেতৃত্ব ছিল) যে স্বার্থ সংঘাতের জন্য মুসলিম লীগ প্রথমোক্ত ধরণের প্রদেশগুলির সমর্থন পেতে পূর্ণ সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং দ্বিতীয়োক্ত ধরণের প্রদেশের মুসলমানদের স্বার্থে রক্ষাকবচের দাবির মধ্যে দোদুল্যমান ছিল এবং জিন্না নিজের রাজনৈতিক অভীপ্সা—কেন্দ্রে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রবক্তা হবার জন্য পূর্বোক্ত দুই পরস্পরবিরোধী ভূমিকার মধ্যে আপোসের পন্থা খুঁজতেন তার চিত্তাকর্ষক বিবরণের জন্য ডঃ আয়েষা জালালের The Sole Spokesman : Jinnah, the Muslim League and the Demand of Pakistan ; কেম্ব্রিজ ইউনিভারসিটি প্রেস (১৯৮৫) পৃঃ ৩৫-৬০ দ্রষ্টব্য। তাঁর নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যও উল্লেখনীয়ঃ "লাহোর প্রস্তাবকে তাই একটি দর-কষাকষির বিষয় হিসাবে দেখতে হবে যা (আপাতদৃষ্টে) মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহের দ্বারা গৃহীত হবার উপযুক্ত ছিল ও কংগ্রেসের কাছে ছিল গ্রহণের একান্ত অযোগ্য এবং শেষ অবধি ব্রিটিশের কাছেও অগ্রহণীয়। এই কারণে লীগের এই বাহ্য দাবি যে মানা হবে না তার পূর্ণ নিশ্চয়তা ছিল এর মধ্যে এবং জিন্নাও প্রকৃত: সত্য সত্য এটা চাইতেন না।" (সমগ্রন্থ, পৃ: ৫৭)।

১৯. পীরজাদা (সম্পাদিত), সমগ্রন্থ, ৯৮ পৃষ্ঠা।

২০. শরীফ অল মুজাহিদ : সমগ্রন্থ ; ৫৯২ পৃষ্ঠা।

২১. খলিকুজ্জমা, সমগ্রন্থ ; ২৩৪ পৃষ্ঠা।

২২. গ্লেনডেভন, Linlithgo, পৃঃ ১৯১। উলপার্ট কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ১৭৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

২৩. Times of India-এর উপস্থিত সংবাদদাতার বিবরণী। পীরজাদা, Foundations of Pakistan. দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩২৭। উলপার্ট কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ১৮০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

২৪. আসন্ন সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের সক্রিয় কার্যকলাপ থেকে বিদায় নেবার পাঁচ বছর পর গান্ধী নিজের আগ্রহে রামগড়ে কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের সম্বোধন করেন। এই প্রসঙ্গে ১৯শে মার্চ তিনি বলেন : হিন্দু মুসলমান পার্শী

খ্রীষ্টান নির্বিশেষে আমরা সবাই আমাদের স্রষ্টার সম্মুখে সমান, আমরা সকলে একই ঈশ্বরের উপাসনাকারী। তবে কেন আমরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ করি? আমরা পরস্পরের ভাই—এমন কি কায়েদ-এ-আজমও আমার ভাই। তাঁর সম্বন্ধে আমি যা বলেছি তা আমার মনের কথা। তাঁর সম্বন্ধে কখনও কোন তাচ্ছিল্যজনক উক্তি আমার মুখফস্কেও নির্গত হয় নি। আর আমি একথাও বলতে চাই যে আমি তাঁকে স্বপক্ষে আনতে চাই। জনৈক বক্তা বলেছেন যে আমি তাঁকে স্বমতে না আনা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে বিবাদ করব না এবং তিনি ঠিকই বলেছেন। এমন একটা সময় ছিল যখন আমি সব মুসলমানেরই আস্থাভাজন ছিলাম। আজ আমি সেই আস্থা হারিয়েছি এবং অধিকাংশ উর্দু সংবাদপত্রে আমার প্রতি কটূক্তি করা হয়। তবে এতে আমার খেদ নেই। এতে আমার এই বিশ্বাসই পুষ্ট হয় যে মুসলমানদের সঙ্গে বোঝাপড়া ব্যতিরেকে স্বরাজ সম্ভবপর নয়।" টেণ্ডুলকর, সমগ্রন্থ; পঞ্চম খণ্ড, ৩২৩ পৃষ্ঠা।

২৫. শরীফ অল মুজাহিদ, সমগ্রন্থ, ৪৯১-৪৯৫ পৃষ্ঠা।

২৬. এই রাষ্ট্রসমূহ (States) শব্দের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জন্মের যৌক্তিকতা দানা বাঁধে। পরবৎসর মাদ্রাজ সম্মেলন থেকে অঘোষিত ভাবে এর বদলে লাহোর প্রস্তাবে রাষ্ট্র (State) শব্দটি ব্যবহৃত হওয়া আরম্ভ করলেও ধুরন্ধর রাজনীতিবিশারদ জিন্না এমন কি সমালোচকদের সমালোচনার প্রত্যুত্তরেও স্বয়ং কখনও পাকিস্তানের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন নি। অন্তরঙ্গ মহলে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে পরিহাসের ছলে তিনি নাকি বলতেন যে বুদ্ধিমান হিন্দুরা —হয়ত বা রাজাজীর মত কুশাগ্র বুদ্ধিসম্পন্ন কোন নেতাই সে কাজ করে দেবেন। পরবর্তীকালে আমবা দেখব যে তাঁর ফর্মুলার দ্বারা প্রত্যুতঃ রাজাজী এ কাজ করেন। জিন্না স্বয়ং সর্বপ্রথম ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর গান্ধীকে লিখিত তাঁর পত্রে রাষ্ট্রসমূহ শব্দটি সম্বন্ধে মন্তব্য করেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল দিল্লীতে লীগ পরিষদ সদস্যদের সভায় আনুষ্ঠানিক ভাবে এর বদলে "রাষ্ট্র" শব্দটি স্বীকৃত হয়।

২৭. শরীফ অল মুজাহিদ; সমগ্রন্থ; ৪৯৫-৪৯৬ পৃষ্ঠা।

॥ ২০ ॥

১. এ সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্যের জন্য ডঃ তারাচাঁদের Influence of Islam on Indian Culture; ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ (১৯৬৩) ও পণ্ডিত সুন্দরলালের ভারতমে আংগরেজী রাজ (হিন্দি); প্রথম খণ্ড; প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার;

গ্রন্থের বিশেষতঃ পৃঃ ৪০-৯৮ দ্রষ্টব্য। অধ্যাপক মহম্মদ মূজীবের The Indian Muslims দেশজ প্রভাবের জন্য ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে কেবল সংস্কৃতি-বৈচিত্র্যেরই আলেখ্য নয়, ব্যক্তিগত আইন ও মূল ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও বিভিন্নতার দলিল। মুসলমান-সমাজে এবং বিশেষ করে উর্দু ভাষার ক্ষেত্রে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের বিবরণের জন্য পাকিস্তানী গবেষক ইকবাল খাঁ-এর Rise of Urdu and Partition প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (Times of India, দিল্লী) ২, ৩ ও ৫ই অক্টোবর, ১৯৮৭। ডঃ জগদীশনারায়ণ সরকারের Thoughts on Trends of Cultural Contacts in Medieval India; কলকাতা (১৯৮৪) ছাড়াও ক্ষিতি-মোহন সেন, কাজী আবদুল ওদুদের রচনাবলী এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়। সুরজিৎ দাশগুপ্তের "ইসলাম ও ভারত" (রুচিরা প্রকাশন, কলিকাতা ৭২) সর্বভারতীয় এবং ডঃ জগদীশনারায়ণ সরকারের "বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক (মধ্যযুগ)" (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৮৮) বঙ্গদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কৃতি সমন্বয়ের সম্বন্ধে তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা।

২. পরবর্তী তিনটি অনুচ্ছেদ এবং এই অধ্যায়ের আরও কিছু কিছু তথ্য ভিনসেণ্ট স্মিথের The Oxford History of India (১৯৬১)-এর পৃঃ ৭৯৯-৮০৭ অবলম্বনে রচিত।

৩. রামগোপাল; সমগ্রন্থ, পৃঃ ২০-২১।

৪. এই প্রবণতা প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের ইসলাম সম্বন্ধে এক প্রামাণ্য গবেষক অধ্যাপক আজিজ আহমদের (Studies in Islamic Culture in the Indian Environment, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৪) অভিমত প্রণিধানযোগ্য। ইকবাল মাসুদের মতে (Overcoming the Trauma of Indian History; দৈনিক Indian Express, দিল্লী, দোসরা নভেম্বর, ১৯৮৬) সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য নিম্নরূপ: "ভারতবর্ষে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ তার সার্বত্রিক দুর্ধর্ষ টিঁকে থাকার অধ্যবসায়জনিত টানাপোড়েনের অবস্থার মতই এক আঞ্চলিক প্রতিক্রিয়াও বটে। ভারতবর্ষের প্রবল অমুসলমান পরিবেশে আত্মনিমজ্জনের আশঙ্কায় তাই ইসলামী সংস্কৃতিকে সময়ে সময়ে নানা রকম আপোস রফা করতে হয়েছে। মঙ্গোল আক্রমণের আশঙ্কার পরিবেশে মুসলমানেরা নিজেদের অসুরক্ষিত বিবেচনা করতেন। ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তৈমুরের আক্রমণের সময়ে মুসলিম অভিজাত-মানস একদিকে মঙ্গোলদের হাতে উৎসাদন এবং অপরদিকে স্থানীয় হিন্দুদের বিরোধিতার প্রবল শক্তির ভীতিপীড়িত ছিল। এই ঘটনা প্রশাসন ও ধর্মাচরণের

ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতা এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে পৃথক থাকার প্রবণতাকে প্রোৎসাহিত করে।"

৫. জে. জে. পাল ; Jinnah and the Creation of Pakistan ; পৃঃ ২।

৬. এ সম্বন্ধে ডবলু. ডবলু. হাণ্টারের Indian Musalmans-এর পৃঃ ২০-২৪ দ্রষ্টব্য। হাণ্টারের গ্রন্থ ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং কথিত আছে যে তিনি মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে এটি রচনা করেন। বহুদিন যাবৎ হাণ্টারকে ভারতীয় মুসলিম বিশেষজ্ঞ মনে করা হত এবং তিনি যেভাবে মুসলিম সমস্যা উপস্থাপিত করেন তা বহু ব্যক্তির চিন্তা-ভাবনাকে প্রভাবিত করে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে কোন কোন পণ্ডিত তাঁর বক্তব্যকে সমালোচনা করা আরম্ভ করেছেন। "মুসলমান সম্প্রদায় সম্বন্ধে (তাঁর) একতরফা সামান্য অভিমত (যা তথ্যভিত্তিক নয়) অনেকের—বিশেষ করে মুসলমান নেতা ও লেখকদের কাছে অভ্রান্ত সত্য বলে মনে হত। তাঁরা মুসলমানদের অবনতির কারণ হিসাবে ব্রিটিশ ও হিন্দুদের দায়ী করার ব্যাপারে অত্যুৎসাহী ছিলেন।" (অধ্যাপক এ. এফ. সালাউদ্দিন আহমদ, দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রেস, ঢাকা)

৭. মহম্মদ মুজীব, The Indian Muslims, ৫২৮ পৃষ্ঠা।

৮. জে. জে. পাল, সমগ্রন্থ, ৪ পৃষ্ঠা।

৯. খলিকুজ্জমাঁ কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ২৬৯-৭০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। খলিকুজ্জমাঁর মতে তাঁর সঙ্গে অধ্যাপক কুপল্যাণ্ডের পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী আলোচনাপ্রসঙ্গে স্যার সৈয়দের এই বক্তৃতার উল্লেখ করায় তিনি বহুলাংশে তাঁর প্রস্তাবে ভারত বিভাজনের পরিকল্পনার সন্নিবেশ করতে উদ্বুদ্ধ হন।

১০. পেণ্ডারেল মুন, Divide and Quit, লণ্ডন (১৯৬৪), ১১-১২ পৃষ্ঠা।

১১. এ. এইচ. আলবিরোনি ; Makers of Pakistan and Modern Muslim India, (লাহোর, মহম্মদ আশরফ, ১৯৫০) ; ১০৯ পৃষ্ঠা। জে. জে. পাল কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের পৃঃ ৫-এ উদ্ধৃত।

১২. এম. নূরউল ইসলাম কর্তৃক তাঁর Bengali Muslim Public Opinion as Reflected in Bengali Press, 1901-1930 (ঢাকা ১৯৭৩ খ্রীঃ) গ্রন্থের ৬৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। জে. জে. পাল কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১৩. ঐস্লামিক শিক্ষা-সংস্কৃতির ফসল দেওবন্দ এবং উলেমা গোষ্ঠীর বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রবক্তা স্যার সৈয়দ ও তাঁর অনুবর্তীদের তুলনায়

হিন্দুদের প্রতি অধিকতর উদার ও ইংরেজবিরোধী জাতীয়তাবাদী হবার (খিলাফতের নেতৃত্ব নেন প্রধানতঃ এই উলেমা গোষ্ঠী এবং তাঁরা এর জন্য এমন কি অমুসলমান গান্ধীর পথপ্রদর্শনও স্বীকার করেন। পক্ষান্তরে জিন্না বা তাঁর মত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিতরা এ আন্দোলনের প্রতি তেমন আকর্ষণ বোধ করেন নি।) আপাত বিস্ময়কর ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে। অধ্যাপক আজিজ আহমদের অনুসরণে ইকবাল মামুদের বক্তব্য এই যে স্যার সৈয়দের নেতৃত্ব সর্বপ্রথম যে শক্তিশালী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় তার কেন্দ্রবিন্দু জনৈক অভারতীয় মুসলিম শাস্ত্রানুসারী নেতা জমাত-অল-দীন আফগানী (১৮৩৯-১৮৯৭)। আফগানী স্যার সৈয়দের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রবর্তন ইত্যাদিকে ব্রিটিশের বশম্বদ হবার নিদর্শন বিবেচনা করতেন এবং স্বয়ং ইংরেজবিরোধী ছিলেন। ভারতের উলেমা গোষ্ঠী আফগানী দ্বারা প্রভাবিত হবার কারণে ইংরেজের বিরোধিতার উদ্দেশ্যে হিন্দুদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ছিলেন। পক্ষান্তরে স্যার সৈয়দ প্রভাবিত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত অভিজাত ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সাময়িক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইংরেজ-বিরোধিতার পন্থা পরিহার করাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। ইকবাল মামুদের সিদ্ধান্ত হল, "স্যার সৈয়দেব ত্রিমুখী আবেদন—(ইংরেজের প্রতি) আনুগত্য, পৃথক থাকাব মানসিকতা এবং 'আধুনিকতা' পাকিস্তানের পথ প্রশস্ত করে।" (দ্রঃ Overcoming the Trauma of Indian History, Indian Express, দিল্লী, দোসবা নভেম্বর ১৯৮৬)।

১৪. অধ্যাপক মঈন সকিরের মতে, "মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদ বিত্তবান সম্প্রদায়ের শ্রেণীস্বার্থের পরিণাম। গোড়ার দিকে সামন্তবাদী, বিভিন্ন উচ্চ বৃত্তিনির্ভর এবং সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ কর্তৃক এর সাগ্রহ অনুশীলন হয়। জিন্নাব নেতৃত্বাধীন মুসলিম বুর্জোয়া সম্প্রদায় দ্বারা একে সাফল্যমণ্ডিত করা হয়।" এক বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হলেও বিচ্ছিন্নতাবাদের মূল অনুসন্ধান প্রসঙ্গে অধ্যাপক সকিরের বক্তব্য অনুধাবনীয়ঃ "...প্রতিটি সম্প্রদায়ের ভিতরই শ্রেণী ও জাতিভিত্তিক ভেদ বেশ গভীর এবং প্রশস্ত ছিল। আর তা গোপন করার পথ হল ঐক্য ও সংহতির ধূয়া তোলা। এই হল বিচ্ছিন্নতাবাদের মূল তথ্য।" (দ্রঃ Role of Minorities in Freedom Struggle; অজন্তা, নূতন দিল্লী (১৯৮৬) গ্রন্থে লেখকের Jinnah and Muslim Separatist Strategy প্রবন্ধের যথাক্রমে ৬১ ও ৫৯ পৃষ্ঠা।)

১৫. আগা খাঁ; The Memoirs World Enough and Time (লণ্ডন,

ক্যাসেল, ১৯৫৪) ১৪ পৃষ্ঠা। জে. জে. পাল কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ১০-১১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১৬. রফিক জ্যাকেরিয়া, Rise of Muslims in Indian Politics : An Analysis Development from 1885-1906 ; ৫৯ পৃষ্ঠা। জে. জে. পাল কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১৭. এম. নূরউল ইসলাম কর্তৃক তাঁর Bengali Public Opinion as Reflected in the Bengali Press, 1901-1930 গ্রন্থের ৫৮-৫৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। জে. জে. পাল কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ১১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১৮. ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য কেবল লীগের বিরূপ সমালোচনা করা উচিত হবে না। সেকালে তাবৎ রাজনৈতিক দলেরই এই ভূমিকা ছিল, এমন কি কংগ্রেসেরও।

১৯. শরীফুদ্দীন পীরজাদা (সম্পাদিত), Foundation of Pakistan, প্রথম খণ্ড (করাচী, ১৯৬৯) পৃঃ ৬। জে. জে. পাল কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ১৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

২০. এ. এস. জাঈদী, Evolution of Muslim Political Thought in India ; প্রথম খণ্ড (দিল্লী, ১৯৭৫), পৃঃ ১২৫। জে. জে. পাল কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ২১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

২১. জে. জে. পাল, সমগ্রন্থ, ২২ পৃষ্ঠা।

২২. সমগ্রন্থ, ২৭ পৃষ্ঠা।

২৩. লাহোরে প্রকাশ্যে দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রচারের কিছুদিন পূর্বে Manchester Guardian পত্রিকার প্রতিনিধিকে প্রদত্ত জিন্নার বিবৃতির দুটি বাক্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : "এমন কি প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধেও মুসলমানদের মনে চিরকালই ভয় ও আশঙ্কা ছিল এবং ভারতবর্ষে গণতন্ত্র যেভাবে কার্যকরী করা হচ্ছিল তার সম্বন্ধে আরও বেশী। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার থেকে আরম্ভ করে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পাদিত ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ঐতিহাসিক লখনউ চুক্তি পর্যন্ত তাঁরা যে পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থা, সংখ্যাধিক্য (Weightage) ও বৈধানিক রক্ষাকবচের জন্য জোর দিয়ে এসেছেন তা পূর্বোক্ত ভয়েরই সুস্পষ্ট দ্যোতক।" (এম. এইচ. সঈদ ; সমগ্রন্থ ; পৃঃ ২৩৮)।

২৪. ভিনসেণ্ট স্মিথ ; The Oxford History of India ; ৮০৭ পৃষ্ঠা।

১. সমগ্রন্থ ; ২০১ পৃষ্ঠা।

২. স্যার ফজল-ই-হাসানকে লিখিত আগা খাঁর পত্র। ডঃ আয়েষা জালাল কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ৫২ পৃষ্ঠায় ৩১ সংখ্যক পাদটীকায় উদ্ধৃত।

৩. সমগ্রন্থ ২৩৭ পৃষ্ঠা।

৪. পীরজাদা ; The Pakistan Resolution and the Historic Lahore Session, করাচী (১৯৬৮) ; ১৭-১৮ পৃষ্ঠা।

৫. আফজল ইকবাল, সমগ্রন্থ, পৃঃ ৩২ এবং ৩৩-৩৪।

৬. "তাঁদের বক্তব্যে যে বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হত তা সহজ : মুসলিম লীগের পক্ষে যাঁরা ভোট দিচ্ছেন তাঁরা মুসলমান। এই এক কাজের জন্য তাঁরা বেহেস্তে যাবেন। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ভোটদানকারীরা কাফের। মৃত্যুর পর তাঁদের স্থান দোজখ-এ। মুসলমানদের কবরস্তানে তাঁদের গোর দিতে দেওয়া উচিত নয়।" দ্রষ্টব্য আফজল ইকবালের সমগ্রন্থ, পৃঃ ৩৮।

৭. আফজল ইকবাল, সমগ্রন্থ, ৩৭ পৃষ্ঠা।

৮. সমগ্রন্থ, ২৩ পৃষ্ঠা।

৯. বিধানসভায় তাঁর ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চের বক্তৃতা। ডঃ আয়েষা জালাল কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ৬৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১০. বোম্বাই-এর ছোটলাট রজার লুমলে-এর এতৎসংক্রান্ত ২০শে জুলাই ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের চিঠির উত্তরে জিন্নার ২১শে জুলাই-এর চিঠি।

১১. এম. এইচ. সঈদ, সমগ্রন্থ ; ২৬১ পৃষ্ঠা।

১২. তবে জিন্নার সঙ্গে ফজলুল হকের বিরোধ ভিতরে ভিতরে চলতে থাকল এবং ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের তেসরা ডিসেম্বর হক্ জিন্নার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে লীগকে বাদ দিয়ে শরৎ বসু ও শ্যামাপ্রসাদ প্রমুখদের সহযোগিতায় ১১ই ডিসেম্বর এক মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করেন। কিন্তু ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ গভর্ণরের চাপে পদত্যাগ করতে বাধ্য হবার পর পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী অগৌরবজনক ভাবে শেরে বঙ্গালকে জিন্নার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পিছনের সারির নেতা হিসাবে লীগে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। মুসলিম সমাজে জিন্না ও লীগের দোর্দণ্ডপ্রতাপের পরিচায়ক জিন্না-হক বিরোধের কাহিনী।

১৩. খলিকুজ্জমাঁ ; সমগ্রন্থ ; ২৪৯-৫০ পৃষ্ঠা।

১৪. পীরজাদা (সম্পাদিত) ; সমগ্রন্থ ; ৩৩ পৃষ্ঠা।

১৫. সমগ্রন্থ ; ২৫০ পৃষ্ঠা।

॥ ২২ ॥

১. উলপার্ট কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ১৮৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

২. শরীফ অল মুজাহিদ ; সমগ্রন্থ ; ৫৯৬।

৩. জিন্নার বক্তব্য জামিলউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত) M. A. Jinnah, Some Recent Speeches and Writings (লাহোর, ১৯৫২) (অতঃপর Some Recent Speeches রূপে উল্লেখিত হবে) গ্রন্থের ২৫৩-৫৬ পৃষ্ঠা থেকে অ্যালান হেইস মিরিয়াম কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ৭২-৭৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৪. সঈদ, সমগ্রন্থ ; ২৫৯ পৃষ্ঠা।

৫. উলপার্ট ; সমগ্রন্থ ; ১৯৬-১৯৭ পৃষ্ঠা।

৬. রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সমগ্রন্থ, ১৬০ পৃষ্ঠা এবং খলিকুজ্জমাঁ, সমগ্রন্থ, ২৭৪-২৭৬ পৃষ্ঠা।

৭. সমগ্রন্থ ; ৮২ পৃষ্ঠা।

৮. সমগ্রন্থ, ৭৮ পৃষ্ঠা।

৯. সমগ্রন্থ, ২৭৮-২৭৯ পৃষ্ঠা। খলিকুজ্জমাঁর ভূমিকার পূর্ণ তাৎপর্যের জন্য নিম্নোদ্ধৃত তথ্যও বিবেচ্য: "১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের (৭ই) অক্টোবরে অর্থাৎ ক্রিপস প্রস্তাবের পর চৌধুরী খলিকুজ্জমাঁ জিন্নাকে এজাতীয় 'আঞ্চলিক পুনর্বিন্যাসের' সম্ভাব্য অসুবিধার সম্বন্ধে লেখেন। পাকিস্তানের উভয় এলাকা এবং মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশগুলির সঙ্গে সংযোগ বজায় রাখার উপর তিনি জোর দেন। পাকিস্তান এলাকার সঙ্গে মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশসমূহের বিপুল দূরত্ব এবং মাঝের শত্রুতাভাবাপন্ন এলাকার ফলে সাংস্কৃতিক প্রভাব ব্যাহত হবে। তাছাড়া পাকিস্তান প্রস্তাবের পিছনে একটি মূল নীতি হল হিন্দু প্রদেশের মুসলমানদের বদলে মুসলমান প্রদেশসমূহে হিন্দুদের প্রতিভূ হিসাবে রাখা। আমরা যদি লক্ষ লক্ষ হিন্দুদের আমাদের প্রভাব-বৃত্তের বাইরে চলে যেতে দিই তাহলে সংখ্যালঘু প্রদেশসমূহে মুসলমানদের নিরাপত্তা প্রচণ্ড ভাবে হ্রাস পাবে।" ডঃ আয়েষা জালাল ; সমগ্রন্থ ; ৫৯ পৃষ্ঠার ৫৪ সংখ্যক পাদটীকা।

১০. ইতিপূর্বে তাঁর প্রভাবে ২৩শে এপ্রিল মাদ্রাজের বিধানসভার কংগ্রেসী সদস্যরা জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সহযোগিতার জন্য

কেন্দ্রে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করতে লীগের সন্দেহ দূর করার উদ্দেশ্যে ভারতের অংশবিশেষের বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার সমর্থন করে। এর সঙ্গে সঙ্গে লীগ ও অন্যান্য দলের সঙ্গে মিলিতভাবে মাদ্রাজে কোয়ালিশন সরকার গড়তে দেবার জন্য রাজাজী এলাহাবাদের অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় (২৯শে এপ্রিল —দোসরা মে) প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। তাঁর প্রস্তাব বিপুল ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে গেলেও তিনি পাকিস্তান দাবির মূল নীতির পক্ষে প্রচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

১১. CWMG; ৭৬ তম খণ্ড; পৃঃ ৩৮২ এবং প্যারেলাল; Last Phase, প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ (১৯৬৫), ৬৬ পৃষ্ঠা।

১২. সমালোচকদের মতে আগস্ট প্রস্তাবে ভবিষ্যৎ সংবিধানের রূপরেখা বর্ণনা প্রসঙ্গে, "ফেডারেল ধরণের যেখানে সর্বাধিক পরিমাণে স্বয়ংশাসনের অবকাশ থাকবে এবং যেখানে বাদবাকী (residuary) ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে ঐসব একম্-এর হাতে" (টেণ্ডুলকর; সমগ্রন্থ; ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৮৫)—এই মর্মে যে উক্তিটি করা হয়েছে তা প্রচ্ছন্ন ভাবে পাকিস্তানের স্বীকৃতির দ্যোতক। এই অভিমতের সমর্থকদের মতে কংগ্রেস এরও পূর্বে ক্রিপস প্রস্তাবের আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অধিকার মেনে নিয়ে প্রথমে ভারত বিভাজনের দাবি নীতিগতভাবে মেনে নেয়। অতঃপর ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে যখন বলা হয় যে "নিজের ঘোষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন আঞ্চলিক একম্‌কে কোন ভারতীয় যুক্তরাজ্যের মধ্যে থাকতে বাধ্য করার নীতি (কংগ্রেস) চিন্তা করতে পারে না" (সীতারামাইয়া; সমগ্রন্থ; দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬৩৪)— তখনও আর এক দফা কংগ্রেস ভারত বিভাজনের যৌক্তিকতা স্বীকার করে নেয়।

১৩. সমস্ত জেলা-শাসকদের কাছে বাংলার মুখ্যসচিবের ৬ই ও ৮ই আগস্টের ডেমি অফিসিয়াল পত্র। শ্রীমতী শীলা সেন কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ১৫৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

॥ ২৩ ॥

১. ডঃ আয়েষা জালাল; সমগ্রন্থ; পৃঃ ৪৯। লিনলিথগোর বক্তব্য ভারতসচিব লর্ড জেটল্যাণ্ডকে লেখা।

২. দুর্গাদাস; সমগ্রন্থ; ১৬৯ পৃষ্ঠা।

৩. সমগ্রন্থ; ২০৪-২০৫ পৃষ্ঠা।

৪. ৪৯-৮১ পৃষ্ঠা।

৫. পৃঃ ২৬৮। এ সম্বন্ধে প্যারেলালের (সমগ্রন্থের) প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশের ৬৮-৮১ পৃষ্ঠার তথ্যসমূহও উল্লেখযোগ্য।

৬. সঈদ ; Sound of Fury ; ২৮৫ পৃষ্ঠা।

৭. এন. মানসার্গ ; The Transfer of Power ; (লণ্ডন) ; (অতঃপর T. P. হিসাবে উল্লেখিত) ; দ্বিতীয় খণ্ড ; ৮৩৯ পৃষ্ঠা।

৮. দিল্লীতে এপ্রিলের ২৪-২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অধিবেশন সম্বন্ধে "একান্ত গোপনীয় নোট"। T. P. ; তৃতীয় খণ্ড ; ৯১৮-৯২০ পৃষ্ঠা।

৯. পীরজাদা, Foundations of Pakistan, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪২২ ; উলবার্ট কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ২১৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১০. উলপার্ট ; সমগ্রন্থ, ২১৮ পৃষ্ঠা।

১১. সমগ্রন্থ, ২০৮ পৃষ্ঠা।

১২. মানসার্গ ; T. P. ; তৃতীয় খণ্ড ; ৯৮২ পৃষ্ঠা।

১৩. রাজমোহন গান্ধী ; The Rajaji Story : 1937-1972 ; ভারতীয় বিদ্যাভবন, বোম্বাই (১৯৮৪) ; ৯৫-৯৬ পৃষ্ঠা।

১৪. CWMG ; খণ্ড ৮৭, ৭৫ পৃষ্ঠা।

১৫. মানসার্গ, T. P. ; চতুর্থ খণ্ড ; ২৬০ ও ২৬১ পৃষ্ঠা।

১৬. সমগ্রন্থ ; ৮৭৩ ও ৮৬৯ পৃষ্ঠা।

১৭. এখানে খুব সম্ভব গান্ধী জিন্নার সঙ্গে ভারতের বুকে তাঁর প্রথম দর্শনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করছেন। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী বোম্বাই-এ গুর্জর সভার দ্বারা প্রদত্ত এক সংবর্ধনা সভায় জিন্না চোস্ত ইংরাজীতে তাঁকে স্বাগত জানালে উভয়ের মাতৃভাষা গুজরাতীর বদলে ইংরাজীতে ভাষণ দেবার জন্য গান্ধী তাঁর প্রতিভাষণে জিন্নাকে মৃদু তিরস্কার করেছিলেন। (দ্রঃ CWMG ; ত্রয়োদশ খণ্ড ; ৯ পৃষ্ঠা)।

১৮. প্যারেলাল ; সমগ্রন্থ ; প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ ; ৬৭ পৃষ্ঠা।

১৯. বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য—ডঃ আয়েষা জালাল ; সমগ্রন্থ, ৯০-৯৩ পৃষ্ঠা।

২০. সঈদ ; Sound of Fury ; ২৯৩ পৃষ্ঠা।

২১. প্যারেলাল ; সমগ্রন্থ ; প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ ; পৃঃ ৮২ এবং টেণ্ডুলকর ; সমগ্রন্থ ; ষষ্ঠ খণ্ড ; পৃঃ ৩৩৭-৩৩৮ দ্রষ্টব্য।

২২. জিন্নার এই ভূমিকা যে অযৌক্তিক একথা সংযুক্ত প্রদেশের লীগের

নেতা হিসাবে পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা এবং আইনজীবী খলিকুজ্জমাঁ। ঐ রাষ্ট্রের সৃষ্টির চোদ্দ বছর পরও লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁর মতে, "কেবল মুসলমান ভোটের ভিত্তিতে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার···এমন একটা দাবি যার তুলনা বিশ্ব-ইতিহাসে নেই।" (সমগ্রন্থ ; ২৭৮ পৃষ্ঠা)

২৩. টেণ্ডুলকর, সমগ্রন্থ ; ষষ্ঠ খণ্ড ; ৩৩৩ পৃষ্ঠা।

২৪. সমগ্রন্থ ; পৃঃ ৯৩-৯৪। গান্ধীর সম্বোধন দ্বারা জিন্নার "কায়েদ-এ-আজম" অভিধা জনপ্রিয় হয় এবং বিশেষ করে মুসলমানরা গান্ধীর এই স্বীকৃতি শব্দার্থে নেন—এও মৌলানার অপর এক অভিযোগ।

২৫. হেক্টর বলিথো ; সমগ্রন্থ ; পৃঃ ১৫১-১৫২। গান্ধীও ২৮শে সেপ্টেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বলেন: "আমরা উভয়ে একটা বোঝাপড়ায় উপনীত হতে সমর্থ হই নি—এ অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। তবে হতাশ হবার কারণ নেই। আলোচনা ভেঙ্গে গেছে কেবল নামেই। আসলে আলোচনা অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী হয়েছে।" তিনি আরও বলেন, "আমরা যে এই তিন সপ্তাহকাল সময় নষ্ট করি নি—এ বিষয়ে আমি পূর্ণতঃ সন্তুষ্ট। আর এ বিষয়ে আমার মনে তিলমাত্র সন্দেহ নেই যে পূর্বের তুলনায় আমরা পরস্পরকে ভালভাবে জানি।" অতঃপর তিনি বলেন, "আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই যে আমরা শত্রুরূপে নয় মিত্ররূপে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছি।" (টেণ্ডুলকর ; সমগ্রন্থ ; ষষ্ঠ খণ্ড ; পৃষ্ঠা ৩৫১-৩৫৩)। "আমি বিশ্বাস করি যে শ্রীযুক্ত জিন্না ভাল মানুষ। আমি আশা করি যে আবার আমাদের সাক্ষাৎ হবে।" (প্যারেলাল, সমগ্রন্থ ; প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ ; পৃঃ ৯৪)।

॥ ২৪ ॥

১. জমিলউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত) ; Some Recent Speeches ; উলপার্ট কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ২৩৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

২. শরীফ অল মুজাহিদ ; সমগ্রন্থ ; ৬১৯ পৃষ্ঠা।

৩. জমিলউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত) ; Some Recent Speeches ; পৃঃ ১১৬। জে. জে. পাল কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ১১৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৪. ১৯শে জানুয়ারীর বিবৃতি। T. P. ; পঞ্চম খণ্ড ; পৃঃ ৪২৩। তবে এ সম্বন্ধে খলিকুজ্জমাঁর বক্তব্য হল ; "···হিন্দু প্রভুত্বের বিরুদ্ধে এক সংগ্রামের মধ্যে এবং পাকিস্তানের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে হঠাৎ এরকম আচমকা এসব প্রশ্ন নবাবজাদা

লিয়াকৎ আলী খাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তা সহজে বোধগম্য হয় না। আমি একথা মনে করতে বাধ্য হচ্ছি যে খুব সম্ভব ঐ বিবৃতি (এখানে লিয়াকৎ আলী খাঁর সেই বিবৃতির উল্লেখ করা হচ্ছে যেখানে তিনি বলেন যে এ ব্যাপারে তিনি জিন্নার সঙ্গে পরামর্শ করেন নি—লেখক।) মিস্টার জিন্নার পরামর্শে দেওয়া হয়েছিল, যদিচ নবাবজাদা মিস্টার জিন্নার নীতি অনুসরণ করার অতিরিক্ত আর কিছুই করেন নি। স্যার সিকন্দর এবং আমার বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রারব্ধ মিস্টার জিন্নার এই নীতি ছিল কেন্দ্রে একটা জাতীয় সরকার গঠনের জন্য চেষ্টা করা। (সমগ্রন্থ ; ৩৩১ পৃষ্ঠা)।

সীতারামাইয়া তাঁর গ্রন্থে (দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৬৪৯-৬৫০) জানিয়েছেন যে এ প্রস্তাবে গান্ধীর আপত্তি ছিল না যদিও তিনি মনে করতেন যে এজাতীয় নিছক সাংবিধানিক প্রস্তাবে অচলাবস্থা দূর হবে বলে তাঁর ভরসা নেই। তবে "এতৎসত্ত্বেও গান্ধী ভুলাভাইকে তাঁর প্রয়াস চালিয়ে যাবার ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছিলেন।" এ প্রসঙ্গে টেণ্ডুলকরের গ্রন্থ (সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৮-৯) এবং প্যারেলালের Last Phase (প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ১১৩)-ও দ্রষ্টব্য।

৫. জমিলউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত) ; Some Recent Speeches, পৃঃ ১৭০। অ্যালেন হেইস মেরিয়াম কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ১১৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৬. শরীফ অল মুজাহিদ ; সমগ্রন্থ ; ৬২০ পৃষ্ঠা।

৭. পেনড্রেল মুন (সম্পাদিত) ; Wave II : The Viceroy's Journal ; অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ; করাচী ; পৃঃ ১৫২-১৫৩। উলপার্ট কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ২৪৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৮. এ সম্বন্ধে মৌলানা আজাদ বলেছেন : "দশ বছর পর ঘটনাবলী সম্বন্ধে পুনঃসমীক্ষা করতে গিয়ে মুসলিম লীগের দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য যে বিচিত্র অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল তার কারণ আমি বিস্মিত না হয়ে পারছি না। লর্ড ওয়াভেল স্বয়ং যে প্রারম্ভিক (tentative) সূচী তৈরী করেছিলেন তাতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পাঁচ-পাঁচটি নাম ছাড়াও অতিরিক্ত চারটি নাম ছিল। তার মধ্যে এক-জন ছিলেন শিখদের প্রতিনিধি, দুইজন তপশিলী হিন্দুদের এবং চতুর্থজন ছিলেন পাঞ্জাবের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খিজির হায়াৎ খাঁ। তালিকায় এমন দুইজন মুসলমানের নাম আছে···যাঁরা তাঁর মনোনীত নন জেনে জিন্না তার প্রবল বিরোধিতা করেন।···সুতরাং জিন্নার বিরোধিতার ফলে যদি সম্মেলন ভেঙ্গে না যেত তাহলে ঐ সম্মেলনের পরিণাম স্বরূপ মুসলমানরা ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার

এক-চতুর্থাংশ হওয়া সত্ত্বেও চোদ্দজনের শাসন পরিষদে সাতটি আসন পেতে পারত।…লীগ মুসলিম স্বার্থের প্রবক্তা রূপে দাবি জানাত। অথচ লীগেরই বিরোধিতার জন্য ভারতবর্ষের মুসলমানরা অবিভক্ত ভারতের শাসনকার্যে প্রভূত পরিমাণ অংশ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হল।" (পৃঃ ১১৪) মৌলানার মতে অপর এক দিক থেকেও ঐ সম্মেলনের ব্যর্থতার অভিনবত্ব ছিল: "এই সর্বপ্রথম ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে কোন রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে নয়, দেশের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে বিভক্তকারী সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা ভঙ্গ হল।" (সমগ্রন্থ ; পৃঃ ১১০)

৯. সমগ্রন্থ ; পৃঃ ৩১৮। আমেরীর কাছে লীগের কৃতজ্ঞতাভাজন হবার বহুবিধ কারণের মধ্যে অপর একটির উল্লেখও এ প্রসঙ্গে করা যেতে পারে। সিন্ধুর লীগ মন্ত্রীসভা ভাঙ্গনের মুখে। বিধানসভার অধিবেশন বসলেই মন্ত্রীমণ্ডলকে অপরিহার্য ভাবে অনাস্থা প্রস্তাবের সম্মুখীন হতে হবে। প্রদেশের ছোটলাট ফ্রান্সিস মুডি (খলিকুজ্জমাঁর মতে যিনি "পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন") অধিবেশন না ডাকার পক্ষে, যদিও বড়লাট ওয়াভেল চান যে বিধাসভার অধিবেশন আহ্বান করা হোক। নিয়মানুসারে বড়লাট ও ছোটলাটের মতভেদের প্রশ্ন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য ভারতসচিব আমেরীর কাছে গেল। তিনি মুডির সপক্ষে বায় দিলেন। কৃতজ্ঞ লীগনেতা খলিকুজ্জমাঁ এ ঘটনা লিপিবদ্ধ করার প্রসঙ্গে বলেছেন: "তিনি (আমেরী) ছোটলাটের সঙ্গে সহমত হলেন এবং বিধানসভা ভঙ্গ করা হল। এসব তথ্য আমি দিচ্ছি স্বয়ং স্যার ফ্রান্সিস মুডি কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণেব ভিত্তিতে। লীগের ইতিহাসের এক সঙ্কটজনক মুহূর্তে তিনি সিন্ধুকে পাকিস্তানের জন্য রক্ষা করেছিলেন।" (সমগ্রন্থ ; পৃঃ ৩৩৩)

১০. প্যারেলাল ; সমগ্রন্থ ; প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ ; পৃঃ ১৩১। জিন্নার ঐ বিবৃতির নিম্নোদ্ধৃত অংশ উল্লেখযোগ্য: "ওয়াভেল পরিকল্পনাকে চূড়ান্তভাবে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করে আমরা দেখেছি যে ও হল এক ফাঁদ। এক দিকে গান্ধী— হিন্দু কংগ্রেস, যা অখণ্ড ভারতের নামে ভারতবর্ষের হিন্দু জাতীয় স্বাধীনতার প্রবক্তা এবং অপর দিকে রয়েছেন ইদানীং ভৌগোলিক ঐক্যের ধ্বজাধারক লর্ড ওয়াভেল এবং গ্ল্যান্সি-খিজির চক্র যারা পাঞ্জাবের মুসলমানদের ভিতর বিভেদ সৃষ্টিতে কৃতসঙ্কল্প। আমাদের এই ব্যবস্থার মধ্যে ঠেলে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবানুযায়ী আমরা যদি এতে রাজী হতাম তাহলে আমাদের মৃত্যু-পরোয়ানা দস্তখত করার সমতুল্য হত।…১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আমরা ব্রিটিশ সরকারের কাছে আমাদের ভূমিকার কথা স্পষ্ট করে এসেছি। আমাদের সেই

ভূমিকা হল—ব্রিটিশ সরকার যতক্ষণ না মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের গ্যারান্টি ঘোষণা করছে এবং এই আশ্বাস দিচ্ছে যে যুদ্ধের পরই অথবা তার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করবে ততদিন আমরা কোন সাময়িক ব্যবস্থায় রাজী হতে পারি না।…আমরা সংখ্যালঘু নই, আমরা একটি জাতি (নেশন) এবং যুদ্ধের সময়ে যে বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে ও প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি রেখেই কেবল আমরা কোন সাময়িক ব্যবস্থায় রাজী হতে পারি।" (এম. এইচ. সঈদ; Sound of Fury; পৃঃ ৩০০)।

১১. ডঃ আয়েষা জালাল; সমগ্রন্থ; পৃঃ ১৩২। জালাল প্রদত্ত উদ্ধৃতির উৎস—Indian Annual Register, ১৯৪৫; দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা।

১২. T. P.; পঞ্চম খণ্ড; ১২৬২ পৃষ্ঠা।

১৩. সমগ্রন্থ; ১২৩৭ পৃষ্ঠা।

১৪. এইচ. ভি. হডসন; The Great Divide; করাচী (১৯৬৯); অনুসারে "সিমলা সম্মেলনে জিন্না কর্তৃক উদ্ধত শক্তির প্রদর্শন লীগের মনোবল বৃদ্ধির কারণ এবং তার মুসলমান বিপক্ষীয় দলসমূহের—বিশেষ করে পাঞ্জাবের লীগবিরোধী মুসলমানদের উপর প্রবল প্রহার স্বরূপ হয়েছিল।" (পৃঃ ১২৭)। ভি. পি. মেননের মতে (সমগ্রন্থ; পৃঃ ২১৫) এর ফলে মধ্যপন্থী মুসলমানরা অতঃপর লীগকেই তাঁদের একমাত্র শরণ বলে মনে করেন। এছাড়া জাতীয়তাবাদী শক্তিসমূহের পক্ষে ঐটাই শেষ সুযোগ হওয়ায় এরপর সাম্প্রদায়িকতা ও তার পরিণামে দেশবিভাজন ছাড়া অপর কোন বিকল্প রইল না। তবে এ সম্মেলনের ব্যর্থতার জন্য ব্রিটিশ শাসকদলের কিছুসংখ্যক নেতৃবৃন্দের ভূমিকাও ক্রিয়াশীল ছিল যাঁরা জিন্নাকে একরকম ভেটো দেবার জন্য বড়লাটের উপর চাপ দিয়েছিলেন (T. P.; পঞ্চম খণ্ড; পৃঃ ১২০১-১২০২ ও ১২২১-১২২৪)। ভারতের ব্রিটিশ আমলাদের একাংশও যে জিন্নাকে সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ করার জন্য প্ররোচনা দেন তার প্রমাণ জয়াকর (সন্ধ্যা চৌধুরী; সমগ্রন্থ; পৃঃ ১৪৮) ও ভি. পি. মেনন (Transfer of Power; পৃঃ ২১৫) কর্তৃক দেওয়া ছাড়াও দুর্গাদাস দিয়েছেন। সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ হবার পরই দুর্গাদাস জিন্নার সঙ্গে দেখা করেন এবং "এই সাংবাদিক যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁর কংগ্রেসের সঙ্গে সংখ্যাসাম্যের দাবি স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও কেন তিনি ওয়াভেলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন, জিন্না উত্তরে বললেন: আমি কি এতই বোকা যে যখন আমাকে থালায় সাজিয়ে পাকিস্তান দেওয়া হচ্ছে তখন এই প্রস্তাব গ্রহণ করব?" (সমগ্রন্থ; পৃঃ ২১৬);

১৫. T. P. ; ষষ্ঠ খণ্ড ; পৃঃ ২২-২৩।

১৬. তদেব ; পৃঃ ৭১-৭২।

১৭. তদেব , পৃঃ ২৪৭-২৪৮।

১৮. জমিলউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত) , Some Recent Speeches থেকে উলপার্ট কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের পৃঃ ২৪৮-এ উদ্ধৃত।

১৯. অ্যালেন হেইস মেরিয়াম , সমগ্রন্থ ; পৃঃ ১১৭।

২০. জমিলউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত) ; Some Recent Speeches (দ্বিতীয় খণ্ড) ; পৃঃ ২১৮। মেরিয়াম কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ১১৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

২১. সমগ্রন্থ ; পৃঃ ১১৭।

২২. জমিলউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত) ; Some Recent Speeches থেকে উলপার্ট কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ২৫১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

২৩. জমিলউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত) ; Some Recent Speeches থেকে মেরিয়াম কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ১১৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

২৪. উলপার্ট ; সমগ্রন্থ ; পৃঃ ২৫০।

২৫. জমিলউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত) ; Some Recent Speeches থেকে উলপার্ট কর্তৃক নিজ গ্রন্থের ২৫৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

২৬. এ সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য ডঃ আয়েষা জালাল , সমগ্রন্থ ; পৃঃ ১৩৮-১৭৩।

২৭. রামগোপাল ; সমগ্রন্থ ; পৃঃ ৩০৪-৩০৫। তবে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলির মধ্যে কুত্রাপি লীগ নিজবলে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করতে পারে নি। সিন্ধুতে লীগমন্ত্রীমণ্ডল গঠনের পিছনে ছোটলাট মুডির বদান্যতার পরিচয় ছিল। লীগের ও প্রধান বিরোধী সৈয়দ ও মৌলাবক্সের কোয়ালিশনে ২৮ জন করে ও ৪ জন নির্দলীয় সদস্য মন্ত্রীসভা গঠনের সময়ে থাকলেও ছোটলাট লীগকেই মন্ত্রীসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানান। বঙ্গেও লীগ মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হয় ইউরোপীয় সদস্যদের সহযোগিতায়। পাঞ্জাবে ইউনিয়নিস্ট কংগ্রেস ও আকালীদের কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আসামে (মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ না হলেও প্রস্তাবিত পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত) কংগ্রেসী মন্ত্রী-মণ্ডল গঠিত হয়।

২৮. ডঃ আয়েষা জালাল ; সমগ্রন্থ ; পৃঃ ১৩৩।

২৯. সমগ্রন্থ ; পৃঃ ১১৪।

৩০. সমগ্রন্থ ; পৃঃ ১১৬।

৩১. অতুলানন্দ চক্রবর্তীর Call It Politics? স্যার আরদেশির দালালের An Alternative to Pakistan, হুমায়ুন কবীরের Muslim Politics, 1905-42, স্যার হোমি মোদী ও ডঃ জন মাথাই-এর A Memorandum on the Economic and Financial Aspects of Pakistan, ডঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের An Economist Looks at Pakistan, কে. টি. শাহ্-এর Why Pakistan? Why Not? প্রমুখ বুদ্ধিজীবীদের গ্রন্থের বক্তব্য স্বল্প কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তির পরিধির বাইরে প্রচারিত হতে পারে নি। কংগ্রেসী নেতাদের মধ্যে রেজাউল করীমের Pakistan Examined, অশোক মেহেতা ও অচ্যুৎ পট্টবর্ধনের The Communal Triangle ইত্যাদি গ্রন্থের বক্তব্যের প্রভাবও অনুরূপভাবে সীমিত ছিল। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের India Divided অত্যন্ত যুক্তিশীল ও তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা হওয়া সত্ত্বেও প্রথমতঃ এই নির্বাচনী হিষ্টিরিয়া কেটে যাবার পর (১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে) প্রকাশিত হয় এবং তার আবেদনও অন্যান্য গ্রন্থের মত স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

৩২. এ সম্বন্ধে ডঃ আয়েষা জালালের বক্তব্য : "১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে জিন্নার সাফল্যের পিছনে বহুলাংশে ছিল পাকিস্তান যে আসলে কি একথা ভোটারদের বলতে ব্রিটিশের অনিচ্ছা। এর জন্য কংগ্রেসও সমপরিমাণে দায়ী। ঐ প্রতিষ্ঠান লীগের আওতাবর্হিভূত প্রদেশগুলিতে সম্ভাব্য মুসলমান মিত্রদের সংগঠিত করতে পারে নি। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কংগ্রেস সভাপতি হবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসী মুসলমানদের মধ্যে প্রমুখ ছিলেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি প্রস্তাব দেন যে কংগ্রেস যেন প্রকাশ্যে ফেডারেল সংবিধান এবং সীমিত সংখ্যক বিষয়ের অধিকারবিশিষ্ট অপেক্ষাকৃত দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে নিজ অভিমত ব্যক্ত করে। আজাদ কেন্দ্রে মুসলমানদের সংখ্যাসাম্য (parity) মেনে নিতে প্রস্তুত হলেও লীগকে সমানসংখ্যক আসন দিতে রাজী ছিলেন না। (আজাদের পরিকল্পনার বিস্তৃত বিবরণের জন্য অ্যাবেলকে লিখিত জেনকিন্সের ২৫শে আগস্ট ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের পত্র দ্রষ্টব্য। Transfer of Power; ষষ্ঠ খণ্ড; পৃঃ ১৫৫)। কংগ্রেসের পক্ষে অপর একটি বিকল্প ছিল রাজাজীর প্রস্তাবের সমর্থন করে স্পষ্ট ভাষায় দেশবিভাগ এবং পাঞ্জাব ও বঙ্গের বিভাজন সম্বন্ধে প্রচার করা। কিন্তু শক্তিশালী কেন্দ্রের প্রতি কংগ্রেসের আনুগত্যের নীতি এবং গান্ধীর বিচিত্র প্রভাবের কারণ আজাদের শিথিল ফেডারেশন ও সীমিত ক্ষমতাযুক্ত কেন্দ্র অথবা

শক্তিশালী কেন্দ্রের জন্য অপরিহার্য মূল্য—দুটি প্রধান মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের বিভাজনের যুক্তিযুক্ত ভূমিকার কোন একটিও কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড গ্রহণ করতে পারল না।" (সমগ্রন্থ , পৃঃ ১৩৫)

৩৩. ডঃ আয়েষা জালাল ; সমগ্রন্থ ; পৃঃ ১৩৪-১৩৫ ।

৩৪. রামগোপাল ; সমগ্রন্থ ; পৃঃ ৩০৫-৩০৬ ।

॥ ২৫ ॥

১. ডঃ আয়েষা জালাল ; সমগ্রন্থ ; পৃঃ ১৭৪-৭৫ । পাঞ্জাব ও বঙ্গের নামমাত্র মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও বিপুল অমুসলমান জনসংখ্যা চিরকালই প্রস্তাবিত পাকিস্তানের মাথাব্যথার কারণ হবে বলে, "জিন্না একান্তভাবে উড্রো ওয়াইআটের কাছে স্বীকার করেন যে · তিনি আম্বালা ও বর্ধমান (বিভাগ)-কে যেতে দিতে প্রস্তুত, তবে 'গুরুতর গোলযোগ' এবং গৃহযুদ্ধ হলেও কলকাতাকে তাঁর পেতেই হবে।" (সমগ্রন্থ ; পৃঃ ১৭৫)

২. এই নির্বাচনকে জিন্না "ভারতের মুসলমানদের কাছে পাকিস্তানের জন্য গণভোট" আখ্যা দিয়ে তাঁদের কাছে এই আবেদন জানিয়েছিলেন যে তাঁরা যেন "বিশ্বের কাছে এই কথা সপ্রমাণ করেন যে অখিল ভারত মুসলিম লীগই এদেশের মুসলিম জাতির প্রতিনিধি।" জমিলউদ্দীন আহমদ (সঃ) ; সমগ্রন্থ ; দ্বিতীয় খণ্ড ; ২০২ পৃষ্ঠা।

৩. ভি. পি. মেনন ; সমগ্রন্থ ; ২৩৪-৩৫ পৃষ্ঠা।

৪. স্যার মীর্জা ইসমাইল ; My Public Life ; ১১৮ পৃষ্ঠা।

৫. চৌঠা এপ্রিল ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে আলোচনার সময়ে জিন্না বলেন যে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে আলোচনার কোন পরিণাম হবে না এবং তাই ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের মত ব্রিটিশ সরকারেরই একটা রোয়েদাদ ঘোষণা করা উচিত। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্ক ছাড়াও যোগাযোগ ব্যবস্থার অধিকারযুক্ত এক কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। তিনি আরও জানান যে প্রস্তাবিত পাকিস্তান থেকে তিনি আসামকে বাদ দিতে এবং বাকী এলাকার সীমানা পারস্পরিক আলোচনার দ্বারা পুনঃনির্ধারণেও রাজী হতে পারেন। তবে কলকাতা তাঁর চাই-ই চাই। কারণ "কলকাতা ছাড়া পাকিস্তান কোন মানুষকে তার হৃৎপিণ্ড বাদ দিয়ে বেঁচে থাকতে বলার মত।" (T. P. ; সপ্তম খণ্ড ; পৃঃ ১১৮-২৪)। কিন্তু সুরাবর্দী (বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী), গোলাম হোসেন (সিন্ধুর প্রধানমন্ত্রী) এবং

মামদোতের নবাব (পাঞ্জাব লীগের সভাপতি) প্রমুখ লীগের প্রাদেশিক নেতৃবর্গ বা পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী খিজির হায়াৎ খাঁ প্রমুখ কেউই জিন্নার প্রদেশ বিভাজনের প্রস্তাবের সমর্থক ছিলেন না। মিশনের কাছে তাঁরা বরং স্ব স্ব প্রদেশের বিশিষ্ট সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে চূড়ান্ত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি করেন। সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী যে পাকিস্তানেব বিরোধিতা করবেন—একথা বলাই বাহুল্য। তবে মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশগুলির লীগনেতারা পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন জানান।

৬. ডঃ গোপাল কর্তৃক Jwaharlal Nehru—A Biography গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৩১৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৭. T. P.; সপ্তম খণ্ড; ১৭৬-১৮০ পৃষ্ঠা।

৮. এখানে উল্লেখনীয় যে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লিখিত লীগের আইনসভার সদস্যদের ৭ই থেকে ৯ই এপ্রিলেব সম্মেলনে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের লাহোব প্রস্তাবের "স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ যার অংশভুক্ত একমগুলি স্বয়ংশাসিত ও সার্বভৌম হবে"—এর সংশোধন করে তার পরিবর্তে নিম্নোদ্ধৃত অংশ গৃহীত হয়—"উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে বঙ্গ ও আসাম এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে পাঞ্জাব, উঃ পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানকে নিয়ে এক সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র।" এই সংশোধনের কারণ হিসাবে বলা হয় যে এর দ্বারা লাহোর প্রস্তাবের "অস্পষ্টতা" দূর হবে। লীগেব বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত এবং পরবর্তী সাধারণ অধিবেশনে পুনঃস্বীকৃত এইজাতীয় একটি মৌলিক সিদ্ধান্তের (রাষ্ট্রসমূহের বদলে রাষ্ট্র) পরিবর্তনের অধিকার আইন-সভার সদস্যদের এক সম্মেলনের আছে কিনা এসব আইনগত বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও বলা যায় যে ফজুলল হক্ উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাবের এই সংশোধনের মধ্যে পৃথক ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের দাবির বীজ নিহিত ছিল। লাহোর প্রস্তাবের এই সংশোধন কৌশলী জিন্না অপর এক বাঙালী সুরাবর্দীকে দিয়ে উত্থাপন করিয়ে-ছিলেন, বাংলার লীগ-রাজনীতিতে যাঁকে তিনি আদৌ নিজের লোক মনে করতেন না। একে এক ঢিলে দুই পাখী মারার উদাহরণ বলা যায়।

৯. রামগোপাল; সমগ্রন্থ; ৩০৯ পৃষ্ঠা।

১০. T. P.; সপ্তম খণ্ড; ৪৮০ পৃষ্ঠা।

১১. পেনড্রেল মুন (সঃ); সমগ্রন্থ; পৃঃ ২৬০। উলপার্ট কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ২৬৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১২. সমগ্রন্থ ; পৃঃ ২৬৭-২৬৮। উলপার্ট কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ২৬৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১৩. সীতারামাইয়া ; সমগ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড ; clxxi পৃষ্ঠা।

১৪. সমগ্রন্থ ; clxxiv ও clxxvi পৃষ্ঠা।

১৫. ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে সুরাবর্দী, গোলাম হোসেন, খিজির হায়াৎ খাঁ, জি. এম. সৈয়দ ও ডাঃ খাঁ সাহেবের আলোচনার বিবরণ, T. P., সপ্তম খণ্ড ; যথাক্রমে ১৬৩-১৬৬, ১২৬, ১৪৭-১৪৮, ৯২-৯৩ ও ৭৪-৭৫ পৃষ্ঠা।

১৬. জালাল, সমগ্রন্থ ; পৃঃ ১৯৮, ২০০ ও ২০৩। উলপার্টের গ্রন্থের ২৭৪-২৭৫ পৃষ্ঠাও দ্রষ্টব্য।

১৭. T. P., সপ্তম খণ্ড ; ১২৩-১২৪ ও ৩৪২ পৃষ্ঠা।

১৮. জিন্নার সঙ্গে মিশনের ১৬ই এপ্রিলের আলোচনা ; T. P., সপ্তম খণ্ড; ২৮১-১৮২ পৃষ্ঠা।

১৯. "কল্পনালোকের অবাস্তব পাকিস্তানের জন্য সাধারণ মানুষ অথবা মসজিদের মোল্লারা সোরগোল তুলতে প্রস্তুত ছিল না কিংবা 'বিকলাঙ্গ বা কীটদষ্ট' পাকিস্তানের জন্যও নয়…যা শেষ অবধি ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হাতে এল। তাঁর পাকিস্তান অবিভক্ত পাঞ্জাব ও বাংলার সুযোগ-সুবিধা জলাঞ্জলি দিতে চায় নি ; হিন্দুস্থানের মুসলমানদের অরক্ষিত রেখে যাওয়াও সে পাকিস্তানের উদ্দেশ্য ছিল না। প্রদেশ দুটিকে অবিভক্ত রাখা ও সংখ্যালঘু মুসলমানদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা সম্ভব কেবল এক কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার অধীনে যেখানে লীগের সমান অধিকার থাকবে।" "জিন্নার যা প্রয়োজন ছিল তা হল এই যে সকল পক্ষ তখনকার কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থাকে ভঙ্গ করে দেবে এবং বাস্তবে এমন না করে নীতিগতভাবে করলেও চলবে। তারপর অবিলম্বে এক সার্বভৌম পাকিস্তানের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থাকে নূতন করে সৃষ্টি করা হবে। তাঁর মতে কেবল এই পন্থাই কেন্দ্রে মুসলমানদের সমান অধিকার পাবার নিশ্চয়তা দেবে। কারণ এর ভিত্তি হবে স্বাধীন জাতিসমূহের আইন দ্বারা সুনিশ্চিত সমানতা : সার্বভৌম রাষ্ট্রদের মধ্যে অনুষ্ঠিত চুক্তি…। কিন্তু কংগ্রেস যতক্ষণ না এর সপক্ষে স্পষ্টভাবে সম্মতি ব্যক্ত করে এগিয়ে আসছে, 'তিনি কতটা ছেড়ে দিতে প্রস্তুত' তা প্রকাশ করবেন না। কংগ্রেস যদি তার ভূমিকায় অনড় থাকে তাহলে জিন্না চাইছিলেন যে মিশনই যেন একটা ফয়সালা চাপিয়ে দেয় এবং তিনি ভেবেছিলেন যে মিশন 'এটা করতে সক্ষম'…। সুতরাং ব্রিটিশকে তাঁদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে হবে এবং সেটা যাতে কার্যকরী হয় তা দেখার জন্য আরও কয়েক বছর থেকে যেতে

হবে। লীগ ও কংগ্রেস প্রদেশসমূহকে নিয়ে এখনই এক কেন্দ্র গড়াও ভাল যদি অবশ্য দুর্বল অংশীদার অর্থাৎ লীগের প্রতি ন্যায়বিচার হচ্ছে কিনা তার তদারকির জন্য ব্রিটিশ এদেশে থেকে যায়।" ডঃ আয়েষা জালাল ; সমগ্রন্থ ; ১৮৬-১৮৭ এবং ১৮৭-১৮৮ পৃষ্ঠা।

২০. Indian Register প্রথম খণ্ড (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬) ; পৃঃ ১৮১ থেকে জে. জে. পাল কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ১৪৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। ভারতসচিবের মতে এই প্রথম জিন্না সার্বভৌম পাকিস্তানের কম কোন কিছু বিবেচনা করতে প্রস্তুত হন। (ক্যাবিনেট মিশনের ১৯৪৬ খ্রীঃ ২৬শে এপ্রিলের বৈঠকের বিবরণ। T. P. ; সপ্তম খণ্ড ; পৃঃ ৩৪২।)

২১. প্রস্তাবে আপাতদৃষ্টে পরাজয়কে এভাবে দৃশ্যতঃ বিজয়ের রূপ দেবার অন্তরালবর্তী ইতিহাসে পার্লামেণ্টের ভূতপূর্ব সদস্য ও ক্রিপসের তদানীন্তন সহায়ক উড্রো ওয়াইআটের বিশেষ ভূমিকা ছিল। ডঃ আয়েষা জালানের মতে : "এই জাতীয় গ্রহণের অযোগ্য পরামর্শের সম্মুখীন সেই অহঙ্কারী ব্যক্তিটি, অতীতে সর্বদাই যিনি নিজের সুষ্ঠু বিচার-বুদ্ধির উপর একান্তভাবে নির্ভর করতেন, তাঁকে ওয়াইআট নিষ্কৃতির একটা পন্থার হদিস দিলেন। ওয়াইআট বললেন যে লীগ মিশন কর্তৃক পাকিস্তান দাবিকে 'অত্যন্ত অবমাননাকর' ভাবে প্রত্যাখ্যান করার নিন্দা করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করুক এবং তারপর সেই প্রস্তাবে বলুক যে মুসলমানরা অবশ্য আদৌ এ আশা করে নি যে ব্রিটিশ অথবা অপর কেউ থালায় সাজিয়ে পাকিস্তানকে তাঁদের হাতে তুলে দেবেন এবং তাঁরা 'তাঁদের নিজের সবল দক্ষিণ হস্তের' সাহায্যে নিজেদের দাবি আদায় করতে সক্ষম। নিজেদের সদিচ্ছার প্রমাণ দেবার জন্য লীগ **'পাকিস্তানের অভিমুখে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ঘোষণাকে স্বীকার করে নেবে।'** হতাশাপীড়িত জিন্না এই পরামর্শে স্পষ্টতঃ 'উল্লসিত' হয়েছিলেন (ডঃ আয়েষা জালাল ; সমগ্রন্থ ; পৃঃ ২০০)।" ওয়াইআটের প্রস্তাবে জিন্নার প্রতিক্রিয়া তাঁর বিবরণ অনুসারে, "ঠিক ঠিক। আপনি ঠিক ধরেছেন।" (T. P. ; সপ্তম খণ্ড ; ৬৮৭ পৃষ্ঠা)।

২২. মূল পত্রের জন্য সীতারামাইয়া ; সমগ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড ; পৃঃ ccvi—ccxiii দ্রষ্টব্য।

২৩. জিন্না বড়লাটকে লেখা তাঁর ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মে-এর চিঠিতে জানান যে কংগ্রেসের বর্ণহিন্দু সদস্যদের একজনের পরিবর্তে ডঃ জাকির হোসেনকে নেবার প্রস্তাবে "মুসলিম ভারতের প্রতিক্রিয়া মারাত্মক ভাবে প্রতিকূল হবে…এবং

লীগের প্রতিনিধি ছাড়া অপর কোন মুসলমান সদস্যকে আপনার দ্বারা মনোনয়নকে মুসলিম লীগ কখনই মেনে নেবে না। বিষয়টিকে আমি ওয়ার্কিং কমিটির সামনে উত্থাপন করেছিলাম। সেখানে এই অভিমত সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হয়েছে এবং সদস্যরা একে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয় বিবেচনা করেন।"

২৪. এখানে কংগ্রেস সভাপতির মিশনের কাছে এই মর্মে লিখিত আশ্বাসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা গান্ধীজী সহ কংগ্রেসের অপর সব নেতার অজ্ঞাতসারে খুব সম্ভব একটা বোঝাপড়ায় উপনীত হবার সদিচ্ছা নিয়ে মৌলানা দিয়েছিলেন। মিশনের সঙ্গে আলোচনাপ্রসঙ্গে এই দ্বিতীয়বার আজাদ এইভাবে নিজের অপর সব সহকর্মীদের অজ্ঞাতসারে তাঁদের পত্র লেখেন। এর থেকে উদ্ভূত সমস্যার বিবরণের জন্য সুধীর ঘোষের Gandhiji's Emissary ; রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা (১৯৬৭) ; ১০৮-১০৯ ও ১৬৫-১৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২৫. মিশনের ২১শে জুনের আলোচনার বিবরণ ; T. P. ; সপ্তম খণ্ড ; ৯৯৫ পৃষ্ঠা।

২৬. সমগ্রন্থ , ১০৩৯ পৃষ্ঠা।

২৭. পেনড্রেল মুন (সঃ) ; Wavell ; The Viceroy's Journal ; পৃঃ ৩০৬। উলপার্ট কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ২৭৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

॥ ২৬ ॥

১. তাঁর চিকিৎসক ডাঃ জাল প্যাটেলের মতে গুরুতর অসুস্থ অবস্থাতেই মিশনের সঙ্গে আলোচনার জন্য দিল্লী যান ও সেখানে বরাবর অসুস্থ ছিলেন। আবার ব্রঙ্কাইটিস : বারবারই ব্রঙ্কাইটিস হচ্ছিল। দশ দিন যাবৎ তাঁর জ্বরও চলছিল। "সম্ভবতঃ তাঁর ফুসফুসের অসুখ একটানাই ছিল : তিনি সম্পূর্ণ অবসন্ন, দুর্বল ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন।" হেক্টর বলিথো , সমগ্রন্থ , ১৬০-১৬১ পৃষ্ঠা।

২. ঐ সভায় পক্ষে ২০৪ ও বিপক্ষে ৫১ ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৩. ইতিমধ্যে পার্লামেন্টে মিশনের প্রস্তাবের সরকারী ব্যাখ্যা দেওয়া সত্ত্বেও জওহরলাল দিল্লীতে ২২শে জুলাই এক জনসভায় আবার মিশনের প্রস্তাব সম্বন্ধে নিজের ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেন এবং স্বভাবতই লীগের ২৯শে জুলাই-এর প্রস্তাব গ্রহণের পক্ষে এই ঘটনাও প্ররোচনার এক কারণ হয়।

৪. ইতিমধ্যে গণপরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে গেছে এবং লীগ মোট ৭৬টি মুসলমান আসনের মধ্যে (বেলুচিস্তানের একটি এবং বঙ্গের নির্দলীয় হিসাবে নির্বাচিত

হবার পর লীগে যোগদানকারী একজন সহ) ৭৫টি আসন পেলেও কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা ২০৭ জন ছিল। দ্রঃ Constituent Assembly, পি. আর. লেলে; ফিনিক্স পাবলিকেশান, বোম্বাই (১৯৪৬); ৪৯ পৃষ্ঠা।

৫. সাংবাদিকদের কাছে নেহেরুর ঐ বিবৃতির প্রতিক্রিয়া কংগ্রেসের অপর এক প্রথম সারির নেতা প্যাটেল তাঁর "লৌহ-মানব" সদৃশ ভাষায় ব্যক্ত করেন। জিন্না কর্তৃক ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের সংবাদ প্রচারিত হবার দিন (২৯শে জুলাই) "কেন্দ্রীয় প্রদেশের" কংগ্রেস নেতা দ্বারকাপ্রসাদ মিশ্রের কাছে এক পত্রে তিনি লেখেন যে জওহরলাল, "তাঁর শিশুসুলভ হাবাগোবা ভাবের জন্য হঠাৎ আমাদের সবাইকে প্রচণ্ড অসুবিধায় ফেলেন।...তাঁর আবেগ-তাড়িত কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজকর্মের তাল সামলাতে আমাদের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে। সাধ্যাতিরিক্ত কাজ ও তজ্জনিত চাপের জন্য তাঁর মন একেবারেই পরিশ্রান্ত। তিনি নিঃসঙ্গ বোধ করেন ও ভাবাবেগের দ্বারা চালিত হয়ে কাজ করেন এবং এই পরিস্থিতিতে আমাদের সবাইকে তাঁর সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়। মাঝে মাঝে কোন প্রতিবাদের সম্মুখীন হলেই তিনি যেন পাগল হয়ে যান, কারণ তিনি অধৈর্য স্বভাবের।" জওহরলালের জীবনীকার ডঃ গোপাল অবশ্য তাঁর ঐ সাংবাদিক সম্মেলনের বিবৃতিকে কংগ্রেসের নীতির যথাযথ প্রতিফলন হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং আজাদের গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অংশ নিয়ে বিতর্ক প্রসঙ্গে নেহেরুর ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর এক বিবৃতির উদ্ধৃতি দিয়েছেন—"এ হল সে সময়ে ক্রিয়ারত ঐতিহাসিক শক্তিসমূহের বদলে একান্তভাবে ব্যক্তিগতভাবে চিন্তার নিদর্শন।" সমগ্রন্থ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩২৮।

৬. সমগ্রন্থ; ১৫৪-১৫৮ পৃষ্ঠা।

৭. জমিলউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত); সমগ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪০৭-৪১১ থেকে উলপার্ট কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ২৮০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৮. পীরজাদা; Foundations of Pakistan; দ্বিতীয় খণ্ড; পৃঃ ৫৪৬-৫৪৯ থেকে উলপার্ট কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ২৮১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৯. উলপার্ট; সমগ্রন্থ; ২৮১ পৃষ্ঠা।

১০. সীতারামাইয়া; সমগ্রন্থ; দ্বিতীয় খণ্ড; ccxxix পৃষ্ঠা।

১১. পীরজাদা; Foundations of Pakistan; দ্বিতীয় খণ্ড; পৃঃ ৫৬০। উলপার্ট কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ২৮২-২৮৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। এই অংশের রূপক-শোভিত শেষ বাক্যটি অর্থাৎ "আমাদেরও এখন পিস্তল আছে"—অনেক সময়ে জিন্নার

সমালোচকরা পূর্বাপর সম্বন্ধ ছাড়াই উদ্ধৃত করে তাঁর সম্বন্ধে ভুল ধারণা সৃষ্টির কারণ হন বলে এই উদ্ধৃতিটির সবিশেষ গুরুত্ব বিদ্যমান।

১২. উলপার্ট ; সমগ্রন্থ ; ২৮৩ পৃষ্ঠা।

১৩. প্যারেলাল , Last Phase ; প্রথম খণ্ড ; প্রথম অংশ ; ২৪০ পৃষ্ঠা।

১৪. সমগ্রন্থ , ২৪০-২৪১ পৃষ্ঠা।

১৪. জিন্না নিজের ধারা অনুসরণ করে চলেছেন : "আটচল্লিশ ঘণ্টা পূর্বে জিন্না মুসলমানদের শান্ত থাকার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন ; 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' দিবস শান্তিপূর্ণভাবে বিচার-বিবেচনার দিন, 'কোন আকার বা প্রকারের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হবার' দিন কোনক্রমেই নয়।" ডঃ আয়েষা জালাল ; সমগ্রন্থ ; পৃঃ ২১৬। বন্ধনীর অন্তর্ভুক্ত জিন্নার উক্তি চৌধুরী মহম্মদ আলীর The Emergence of Pakistan (লাহোর, ১৯৭৩) গ্রন্থের ৭৫ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত।

১৬. নেহেরুর সুস্পষ্ট প্রস্তাব ছিল ক্যাবিনেট মিশনের অনুসরণে ১৪ জনের মন্ত্রীমণ্ডলে লীগ ও কংগ্রেসের ৫টি করে আসন এবং কংগ্রেসের ৫ জনের মধ্যে এক জন জাতীয়তাবাদী মুসলমান গ্রহণ। ওয়াভেলকে লেখা নেহেরুর ১৮ই আগস্টের চিঠি। T. P. , অষ্টম খণ্ড ; ২৪৮ পৃষ্ঠা।

১৭. ডঃ আয়েষা জালাল ; সমগ্রন্থ ; ২১৫ পৃষ্ঠা।

১৮. ওয়াভেলকে পাঠানো তারবার্তা। T. P. ; অষ্টম খণ্ড ; পৃঃ ২৩৯।

১৯. জমিলউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত) ; সমগ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড , পৃঃ ৪৩৩ থেকে উলপার্ট কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ২৮৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

২০. প্যারেলাল ; Last Phase ; প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ ; ২৪৫ পৃষ্ঠা।

২১. পীরজাদা (সম্পাদিত), Foundations of Pakistan ; দ্বিতীয় খণ্ড ; পৃঃ ৫২৩। মঈন শকীর কর্তৃক তাঁর Jinnah and Muslim Separatist Strategy প্রবন্ধে (Role of Minorities in Freedom Struggle ; অজান্তা ; নূতন দিল্লী (১৯৮৬) ; পৃঃ ৫৭) উদ্ধৃত।

॥ ২৭ ॥

১. জমিলউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত) ; সমগ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড ; ৪৪ পৃষ্ঠা। উলপার্ট কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ২৮৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

২. T. P. ; অষ্টম খণ্ড ; ৪৭৮ পৃষ্ঠা।

৩. ওয়াভেলের ৮ই সেপ্টেম্বরের নোট ; T. P. ; অষ্টম খণ্ড ; পৃঃ ৪৫৩।

উল্লেখনীয় যে ইতিপূর্বে (এপ্রিল ১৯৪৬) বাংলার ছোটলাট ব্যারোজের উদ্যোগে প্রারব্ধ লীগ-কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার প্রয়াস সুরাবর্দী ও কংগ্রেস নেতা কিরণশঙ্কর রায়ের সঙ্গে পনের দিন আলোচনার পরও ব্যর্থ হয় (আয়েষা জালাল ; সমগ্রন্থ ; পৃঃ ১৬২)। জিন্না-সুরাবর্দী প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে অনেকের মতে ঐ এপ্রিল মাসে দিল্লীতে লীগের আইনসভার সদস্যদের সভায় লাহোর প্রস্তাবের একাধিক পাকিস্তানের (States) বদলে একটিমাত্র পাকিস্তান (State) গঠনের সিদ্ধান্ত সুরাবর্দীর বাঙালী জাতীয়তাবাদকে কবর দেবার জন্য জিন্নার এক কৌশল।

৪. সমগ্রন্থ, পৃঃ ২২০-২২১। উদ্ধৃতির মধ্যে প্রদত্ত জিন্নার ৯ই সেপ্টেম্বরের বিবৃতি এবং ওয়াভেলের মন্তব্য T. P. ; অষ্টম খণ্ড ; পৃঃ ৪৭৭, ৪৭৮, ৫৮৮ ও ৬৪৪ পৃষ্ঠা থেকে গৃহীত।

৪. খলিকুজ্জমাঁ, সমগ্রন্থ ; ৩৬৫ পৃষ্ঠা।

৬. উলপার্ট ; সমগ্রন্থ ; ২৯১ পৃষ্ঠা।

৭. ৬ই অক্টোবরের চিঠি ; T. P., অষ্টম খণ্ড ; ৬৭১ পৃষ্ঠা।

৮. ২১শে অক্টোবরের Hindusthan Times থেকে উদ্ধৃত। সমগ্রন্থ ; পৃঃ ১৭৯। এ প্রসঙ্গে এব দিনকয়েক পর প্রদত্ত জিন্নার বক্তব্য উল্লেখযোগ্য : "তাঁদের (কংগ্রেসকে) প্রশাসনের একতরফা দায়িত্বে রাখা আমাদেব স্বার্থের পক্ষে মারাত্মক হত। আমরা তাই আমাদের পাঁচজন প্রহরীকে মনোনীত করতে বাধ্য হই যাঁরা মুসলিম স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন এবং তা সুরক্ষিত কববেন।" (সন্ধ্যা চৌধুরী ; সমগ্রন্থ ; পৃঃ ১৮০)।

৯. প্যারেলাল, Last Phase ; প্রথম খণ্ড ; প্রথম অংশ ; ২৬৯ পৃষ্ঠা।

১০. সমগ্রন্থ ; ২৭৫ পৃষ্ঠা।

১১. জমিলউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত) ; সমগ্রন্থ ; দ্বিতীয় খণ্ড ; পৃঃ ৩৫৯-৩৬১ থেকে জে. জে. পাল কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ১২৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১২. T. P. ; নবম খণ্ড ; ২৪৬-২৪৭ পৃষ্ঠা।

১৩. সমগ্রন্থ ; ২৬০-২৬১ পৃষ্ঠা।

১৪. Ten years of Freedom ; পৃঃ ১৯০-১৯১ থেকে উলপার্ট কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের পৃঃ ৩০১-৩০২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১৫. উলপার্ট ; সমগ্রন্থ ; ৩০৩-৩০৪ পৃষ্ঠা। গোপনে জিন্নার সঙ্গে চার্চিলের যে পত্রব্যবহার হত তার একটির সন্ধান সম্প্রতি পাওয়া গেছে। চার্চিলের পত্রের সম্পূর্ণ বয়ানের জন্য দিল্লীর Hindusthan Times দৈনিকের ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুনের

সংখ্যা দ্রষ্টব্য। পত্রটি লণ্ডন থেকে প্রকাশ্য ডঃ মার্টিন গিলবার্টের চার্চিলের জীবনী গ্রন্থের অষ্টম খণ্ড থেকে গৃহীত।

১৬. সমগ্রন্থ ; ৩০৪ পৃষ্ঠা।

১৭. খলিকুজ্জমাঁ ; সমগ্রন্থ ; ৩৭২ পৃষ্ঠা।

১৮. T. P. ; নবম খণ্ড , ৩৩৩-৩৩৪ পৃষ্ঠা।

১৯. ডঃ গোপাল ; Jwaharlal Nehru , প্রথম খণ্ড , ৩৩৮ পৃষ্ঠা।

২০. উলপার্ট ; সমগ্রন্থ ; ৩০৫ পৃষ্ঠা।

॥ ২৮ ॥

১. ল্যারি কলিন্স ও ডোমিনিক লাপিয়ার ; Mountbatten and Partition of India ; বিকাশ, নূতন দিল্লী (১৯৮২) ; ৪২ পৃষ্ঠা।

২. হডসন ; The Great Divide , ৩৭ পৃষ্ঠা।

৩. ল্যারি কলিন্স ও ডোমিনিক লাপিয়ার , Freedom at Midnight (নিউ ইয়র্ক) ১৯৭৫ ; ৪২ পৃষ্ঠা।

৪. এই জটিল প্রশ্ন সম্বন্ধে আজাদের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য : "শ্রীযুক্ত জিন্নার যুক্তি ছিল কেন্দ্র, প্রদেশসমূহ এবং প্রদেশগোষ্ঠীগুলির মধ্যে ক্ষমতা বিভাজনের ভিত্তিতেই তিনি লীগকে ঐ পরিকল্পনা গ্রহণে রাজী করিয়েছিলেন। আসামের কংগ্রেস নেতারা এতে সম্মত হন নি এবং কিছুটা দ্বিধার পর গান্ধীজী···আসামের নেতাদের প্রস্তাবিত ভাষ্যকে সমর্থন করেন। ন্যায়বিচারের খাতিরে আমাকে স্বীকার করতে হবে যে শ্রীযুক্ত জিন্নার বক্তব্যে যৌক্তিকতা ছিল।" (সমগ্রন্থ ; পৃঃ ১৭৪)।

৫. T. P. ; দশম খণ্ড , পৃঃ ৯৪৫-৯৪৬। বার্তাটি হল : "এ প্রস্তাব আপনি যদি দুই হাত বাড়িয়ে গ্রহণ না করেন তাহলে পাকিস্তানের বাঁচা মরার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াবে।" ঐ আলোচনাপ্রসঙ্গে মাউণ্টব্যাটেন যখন জিন্নার মতিগতির অনিশ্চয়তার কথা জানান তখন "শ্রীযুক্ত চার্চিল গভীর বিস্ময় ব্যক্ত করে বললেন, 'ঈশ্বরের দোহাই, তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যাঁর ব্রিটিশের সাহায্য ছাড়া চলে না'।"

৬. T. P. ; নবম খণ্ড ; পৃঃ ৫৪২-৫৪৩। তারিখবিহীন এই প্রতিবেদনটির একটি নকল ২৪শে জানুয়ারী অ্যাবেল ভারতসচিবের অবগতির জন্য পাঠান।

৭. প্যাটেলের একান্ত বিশ্বাসভাজন ভি. পি. মেনন জানিয়েছেন যে (Tansfer of Power ; পৃঃ ৩৫৮-৩৫৯) সর্দারের সম্মতিতে জানুয়ারী মাসেই তিনি ভারত-

বিভাজনের এক পরিকল্পনা রচনা করেন। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের উপরসারির কোন কোন নেতা ভারত-বিভাগ অবধারিত মনে করা শুরু করেছেন।

৮. সমগ্রন্থ, পৃঃ ৩৭৩। প্রধানমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে এজাতীয় জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা অসন্তুষ্ট ইংরেজ সিভিলিয়ানদের আর একটি চাল কিনা তা আরও গবেষণার বিষয়। পাঞ্জাব সরকার অবশ্য এর সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উপরও নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন।

৯. অন্যত্রও পাকিস্তানের জন্য সামরিক পদ্ধতিতে প্রস্তুতি চলছিল। এ সম্বন্ধে খলিকুজ্জমাঁর সাক্ষ্য উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে লীগ সমর্থক বেলুচিস্তানের কালাতের খাঁ দিল্লীতে তাঁর সঙ্গে সম্পত্তি সংক্রান্ত এক পরামর্শের জন্য দেখা করেন। "মুসলমানদের পাকিস্তান দেওয়া না হলে ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য যে প্রস্তুতি করা হচ্ছে তার কথাও তিনি আমাকে জানান। তিনি এক গেরিলা যুদ্ধ সংগঠন করার কথাও জানান যার জন্য শ্রীযুক্ত জিন্না ইসকন্দর মীর্জার সহায়তা লাভ করেছিলেন।" (সমগ্রন্থ; ৩৮ পৃষ্ঠা)। খলিকুজ্জমাঁ। আরও জানিয়েছেন যে লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে না জানিয়েই আসামে মৌলানা ভাসানী প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছিলেন এবং অবশেষে জিন্নার নির্দেশে তাল সামলাতে তাঁকে আসামে যেতে হয়েছিল।

১০. মন্ত্রীমণ্ডলীর বৈঠকের বিবরণ। T. P.; নবম খণ্ড; ৬১৮ পৃষ্ঠা।

১১. সমগ্রন্থ; ৭৭৪ পৃষ্ঠা।

১২. শরীফ অল মুজাহিদ; সমগ্রন্থ, পৃঃ ৬৩৭।

১৩. উলপার্ট; সমগ্রন্থ, পৃঃ ৩০৯। উদ্ধৃতি চিহ্নের ভিতরস্থ অংশ ভারত সচিবের কাছে পাঞ্জাবের ছোটলাট জেনকিন্সের ২৫শে ফেব্রুয়ারীর প্রতিবেদন থেকে। দ্রঃ T. P.; নবম খণ্ড; ৮১৪-৮১৫ পৃষ্ঠা।

১৪. ডঃ আয়েষা জালাল; সমগ্রন্থ; পৃঃ ২৩৮-২৩৯। উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যস্থিত অংশ পাঞ্জাবের ছোটলাট জেনকিন্সের বড়লাটকে পাঠানো ২৮শে ফেব্রুয়ারীর প্রতিবেদন থেকে।

১৫. উলপার্ট; সমগ্রন্থ; ৩১১ পৃষ্ঠা।

১৬. সমগ্রন্থ; পৃঃ ৩১৩-৩১৪। উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যস্থিত অংশ বড়লাটের সচিব অ্যাবেলের কাছে পাঠান ১৭ই মার্চের প্রতিবেদন থেকে। দ্রঃ T. P.; নবম খণ্ড; ৯৬১-৯৬২ এবং ৯৬৫-৯৬৯ পৃষ্ঠা।

১৭. Divide and Quit; ৮৭ পৃষ্ঠা।

১৮. সমগ্রন্থ ; পৃঃ ৩৮৮। খলিকুজ্জমাঁর এই মন্তব্য অবশ্য ভারতের স্বাধীনতা বিলের প্রসঙ্গে চার্চিলের অনুরূপ অভিমতের উপর।

১৯. উলপার্ট ; সমগ্রন্থ ; ৩১২ পৃষ্ঠা।

২০. আজাদ ; সমগ্রন্থ ; ১৮০ পৃষ্ঠা।

॥ ২৯ ॥

১. জালাল ; সমগ্রন্থ ; ২৩৬ পৃষ্ঠা। হডসন ; সমগ্রন্থ ; পৃঃ ১৯৪। জাইগলার ; Mountbatten ; উইলিয়াম কলিন্স, লণ্ডন (১৯৮৫) ; পৃঃ ৩৫৫। T. P. ; নবম খণ্ড ; পৃঃ ৪৫১। জাইগলার অবশ্য একথাও জানিয়েছেন যে বড়লাট হিসাবে মাউন্টব্যাটেনের নাম প্রস্তাবিত হবার পূর্বেই মন্ত্রীসভায় এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কথা হয় এবং প্রত্যক্ষভাবে এটলী এবং প্রকারান্তরে ওয়াভেলেরও এ ব্যাপারে ভূমিকা ছিল।

২. জাইগলার, সমগ্রন্থ ; ৩৬৪ পৃষ্ঠা।

৩. T. P. ; নবম খণ্ড ; ৯৪৮-৯৪৯ পৃষ্ঠা।

৪. T. P. ; নবম খণ্ড ; ৯৭২-৯৭৪ পৃষ্ঠা।

৫. প্যারেলাল ; সমগ্রন্থ ; দ্বিতীয় খণ্ড ; পৃঃ ৭৯-৮৪। আরও দ্রষ্টব্য T. P. ; দশম খণ্ড ; পৃঃ ৬৯-৭০। এ সম্বন্ধে মৌলানার বক্তব্য : "দুর্ভাগ্যক্রমে জওহরলাল ও সর্দার প্যাটেলের তীব্র বিরোধিতার জন্য এই পদক্ষেপ তেমন অগ্রগতি করতে পারে নি। বস্তুতঃ তাঁরা গান্ধীজীকে এ প্রস্তাব প্রত্যাহারে বাধ্য করেন।" (সমগ্রন্থ ; পৃঃ ১৮৭)।

৬. অ্যালান ক্যাম্পবেল জনসন ; Mission With Mountbatten ; ৫৬ পৃষ্ঠা।

৭. জাইগলার ; সমগ্রন্থ ; পৃঃ ৩৬৮। উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে মাউন্টব্যাটেনের উক্তি বড়লাটের ১১ই এপ্রিল ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের কর্মীসভার বিবরণী থেকে (দ্রঃ T.P. ; দশম খণ্ড ; পৃঃ ১৯০)। এ সম্বন্ধে পরবর্তীকালে মাউন্টব্যাটেনের মন্তব্য : "আমি কখনও কল্পনা করতে পারি নি যে একজন বুদ্ধিমান, উচ্চশিক্ষিত এবং ইংলণ্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিজের মনের দুয়ারকে এমনভাবে বন্ধ করে রাখতে পারেন। তিনি যে এটা বুঝতে পারতেন না তা নয়—তিনি স্রেফ মনের দরজাকে বন্ধ করে দিতেন। যেন দরজার পাল্লা বন্ধ হয়ে যেত। তখন আমি উপলব্ধি করলাম যে তিনি যতদিন জীবিত থাকবেন কিছুই করা যাবে না। আর সবাইকে

বোঝানো সম্ভব হত, কিন্তু জিন্নাকে নয়।" (ল্যারি কলিন্স ও ডোমিনিক ল্যাপিয়ার ; Mountbatten and the Partition of India ; পৃঃ ৪৪।

৮. T. P ; দশম খণ্ড ; ১৯০ পৃষ্ঠা।

৯. জাইগলার ; সমগ্রন্থ ; পৃঃ ৩৭৩-৩৭৪। T. P. ; দশম খণ্ড ; ১৯২ পৃষ্ঠাও দ্রষ্টব্য।

১০. তুলনীয় মাউন্টব্যাটেনের জবানবন্দীতে জিন্নার উক্তি : "...পাঞ্জাব এক জাতি (nation)। বঙ্গ এক জাতি। হিন্দু বা মুসলমান হবার পূর্বে মানুষ পাঞ্জাবী বা বাঙ্গালী।" (ল্যারি কলিন্স ও ডোমিনিক ল্যাপিয়ার ; সমগ্রন্থ ; পৃঃ ৪৩)।

১১. উভয়ের আলোচনার বিবরণের জন্য T. P. ; দশম খণ্ড ; পৃঃ ১৩৮-১৮৮ দ্রষ্টব্য। পরবর্তীকালে ঐসব আলোচনাপ্রসঙ্গে মাউন্টব্যাটেন ল্যারি কলিন্স ও ডোমিনিক ল্যাপিয়ারের কাছে যেসব মন্তব্য করেন তা তাঁদের Mountbatten and Partition of India গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এর কয়েকটি হল : "শ্রীযুক্ত জিন্না চিরকাল ব্রিটিশের অধীনে চালিয়ে যেতে খুবই সুখী বোধ করতেন।" (পৃঃ ১৫) "একটানা 'না' বলার কারণ তিনি (জিন্না) যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছিলেন, তা তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।" (পৃঃ ৩৯)। "জিন্না ছিলেন একক ঐক্যতান বাদন।" (পৃঃ ৩৯)। "জিন্না বিকৃত-মস্তিষ্ক ছিলেন। তাঁর সঙ্গে কাজকারবার করা একেবারেই—সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব।" (পৃঃ ৪০)। "...তিনি (জিন্না) ছিলেন একমাত্র—আবার বলছি একমাত্র বাধা।" (পৃঃ ৪০)। "তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এ (অবিভক্ত ভারত) সম্ভব হতে দেন নি। জিন্নার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ হবার পূর্বে আমি বুঝতে পারি নি যে ব্যাপারটা কী পরিমাণ অসম্ভব হতে চলেছে...আমি বুঝতে পারি নি যে জিন্নার ব্যাপারে কিছুই করা সম্ভব নয়। তিনি তাঁর মন একেবারে তৈরী করে নিয়েছিলেন। কোন কিছুতেই তাঁকে নড়ানো সম্ভব ছিল না (পৃঃ ৪২)।" "...কোন ব্যাপারে মনের অর্গল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেবার ক্ষমতা তাঁর (জিন্নার) ছিল। অপরের যুক্তি তিনি ঠিকই বুঝতেন, তিনি দক্ষ বিতর্ককারীও ছিলেন, তাঁর মানসিক গঠন অত্যন্ত পরিশীলিত ছিল, তিনি ছিলেন আইনজীবী। তবে তাঁর সম্বন্ধে আমার এই ধারণা হয়েছিল যে তিনি তাঁর মনের দরজা বন্ধ করে দিতেন, কান বন্ধ রাখতেন, তিনি বুঝতে চাইতেন না, শুনতে চাইতেন না। আমার বলার উদ্দেশ্য হল—যা কিছুই অপর পক্ষ বলুক না কেন, তা তাঁকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করত

না।...তাঁর শক্তির মূল...এসব তিনি পেতেন তাঁর মনের অর্গল বন্ধ করে ও "না' বলে।" (পৃঃ ৪৫)।

১২. জেনকিন্সের ১৬ই এপ্রিলের নোট। T. P.; দশম খণ্ড; ২৮২-২৮৩ পৃষ্ঠা।

১৩. ভি. বি. কুলকার্নী; The Indian Triumvirate; ভারতীয় বিদ্যাভবন, বোম্বাই; ২০২ পৃষ্ঠা।

১৪. টেণ্ডুলকর; সমগ্রন্থ; সপ্তম খণ্ড; ৪৪৪-৪৪৫ পৃষ্ঠা।

১৫. ২৩শে এপ্রিলে অনুষ্ঠিত বড়লাটের সপ্তম বিবিধ সভার আলোচনা বিবরণী। T. P.; দশম খণ্ড; ৩৮১ পৃষ্ঠা।

১৬. জালাল; সমগ্রন্থ; ২৬১-২৬২ পৃষ্ঠা।

১৭. অ্যালান ক্যাম্পবেল জনসন; সমগ্রন্থ; ৮৪ পৃষ্ঠা।

১৮. সমগ্রন্থ; ৮৫ পৃষ্ঠা।

১৯. প্যারেলাল; সমগ্রন্থ; দ্বিতীয় খণ্ড, ১৬৯ পৃষ্ঠা।

২০. সমগ্রন্থ; ১৭৬-১৯০ পৃষ্ঠা।

২১. ঐ সময়ে জিন্না বলেছিলেন যে পাকিস্তানে যোগ না দিয়েও বাংলা যদি অবিভক্ত থাকে তবে তিনি "খুশী" হবেন। কারণ "কলকাতা ছাড়া বঙ্গের সার্থকতা কি? বরং তাঁরা ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন হয়েই থাকুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁরা আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বভাবাপন্ন থাকবেন।" T. P.; দশম খণ্ড; পৃঃ ৪৫২। সংবাদপত্রের বিবরণ থেকেও জানা যায় যে, এমন কি ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসেও পুরা পাঞ্জাবসহ সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তান পেলে জিন্না বঙ্গের উপর থেকে তাঁর দাবি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন। (দ্রঃ প্যারেলাল; সমগ্রন্থ; দ্বিতীয় খণ্ড; পৃঃ ১৭৮)।

২২. বঙ্গীয় লীগের "সার্বভৌম বঙ্গ" আন্দোলনের বিস্তারিত কাহিনীর জন্য ডঃ শীলা সেনের সমগ্রন্থ পৃঃ ২২৩-২৪৫ দ্রষ্টব্য।

২৩. জিন্নার ১৭ই মে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের নোট। T. P.; দশম খণ্ড; ৮৫২-৮৫৩ পৃষ্ঠা।

২৪. জালাল; সমগ্রন্থ; ২৩৫ পৃষ্ঠা।

২৫. T. P.; দশম খণ্ড; ৮৯৬ পৃষ্ঠা।

২৬. ভি. বি. কুলকার্নী; সমগ্রন্থ; ২০২-২০৩ পৃষ্ঠা।

২৭. T. P.; দশম খণ্ড; ৯২৯-৯৩০ পৃষ্ঠা।

২৮. জাইগলার; সমগ্রন্থ; পৃঃ ৩৮৫। এ প্রসঙ্গে T. P.; দশম খণ্ড; ৯৪৪-৯৪৬ পৃষ্ঠাও দ্রষ্টব্য।

২৯. জাইগলার ; সমগ্রন্থ ; ৩৮৬ পৃষ্ঠা।

৩০. অ্যালান ক্যাম্পবেল জনসন ; সমগ্রন্থ ; ১০২-১০৩ পৃষ্ঠা।

৩১. জাইগলার ; সমগ্রন্থ ; পৃঃ ৩৯২। মাউণ্টব্যাটেনের উক্তির উদ্ধৃতির জন্য T. P. ; একাদশ খণ্ড ; পৃঃ ১৬৩ দ্রষ্টব্য।

৩২. T. P. ; দশম খণ্ড ; পৃঃ ৮৯৯। খলিকুজ্জমাঁ জানিয়েছেন (সমগ্রন্থ ; পৃঃ ৩৯০-৩৯১) যে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত অথবা ১৪ই আগস্ট পাকিস্তানের সৃষ্টি হবে—এ সিদ্ধান্ত এককভাবে জিন্নারই। কারণ ৯ই জুন ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পর লীগ ওয়ার্কিং কমিটি অথবা কাউন্সিলের কোন সভা হয় নি। খলিকুজ্জমাঁ এও বলেছেন যে সাধারণ ধারণা এই রকমের ছিল যে অন্তর্বর্তী কালের জন্য মাউণ্টব্যাটেন উভয় ডোমিনিয়নের বড়লাট হবেন।

৩৩. সমগ্রন্থ ; ১২৭ পৃষ্ঠা।

৩৪. সমগ্রন্থ ; পৃঃ ২৯২। ২৩শে অক্টোবর থেকে উপজাতীয়দের অভিযানের নামে পাকিস্তান কর্তৃক কাশ্মীর আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে বড়লাট হিসাবে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক না হবার সমস্যা জিন্না উপলব্ধি করেছিলেন। ব্রিটিশ সৈন্যদের সুপ্রীম কমাণ্ডার ফিল্ড মার্শাল অচিনলেকের নির্দেশ ছাড়া কেবল বড়লাট জিন্নার ২৭শে অক্টোবরের আদেশে পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনীর অস্থায়ী প্রধান সেনাপতি জেনারেল স্যার ডগলাস গ্রেসি কাশ্মীরে সৈন্য পাঠাতে অস্বীকার করে পাকিস্তানের পক্ষে কাশ্মীর দখলের সম্ভাবনা তিরোহিত করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পাকিস্তানের সামরিক শাসনের বীজও সম্ভবতঃ জিন্নার এই মানসিকতা ও কার্যপদ্ধতিতে নিহিত।

৩৫. সমগ্রন্থ ; ৩৩৩ পৃষ্ঠা।

৩৬. খলিকুজ্জমাঁ ; সমগ্রন্থ ; ৩৯৩ পৃষ্ঠা।

৩৭. উলপার্ট ; সমগ্রন্থ ; ৩৩৪ পৃষ্ঠা।

৩৮. "অন্ততঃ এ ব্যাপারে আমি আপনাদের সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতি দেব। যাতে কোন রক্তপাত বা দাঙ্গা না হয় তা আমি দেখব। আমি সৈনিক, কোন অসামরিক নাগরিক নই। একবার দেশবিভাগ নীতিগতভাবে স্বীকৃত হয়ে গেলে দেশের কুত্রাপি যাতে সাম্প্রদায়িক অশান্তি না হয় তার ব্যবস্থা করার জন্য আদেশ জারি করব। বিন্দুমাত্র গোলযোগের আশঙ্কা দেখলেই আমি তা অঙ্কুরে বিনষ্ট করার জন্য কঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বন করব। আমি এমন কি সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকেও নিয়োগ করব না। আমি স্থল ও বিমান বাহিনীকে কাজে নেমে পড়ার হুকুম দেব। যে কেউ

গোলযোগ সৃষ্টি করতে চায় তাকে দমন করার জন্য আমি সাঁজোয়া গাড়ী ও বিমানবহর নিয়োগ করব।" মাউন্টব্যাটেনের পূর্বোক্ত উক্তি আজাদ কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ১৯০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। মাউন্টব্যাটেনের প্রতিশ্রুতি প্রসঙ্গে মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে এটলীর প্রতিবেদনও স্মরণীয়: "ব্যাপক সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ রোধের একমাত্র সম্ভাবনা হল এর প্রথম নিদর্শনকে সাঁজোয়া গাড়ী ও বিমানবহরসহ যা কিছু শক্তির প্রয়োজন তার প্রয়োগ করে অবিলম্বে ও কঠোর হস্তে দমন করা।" T. P.; দশম খণ্ড; ৯৬৭ পৃষ্ঠা।

৩৯. উলপার্ট, সমগ্রন্থ; ৩৩৬ পৃষ্ঠা।

৪০. শরীফ অল মুজাহিদ, সমগ্রন্থ; ৬৪১ পৃষ্ঠা।

॥ ৩০ ॥

১. লিওনার্ড মসলে; The Last Days of the British Raj; ওয়াইডেনফিল্ড অ্যাণ্ড নিকলসন, লণ্ডন (১৯৬১); ২৪৭ পৃষ্ঠা।

২. শরীফ অল মুজাহিদ; সমগ্রন্থ; ৬৪২ পৃষ্ঠা।

৩. সমগ্রন্থ; ৬৪৪ পৃষ্ঠা।

৪. রাজমোহন গান্ধী; Eight Lives; রোলি বুকস, দিল্লী (১৯৮৬); পৃঃ ১৭৭-১৭৯ ও ২৬৯।

৫. শরীফ অল মুজাহিদ; সমগ্রন্থ; ৬৫০-৬৫১ পৃষ্ঠা।

৬. সমগ্রন্থ; পৃঃ ৩২০-৩২১। খলিকুজ্জমাঁর গ্রন্থে বক্তৃতাটির মাস ভুল উল্লেখ করা হয়েছে। এটি আগস্ট হবে।

৭. "ব্রিটিশের ভূমিকা এমন কিছুর সৃষ্টি করে নি, যার অস্তিত্ব পূর্বে ছিল না। এমন কিছু করা একান্তভাবেই এর ক্ষমতাবহির্ভূত ছিল। যা সুপ্ত অবস্থায় ছিল তাকে হয়ত ইংরেজ সময় সময় জাগিয়েছে এবং যা পাপ তাকেও প্রায়ই কাজে লাগিয়েছে। বর্তমানেরই মত হিন্দু ও মুসলমানের সম্মিলিত ইতিহাস সম্বন্ধে অতীতেও তাদের মধ্যে মতভেদ ছিল এবং তাদের আত্মানুভূতি (identity) ও কার্য-কলাপের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে পার্থক্যের এইটাই হল প্রধান কারণ।" (লোহিয়া; সমগ্রন্থ; পৃঃ ৬-৭)

৮. ফতিমা জিন্নার My Brother গ্রন্থ থেকে উলপার্ট কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ৩৪৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৯. সমগ্রন্থ; ৯৫ পৃষ্ঠা।

১০. "Reminiscences of the Quaid"; জিয়াউদ্দীন আহমদের Mohammad Ali Jinnah (করাচী, ১৯৭৬) গ্রন্থের পৃঃ ৬১-৭০। উলপার্ট কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ৩৪৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১১. এই তথ্যের সমর্থন অন্যান্য সূত্র থেকেও মেলে। পাকিস্তানের সৃষ্টির কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তাঁর এককালের অন্তরঙ্গ সহকর্মীদের প্রতি একান্ত বিরূপ হয়ে ওঠেন এবং একাধিক ব্যক্তির কাছে তাঁদের সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য করেন। দ্রঃ উলপার্ট; সমগ্রন্থ, ৩৬০-৩৬১ পৃষ্ঠা।

১২. Portraits of Myself, সাইমন অ্যাণ্ড সুস্টার; নিউইয়র্ক (১৯৬০); ১৯০-১৯১ পৃষ্ঠা।

১৩. জমিলউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত); দ্বিতীয় খণ্ড; ৫৬৮ পৃষ্ঠা।

১৪. ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে বোম্বাই-এ আলোচনাপ্রসঙ্গে ভ্রাতৃভাব নিয়ে পৃথক ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকুক—গান্ধীর এই প্রস্তাব জিন্না প্রত্যাখ্যান করলেও (জিন্নার ২১শে সেপ্টেম্বরের চিঠি, ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়), সম্ভবতঃ কালপ্রভাবে জিন্না এর যৌক্তিকতা উপলব্ধি করেছিলেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন: "ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে আমাদের নিজস্ব সর্বোচ্চ স্বার্থের খাতিরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তান ও ভারতীয় ডোমিনিয়নের পক্ষে নিজ নিজ ভূমিকার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন। এছাড়া এই একই কারণে পাকিস্তান ও ভারতবর্ষ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও ভূভাগ এবং সমুদ্রের দিক থেকে যে কোন বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করার জন্য বন্ধুত্বমূলকভাবে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করুক এটাও উভয় রাষ্ট্রের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।" (Selected Speeches and Statements of Quaid-i-Azam Mohammad Ali Jinnah, এম. রফিক আফজল, লাহোর (১৯৭৬); পৃঃ ৪৫৮-৪৫৯। রিয়াজ আহমদ কর্তৃক Indo-Pakistan Relations as Visualised by Quaid-i-Azam M. A. Jinnah প্রবন্ধের ৫৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। South Asian Studies; লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া অধ্যয়ন কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত; জুলাই ১৯৮৪ সংখ্যা)। উভয় দেশই নিজ নিজ জাতির জনকের ইচ্ছার প্রতিকূল আচরণ করে নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুঠারাঘাত করছে—এও আধুনিক ইতিহাসের এক নিষ্ঠুর পরিহাস।

১৫. Facts are Facts : The Untold Story of India's Partition ; বিকাশ, দিল্লী (১৯৮৭) ; পৃঃ ১২৪, ১৪৩, ১৫২-১৫৪ ।

১৬. হেক্টর বলিথো ; সমগ্রন্থ ; ১৯০ পৃষ্ঠা ।

১৭. খলিকুজ্জমাঁ ; সমগ্রন্থ ; ৩৯৭-৩৯৯, ৪০৩-৪০৫ এবং ৪১০-৪১৩ পৃষ্ঠা। সুরাবর্দীও এ অভিমত সমর্থন করেছেন। দ্রঃ Memoirs of H. S. Suhrawardy ; এম. এইচ. আর. তালুকদার সম্পাদিত ; ইউনিভার্সিটি প্রেস, ঢাকা (১৯৮৭) ; পৃঃ ১০৯ ।

১৮. সলীম. এম. এম. কুরেশী , Iqubal and Jinnah : Personalities, Perceptions and Politics ; সি. এম. নঈম (সম্পাদিত) Iqubal Jinnah and Pakistan ; জিন্না পাবলিশিং হাউস, দিল্লী (১৯৮২) ; পৃঃ ৩৪-৩৬ ।

১৯. সি. এম. নঈম ; সমগ্রন্থ , পৃঃ ১৮৭ ।

২০. চাগলা ; সমগ্রন্থ ; ১২০ পৃষ্ঠা ।

২১. লিওনার্ড মসলের মতে (সমগ্রন্থ , পৃঃ ২৪৩) পাকিস্তানের অমুসলমানদের শতকরা ৪০ ভাগ—আনুমানিক দেড় কোটি নরনারীকে বাস্তুত্যাগ করতে হয়। ভারতবর্ষ থেকে মুসলিম বাস্তুত্যাগীদের সংখ্যাও কম ছিল না। দেশবিভাজনপূর্ব দাঙ্গা ও উদ্বাস্তু-প্রবাহের বিবরণের জন্য মার্গারেট ব্রুক হোয়াইটের Half Way to Freedom (সাইমন অ্যাণ্ড সুস্টার, নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৯) দ্রষ্টব্য। তাঁর শরণার্থীদের দুই তরফা অভিযানের আলোকচিত্রগুলিও ঐতিহাসিক দলিল। এ ছাড়া ফ্রান্সিস টুকারের While Memory Serves (ক্যাসেল ; লণ্ডন, ১৯৫০) ; হডসনের The Great Divide (অক্সফোর্ড, করাচী ১৯৬৯) ; পেনডেরেল মুনের Divide and Quit (চ্যাটো অ্যাণ্ড উইণ্ডাস, লণ্ডন, ১৯৬৪), খুঁটিনাটি তথ্যে কোথাও কোথাও ভুল থাকলেও নাটকীয়ভাবে বর্ণনার জন্য ল্যারী কলিন্স ও ডোমিনিক ল্যাপিয়ারের Freedom at Midnight প্রমুখ গ্রন্থ উল্লেখনীয়। ভারত বিভাগের সঙ্গে সম্পর্কিত দাঙ্গায় মৃতের সংখ্যা দুই থেকে দশ লক্ষ (পেনডেরেল মুন ; সমগ্রন্থ ; পৃঃ ২৮৩) বলে অনুমিত হয়।

২২. Speeches by Quaid-i-Azam Mohammed Ali Jinnah, Governor General of Pakistan, (করাচী) ; পৃঃ ১৮। অ্যালেন হেইস মেরিয়াম কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ১৩৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

২৩. উলপার্ট ; সমগ্রন্থ ; ৩৫৩ পৃষ্ঠা।

২৪. অ্যালান ক্যাম্পবেল জনসন ; Mission with Mountbatten ; ২৮৩ পৃষ্ঠা।

২৫. এই প্রহেলিকার নিদর্শন হিসাবে অসাম্প্রদায়িক ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনে সম্ভবতঃ উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর চাহিদা মেটাতে তিনি যে সাম্প্রদায়িক ভূমিকা নিতেন সত্যের খাতিরে তার কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। এর তিনটি উদাহরণ পেশ করা হবে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর করাচীতে সৈন্যবাহিনীর তিনটি শাখার অফিসারদের সামনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "পরিকল্পনা ছিল এই যে আমরা এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করব যেখানে আমরা স্বাধীন মানুষ হিসাবে বাঁচতে ও নিঃশ্বাস নিতে পারি, যার বিকাশ আমরা আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি অনুসারে করতে পারি এবং সেখানে ঐস্লামিক সামাজিক ন্যায়বিচারের আদর্শ চূড়ান্তভাবে অবাধে ক্রিয়াশীল থাকতে পারে।" ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ চট্টগ্রামে এক নাগরিক সংবর্ধনার প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, "পাকিস্তানের ভিত্তি হবে সামাজিক ন্যায়বিচার ও ঐস্লামিক সমাজবাদের মজবুত বুনিয়াদ···।" ২৮শে মার্চ ঢাকা বেতারকেন্দ্র থেকে জাতির উদ্দেশে ঘোষণা করেন, "পাকিস্তান মুসলিম জাতির (nation) ঐক্যের মূর্ত প্রতীক এবং তা-ই থাকবে। সাচ্চা মুসলমান হিসাবে আমাদের সেই ঐক্যকে সতর্কভাবে প্রহরা দিতে হবে ও রক্ষা করতে হবে। (শরীফ অল মুজাহিদ ; সমগ্রন্থ ; ৬৪৩, ৬৫৩ ও ৬৫৪ পৃষ্ঠা)।

২৬. সমগ্রন্থ ; ১৮৩ পৃষ্ঠা।

২৭. ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল বড়লাট লিনলিথগো ভারতসচিবকে এক তারবার্তায় জানান : "জিন্না এইজন্য এ (পাকিস্তান) প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন যাতে তিনি দেখাতে পারেন যে মুসলমানদের নিজেদেরও কোন গঠনমূলক পরিকল্পনা আছে, যাতে কংগ্রেসের উগ্রবাদী গোষ্ঠীর স্বাধীনতার দাবির বিরোধিতা করা যায় এবং কংগ্রেসের এই দাবিরও খণ্ডন হতে পারে যে ঐ প্রতিষ্ঠানই ভারতবর্ষের একমাত্র প্রতিনিধি ও ভবিষ্যৎ প্রগতির একমেব উপায় হল প্রাপ্তবয়স্কদের মতাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত এক গণপরিষদ।" সন্ধ্যা চৌধুরী কর্তৃক Gandhi and the Partition of India গ্রন্থের ৬২-৬৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। পাকিস্তান দাবি সম্বন্ধে অন্যান্য পদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারীদের অনুরূপ অভিমতের জন্যও ঐ গ্রন্থের পৃঃ ৬৩ দ্রষ্টব্য।

২৮. "The First Phase of Quaid-i-Azam Jinnah's Leadership in Muslim League : A Political Study" দ্রষ্টব্য। (Grassroots : Biannul Research Journal Pakistan Study Centre ; সিন্ধু

বিশ্ববিদ্যালয়; জামশোরো, সিন্ধু প্রদেশ; ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ড—১৯৮২-৮৩; ৯-৩১ পৃষ্ঠা।)

২৯. আলোচনাপ্রসঙ্গে এর বহুবিধ উদাহরণ দেওয়া হলেও অপর একটি সাক্ষ্য উপস্থাপিত করা হবে এক সুযম বুদ্ধির দক্ষ প্রশাসক ও তদানীন্তন ভারতীয়-রাজনীতির গোপন খবর সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি স্যার মীর্জা ইসমাইলের আত্মকথা থেকে: "অকস্মাৎ জিন্নার এরকম গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বয়ং জিন্নার চেয়ে বোধহয় আর কেউ অধিক বিস্মিত হন নি। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলেন, যুদ্ধ ঘোষণার পর বড়লাট স্বভাবতই লীগের সাহায্য চেয়েছিলেন। অকস্মাৎ আমার প্রতি বড়লাটের আচরণে একটা পরিবর্তন লক্ষিত হল। আমার সঙ্গে শ্রীযুক্ত গান্ধীর মত একই রকম আচরণ করা হতে লাগল। কংগ্রেস হাই-কম্যাণ্ডের প্রতি তা হল প্রচণ্ডতম আঘাত। আমি বিস্ময়াভিভূত হলাম। অকস্মাৎ কেন আমার এই পদোন্নতি এবং শ্রীযুক্ত গান্ধীর পাশাপাশি আসন দেওয়া? এর উত্তর হল অখিল ভারত মুসলিম লীগ। অধ্যাপক এডওয়ার্ড টমসনও এই বলে একথার পুষ্টি করেন যে, 'জিন্নাকে একরকম মুসলমানদের মহাত্মারূপে বিবেচনা করা সরকারী প্রথায়' পরিণত হল। লণ্ডনে ভারতীয় গোলটেবিল বৈঠকের পর যে মানুষটি প্রায় বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর কাছে নিঃসন্দেহে এটা কোন ছোট-খাটো লাভ নয়।" (সমগ্রন্থ; ১১০-১১১ পৃষ্ঠা।)

পূর্বোক্ত ভূমিকার পুষ্টি করবে বড়লাট লিনলিথগো বিভিন্ন ভারতসচিবের কাছে এ ব্যাপারে যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন তার থেকে নিম্নোক্ত তিনটি উদ্ধৃতি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বড়লাটের ভূমিকার পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উদ্ধৃতিগুলি হল: (৬ই এপ্রিল ১৯৪০) "আমি স্বীকার করছি যে আমার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হল মুসলমানদের (ভারত) বিভাজনের পরিকল্পনা নির্বুদ্ধিতার প্রতীক হলেও এই সময়ে ঐ পরিকল্পনাকে একেবারে ছি-ছি করা দুঃখদায়ক হবে। অবশ্য এটা স্পষ্ট যে ও পরিকল্পনাকে কেউ গ্রহণ করতে পারে না এবং আমরা নিজেদের ওর সঙ্গে যুক্তও করতে পারি না।" (১০ই জুন ১৯৪০) "এ ব্যাপারে পূর্বেরই মত গুরুত্বপূর্ণ যে মুসলমানদের ভূমিকাকে পরিপূর্ণ গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ সামরিক (বর্তমানে সৈন্যবাহিনীর শতকরা ৬০ ভাগ মুসলমান) দিক থেকে তাদের সাহায্য ও সমর্থন তো প্রয়োজনই, অন্য মুসলিম রাষ্ট্রে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি রেখেও এটা করা দরকার।" (১২ই অক্টোবর ১৯৪২) "মুসলিম লীগ যে সময়ে প্রত্যুতঃ বেসরকারী ভাবে যুদ্ধপ্রচেষ্টার সাহায্য করছে সে সময়ে শ্রীযুক্ত জিন্নাকে শত্রুভাবাপন্ন

না করা বিশেষ প্রয়োজন।" (সন্ধ্যা চৌধুরী কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ৬২ এবং ১৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত)।

ওয়ালি খাঁ-ও তাঁর গ্রন্থে সীমান্ত প্রদেশের গভর্নর কানিংহামের ডায়েরী উদ্ধৃত করে সরকারী স্তরে ভেদনীতি প্রয়োগের বহু ঘটনার উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ৬১-৭০)। এছাড়া লীগের পাকিস্তান পরিকল্পনার আসল রচয়িতা যে বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য জাফরুল্লা খাঁ এবং লিনলিথগো-এর নির্দেশে তিনি নিজের ভূমিকা গোপন রেখে এই কাজ করেন—এই তথ্যও সীমান্ত গান্ধীর পুত্র দিয়েছেন (সমগ্রন্থ ; পৃঃ ২০-৩০)।

৩০. জোশী ; কংগ্রেস লীগ মিলনের পূর্বে স্বাধীন হও ; বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, কলকাতা। প্রকাশকালের উল্লেখ নেই। তবে গান্ধী-জিন্না আলোচনার ব্যর্থতার পর লিখিত।

৩১. অধিকারী ; Pakistan and National Unity। কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় কমিটি কর্তৃক পুস্তকটির বঙ্গানুবাদও প্রকাশিত হয়।

৩২. অনীতা ইন্দর সিং, The Origins of the Partition of India 1936—1947 ; অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, দিল্লী (১৯৮৭) ; পৃঃ ১২৮।

৩৩. "আজ দেখছি আমি একান্ত নিঃসঙ্গ। এমন কি সর্দার ও জওহরলালও মনে করেন যে আমি যেভাবে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করছি তা ভুল এবং ভারত-বিভাগ মেনে নিলে শান্তি ফিরে আসতে বাধ্য।...আমি যে বড়লাটকে বলেছি যে দেশ-বিভাগ যদি হয়ই তা যেন ব্রিটিশের হস্তক্ষেপে অথবা ব্রিটিশ শাসনাধীনে না হয়—তা তাঁদের পছন্দ হয় নি।...তাঁদের ধারণা আমার বুদ্ধি হয়ত বয়সের জন্য কাজ করছে না।...আমি হয়ত দেখার জন্য বেঁচে থাকব না—তবে আমি যে সর্বনাশের আশঙ্কা করছি তা যদি ভারতবর্ষকে গ্রাস করে এবং তার স্বাধীনতা যদি বিপন্ন হয়, তাহলে ভবিষ্যদ্বংশীয়রা যেন জানতে পারেন যে তার কথা চিন্তা করেই এই বৃদ্ধের হৃদয় কী পরিমাণ ব্যথা-বেদনা ভোগ করেছে। **একথা যেন বলা না হয় যে গান্ধী ভারতবর্ষের জীবন্ত ব্যবচ্ছেদের জন্য দায়ী ছিল।**" (প্যারেলাল ; Last Phase ; দ্বিতীয় খণ্ড ; পৃঃ ২১০ ২১১। নিম্নরেখ প্যারেলালের)। দেশবিভাজনের ব্যাপারে গান্ধীর ভূমিকা সম্বন্ধে সন্ধ্যা চৌধুরীর পূর্বোক্ত গ্রন্থও দ্রষ্টব্য।

৩৪. অসহায় অবস্থায় ভারত-বিভাগে সম্মত হওয়া সম্বন্ধে নেহেরুর একটি উক্তি —"মাথাব্যথার উপশমের জন্য মাথাটাই কেটে ফেলা" (প্যারেলাল ; Last

Phase ; দ্বিতীয় খণ্ড ; পৃঃ ১৫৬) পূর্বেই উদ্ধৃত করা হয়েছে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর নেহেরু নিউ ইয়র্ক শহরে স্বীকার করেন যে দেশবিভাগজনিত দুর্দশার কথা যদি তাঁরা অনুমান করতে পারতেন তাহলে এতে সম্মত হতেন না (সমগ্রন্থ ; পৃঃ ২৫৬)। নেহেরুর দিক থেকে তাঁর অন্যতম জীবনীকার মাইকেল ব্রেচার (Nehru—A political Biography ; অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫৯) এই বিষয়টির বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে নেহেরুর ভারত বিভাগে রাজী হবার কারণ : (১) শোচনীয় গৃহযুদ্ধের আতঙ্ক ; (২) নিরীহ নাগরিকদের হত্যার তুলনায় দেশ-বিভাগ বাঞ্ছনীয় ; (৩) ভারতের সম্মুখস্থ সমস্যাবলী এমন গুরুতর ধরণের যে তার সমাধানে দেশবাসীর হাতে আসল ক্ষমতা আসার প্রক্রিয়াকে আর বিলম্বিত করা চলে না ; (৪) এই উৎকণ্ঠা যে "তাদের (লীগ প্রতিনিধিদের) যদি কেন্দ্রীয় সরকারে বাধ্য হয়ে রাখতে হয়, তাহলে কোন প্রগতি বা (জাতীয় উন্নয়নের) পরিকল্পনা করা সম্ভব হবে না।" ; (৫) পাঞ্জাব ও বঙ্গের বিভাজনের জন্য প্রদেশদ্বয়ের সংখ্যালঘুদের কাছ থেকে জরুরী ও অবিরত আবেদন যে তাঁদের প্রস্তাবিত পাকিস্তানে চিরতরে পক্ষপাতের শিকার এবং এমন কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করা হোক , (৬) ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সম্ভাবনাই তখনকার ঐ পরিবেশে ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে—অন্ততঃ বিলম্বিত তো হবেই ; (৭) জোর করে ঐক্য স্থাপনা করা যায় না ইত্যাদি। (পৃঃ ৩৭৬-৩৭৭)। ব্রেচারের মতে ঐ সাতটি কারণ ছাড়া নিম্নোক্ত পরিস্থিতিও নেহেরুকে প্রভাবিত করে : (ক) সে সময়ে ভারতবর্ষে প্রচলিত ব্যাপক বিশ্বাস যে দেশবিভাগ স্বল্পকাল-স্থায়ী ব্যাপার হবে এবং পাকিস্তান নিজের শক্তিতে টিকে থাকতে অক্ষম ; (খ) কংগ্রেস মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাবকে বাতিল করলে ব্রিটিশ সরকার তার থেকেও খারাপ অপর কোন পরিকল্পনা ভারতের উপর চাপিয়ে দিতে পারে এবং (গ) কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে দীর্ঘকাল সংগ্রামের পর ক্ষমতা পাবার আকাঙ্ক্ষা (পৃঃ ৩৭৮-৩৭৯)। ব্রেচার এও মন্তব্য করেছেন যে, "ক্ষমতালাভরূপী পুরস্কার প্রাপ্তির" জন্য নেহেরু ও প্যাটেল দেশবিভাগে সম্মত হন (পৃঃ ৩৭৯)।

৩৫. ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে নাগপুরে এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের শাসনকালীন বস্তার নামক দেশীয় রাজ্যকে (বর্তমানে মধ্যপ্রদেশের একটি জেলা) ব্রিটিশ রাজকর্মচারীরা (পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের) নিজামকে ইজারা দেবার গোপন ষড়যন্ত্র পাকা করে ফেলেছিলেন এবং ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে তিনি ফাইল তলব করা সত্ত্বেও বার বার তাঁর আদেশ উপেক্ষা করার কাহিনী বর্ণনা করার

পর সর্দার বলেন : "পলিটিকাল ডিপার্টমেন্টের ষড়যন্ত্রের ফলে আমাদের স্বার্থ কেমন ভাবে সর্বপ্রকারে ব্যাহত হচ্ছে তার সম্বন্ধে একমাত্র তখনই আমি পূর্ণমাত্রায় সচেতন হলাম এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে যত তাড়াতাড়ি আমরা এসবের হাত থেকে মুক্তি পাই, আমাদের পক্ষে তত মঙ্গল। আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, এমন কি দেশবিভাজনের মূল্যেও ঐসব বিদেশীদের ভারত ত্যাগকে ত্বরান্বিত করা শ্রেয়।" ২৫শে নভেম্বর ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের এক সভায় বল্লভভাই বলেন, "আমার মনে হয়েছিল যে আমরা যদি ভারত বিভাগ স্বীকার না করি, তাহলে দেশ টুকরো টুকরো হয়ে এবং সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। অন্তর্বর্তী সরকারের এক বৎসরের অভিজ্ঞতা আমাকে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত করেছিল যে আমরা যেভাবে চলছিলাম তার পরিণাম অবধারিত সর্বনাশ। সে অবস্থায় একটি নয়, একাধিক পাকিস্তানের সৃষ্টি হত। প্রতিটি দপ্তরে পাকিস্তান সেল-এর সৃষ্টি হত।" আরও দুই বছর পর (নভেম্বর, ১৯৪৯ খ্রীঃ) গণপরিষদে এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি জানান যে পাঞ্জাবের জনৈক পক্ষপাতগ্রস্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকেও বদলি করানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ছোটলাটের বিশেষ অধিকারের জন্য। দ্বিতীয় সমস্যা ছিল দেশীয় রাজ্যসমূহের উপর ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের (paramouncy)। অতঃপর তিনি বলেন, "যখন আমরা এমন এক অবস্থায় উপনীত হই যে সবকিছু হারাতে হবে—তখন শেষ উপায় হিসাবে আমি দেশবিভাগে সম্মত হই।" (প্যারেলাল ; সমগ্রন্থ ; দ্বিতীয় খণ্ড ; পৃঃ ১৫৩-১৫৪)

৩৬. কংগ্রেস সভাপতি কৃপালনীর বক্তব্য : "আজও আমি মনে করি যে একান্ত নির্ভীকতার জন্য তাঁর (গান্ধীর) কথাই যথার্থ এবং আমার ভূমিকা ত্রুটিমুক্ত। তবু কেন আমি তাঁর সহযাত্রী নই? এর কারণ হল এই যে আমার মতে এখনও তিনি ব্যাপক ভিত্তিতে এই সমস্যার (সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার) সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করতে সক্ষম হন নি।" (কংগ্রেস বুলেটিন সংখ্যা ৪, ১০ই জুলাই ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ, পৃঃ ৯। শঙ্খধর কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠায় এবং ব্রেচার কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের ৩৭৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত)। "মৌলানা আজাদ স্বীকার করেছিলেন, 'সে সময়ে বাপুর কথায় কর্ণপাত না করা আমাদের পক্ষে এক বিরাট ভ্রান্তি হয়েছিল।' ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেছিলেন. 'আমরা যদি বুঝতে পারতাম!' " (প্যারেলাল ; Last Phase ; দ্বিতীয় খণ্ড ; পৃঃ ২৫৬)।

নির্ঘণ্ট